ইসলাম
ও
আধ্যাত্মিকতা

403787

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ইসলাম
ও
আধ্যাত্মিকতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ'২০০৬

তত্ত্বাবধায়ক

মুহাম্মদ আব্দুল মালেক

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

GIFT

403787

উপস্থাপনায়

মোঃ ইব্রাহীম খলিল

এমফিল ২য় বর্ষ

রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১১১/৯৭-৯৮

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Library

403787

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ ইব্রাহীম খলিল, পিতা : মোঃ তাফাজ্জুল হোসেন মিঞা, এমফিল দ্বিতীয় বর্ষ, রেজিস্ট্রেশন নম্বর – ১১১/৯৭-৯৮ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে এমফিল ডিগ্রী লাভের জন্য **'ইসলাম ও আধ্যাত্মিকতা'** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় লিখিত হয়েছে। এটি গবেষকের মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটি একটি একক গবেষণা, কোন যুগ্ম গবেষণা কর্ম নয়। আমার জানামতে, উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা লাভের জন্য উপস্থাপিত হয় নি।

আমি এর প্রতিটি অধ্যায় আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং এমফিল ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের লক্ষ্যে জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

১৮.১১.২০০৬

(মুহাম্মদ আব্দুল মালেক)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

403787

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

বাবা

অধ্যক্ষ মওলানা তাফাজ্জুল হোসাইন শাকুরী

মা

বেগম নূরজাহান হোসাইন

সপ্তসহোদর

শাহ মোঃ নাজমুল হাসান

মাসুম বিল্লাহ

মোঃ মোতাসিম বিল্লাহ

মুর্শিদুল আহসান

মামুন হাসান

মারুফ হাসান

মাহফূয হাসান

ভাবি

নাসিমা সুলতানা

ভ্রাতুস্পুত্রদ্বয়

নাঈম হাসান

সাঈম হাসান

নিত্য শুভার্থী

মৌসুমী

এবং

আমার সকল শিক্ষক–শিক্ষিকাকে ....

আল্লাহ তাঁদের ইহ ও পরকালের জীবন শান্তিময় করুন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি বর্ণায়ন

মূল বর্ণ	প্রতি বর্ণায়ন	মূল বর্ণ	প্রতি বর্ণায়ন	মূল বর্ণ	প্রতি বর্ণায়ন
a	এ, আ	o	অ, ও	ز	য
ay	ে	p	প	س	ছ
b	ব	r	র, ড়, ঢ়	ش	শ
bh	ভ	s	স	ص	ছ
c	ক, স	sh	শ	ض	দ
ch	চ	t	ট	ط	ত
d	ড / দ	th	দ, থ, ছ	ظ	য
dh	ধ	u	উ	ع	'আ 'ই 'উ
dj	জ	v	ভ	غ	গ
f	ফ	w	ওয়া	ف	ফ
g	গ / জ	y	ে / আই	ق	ক
gh	ঘ	z	জ	ك	ক
h	হ	ا	অ, আ	ل	ল
i	ই / আই	ب	ব	م	ম
j	য	ت	ত	ن	ন
jh / zh	ঝ	ث	ছ	و	ওয়া
k / q	ক	ج	জ	ه	হ
kh	খ	ح	হ	لا	লা
l	ল	خ	খ	ء	আ
m	ম	د	দ	ي	য়্যা /ইয়া
n	ন	ذ	য		
o	ও অ	ر	র, ড়, ঢ়		

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচী

অপ্র : অপ্রকাশিত
আ : আলাইহি ওয়া সালাম
ইং : ইংরেজি
বাং : বাংলা
হি : হিজরি
খৃ / খ্রি : খৃষ্টাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ
খৃ পূ : খৃষ্ট পূর্ব
জ : জন্ম
মৃ : মৃত্যু
সা : সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রা : রাদিআল্লাহু আনহু / রাদিআল্লাহু আনহুম / রাদিআল্লাহু আনহা / রাদিআল্লাহু আনহুন্না
রহ : রহমাতুল্লাহু আলাইহি / রহমাতুল্লাহু আলায়হা
ড : ডক্টর
অনূ : অনূদিত
অনু : অনুবাদ
পৃ : পৃষ্ঠা
ইফাবা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রাগুক্ত : পূর্বে কথিত বা উল্লিখিত
টী. : টীকা
v. : Volume
p : page
pp. : pages
ibid : in the same book or same piece of writing as the one that has just been mentioned (from latin 'ibidem).
op.cit. : used in formal writing to refer to a book or an article that has already been mentioned.

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের রব আল্লাহ তাআলার জন্য, যাঁর অপার অনুগ্রহে আমরা বেঁচে আছি। দুরূদ ও সালাম বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সা) এর প্রতি, যাঁর মাধ্যমে আমরা জেনেছি মুক্তির শাশ্বত পথ সিরাতুল মুস্তাকীমের সন্ধান। অপরিসীম দুআ আমার মা আর বাবার জন্য, যাঁদের স্নেহ – মমতা আমাকে পৃথিবীর আলোয় নিয়ে এসেছে, বড় করেছে আর মানুষ হওয়ার প্রেরণা দিয়েছে নিরন্তর।

আমার এ গবেষণা কর্মটি অনেক আগেই সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত নানা অসুবিধা ও ঝামেলার কারণে কোনভাবে কাজটি আমি শুরুই করতে পারছিলাম না। এভাবে একসময় এর ব্যাপারে আমি পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম এবং কখনোই ভাবি নি, এ কাজটি কোনদিন আমি সম্পন্ন করতে পারব। আলহামদুলিল্লাহ, শেষ পর্যন্ত গবেষণা কর্মটি আমি সমাপ্ত করতে পেরেছি। এ জন্যে অপরিসীম কৃতজ্ঞতা জানাই আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক এবং প্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল মালেক স্যারকে। শেষ পর্যন্ত তিনি আমার ব্যাপারে আশা না রাখলে এবং অনুগ্রহ করে তাঁর অধীনে আমাকে দীর্ঘ সময় নিয়ে গবেষণা করার সুযোগ না দিলে আমার পক্ষে এ কাজটি করার কোন সুযোগই থাকত না। বিশেষত অসুস্থ শরীর এবং পারিবারিক অনেক ঝামেলা থাকা সত্ত্বেও স্যার আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটির প্রতিটি লাইন যেভাবে পড়েছেন, প্রতিটি শব্দের ব্যাপারে যেভাবে তাঁর মতামত ও পরামর্শ দিয়েছেন তাতে আমি তাঁর প্রতি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। এতটা নিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা ও আন্তরিকতার দায় কোন কৃতজ্ঞতা দিয়েই শোধ হতে পারে না। পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে আমি স্যারের দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক সফলতা কামনা করি। তাঁর সকল নেক মাকসূদ পূর্ণ হোক অহর্নিশি এ দুআই করি।

আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার বাবা মাওলানা তাফাজ্জুল হুসাইন শাকুরী, মা নূরজাহান শাকুরী, বড় ভাই শাহ মোঃ নাজমুল হাসান, ভাবি নাসিমা সুলতানা, ছোট ভাই মাসুম বিল্লাহ, মুতাসিম বিল্লাহ, মুর্শিদুল আহসান, মামুন হাসান, মারুফ হাসান এবং মাহফুয হাসানকে। কাজটি করার ক্ষেত্রে আমাকে তারা নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে আমার বাবা সবসময় গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়েছেন। আমার মা আমাকে ছাড়া কোন উৎসব–আনন্দ করেন না। গবেষণা কাজ সম্পন্ন করার জন্য ঈদ–কুরবানীতে আমি বাড়ি যাই নি – তাও তিনি মেনে নিয়েছেন। সকলে মিলে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন বলেই আল্লাহর রহমাতে কাজটি আমি শেষ করতে পারলাম। এ ক্ষেত্রে তাঁরা যে সাহায্য করেছেন তার কোন বিনিময় হতে পারে না। আমার জীবনের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় কাতর আমার মা, বাবা, ভাবি ও ভাইয়েরা তাদের জীবনের সুখ–স্বাচ্ছন্দের একটা বড় অংশ ছাড় দিয়েছেন আমার গবেষণা কর্মের স্বার্থে। আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে তাদের সর্বাত্মক সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি চেয়ে মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে মুনাজাত করি। সুহৃদ মৌসুমী নিরন্তর তাগিদ আর উৎসাহ দিয়ে গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে আমার প্রেরণা হয়ে সঙ্গে ছিল। রাগে, অভিমানে, ক্ষোভে, উৎসাহে আমাকে আমার কাজ শেষ করার পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তার জন্য কোন কৃতজ্ঞতার ভাষাই যথেষ্ট নয়, আমি তাকে কৃতজ্ঞতা জানাতেও চাই না। কেবল সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে তার দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের জন্য দুআ করি।

আমার গবেষণা কাজে আমাকে অনেকেই নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। অনেকের দ্বারাই আমি নানাভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি। এঁদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ রুহুল আমীন, অধ্যাপক ডঃ আ ন ম রইসউদ্দীন, অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ আনসার উদ্দীন, অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল লতীফ স্যারদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। ড. রইস স্যার দেখা হলেই আমার থিসিসের খবর নিয়েছেন, তাড়াতাড়ি জমা দেয়ার জন্য তাড়া দিয়েছেন। প্রিয় বন্ধু

Dhaka University Institutional Repository

উমর ফারুক দূর প্রবাস থেকে নিয়মিত খবর নিয়েছে, প্রকাশক বন্ধু আবু জাফর সবসময় তাগিদ দিয়েছে, প্রিয় সতীর্থ হাসনা ফেরদৌসী উৎসাহ দিয়েছে, বিভাগের পিএইচডি গবেষক আবুল বাশার ভাই বিভিন্ন পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। আমার কলেজের অধ্যক্ষ প্রিয় প্রশাসক জনাব মোঃ আব্দুর রহমান বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত করেছেন। এ ছাড়াও প্রিয় বোন এবং বন্ধু নাহিদ সাবরিনা আলম, তাসকিন ফাতিমা, খাজা কামরুন নাহার ও ইসরাত জাহান পামেলা, সহকর্মীদের মধ্যে জোবেদা আখতার, মোঃ আসলাম মিয়া, কুলসুম আরা রুমি, মোঃ শরীফ, নূর বানু মুন্নী, সুমগ্না রশিদ, হাসিনা রাকিবা বানু, মোঃ হারুনুর রশিদ, শামীমা সুলতানা, মোঃ ফারুক এবং সাবেক সহকর্মী মোঃ মনিরুল হক খান, আসমা সিদ্দীকা মিলি, মোঃ মাসুদ হাসান, এস এম আশরাফুজ্জামান দোলা, হাদরুল আনাম সিদ্দিকী প্রমুখ সাহস দিয়ে, সহযোগিতা দিয়ে, বিভিন্নভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে কাজটি এগিয়ে নেয়ার নেপথ্য প্রেরণা হয়েছিলেন। এঁদের মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা আমার চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। আমার স্নেহাস্পদ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্নভাবে আমাকে এ কাজটি করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। বিভিন্ন সময়ে খোঁজ খবর নিয়েছে। আমাকে আমার যোগ্যতার চেয়েও বেশি সম্মান দিয়ে কাজটি করার প্রেরণা দিয়েছে। তাদের সকলের ভূমিকা আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। আল্লাহ তাদের জীবন সফলতায় উদ্ভাসিত করে তুলুন।

গবেষণা কর্মে আমি প্রয়োজনীয় অনেক বই ও নিবন্ধ-প্রবন্ধের উদ্বৃতি ব্যবহার করেছি। এ সকল গ্রন্থ ও নিবন্ধের বিজ্ঞ লেখকদের নিকট আমি সবিশেষ ঋণী। তাঁদের মধ্যে যাঁরা জীবিত আছেন আল্লাহ তাঁদের লেখার ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দিন। তাঁদের লেখায় ইসলামী জীবন দর্শন ও আদর্শ আরো সহজবোধ্য হয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপিত হোক এ দুআ করি। আল্লাহ তাঁদের হায়াত দরাজ করুন। হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন। লেখকগণের মধ্যে যাঁরা ইন্তিকাল করেছেন তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করি। পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ক্ষমা করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন।

অভিসন্দর্ভটিতে আমি বাংলা একাডেমী ও এনসিটিবির সমন্বিত উদ্যোগে প্রণীত পাঠ্য বইয়ের বানান রীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার স্বাধীন মত প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা করেছি। বিশেষতঃ আরবি শব্দের ক্ষেত্রে মূল উচ্চারণ যা হয় হুবহু তা লেখার চেষ্টা করেছি। যেমন সূরা 'আলে ইমরান' না লিখে আমি লিখেছি 'আলি ইমরান।' 'কায়েম' না লিখে লিখেছি 'কায়িম।' এ ছাড়াও বানানরীতিতে সাধারণভাবে বিদেশি শব্দে হ্রস্ব ই-কার ও হ্রস্ব উ-কার ব্যবহারের সিদ্ধান্ত থাকলেও আমি যের ও পেশের পরে সাকিনের উচ্চারণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ ই-কার ও দীর্ঘ উ-কার ব্যবহার করেছি। এ জন্য আমি কোথাও 'হাদিস, খলিফা, নবি, ইমান' ইত্যাদি না লিখে 'হাদীস, খলীফা, নবী, ঈমান' ইত্যাদি ব্যবহার করেছি। আরবি শব্দের বাংলা প্রতি বর্ণায়নে প্রচলিত মতের সাথে আমার ব্যক্তিগত মতের ভিন্নতা আছে। আল্লাহ তৌফিক দিলে এ বিষয়ে সহসাই আমি প্রয়োজনীয় লেখালেখি শুরু করা। গবেষকগণ সতর্কতার সাথে বিবেচনা করলে আমার অনুসৃত বানানরীতির যৌক্তিকতা মেনে নেবেন আশা করি।

আমার এ গবেষণা কর্মে যা কিছু ভালো এবং সঠিক তাঁর সবই পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার অসীম করুণার ফলশ্রুতি। আর এর মধ্যে যা কিছু ভুল-ভ্রান্তি , তার সবকিছুরই দায় শুধু আমার। আল্লাহ তাআলা সকল ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করে আমার এ ক্ষুদ্র কাজটুকু কবুল করুন। আমীন।

(মোঃ ইব্রাহীম খলিল)
এমফিল দ্বিতীয় বর্ষ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রত্যয়ন পত্র
উৎসর্গ পত্র
প্রতি বর্ণায়ন
সংকেত সূচী
কৃতজ্ঞতা স্বীকার
সূচীপত্র
ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় : ইসলাম পরিচিতি ১৩ - ৪৫
ভূমিকা
ইসলাম অর্থ
ইসলামের সংজ্ঞা
'ইসলাম আল্লাহ মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা'
'পৃথিবীর সকল নবী–রাসূলের প্রচারিত জীবনব্যবস্থা ইসলামই ছিল'
'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা'
ইসলামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

দ্বিতীয় অধ্যায় : আধ্যাত্মিকতা পরিচিতি ৪৬- ৬৯
ভূমিকা
আধ্যাত্মিকতা অর্থ
আধ্যাত্মিকতার সংজ্ঞা
বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনে আত্মা এবং আধ্যাত্মিকতা : পর্যালোচনা

তৃতীয় অধ্যায় অধ্যায় : আল কুরআনে আধ্যাত্মিকতা ৭০– ১০৭
ভূমিকা
আল কুরআন পরিচিতি
কুরআনী আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন দিক

চতুর্থ অধ্যায় : আল হাদীসে আধ্যাত্মিকতা ১০৮ – ১৩৪
ভূমিকা
হাদীস পরিচিতি
হাদীসে ইসলামী আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন দিক

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় : ইসলামী আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ ও প্রকৃতি ১৩৫ – ২১৩

ভূমিকা
ঈমান ও আধ্যাত্মিকতা
ইবাদত ও আধ্যাত্মিকতা
সালাত
যাকাত
সাওম
হাজ্জ
আখলাক হাসানাহ ও আধ্যাত্মিকতা
তাকওয়া
সিদক ও কিযব
সবর
ইহসান
যিকর
শুক্‌র
কর্তব্যপরায়ণতা
হালাল উপার্জন, হারাম উপার্জন
তাযকিয়া নফস, তাসাউফ ও আধ্যাত্মিকতা
তাযকিয়া নফস পরিচিতি
তাসাউফ পরিচিতি
তাসাউফের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
তাসাউফ ও শরীআত

ষষ্ঠ অধ্যায় : কয়েকজন বিখ্যাত আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ২১৪ – ২৬৬

ভূমিকা
হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র)
হযরত খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী (র)
হযরত শেখ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র)
হযরত শাহজালাল (র)
হযরত খানজাহান (র)

উপসংহার ২৬৭ – ২৬৮

গ্রন্থপঞ্জী ২৬৯ – ২৭২

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার খলীফা। মানুষকে আল্লাহ মর্যাদা দিয়েছেন, শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ তার জ্ঞান। আদম (আ) কে সৃষ্টির পর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের উপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার যে ব্যবস্থা করেছিলেন তার ভিত্তি ছিল জ্ঞান। আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান দিয়েছেন। বিবেক দিয়েছেন। বিবেককে জ্ঞানের এবং জ্ঞানকে বিবেকের অনুসারী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও নির্দেশনা দিয়েছেন।

পৃথিবীর বিশাল প্রাঙ্গণের সকল কিছু আল্লাহ তাআলা মানুষের সুখ ও সম্ভোগের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সকল প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক সৃষ্টি মানুষের সুখ সুবিধার অনিবার্য উপাদান। পৃথিবীর বিশাল প্রাঙ্গণে বিপুল এ নিআমতরাশিসহ মানুষকে প্রেরণ করেই আল্লাহ তাআলা তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন নি। বরং মানুষের জন্য চিরশান্তির জীবন বিধান ইসলাম প্রদান করেছেন। মানুষকে বল্গাহীন ও ইচ্ছাস্বাধীনভাবে জীবন পরিচালনা করার অনুমতি দেন নি। নিআমত দিয়েছেন, নিআমত ব্যবহারের পথ ও পদ্ধতিও বলে দিয়েছেনে।

মানুষের জীবন ধারা গতিশীল। প্রতিনিয়ত এতে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটে। সে জন্যে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য প্রদত্ত তাঁর বিধানটিকে ক্রমান্বয়ে পূর্ণতা দান করেছেন। প্রথম মানুষ যখন পৃথিবীতে আসে সে সময়ে একসাথে সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে দেন নি। বরং সে সময়ের মানুষের সকল সমস্যার প্রয়োজনীয় সমাধান দিয়েছেন। তাদের জন্য প্রযোজ্য হিদায়াত প্রদান করেছেন। এভাবে মানুষ বেড়েছে, মানুষের সমস্যা বেড়েছে, পৃথিবীর পরিবেশ, প্রেক্ষিত ও প্রকৃতি বদলে গেছে, বদলে গেছে মানুষের সমস্যার ধরন-ধারণ। সকল পরিবর্তনের মূল কারণ আল্লাহ তাআলা এ সকল পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিধান দেয়ার জন্য যুগে যুগে পাঠিয়েছেন পথ প্রদর্শক অসংখ্য নবী-রাসূল (আ)।

এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে নবী রাসূলগণ তাঁদের দাওয়াত পেশ করেছেন। বিধান বাস্তবায়ন, সমস্যার প্রকৃতি এবং তার সমাধানের ধরন যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের এ আহ্বান ছিল সকল যুগে অভিন্ন এবং এক।

নবী – রাসূলগণের (আ) মাধ্যমে মানুষকে হিদায়াত দেয়ার যে ধারা আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আ) এর মাধ্যমে শুরু করেছিলেন – তিনিই তাঁর সমাপ্তি টেনেছেন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) কে প্রেরণের পর আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূল প্রেরণের ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। এরপর আর কোন নবী আসবেন না। নতুন কোন বিধানও আসবে না। সাথে সাথে এই ঘোষণাও দিয়েছেন যে, এত দীর্ঘ পথপরিক্রমার পর এতদিনে জীবনব্যবস্থা হিসেবে আল্লাহর দেয়া বিধান ইসলাম পরিপূর্ণতা অর্জন করল। এরপর এমন কোন সমস্যা উদ্ভূত হবে না, এমন কোন বিষয় উদঘাটিত হবে না, মানুষের জীবনে এমন কোন দিক ও বিভাগ উন্মোচিত হবে না, যার সমাধান ও নির্দেশনা ইসলামে থাকবে না। বরং যে সমস্যা আসুক, যে বিষয় উদঘাটিত হোক, জীবনের জন্য নতুন যে বিভাগ ও দিকই উন্মোচিত হোক – সে সমস্যাসমূহের প্রতিটির বিস্তারিত, যুক্তিসঙ্গত, বিজ্ঞানসম্মত এবং মানবিক সমাধান ইসলামে থাকবেই।

মানুষের জীবন মূলত বহুমাত্রিক বিচিত্র সমস্যা ও সম্ভাবনার এক অপূর্ব সমন্বয়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক, ইহলৌকিক, পারলৌকিক, আধ্যাত্মিক সহ মানুষের এ জীবনের অসংখ্য দিক রয়েছে। একটি জীবনব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হতে হলে তার মধ্যে মানুষের জীবনের উল্লিখিত প্রতিটি দিকের সকল সমস্যার প্রয়োজনীয় সমাধান থাকতে হবে।

পৃথিবীতে অসংখ্য মত, পথ ও ধর্ম রয়েছে। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ প্রভৃতি মতবাদ রয়েছে; ইহুদী, খৃষ্ট, বৌদ্ধ, সনাতন, শিখ, পারসিক, জৈন প্রভৃতি ধর্ম রয়েছে। কিন্তু এ সকল মতবাদের কোন একটিও মানুষের জীবনের সকল সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান দেয় না। পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালায়। এ ছাড়া জীবনের যে আরো অনেক সমস্যা আছে এ মতবাদগুলো তা স্বীকারও করে না। স্বাভাবিকভাবেই এ সকল সমস্যা সমাধানে এ মতবাদগুলোর কোন নির্দেশনা নেই। গণতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ ও রাজতন্ত্র রাজনৈতিক মতবাদ। এগুলো আবার অর্থনীতি, ধর্মনীতি

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি সম্পর্কে কোন মতামত পেশ করে না। উল্লেখিত সকল ধর্ম আনুষ্ঠানিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং সুনির্দিষ্ট কিছু নৈতিক নীতিমালার কথা বললেও মানুষের রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজ ও আন্তর্জাতিক বিশ্বব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বলে না। যে কারণে এগুলোর একটিও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা নয়। এমনকি এ মতবাদ ও ধর্মের ধারক–বাহক প্রচারকগণ তেমন দাবিও করেন নি।

এ সবকিছুর মধ্যে ইসলাম জীবনব্যবস্থা ও ধর্ম হিসেবে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কেননা ইসলাম দাবি করে, সে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। কাজেই মানুষের জীবনের সকল দিকের বিস্তারিত সমাধান ইসলামে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আল কুরআন ও আল হাদীসের সুস্পষ্ট ঘোষণা, প্রদত্ত হুকুম–আহকাম, নীতি–দর্শন এবং মুসলমানগণ সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা, গবেষণা ও দীর্ঘদিনের অনুশীলনের ভিত্তিতে প্রমাণ করতে পেরেছেন যে, প্রকৃতই ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা বলেই জীবনের অন্যান্য দিকের মত আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে এর রয়েছে নিজস্ব বিস্তারিত দর্শন এবং সে দর্শন কোনভাবেই ইসলামের মূল চেতনা বিরোধী নয় বরং মূল চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও পরিপূরক। ইসলামের মূল চেতনা হল তাওহীদের চেতনা। এ জীবনব্যবস্থার সকল বিধি–বিধান, শিক্ষা–আদর্শ, নীতি–দর্শন, হুকুম আহকাম – সব কিছু এ চেতনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। ইসলাম রিসলাত, আখিরাত, কিতাব, মালাইকা, তাকদীর, কিয়ামাত প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্বাস করার কথা বলে। কিন্তু তাওহীদ ছাড়া এর কোটিতে বিশ্বাসই অর্থবহ হয় না। কাজেই ইসলাম যদি আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে বিধান দিয়ে থাকে – এবং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে তা সে অবশ্যই দিয়েছে – তা হলে সে বিধান কোনভাবেই তাওহীদ বিরোধী হতে পারবে না।

বর্তমানে ইসলামী আধ্যাত্মিকতার নামে বাংলাদেশ এবং বিশ্বে যা হচ্ছে সেগুলো অনেকাংশেই তাওহীদের এই মূল চেতনা পরিপন্থী। বিভিন্ন ওলী–দরবেশকে উপজীব্য করে তৈরি করা হচ্ছে শিরকের ভয়ঙ্কর বলয়। সন্তান, সম্পদ, সমৃদ্ধি, সুস্থতা আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়ার পরিবর্তে তাদের কাছে চাওয়া হচ্ছে। পৌত্তলিকতার আদলে পূজা হচ্ছে কারো কারো কবরে। কেউ কেউ ধৃষ্টতা দেখিয়ে এতদূর পর্যন্ত বলছে, একটা পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পর তাদের আর প্রকাশ্য ইবাদত না করলেও চলে। অথচ আল্লাহর রাসূল (সা) জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত প্রকাশ্য ইবাদতের ক্ষেত্রে পরম নিষ্ঠাবান ছিলেন। আবার রাতের পর রাত নির্ঘুম থেকে সালাতে, তাসবীহ পাঠে, কুরআন তিলাওয়াতে অতিবাহিত করেছেন। বিয়ে করেছেন, সংসার করেছেন। রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। পিতা, স্বামী, বন্ধু, আত্মীয়, প্রতিবেশী, রাষ্ট্রপ্রধান, নেতা, যোদ্ধা, সহচর, ব্যবসায়িক অংশীদার প্রভৃতি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করেছেন আবার সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য সাধনায় নিবেদিত হয়েছেন।

মহানবী (সা) হলেন ইসলামের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। ইসলামের সকল নীতি, দর্শন, সুনীতি, আদর্শ, হুকুম–আহকাম আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারে তিনি নিজ জীবনে বাস্তব করে তুলেছিলেন। তাঁর চেয়ে বেশিকিছু করা কারো জন্য উচিত নয়, করা সম্ভবও নয়। আর তিনি যা করেন নি এমন কিছু করতে যাওয়া, করতে চাওয়া ইসলাম সমর্থন করে না । কাজেই ইসলামী আধ্যাত্মিকতার নামে বর্তমানে যা কিছু করা হচ্ছে তাকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর আদর্শের আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে এ ব্যাপারে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করা এবং এভাবে একটি ভয়াবহ শিরক ও পথভ্রষ্টতা থেকে নিজেদেরকে এবং মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা।

আমার এ গবেষণা কর্মটি ইসলামী আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত রূপ নিরূপণের একটি ক্ষুদ্রতম প্রয়াস। আশা করি আপামর জনগোষ্ঠীকে আধ্যাত্মিকতার নামে ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ করা থেকে দূরে রাখার ক্ষেত্রে এ প্রয়াসটি সামান্যতম হলেও সহযোগিতা করবে। তারা শিরকের ব্যাপারে আরো সচেতন হবে। অথবা এর পথ ধরে আরো কার্যকর ও প্রভাবশালী নতুন নতুন লেখা প্রকাশিত হবে, নবতর গবেষণা পরিচালিত হবে। আমার এ প্রত্যাশার অণুমাত্রও যদি বাস্তব হয়ে ওঠে আমি আমার শ্রমকে সার্থক মনে করব।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় :

ইসলাম পরিচিতি

- ভূমিকা
- ইসলাম অর্থ
- ইসলামের সংজ্ঞা
- 'ইসলাম আল্লাহ মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা'
- 'পৃথিবীর সকল নবী–রাসূলের প্রচারিত জীবনব্যবস্থা ইসলামই ছিল'
- 'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা'
- ইসলামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত; আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। তিনি তাঁর পরম অনুগ্রহের প্রকাশ ঘটিয়ে মানুষকে এ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। মানুষের সুখ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য পৃথিবীর আর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন তিনি। সৃষ্টি বৈচিত্র্য, ক্ষমতা, স্বাধীনতা, সৌন্দর্য, জ্ঞান, বিবেচনাবোধ প্রভৃতি দিক দিয়ে মানুষকে তিনি বিশেষত্ব দিয়েছেন। নির্বাচিত করেছেন নিজের খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত হিসেবে। তাদের হাতে দিয়েছেন দুনিয়া জাহানের শাসন ভার। দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁর হুকুম আহকাম পালন ও প্রতিষ্ঠা করার। মানুষ ছাড়া আর কোন প্রজাতির সৃষ্টিকেই আল্লাহ তাআলা এমন সম্মানে সম্মানিত করেন নি। কুরআন মাজীদে মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্বের কথা আল্লাহ বহুভাবে বিবৃত করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে – "তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত, দিন, সূর্য ও চাঁদকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই নির্দেশে। ..... আর তিনি বিবিধ প্রকার বস্তুও যা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন।"[১]

"আমি তো আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিযক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"[২]

"তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন? মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে। তাদের না আছে পথনির্দেশক আর না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব।"[৩]

"দয়াময়, তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ, তিনিই কথা বলতে করতে শিখিয়েছেন।"[৪]

"তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়াতে খলীফা করেছেন। তাই কেউ কুফরী করলে তার কুফরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কাফিরদের কুফরী কেবল তাদের রবের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী তাদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়।"[৫]

"হে দাউদ! আমি তোমাকে দুনিয়াতে খলীফা করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর, খেয়াল খুশির অনুসরণ কর না – কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচারদিনকে ভুলে বসে আছে।"[৬]

"তিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার খলীফা করেছেন এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কাউকে কাউকে কারো কারো উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। তোমার প্রতিপালক তো শাস্তি প্রদানে দ্রুত আর তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ময়।"[৭]

"স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাকে বললেন – 'আমি দুনিয়াতে খলীফা সৃষ্টি করছি।"[৮]

তবে মানুষকে আল্লাহ তাআলা সত্যিকারার্থে যা দিয়ে সম্মানিত করেছেন তা হল ইসলাম। সৃষ্টির উষালগ্নে মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণের প্রথম প্রহরে মানুষ যখন পৃথিবীর অজানা জীবন যাপন সম্পর্কে শংকায়, আতঙ্কে মুহ্যমান ছিল তখন আল্লাহ তাদেরকে অভয় বাণী দিয়েছেন – "আমি বললাম, তোমরা সকলে এখান থেকে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সৎপথের কোন নিদর্শন আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"[৯] আল্লাহ তাআলার এই প্রতিশ্রুত সৎপথের নিদর্শন ও নির্দেশই হল ইসলাম। যেমন ইরশাদ হয়েছে – "নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন।"[১০] মানুষের জীবনে এবং দুনিয়া ব্যবস্থাপনায় ইসলাম তাই আল্লাহ নির্দেশিত শান্তি ব্যবস্থা।

---

[১] আল কুরআন / ১৬: ১২-১৪
[২] আল কুরআন/১৭: ৭০
[৩] আল কুরআন /১৭: ২০
[৪] আল কুরআন / ৫৫: ১-৪
[৫] আল কুরআন /৩৫: ৩৯
[৬] আল কুরআন /৩৮: ২৬
[৭] আল কুরআন /৬: ১৬৫
[৮] আল কুরআন /২: ৩০
[৯] আল কুরআন / ২ : ৩৮-৩৯
[১০] আল কুরআন / ৩: ১৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম অর্থ

"বিশ্বের প্রধান ধর্মসমূহের মধ্যে একমাত্র ইসলামই বিশিষ্ট নামকরণের অধিকারী। 'ইসলাম' এই একটি মাত্র শব্দের মধ্যে এই ধর্মের প্রাণশক্তি স্পন্দিত, এর মহিমা বিচ্ছুরিত। মুসলিম জাতির জীবনধারা, কর্মপদ্ধতি, আদর্শ – এক কথায় এ জাতির প্রেরণা ও কর্মচাঞ্চল্য, ত্যাগ ও তিতিক্ষা, সাধনা ও সাফল্য এই একটি মাত্র শব্দে বিধৃত হয়েছে। তাই ইসলাম শব্দটি গভীর তাৎপর্যবহ ও ব্যাপক ব্যঞ্জনাময়।"[১১]

দুনিয়ায় যতরকম ধর্ম রয়েছে তার প্রত্যেকটির নামকরণ হয়েছে কোন বিশেষ ব্যক্তির নামে অথবা যে জাতির মধ্যে তার জন্ম হয়েছে তার নামে। যেমন ঈসায়ী ধর্মের নাম রাখা হয়েছে তার প্রচারক ঈসা (আ) এর নামে। বৌদ্ধ ধর্মমতের নাম রাখা হয়েছে তার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা বুদ্ধের নামে। জরদশতি ধর্মের নামও হয়েছে তেমনি তার প্রতিষ্ঠাতা জরদশতের নামে। আবার ইয়াহুদী ধর্ম জন্ম নিয়েছিল ইয়াহুদা নামে বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে। দুনিয়ায় আরো যে সব ধর্ম রয়েছে, তাদেরও নামকরণ হয়েছে এমনিভাবে। অবশ্যি নামের দিক দিয়ে ইসলামের রয়েছে একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। কোন বিশেষ ব্যক্তি অথবা জাতির সাথে তার নামের সংযোগ নেই। বরং ইসলাম শব্দটির অর্থের মধ্যে আমরা একটি বিশেষ গুণের পরিচয় পাই, সেই গুণই প্রকাশ পাচ্ছে নামে। "নাম থেকেই বুঝা যায় যে, ইসলাম কোন এক ব্যক্তির আবিষ্কার নয়, কোন এক জাতির মধ্যে এ ধর্ম সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম কোন ব্যক্তি, দেশ অথবা জাতির সম্পত্তি নয়। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে ইসলামের গুণরাজি সৃষ্টি করা। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক কওমের যে সব খাঁটি ও সৎলোকের মধ্যে এ সব গুণ পাওয়া গেছে, তাঁরা ছিলেন মুসলিম। এ ধরনের লোক আজো রয়েছেন, ভবিষ্যতেও থাকবেন।"[১২]

ইসলাম শব্দটি আরবি সলম ধাতু হতে উৎপন্ন। সলম ধাতুর মূল অর্থ হল "শান্ত হওয়া, বিশ্রামে থাকা, কর্তব্য নিষ্পন্ন করা, দিয়ে দেয়া, পূর্ণ শান্তিতে থাকা।"[১৩] এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল শান্তি, আপোষ, বিরোধ পরিহার।

স্বরচিহ্নের তারতম্যে বিভিন্ন আকারে একই অর্থে কুরআন মাজীদে এই ধাতু হতে নিষ্পন্ন কয়েকটি পদের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন –

এর একটি অর্থ যুদ্ধ বিরতির জন্য শান্তির প্রস্তাব। এ অর্থে বলা হয়েছে – "তারা যদি সন্ধির (সালম) দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবে; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[১৪]

অথবা এর অর্থ হল ইসলামী বিধান, হুকুম আহকাম। এ অর্থে ইরশাদ হয়েছে – "হে মুমিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে (সিলম) প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু।"[১৫]

অথবা এর অর্থ যুদ্ধ পরিহারের প্রস্তাব। এ অর্থে বলা হয়েছে – "সুতরাং তারা যদি তোমাদের নিকট হতে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব (সালাম) করে তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেন না। ..... যদি তারা তোমাদের নিকট হতে চলে না যায়, তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব (সালাম) না করে এবং তাদের হাত সংবরণ না করে তবে তাদেরকে যেখানে পাবে গ্রেফতার করবে ও হত্যা করবে এবং তোমাদেরকে এর বিরুদ্ধাচারণের স্পষ্ট অধিকার দিয়েছি।"[১৬]

অথবা এর অর্থ শান্তি। এ অর্থে ইরশাদ হয়েছে – "আল্লাহ শান্তির (সালাম) আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে পরিচালিত করেন।"[১৭]

অথবা এর অর্থ শান্তি কামনামূলক মুসলিম অভিবাদন। এ অর্থে বলা হয়েছে – "যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, সালাম। উত্তরে সে বলল, সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক।"[১৮]

---

[১১] ডঃ রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, সাহিত্য কুটির, বগুড়া – ১৯৮৪, পৃ.১

[১২] সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলাম পরিচিতি*, ভাষান্তর : সৈয়দ আবদুল মান্নান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা – জুলাই ১৯৭৯, পৃ.১

[১৩] Sayed Amir Ali, *The Spirit of Islam*, Delhi – 1947, p. 168

[১৪] আল কুরআন / ৮: ৬১

[১৫] আল কুরআন / ২ : ২০৮

[১৬] আল কুরআন /৪: ৯০-৯১

[১৭] আল কুরআন / ১০: ২৫

[১৮] আল কুরআন / ৫১: ২৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

অথবা এর অর্থ বাহ্যিক আনুগত্য। এ অর্থে আল্লাহ বলেন – "বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। বল, তোমরা ঈমান আন নি বরং তোমরা বল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। কারণ ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নি।"[১৯]
শব্দটি সিলমুন ধাতু থেকেও উদ্ভূত শব্দ হতে পারে। সিলমুন অর্থ হল শান্তি ও শুভেচ্ছা[২০]

ইসলাম অর্থ হল আত্মসমর্পণ করা।[২১] এ অর্থে ইরশাদ হয়েছে – "তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, আত্মসমর্পণ কর (আসলিম), সে বলেছিল, জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।"[২২]

ইসলামের আরেকটি অর্থ হল শান্তিস্থাপন।[২৩] আরবি ভাষায় ইসলাম বলতে বুঝায় আনুগত্য ও বাধ্যতা।[২৪]
ইসলামের আভিধানিক অর্থ – আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্য করা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা।[২৫]

ইমাম গাযালী (র) এর অর্থ লিখেছেন – আনুগত্য স্বীকার করা এবং বাধ্যতা, অস্বীকৃতি ও হঠকারিতা বর্জন করা।[২৬]
কারো কারো মতে, ইসলাম অর্থই হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য, উৎসর্গ করা তথা আত্মসমর্পণ করা।[২৭]
আভিধানিকভাবে 'আদেশ পালন করে চলা'কেও ইসলাম বলা হয়।[২৮]

শান্তি স্থাপন তথা বিরোধ পরিহার করা অর্থাৎ আত্মসমর্পণে আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপিত হয় এবং তার বিরুদ্ধতা পরিত্যক্ত হয় আর আল্লাহর সৃষ্টমানুষের সাথে একাত্মতার অনুভূতিতে, সাম্যনীতির স্বীকৃতিতে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

কাজেই আভিধানিক বিবেচনায় ইসলাম হল শান্তি স্থাপন করা, শান্তির পথে চলা, আত্মসমর্পণ করা, মেনে চলা বা আনুগত্য করা। আর পারিভাষিক বিবেচনাতেও ইসলামের মধ্যে এ ভাব ও তাৎপর্য অক্ষুন্ন থাকতে দেখা যায়।

ইসলামের সংজ্ঞা

পারিভাষিক দিক থেকে ইসলামকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। অবশ্য সংজ্ঞাগুলোর একটিও অন্যটির বিরোধী নয়। বরং একটি অপরটির পরিপূরক। এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হল।

Oxford Dictionary – "Islam the Muslim religion based on belief in one God and revealed through Muhammad as the prophet of Allah."[২৯]
আল্লামা তাফতাযানী (র) বলেছেন – "ইসলাম হল নত ও নম্র হওয়া এবং আনুগত্য করা। অর্থাৎ শরীআতের আহকামসমূহ কবুল করা এবং তা অন্তরে স্বীকার করা। আল্লাহর উলুহিয়্যাতকে মেনে নেওয়া এবং তাঁর সামনে মস্তক অবনত করা। আর এ আদেশ ও নিষেধ গ্রহণ করা ব্যতীত কেউ মুমিন বা মুসলিম সাব্যস্ত হতে পারে না।"[৩০]

সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (র) বলেন – "আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও তাঁর বাধ্যতা স্বীকার করে নেওয়া যে ধর্মের লক্ষ্য তার নামই ইসলাম।"[৩১]

---

[১৯] আল কুরআন / ৪৯: ১৪
[২০] মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, *আল কাওসার আধুনিক আরবী–বাংলা অভিধান,* মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা – মার্চ ১৯৮৬, পৃ.২৯৩
[২১] প্রাগুক্ত পৃ.৫৩
[২২] আল কুরআন / ২ : ১৩১
[২৩] ডঃ রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা,* প্রাগুক্ত, পৃ.১
[২৪] সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলাম পরিচিতি,* প্রাগুক্ত, পৃ.১
[২৫] অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আকায়েদুল ইসলাম,* কুতুবখানায়ে রশিদিয়া, ঢাকা, জুন – ১৯৯৭, পৃ.১৪৪
[২৬] ইমাম গাযালী (র), *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন,* প্রথম খণ্ড, ভাষান্তর : মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা – সেপ্টেম্বর, ২০০৪, পৃ.২৩৭
[২৭] অধ্যাপক হাসান আইয়ুব, *ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা – ফেব্রুয়ারি, ২০০৪, পৃ.৩৮
[২৮] মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, *ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ,* ভাষান্তর : আব্বাস আলী খান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, নভেম্বর – ১৯৮৮, পৃ.১৩
[২৯] A S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English,* Oxford University Press, Sixth edition, 2002, p.689
[৩০] *তানজীমুল ফারায়েদ আরবী–বাংলা শরহে আকাইদ নিসাফী,* আশরাফিয়া লাইব্রেরী, চৌমুহনী, নোয়াখালী, ২০০৫খ্রি. পৃ.১০৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

সদরুদ্দীন ইসলাহী বলেন – "দীনের ভাষায় যখন বলা হয় তখন ইসলাম শব্দের অর্থ শুধু সে আদেশ পালন, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ পালন করে চলা। অতএব মুসলিম তাকেই বলে যে আল্লাহর আদেশ মেনে চলে এবং তাঁর কোন আদেশ লংঘন করে না।"[৩২]

"ইসলাম বলতে মানব মনের স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাস এবং সামগ্রিক সত্তা ও প্রবৃত্তির আত্মসমর্পণকে বুঝায়। পরম স্বস্তি ও তৃপ্তি সহকারে রাসূল (সা) প্রদর্শিত জীবনদর্শন ও শিক্ষাকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ ও সচেতনভাবে আল্লাহর বিধানের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম। কোন প্রকার প্রশ্ন, সন্দেহ ও অনুসন্ধান ব্যতিরেকে আল্লাহ প্রদত্ত আদর্শের প্রতি নিঃসঙ্কোচে নির্দিধায় স্বীয় সত্তা ও প্রবৃত্তিকে আল্লাহর মর্জির কাছে বিলিয়ে দেয়া, উৎসর্গ করাই হচ্ছে ইসলাম। ইসলামের এ সংজ্ঞা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম বস্তুত আত্মিক ও মানসিক দিক হতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মর্জি ও কানূনের প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনুগত্য করা, উৎসর্গ ও আত্মসমর্পণকে বুঝায়।"[৩৩]

"ইসলাম হচ্ছে হৃদয়ের গভীর অনুভূতি ও চেতনা এবং আল্লাহ প্রদত্ত শরীআতের প্রয়োজনীয় ইলম সহকারে ইসলাম শরীআতের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য ও আত্মোৎসর্গ করার নাম।"[৩৪]

"ইসলাম হল মেনে নেওয়ার নাম, অন্তর দিয়ে হোক, মুখে হোক অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা। এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে অন্তর দিয়ে মানা। অন্তরের এ মেনে নেওয়াকে তাসদীক বা সত্যায়ন বলে। একেই বলা হয় ঈমান।"[৩৫]

ইসলামকে এভাবেও সংজ্ঞায়িত করা যায় – "নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত যাবতীয় বিধি-নিষেধ মেনে নেওয়া এবং সে অনুসারে আমল করার নাম ইসলাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর জন্য যে জীবন বিধান দান করেছেন, স্বেচ্ছায় এবং বিনা আপত্তিতে তা গ্রহণ করে পরিপূর্ণ আনুগত্যের সাথে তা মেনে চলাই ইসলাম।"[৩৬]

"ইসলাম শুধু একটা মতবাদ নয়, এটা বর্তমান কালে জীবন যাপনের ব্যবস্থা। সৎকাজ, সৎচিন্তা ও সত্য কথা বলার ধর্ম। এটা স্বর্গীয় প্রেম, সর্বজনীন বদান্যতা এবং আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।"
(Islam is not a mere creed. It is a life to be lived in the present, a religion of right doing, right thinking and right speaking, founded on divine love, universal charity and the equality of man in the sight of the Lord.)[৩৭]

"বাস্তবিক ইসলাম ধর্ম তাত্ত্বিক ব্যবস্থা অপেক্ষা অনেক কিছু বেশি, এটা একটি পরিপূর্ণ সভ্যতা। ..... ইসলামের চেয়ে অন্য কোন ধর্মে বিকাশের এত বৃহত্তর সম্ভাবনা নিহিত নেই, কোন ধর্মই অধিকতর বিশুদ্ধ অথবা মানব জাতির প্রগতিশীল আবেদনের সাথে এত অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।"
(Islam is indeed, much more than a system of theology, it is a complete civilization... No religion contained greater promise of development, no faith was purer or more in conformity with the progressive demands of humanity than Islam.)[৩৮]

---

[৩১] সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলাম পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ.১
[৩২] মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, *ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩
[৩৩] অধ্যাপক হাসান আইয়ূব, *ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮
[৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮-৩৯
[৩৫] ইমাম গাযালী (র), *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩৯
[৩৬] অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আকায়েদুল ইসলাম*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪৪
[৩৭] Sayed Amir Ali, *The Spirit of Islam*, ibid, p.178,
[৩৮] Gibb, Whither Islam (উদ্বৃত : ডঃ রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, প্রাগুক্ত পৃ.১০)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম একটি দীন। ইরশাদ হয়েছে – "নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন।"[৩৯] দীন অর্থ পারস্পারিক ব্যবহার, লেনদেন ইত্যাদি। এ দীনের প্রধান উৎস কুরআন। কুরআনে বিধৃত দীন একটি জীবনব্যবস্থা, যা বিশ্বাস, আনুষ্ঠানিক ইবাদাত, দার্শনিক তত্ত্ব ইত্যাদি মানবের কর্ম জীবন নিয়ন্ত্রণের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে।

হাদীসে জিবরীলে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট আরয করা হয় – হে হযরত মুহাম্মদ (সা)! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন – "ইসলাম হচ্ছে এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল। সালাত কায়িম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযানে সাওম পালন করবে এবং বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পথ অতিক্রম করার সামর্থ্য থাকলে হাজ্জ পালন করবে।"[৪০]

ইসলাম মানবের চিরন্তন ধর্ম। এ কারণেই "কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবূল করা হবে না এবং সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত।"[৪১] এর মূলকথা হল – আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃত্যুর পর পুণরুত্থানে এবং বিচারান্তে অনন্ত পরজীবনে বিশ্বাস এবং সৎকাজে আত্মনিয়োগ। বিশ্বাসের পর্যায়ে আল্লাহতে বিশ্বাসের সাথে যোগসূত্ররূপে ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, নবী–রাসূলগণ এবং তাঁর সর্বময় নিয়ন্ত্রণ তাকদীরে বিশ্বাসও উপরোক্ত তিনটি মৌলিক উপাদানের সাথে যুক্ত হয়। পৃথিবীর প্রথম মানব ও নবী আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত কুরআনে উল্লিখিত–অনুল্লিখিত সকল নবী–রাসূল পৃথিবীর বিভিন্ন গোত্র ও জাতির কাছে উপরোক্ত তিনটি উপাদান সম্বলিত ইসলাম প্রচার করেছিলেন। ইরশাদ হয়েছে –

"আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। আমি তাদের কারো কারো কথা তোমার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করি নি।"[৪২]

"প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রাসূল এবং যখন তাদের রাসূল এসেছে তখন ন্যায়বিচারের সাথে তাদের মীমাংসা হয়েছে এবং তাদের প্রতি যুলম করা হয় নি।"[৪৩]

এ তিনের ভিত্তিতে কুরআন মাজীদ সমসাময়িক ইয়াহূদী, খৃষ্টান, সাবিঈ ও মাজুসী তথা অপরাপর ধর্মাবলম্বী লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিল এবং এ আহ্বানে সাড়া দেয়ার প্রেক্ষিতে তাদের নিরাপত্তা ও মুক্তি নিশ্চিত করেছিল। ইরশাদ হচ্ছে – "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহূদী হয়েছে এবং খৃষ্টান ও সাবিঈন – যারাই আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য পুরস্কার আছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"[৪৪]

ইসলামের শাশ্বত ও অবিনাশী এ আহ্বান এখনো কার্যকর। পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত তা কার্যকর থাকবে।

আল্লাহ তাআলা ও তাঁর সৃষ্টিজগতের সাথে শান্তি স্থাপনই ইসলামের মর্মবাণী, ইসলামের অনুসারী মুসলিমদের জীবনাদর্শ, কর্মপ্রেরণা ও গতিশক্তি। আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিজগতের সাথে শান্তি স্থাপনের মাধ্যমে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির সম্যক স্ফুরণ ঘটে বলে ইসলামকে 'দীনে ফিতরাত' বা মানুষের স্বভাবজাত সহজাত ধর্ম বলা হয়। ইসলামের শান্তি স্থাপন করা কথাটির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে ইসলামকে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম বা মানুষের সহজাত ধর্ম কেন বলা হয়েছে তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

ইসলাম নির্দেশিত শান্তি সংস্থাপন সর্বাত্মক, আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিজগতের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য। আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপনের অর্থ তাঁর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, দেহ–প্রাণ–মনের সমস্ত শক্তি তাঁর অনন্ত শক্তির সাথে মিশিয়ে দেয়া। সুখে–দুখে, জীবনে–মরণে, আনন্দে–নৈরাশ্যে, প্রকাশ্যে–গোপনে – জীবনের সকল অবস্থায় আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ নির্ভরতা ও তাঁর প্রতি সমাহিত চিত্ততা, একমাত্র তাঁরই সাহায্য সহযোগিতা কামনা, দুনিয়া ও আখিরাতে

---

[৩৯] আল কুরআন / ৩ : ১৯

[৪০] মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, *আস সহীহ লি মুসলিম,* দেওবন্দ, ১৯৮৫ কিতাবুল ঈমান

[৪১] আল কুরআন / ৩ : ৮৫

[৪২] আল কুরআন /৪০: ৭৮

[৪৩] আল কুরআন / ১০ : ৪৭

[৪৪] আল কুরআন / ২ : ৬২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁকেই একমাত্র পরম বন্ধু বলে গ্রহণ করা এবং সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিধানদাতা হিসেবে কেবল তাঁকেই মেনে চলা হল আল্লাহ তাআলার সাথে শান্তি স্থাপন। সহজ কথায়, আল্লাহ তাআলাকে ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সত্তা হিসেবে তাঁর নিঃশর্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন আনুগত্য করাই হল তাঁর সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা।

ইসলাম একদিকে যেমন মহান আল্লাহ তাআলার সাথে শান্তি সংস্থাপক অন্যদিকে তেমনি আল্লাহর সৃষ্টিজীব ও জগতের সাথেও নিরন্তর শান্তির সংস্থাপক। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে যে এক নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে, সকল মানুষই যে আল্লাহর খলীফা, তাঁর প্রিয় সৃষ্টি, সকলের মধ্যেই যে আল্লাহর বার্তাবাহক নবী-রাসূলগণ আবির্ভূত হয়েছেন, প্রত্যেক জাতিই যে আল্লাহর নির্দেশ পেয়েছে, ওহী লাভ করেছে – ইসলামের এ বিশ্বাস ও প্রত্যয় আন্তর্জাতিক শান্তি ও শুভেচ্ছার ভিত্তি। পুরো মানবজাতিকে এক পরিবারভুক্ত মনে করাই ইসলামী জীবন পদ্ধতির এক অত্যুজ্জ্বল দিক। দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ধনী, নির্ধন, জ্ঞানী, মূর্খ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের স্বীকৃতি হল মানুষে মানুষে শান্তি স্থাপন। দূরের ও নিকটের, আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত-অপরিচিত, প্রতিবেশী, অপ্রতিবেশী, বন্ধু, প্রতিপক্ষ প্রমুখ সকল মানুষের প্রতি আরোপিত মানবিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমেই কেবল বিশ্বশান্তি স্থাপন করা যেতে পারে, অন্য কোন পথে যে নয় – ইসলামের মর্মবাণী থেকে তাও প্রতীয়মান হয়।

ইসলাম যে শান্তি ও সংহতির কথা বলে তা শুধু মানবজাতির জন্য নয় বরং ইতরপ্রাণী, উদ্ভিদ, প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক নানা সৃষ্টিরাজির সাথে শান্তি স্থাপনে সহায়ক। মানবেতর প্রাণী, গাছপালা, প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক সৃষ্টিসমূহ মানুষের শারীরিক ও মানসিক গঠন – পরিপোষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে কারণে এগুলোর যত্ন নেওয়া, এগুলোর সংরক্ষণ করা এবং মানুষের উপকারে কাজে লাগার মত যোগ্য করে তোলার দায়িত্বও মানুষের। মানুষ এ সকল প্রাণী, প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক সম্পদ, গাছপালা প্রভৃতি নানা জাতীয় সম্পদের উপর নির্ভর করে। যে জন্যে আল্লাহর এ সৃষ্টিজগতের সাথে শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে মানুষের প্রতি যথাযোগ্য আচরণের পাশাপাশি এসকল মানবেতর সৃষ্টিরও যথাযোগ্য ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচর্যা প্রয়োজন। শান্তি ইসলামের মর্মবাণী, শান্তি ইসলামের তাৎপর্য – এ শান্তিই হল আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, মানুষের প্রতি পরম প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবেতর সকল সৃষ্টির প্রতি সদাচরণ। এ কারণে ইসলামকে সংজ্ঞায়িত করা যায় সর্বপ্লাবী শান্তির ধর্ম হিসেবে।

'ইসলাম আল্লাহ মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা'

ইসলামের শাব্দিক বিশ্লেষণে যে গভীর ও ব্যাপক তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হতে স্পষ্টই প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, ইসলাম মানবজাতির স্বাভাবিক ধর্ম, কাজেই ইসলাম মানুষের একমাত্র ধর্ম। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর আগে এ ধর্ম যে নামেই অভিহিত হোক না কেন। কারণ মানব স্বভাবের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যা প্রয়োজন তা হল ইসলাম, তা হল শান্তির নীতি। আর এ শান্তির নীতি জড়ে, চেতনে সর্বত্র সমানভাবে পরিস্ফুট। জড়, জীব, চেতন, অচেতন – এক কথায় সমগ্র বিশ্বের সর্বত্র এক স্বাভাবিক সংহতি ও ঐক্য পরিব্যপ্ত, এক শান্তির নীতি ক্রিয়াশীল। ইসলাম এ সর্বজনীন শান্তির অনন্য প্রকাশ।

আল্লাহ তাআলা ইসলামকে বিশ্বমানবের জন্য একমাত্র দীন বা জীবনব্যবস্থা হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। কোন রকম দ্ব্যর্থতা বা অস্পষ্টতা ছাড়া তিনি অসংখ্য ঘোষণায় এ সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে –

"নিঃসন্দেহে ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা পরস্পর বিদ্বেষবশত তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরও মতানৈক্য ঘটিয়েছিল। আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনকে অস্বীকার করলে আল্লাহ তো হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে তুমি বল, আমি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেছি (আসলামতু – আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি) এবং অনুসারীরাও। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদেরকে ও নিরক্ষরদেরকে বল, তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছো? যদি তারা আত্মসমর্পণ করে তবে নিশ্চয় তারা পথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমার কর্তব্য শুধু প্রচার করা।"[৪৫]

---

[৪৫] আল কুরআন, ৩ : ১৯-২০

Dhaka University Institutional Repository

"আরবি ভাষায় দীন শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে একটি অর্থ হল রীতি ও পদ্ধতি। কুরআনের পরিভাষায়, দীন সে সব মূলনীতি ও বিধি-বিধানকে বলা হয় যা আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সকল পয়গম্বরের মধ্যে সমভাবেই বিদ্যমান ছিল।"[৪৬]

"তারা কি চায় আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য দীন? যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকলেই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। আর তাঁর দিকেই তারা ফিরে যাবে। বল, আমরা আল্লাহতে, আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছিল ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরদের প্রতি আর মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাদের রবের নিকট হতে যা প্রদান করা হয়েছে তাতে ঈমান এনেছি, আমরা তাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী। কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"[৪৭]

"তার চেয়ে দীনে কে উত্তম যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে? এবং আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছেন।"[৪৮]

"আজ কাফিররা তোমাদের দীনের বিরুদ্ধাচারণে হতাশ হয়ে পড়েছে; সুতরাং তাদেরকে ভয় কর না, শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।"[৪৯]

"বল 'আল্লাহ ব্যতীত আমরা কি এমন কিছুকে ডাকব যা আমাদের কোন উপকার কিংবা অপকার করতে পারে না? আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সে ব্যক্তির মত আগের অবস্থায় ফিরে যাবো যাকে শয়তান দুনিয়ায় পথ ভুলিয়ে হয়রান করেছে, যদিও তার সহচরগণ তাকে ঠিক পথে আহ্বান করে বলে, আমাদের কাছে এস'? বল, আল্লাহর পথই পথ এবং আমরা আদিষ্ট হয়েছি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করতে।"[৫০]

"আল্লাহ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন এবং কাউকেও বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন; তার কাছে ইসলাম অনুসরণ করা আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যারা বিশ্বাস করে না আল্লাহ তাদেরকে এভাবে লাঞ্ছিত করেন। এটাই তোমার প্রতিপালক নির্দেশিত সরল পথ।"[৫১]

"বল, আমার প্রতিপালক তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ, সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বল, আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি এরই জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর আমিই প্রথম মুসলিম। বল, 'আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য প্রতিপালককে খুঁজবো? অথচ তিনিই সব কিছুর প্রতিপালক। প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী এবং কেউ অন্য কারো ভার গ্রহণ করবে না। এরপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন তোমাদের প্রতিপালকের নিকটেই, এরপর যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে তা তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।"[৫২]

---

[৪৬] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) *পবিত্র কোরআনুল করীম*, অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিবউল্লীন খান, খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩হিজরি, পৃ.১৬৮

[৪৭] আল কুরআন / ৩ : ৮৩-৮৫

[৪৮] আল কুরআন / ৪: ১২৫

[৪৯] আল কুরআন / ৫ : ৩

[৫০] আল কুরআন / ৬ : ৭১

[৫১] আল কুরআন / ৬: ১২৫-২৬

[৫২] আল কুরআন / ৬ : ১৬১-৬৪

Dhaka University Institutional Repository

"তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতি নির্বাপিত করতে চায়। কাফিররা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া অন্য কিছু চান না। মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সমস্ত দীনের উপর জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ তাঁর রাসূল প্রেরণ করেছেন।"[৫৩]

"বল, কে তোমাদেরকে আকাশ হতে জীবনোপকরণ সরবরাহ করেন অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি কার কর্তৃত্বাধীন, জীবিতকে মৃত হতে কে বের করেন এবং সকল বিষয় কে নিয়ন্ত্রিত করেন? তখন তারা বলবে, আল্লাহ। বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? তিনিই আল্লাহ, তোমাদের সত্য প্রতিপালক। সত্য ত্যাগ করার পর বিভ্রান্তি ছাড়া আর কী থাকতে পারে? সুতরাং তোমরা কোথায় চালিত হচ্ছো?"[৫৪]

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় কর, সালাত কায়িম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।"[৫৫]

"তিনিই তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, অপর সকল দীনের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্য। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট।"[৫৬]

"যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহূত হয়েও আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। তারা আল্লাহর নূর ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায় কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ সকল দীনের উপর তাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে।"[৫৭]
"আমি তাদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব, বিশ্বজগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, উহাই সত্য। এটা কি তোমার প্রতিপালক সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সব বিষয়ে অবহিত?"[৫৮]

কুরআন মাজীদের এ সকল দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা অবিসংবাদিতভাবে যে বিষয়টি প্রমাণ করে তা হল, আল্লাহ তাআলা বিশ্বমানবের জীবনব্যবস্থা হিসেবে কেবল ইসলামকেই মনোনীত করেছেন। এ ছাড়া তাঁকে আর কোন জীবনব্যবস্থা অনুসরণ করে সন্তুষ্ট করা যাবে না। অন্য কোন পথ বা পদ্ধতি অনুসরণ করলে তাঁর আনুগত্য করা হবে না। বরং আল্লাহর সুস্পষ্ট ঘোষণার পর যারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করবে তারা আল্লাহর নির্দেশ লংঘনকারী হিসেবে আল্লাহর চিরকালীন অভিশাপের শিকার হবে। কাজেই যারা বলেন – 'আল্লাহ বা বিশ্বনিয়ন্তা হলেন এক মহাসাগর। সে সাগরে পৌছার জন্য অসংখ্য নদীপথ আছে। মহাসাগরে পৌছার জন্য এর যে কোন একটি পথ অনুসরণ করলেই তা যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টিরও পথ আছে অসংখ্য। পৃথিবীর সকল ধর্ম-মতই কমবেশি আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি বিধানের কথাই বলে। কাজেই এর যে কোন একটি অনুসরণ করলে মহান আল্লাহ বা পরমাত্মায় উপনীত হওয়া যাবে' – তাদের এ কথা মোটেই গ্রহণ যোগ্য নয়। বরং প্রকৃত বিষয় হল সত্য পথ একটি এবং নিঃসন্দেহে তার নাম ইসলাম। আর একমাত্র ইসলামের অনুসরণ করলেই মহান আল্লাহর দরবারে পৌছা সম্ভব হবে। এ ছাড়া আর কোন প্রথা, পদ্ধতি, ধর্ম বা সাধনাতেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যাবে না।

অর্থাৎ আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের জন্য একটি মাত্র জীবনব্যবস্থা ও জীবন যাপন পদ্ধতি বিশুদ্ধ ও নির্ভুল। আর তা হচ্ছে এই যে, মানুষ এক আল্লাহকেই নিজের মালিক ও মা'বূদ মেনে নেবে এবং তাঁরই দাসত্ব ও বন্দেগীতে নিজেদেরকে

---

[৫৩] আল কুরআন / ৯: ৩২-৩৩ ·
[৫৪] আল কুরআন / ১০: ৩১-৩২
[৫৫] আল কুরআন / ৩০: ৩০-৩১
[৫৬] আল কুরআন / ৪৮: ২৮
[৫৭] আল কুরআন / ৬১: ৭-৯
[৫৮] আল কুরআন / ৪১: ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেবে। উপরন্তু তাঁর বন্দেগী করার কোন পন্থা নিজেরা আবিষ্কার করবে না বরং তিনি নিজেই তাঁর পয়গম্বরগণের মারফতে যে বিধান নাযিল করেছেন কোন প্রকার কম বেশি না করে পুরোপুরি তার অনুসরণ করবে। এ চিন্তা ও কর্ম পদ্ধতির নাম হচ্ছে ইসলাম।

"বিশ্বনিখিলের সৃষ্টিকর্তা ও একচ্ছত্র মালিক আল্লাহ নিজের সৃষ্টি ও প্রজা সাধারণের জন্য এ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন পন্থা সঙ্গত মনে করেন না। মানুষ নির্বুদ্ধিতাবশত নিজেকে নাস্তিকতা হতে শুরু করে শিরক ও মূর্তি পূজা পর্যন্ত সকল প্রকার মতাদর্শ গ্রহণ ও সকল পথ অনুসরণের অধিকারী বলে মনে করতে পারে; কিন্তু বিশ্বসম্রাট আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে এটা সুস্পষ্ট বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছু নয়।"[৫৯]

'পৃথিবীর সকল নবী–রাসূলের প্রচারিত জীবনব্যবস্থা ইসলামই ছিল'

ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম। হযরত মুহাম্মদ (সা) প্রচারিত ধর্ম বা জীবনব্যবস্থাকে ইসলাম আখ্যা দেয়া হলেও আল্লাহ প্রেরিত সকল ধর্মই ইসলাম ধর্ম। পৃথিবীর সকল নবী–রসূল যে জীবনব্যবস্থা বা ধর্ম প্রচার করেছেন তার প্রতিটিরই অভিন্ন নাম হল ইসলাম। যুগে যুগে মানবজাতির পথ প্রদর্শক হিসেবে যে সকল বার্তাবাহক মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন তাঁরা সকলেই ইসলামের নবী, সকলেই শান্তির বার্তাবাহক। ইসলামী ঈমান বা বিশ্বাসের বিষয়টি বিশ্লেষণ করলেও ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। ইসলামী ঈমানের একটি উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সা) এর পূর্ববর্তী সকল নবী–রাসূলের প্রতি দ্বিধাহীন বিশ্বাস ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাবোধ প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানের অনিবার্য অঙ্গ। আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত নবী–রাসূলগণের মধ্য থেকে কোন একজনকে অবিশ্বাস করে বা কারো প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ করে মুসলিম হওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের ব্যর্থহীন ঘোষণা বিষয়টিকে প্রামাণ্য বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। যেমন –

"আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নি তার প্রতি এ ওহী ব্যতীত যে, 'আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই; সুতরাং আমারই ইবাদত কর।"[৬০]

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে আর যা আমি ওহী করেছি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে এই বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতভেদ কর না। তুমি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছো তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী তাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন।"[৬১]

"তোমরা বল, আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি এবং ঈমান রাখি যা আমাদের প্রতি ও ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার বংশধরদের প্রতি নাযিল হয়েছে, যা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী।"[৬২]

"রাসূল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মুমিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহে এবং তাঁর রাসূলগণে ঈমান এনেছে। তারা বলে, আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনেছি এবং পালন করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট।"[৬৩]

আল্লাহ তাআলার এ সকল ঘোষণা এবং এমন আরো অসংখ্য আয়াত সংশয়হীনভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলামে ঈমান পোষণের অর্থই হল হযরত মুহাম্মদ (সা) এর পাশাপাশি পৃথিবীর সকল প্রেরিত পুরুষের প্রতি ঈমান পোষণ করা।

---

[৫৯] সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, *তাফহীমুল কুরআন, ২য় খণ্ড*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা – জুলাই, ১৯৮৫, পৃ.১৫-১৬
[৬০] আল কুরআন / ২১: ২৫
[৬১] আল কুরআন / ৪২: ৪২
[৬২] আল কুরআন / ২ : ১৩৬
[৬৩] আল কুরআন / ২ : ২৮৫

Dhaka University Institutional Repository

যদি তাদের প্রত্যেকের প্রচারিত ধর্মমত ইসলাম ছাড়া অন্যকিছু হত তাহলে এমন নিরবিচ্ছিন্ন ঈমান পোষণের ধারণাটি অসার এবং অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হত। এ প্রসঙ্গে আরো কিছু আয়াত উল্লেখ করা যায়। যেমন – "তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র। আমি তো তোমাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে; এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয় নি। তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যারোপ করে তবে তাদের পূর্ববর্তীরাও তো মিথ্যারোপ করেছিল – তাদের নিকট এসেছিল তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান কিতাবসহ।"[৬৪]

"আর ইব্রাহীম ও ইয়াকূব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিল, হে পুত্ররা! আল্লাহই তোমাদের জন্য এ দীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ কর না।"[৬৫]
আয়াতে সন্তানদের প্রতি ইব্রাহীম–ইয়াকূব (আ) এ নসীহতের অর্থ এটা নয় যে, তারা যেন মৃত্যুর আগে ইসলাম গ্রহণ করে বা ইসলাম গ্রহণ না করে মৃত্যুবরণ করা থেকে বিরত থাকে কিংবা মৃত্যুবরণের জন্যই কেবল ইসলাম গ্রহণ করে। এর প্রকৃত অর্থ হল, তোমরা আমৃত্যু ইসলামে কায়িম থাকবে।

এ আয়াতসমূহের মর্মার্থ হল এই যে, মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ বিভিন্ন যুগে যে সকল নবী রাসূল বা মহাপুরুষ প্রেরণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন মুসলিম এবং তাঁদের প্রত্যেকে চিরশান্তির একমাত্র জীবনব্যবস্থা ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্যই আদিষ্ট হয়েছিলেন। কাজেই পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে ধর্ম এসেছে তা একাধিক ধর্ম নয়। তা হল এক ও অভিন্ন ধর্ম ইসলাম। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত কোন নবী–রাসূলই তাদের মনগড়া কোন মত বা ধর্ম প্রচার করেননি। এটা তাদের জন্য শোভন ছিল না, সম্ভবও ছিল না। পরবর্তীতে তাদের প্রচারিত এ মতাদর্শ তাদের অনুসারীদের মাধ্যমে বিকৃত, পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত হয়ে নানারূপ পরিগ্রহ করেছে। এমনকি তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ স্বর্গীয় কিতাবেও নানারকম স্বেচ্ছাচারী পরিবর্তন সাধন করেছিল।

সাধারণভাবে যখন কোন নবী–রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী বা কিতাব লাভ করেছেন তখন তা কোন রকমের পার্থক্য ছাড়াই আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ ও নবী–রাসূলগণের নবুয়্যত–রিসালাতের সাক্ষ্য বহন করেছে। তাঁরা সকলেই কোন রকমের ব্যতিক্রম ছাড়া সমকালীন সকল মানুষকে এক আল্লাহর ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন, সৎকাজে নিবেদিত হওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন এবং মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য কতগুলো বিধি–নিষেধ আরোপ করেছেন। নবী–রাসূলগণ প্রচারিত ধর্মের মূলনীতিতে কখনোই কোন ব্যতিক্রম বা ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় নি। অথচ পৃথিবীর প্রতিটি জাতি ও সম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহ তাআলা নবী–রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে – "যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদেরই কল্যাণের জন্য তা করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য। কেউ কারো বোঝা বহন করবে না। আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকেও শাস্তি দেই না।"[৬৬]

"আমি তো তোমার আগে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। আমি তাদের কারো কারো কথা তোমার কাছে বলেছি এবং কারো কারো কথা তোমার কাছে বলি নি। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নয়। আল্লাহর আদেশ এলে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা হয়ে যাবে। তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"[৬৭]

"আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আনন্দ পায়, কিন্তু কোন কোন দল তার কিছু অংশ অস্বীকার করে। বল, আমি তো আল্লাহর ইবাদত করতে ও তাঁর সাথে কোন শরীক না করতে আদিষ্ট হয়েছি। আমি তাঁরই প্রতি আহ্বান করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।"[৬৮]

---

[৬৪] আল কুরআন / ৩৫ : ২৩-২৫
[৬৫] আল কুরআন / ২ : ১৩২
[৬৬] আল কুরআন / ১৭: ১৫
[৬৭] আল কুরআন / ৪০: ৭৮
[৬৮] আল কুরআন / ১৩: ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

"প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রাসূল এবং যখন তাদের রাসূল এসেছে তখন ন্যায়বিচারের সাথে তাদের মীমাংসা হয়েছে এবং তাদের প্রতি যুলম করা হয় নি।"[৬৯]

আরবি ভাষায় দীন শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে। তন্মোধ্যে এক অর্থ রীতি ও পদ্ধতি। কুরআনের পরিভাষায় দীন সে সব মূলনীতি ও বিবিধ-বিধানকে বলা হয় যা আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সব পয়গম্বরের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান রয়েছে। শরীআত অথবা মিনহাজ শব্দটি পরবর্তী পরিভাষা। মাযহাব শব্দটি দীনের বিভিন্ন শাখার বিধি-বিধান অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।

মোটকথা এই যে, প্রত্যেক পয়গম্বরের আমলে তাঁর আনীত দীনই ছিল ইসলাম এবং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। পরে এগুলো একের পর এক রহিত হয়েছে এবং পরিশেষে দীনে মুহাম্মাদীই ইসলাম নামে অভিহিত হয়েছে যা কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। যদি ইসলামের দ্বিতীয় অর্থ নেওয়া হয় অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা) এর আনীত ধর্ম তবে আয়াতের অর্থ হবে এই যে, এ যুগে হযরত মুহাম্মদ (সা) এর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল ইসলামই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। পূর্ববর্তী দীনগুলোকেও তাদের সময়ে ইসলাম বলা হলেও এখন তা রহিত হয়ে গিয়েছে। অতএব উভয় অবস্থায় আয়াতের প্রকৃত অর্থ একই দাঁড়ায়।

তাই কুরআনের সম্বোধিত উম্মাতের সামনে ইসলামের যে কোন অর্থই নেওয়া হোক না কেন, সারমর্ম হবে এই যে, রাসূলের (সা) আবির্ভাবের পর কুরআন ও তাঁর শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মই ইসলাম নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য এবং এ ধর্মই আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য, অন্যকোন ধর্ম নয়। এ বিষয়বস্তুটি কুরআনের অসংখ্য আয়াতে বিভিন্ন শিরোনামে বিধৃত হয়েছে।

আজকাল ইসলামের উদারতার নামে কুফর ও ইসলামকে এক করার চেষ্টা করা হয় এবং বলা হয় যে, সৎকর্ম সম্পাদন করলে ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে যে কোন ধর্মাবলম্বীই মুক্তি পাবে – সে ইয়াহুদী, খৃষ্টান অথবা মূর্তিপূজারী যাই হোক না কেন। আলোচ্য আয়াত এ উদ্ভট মতবাদের মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এভাবে ইসলামের মূলনীতি বিধ্বস্ত করা হয়। কারণ এর সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, ইসলামের বাস্তব কোন ভিত্তি নেই। এটা একটি কাল্পনিক বিষয়, যা কুফরের পোশাকেও সুন্দর মানায়। কুরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াত পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, আলো ও অন্ধকার যেমন এক হতে পারে না তেমনি অবাধ্যতা ও আনুগত্য উভয়টি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হতে পারে না। যে ব্যক্তি ইসলামের কোন একটি মূলনীতিও অস্বীকার করে সে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার প্রতি বিদ্রোহী ও পয়গম্বরগণের প্রতি প্রকাশ্য শত্রুতা পোষণকারী। প্রচলিত অর্থে সৎকর্ম বা নেক আমল ও প্রথাগত চরিত্রে সে যতই সুন্দর হোক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের উপরই আখিরাতের মুক্তি নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এ থেকে বঞ্চিত, তার কোন কর্মই ধর্তব্য নয়।

"মৃত্যুর পর প্রথমত কবর তথা বরযখ জগতে আখিরাতের প্রথম পরীক্ষা নেওয়া হবে। এরপর বিস্তারিত হিসাব নিকাশ হবে কিয়ামতে। এ হিসাব নিকাশ নেওয়ার সময়ই সব বিরোধের স্বরূপ ফুটে উঠবে। বিরোধীবাদী ও মিথ্যাপন্থীরা তাদের স্বরূপ জানতে পারবে এবং শাস্তিও আরম্ভ হয়ে যাবে।"[৭০]

আল্লাহ তাআলা যে সকল নবী-রাসূলকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন তারা সকলেই ছিলেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হিদায়াত প্রাপ্ত। আল্লাহ তাঁদেরকে চিরশান্তির জীবনব্যবস্থা ইসলাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ, জাতি ও সম্প্রদায়ের নিকট অভিন্ন মিশন দিয়ে প্রেরণ করেন। সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকে ক্রমান্বয়ে মানুষের বিস্তৃতির সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা তাঁর বিধানও বিস্তৃত করেছেন। কিন্তু কখনো তাঁর মূলনীতিতে কোন পরিবর্তন আসে নি।

এ পর্যায়ে একটি অত্যন্ত যৌক্তিক প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। তাহল, যদি ইসলামই আল্লাহ মনোনীত একমাত্র ধর্ম হয়ে থাকে এবং হযরত আদম (আ) থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূলের ধর্মের নাম ইসলামই হয়ে থাকে তাহলে প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক যুগে প্রতিটি মানবজাতির প্রতিটি সম্প্রদায়ের নিকট ভিন্ন ভিন্ন নবী-রাসূল ও ধর্মগ্রন্থ

---

[৬৯] আল কুরআন / ১০ : ৪৭

[৭০] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৮-৬৯

Dhaka University Institutional Repository

নাযিলের কী প্রয়োজন ছিল? হযরত আদম (আ) যে ইসলাম প্রচার করেছেন তাইতো মানব জাতির জন্য যথেষ্ট হতে পারত!

এ প্রশ্নের সহজ উত্তর হল, মানুষের মধ্যে বিভিন্নমুখী চেতনার যেমন ক্রমবিকাশ আছে, ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক চেতনারও তেমন ক্রমবিকাশ রয়েছে। হযরত আদম (আ) এর সময়ে মানুষ যে জীবনযাপন করেছে, যে সমস্যার মুকাবিলা করেছে এবং জগত-জীবন-দর্শন সম্পর্কে যে সরল মানসিকতা পোষণ করেছে তার সাথে আজকের জীবনধারা ও চিন্তাদর্শনের পার্থক্য একটি অকল্পনীয় পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। আজকের মানুষ সে সময়ের মানুষের সমস্যা, সম্ভাবনা, স্বপ্ন আর আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে সুষ্ঠু কোন ধারণায় উপনীত হতে অদ্যাবধি পারে নি। সময়ের পরিক্রমণের সাথে সাথে মানুষের বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি বিভিন্নমুখী সমস্যার ক্রমবিকাশ ঘটেছে। পৃথিবীর মানুষের কাছে নতুন নতুন রহস্যের দুয়ার উন্মুক্ত হয়েছে। বিপুল চিন্তা-ভাবনার খোরাক সংগৃহীত হয়েছে। মানুষ ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর ভাবনার পথে তার পদচারণা অব্যাহত রেখেছে। কাজেই আদম (আ) এর যুগে মানুষ যা হৃদয়ঙ্গম করতে পারত না আজকের মানুষ তা খুব সহজেই বুঝতে পারছে। আদম (আ) এর যুগে জীবনের যে বিষয়গুলোকে মনে হত শাশ্বত রহস্য এখন মানুষ সে রকম অনেক রহস্যই ভেদ করেছে। এভাবে প্রতিজন নবীর সমসাময়িক মানুষের চেয়ে পরবর্তীকালের মানুষেরা চিন্তা, দর্শন, উপলব্ধি ও সমস্যায় পূর্ববর্তীদের চেয়ে অধিকতর অগ্রসর হয়েছে। ক্রমাগ্রসর এসকল মানুষের জীবন ধারা ও ক্রমোন্নত চিন্তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জীবন বিধান প্রদান করা হল বিবেক-বুদ্ধির স্বাভাবিক দাবি। এ দাবি অনুসারেই আল্লাহ তাআলা অভিন্ন মূলনীতির হিদায়াত দিয়ে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন কিতাবসহ অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। সমকালীন লোকদের কাছে বোধগম্য করে দাওয়াত পেশের জন্য আল্লাহ তাআলা কেবল ভিন্ন ভিন্ন নবী-রাসূলই পাঠান নি বরং নবী-রাসূলগণের দাওয়াত যাতে করে সমকালীন লোকদের বুঝতে কোন অসুবিধা না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য তাঁদেরকে স্ব স্ব জাতির ভাষাভাষি করেই প্রেরণ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে –

"আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষি করে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৭১]

মানুষের বোধের অতীত বা মানুষের পক্ষে বুঝা সম্ভব নয় এমন কোন নির্দেশ দেয়া আল্লাহ তাআলার নীতিবিরুদ্ধ বিষয়। তিনি মানুষের উপর এমন কোন দায়িত্ব প্রদান করেন না যে দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা বা শক্তি তাদের নেই। আবার আল্লাহ যদি চান তাহলে তিনি প্রথম যুগের মানুষদেরকেই চূড়ান্ত বোধ ও বিবেক এবং প্রকৌশল ও চিন্তন ক্ষমতার দিক দিয়ে উৎকর্ষের শীর্ষদেশে পৌঁছে দিতে পারতেন। কিন্তু এটাও আল্লাহর নীতি নয়। আল্লাহ তাআলা মানুষের বিকাশ, লালন-পালন, পরিপোষণ এবং পৃথিবীসহ সারা বিশ্বজাহানের আবর্তন ও বিবর্তনে একটি ক্রমধারা অনুসরণের নীতি ঠিক করে দিয়েছেন। তিনি নিজে কখনোই তাঁর এ নীতি লংঘন করেন না। এর মাধ্যমে তিনি মানুষকেও ক্রমধারা অনুসরণের আদেশ ও নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

এ জন্যই ঈসা (আ) তাঁর অনুসারীদেরকে বলেছেন- "তোমাদেরকে বলার এখনও আমার অনেক বাকি আছে। কিন্তু এখন তোমরা সে সকল কথা বুঝতে পারবে না। যাই হোক, যখন তিনি – সত্যের পথ প্রদর্শক আসবেন তিনি তোমাদেরকে পূর্ণ সত্যের দিকে পরিচালিত করবেন।"

(I have yet many things to say unto you but yet can not hear them now. How be it, when he, the spirit of truth is come, he will guide you unto all truth.) [৭২]

আল্লাহ তাআলা বিশ্বমানবের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য যে সকল কিতাব যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন তার নির্ভেজাল, অবিকৃত ও প্রকৃত রূপটি এখন আর পাওয়া যায় না। যদি পাওয়া যেত তাহলে দেখানো যেত যে, পরবর্তী প্রত্যেক নবী-রাসূলের নিকট প্রেরিত বাণী পূর্ববর্তী নবী-রাসূলের নিকট প্রেরিত বাণীর চেয়ে অধিক বিকশিত ও পূর্ণতর ছিল। এভাবে পূর্ববর্তীর চেয়ে পরবর্তীর অধিকতর বিকাশের ধারাবাহিকতাতেই

---

[৭১] আল কুরআন / ১৪: ৪

[৭২] John 16 : 12, 13

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুহাম্মদ (সা) এর নিকট প্রেরিত বাণীতেই আধ্যাত্মিক চেতনা পরিপূর্ণ মহিমায় বিকশিত হয়েছে। তা বলে কোন নবী-রাসূলের কাছে এমন কোন নির্দেশনা আসে নি বা কোন নবী রাসূল এমন কোন আদেশ-নিষেধ প্রচার করেন নি যার মধ্যে ইসলামের মৌলিক নীতিসমূহের কোন রূপ ব্যতিক্রম বা বিরোধী কিছু এসেছে। আল্লাহর একত্ববাদ বা তাওহীদ, আখিরাত, কিতাব, রিসালাত, জান্নাত, জাহান্নাম, তাকদীর, কিয়ামাত প্রভৃতি বিষয়ে সকল নবী-রাসূলের নিকট অভিন্ন এবং অবিচ্ছিন্ন বাণী অবতীর্ণ হয়েছে। শুধু পার্থক্য হল এই যে, আল্লাহর বেঁধে দেয়া জীবনের সনাতন রীতিতে তা ক্রমগতিতে বিকাশের পথে এগিয়েছে, ক্রমান্বয়ে ইসলামের স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর সময়ে এসে তা পূর্ণতমরূপে বিকশিত হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ঘোষণায়ও এ বিষয়টি প্রতিভাত হয়ে ওঠে। নবুয়্যত ও রিসালাতের দীর্ঘ ধারাবাহিকতার পূর্ণতা এবং সমাপ্তি ঘোষণা দিয়ে তিনি ইরশাদ করেন -"আজ কাফিররা তোমাদের দীনের বিরুদ্ধাচারণে হতাশ হয়েছে, সুতরাং তাদেরকে ভয় কর না, শুধু আমাকেই ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম।"[৭৩]
"মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়; বরং সে আল্লাহর রাসূল এবং শেষনবী।"[৭৪]

প্রত্যেক যুগে, সভ্যতা বিকাশের প্রতিটি ধাপে - পৃথিবীর প্রতিটি মানব সম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূল প্রেরণ করে মানুষের প্রতি তাঁর অসীম করুণার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এভাবে নবী-রাসূল প্রেরণ করে তিনি নিরন্তর সতর্ক করার মাধ্যমে মানবজাতিকে কল্যাণ ও সত্য পথে অধিষ্ঠিত রাখতে চেয়েছেন। কেননা আল্লাহ তাআলার প্রতি আনুগত্য করা, আল্লাহর হুকুম আহকাম মেনে চলা যেমন মানুষের দায়িত্ব, তেমনি আল্লাহ তাআলার দায়িত্ব হল মানুষকে যে সকল কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান দেয়া। অসীম করুণাময় আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে রাসূল পাঠিয়ে মানুষকে সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেই অবহিত করেছেন। তাছাড়া বিভিন্ন যুগের মানুষের মধ্যে এক অখণ্ড যোগসূত্র ও অভিন্ন সামগ্রিক চেতনা সৃষ্টি করার জন্যই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক জাতির নিকট নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। কাজেই এক ধর্ম হওয়ার পরও তা প্রচারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নবী-রাসূল প্রেরণ বা বিভিন্ন কিতাব নাযিল হতে কোন সমস্যা নেই। বস্তুত এটি এক প্রামাণ্য চিরন্তন সত্য যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য যে জীবনব্যবস্থা মনোনীত করেছেন, তা ইসলাম ছাড়া আর কিছু নয়, হতে পারে না।

'ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা'

মানবতা অতীতে ও বর্তমানে অনেক মতবাদ পর্যবেক্ষণ করেছে। রাজনীতিতে গণতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ ও একনায়কতন্ত্রবাদ; অর্থনীতিতে সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজম ইত্যাদি। রাজনৈতিক মতবাদগুলো রাজনীতিকে মুখ্য ও অর্থনীতিকে গৌণ মনে করে আবার অর্থনৈতিক মতবাদগুলো অর্থনীতিকে মুখ্য ও মানবজীবনের একমাত্র বুনিয়াদ মনে করে রাজনীতিকে গৌণ বিবেচনা করে। মানবজীবনকে ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন না করার ফলেই এসকল ভারসাম্যহীন চিন্তাভাবনার সৃষ্টি হয়েছে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, রোমান সভ্যতা ও জীবনব্যবস্থার অস্তিত্ব দেখা যাবে যা দীর্ঘ দিন গোটা ইউরোপকে নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং যার মূলভিত্তি ছিল দাসপ্রথা। এ সভ্যতা স্বাধীন রোমান জনসংখ্যার চেয়ে দাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কেননা রোমান আইনে ভিন্ন দেশের যাদের সাথে তাদের কোন চুক্তি ছিল না তাদের ক্ষমতা ও সম্পদ দখল করা ছিল সঙ্গত। রোমানদের জন্য একরকম আইন ছিল যা তাদেরকে সুবিধা দিতো আর রোমান নয় এমন লোকদের জন্য একরকম আইন ছিল যা তাদেরকে নানা রকম অসুবিধায় ফেলতো। এ আইনকে দুর্বলের জন্য দ্বিগুণ শাস্তিবিধানকারী জাতীয় আইন হিসেবে অভিহিত করা হয়। যেমন, সম্ভ্রান্ত বংশের কোন লোক কোন নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুললে তার জন্য তাকে নিজ সম্পদের অর্ধেক জরিমানা দিতে হত। আর যদি কোন নিম্ন বংশীয় লোক একই কাজ করত তাহলে তাকে বেত্রাঘাতের পর দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হত। রোমানরা পৃথিবীতে তাদের আদর্শ নয় বরং

[৭৩] আল কুরআন / ৫:৩
[৭৪] আল কুরআন / ৩৩ : ৪০

Dhaka University Institutional Repository

অস্ত্রের শক্তিতে প্রভাব বলয় বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রাখে। এই চেষ্টা গোত্রে গোত্রে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে দেয়। একসময় সে আগুন খোদ রোমানদের বিরুদ্ধে জ্বলে ওঠে। ফলে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী রোমান সাম্রাজ্য ইতিহাসের অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

রোমানদের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পর সামন্তবাদ নতুন শক্তি হিসেবে মানুষের জীবনধারায় ঠাঁই করে নেয়। এ মতবাদ রাজনৈতিক দিক থেকে মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তোলে। শাসকশ্রেণী হয় এ বিভাজনের শীর্ষচূড়া, সর্বস্ব আর তাদের পরে মর্যাদাশীল হয়ে ওঠে গীর্জার পাদ্রী আর সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকেরা। বিভিন্ন পেশার লোকেরা এর পরের শ্রেণীভুক্ত হয় আর সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ শ্রমিক ও কৃষকরা পায় মর্যাদা ও স্বীকৃতির সর্বনিম্ন ধাপ। তারা মানুষের মর্যাদার পরিবর্তে অস্থাবর সম্পত্তির মর্যাদা পায়। তাদের জীবন জড়িত হয় জমির সাথে। তাদেরকে বলা হয় ভূমিদাস। জমির মালিকানা পরিবর্তনের সাথে সাথে তাদেরও মালিকানা পরিবর্তন হতে থাকে। অর্থনৈতিক বিচারে ভূমি ছাড়া এ ব্যবস্থায় আর কোন কিছুকে সম্পদ বলে গণ্য করা হয় না। আর ভূমি থাকে ভূস্বামীদের মালিকানাধীন। কৃষক-শ্রমিকরা ভূস্বামীদের স্বার্থরক্ষা ও জীবনধারণ নির্বিঘ্ন করে তোলার জন্য কেবল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন করবে। সামন্তবাদ সামন্তপ্রভূদের অভূতপূর্ব ক্ষমতার মালিক করে আর তাদের প্রত্যক্ষ মদদে গীর্জাগুলো শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

খৃষ্টবাদ দীর্ঘদিন ইউরোপে তার অনুসারীদের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য একটি অভিনব শ্লোগান ব্যবহার করেছে। সামন্তবাদীদের সহযোগিতা এবং গীর্জার স্বার্থ রক্ষার জন্য এ শ্লোগান যুগপৎভাবে সক্রিয় ছিল। শ্লোগানের ভাষ্য ছিল – "শাসক কাইজারের যা প্রাপ্য আমি তাকে তা দেব এবং আল্লাহকে তাঁর যা প্রাপ্য তা দেব।"[৭৫] এ শ্লোগান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলোকে পুরোপুরি রোমান শাসকদের ইচ্ছাধীন করে দিয়েছিল। আর ধর্মীয় বিষয়টি প্রকৃত অবস্থা থেকে সরে এসে ধর্মযাজকদের স্বার্থ রক্ষা ও প্রভাব বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিলো। বস্তুত এ দ্বিবিধ শোষণ আর বঞ্চনা শেষপর্যন্ত ইউরোপীয়দেরকে শান্তির নিশ্চয়তা দিতে ব্যর্থ হয়। এমনি প্রেক্ষিতে মুসলমানদের ৭১৭ খৃষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল এবং ৭৩২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের পরপাটিয়া জয় ইউরোপের প্রচলিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পর্যদুস্ত করে দেয়।

সাধারণ অবস্থায় মুসলমানদের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক তৈরীর কোন সুযোগ না থাকলেও একটি বিরুদ্ধ পরিস্থিতি ইউরোপবাসীকে সে সুযোগ এনে দেয়। মুসলমানদের স্পেন জয় এবং ইউরোপের ধর্মান্ধ শাসকগোষ্ঠী ও ক্ষমতালোভী ধর্মযাজকদের অনবরত ক্রুসেড চালিয়ে যাওয়ার আগ্রাসী মনোভাব মানবিক সভ্যতার জনক মুসলিমদের সাথে ইউরোপবাসীর আন্তঃযোগাযোগ প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু গীর্জাসৃষ্ট গোঁড়ামির জন্য এ উপলক্ষ্য তেমন একটা ফলপ্রসু হয়ে উঠতে পারে নি। তারপরও খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতক থেকে ষোড়শ শতকের শেষ পর্যন্ত মুসলিমদের চিন্তাধারা থেকে তারা নবজীবনের বিপুল সামগ্রী লাভ করে এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানসাধনার জগত আরো সম্প্রসারিত হয়ে ওঠে।

ক্ষমতাদর্পী শাসনযন্ত্র আর শোষণে সহযোগী গীর্জার এ মিলন অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। রাষ্ট্রের বর্তমান আইন আর সামন্ত প্রভূদের গীর্জার অভিভাবকত্ব তৈরি করে নতুন দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব বিজ্ঞান ও সমাজের সকল স্তরে বিস্তার লাভ করে। নানা কারণে এ দ্বন্দ্বে গীর্জার পরাজয় ঘটে। এমনি প্রেক্ষাপটে নৈতিক মূল্যবোধবর্জিত রাজনীতি প্রবর্তিত হয়। আর এর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এবং সুদভিত্তিক বিভিন্ন অর্থনৈতিক মতবাদ। অষ্টাদশ শতকে সভ্যতার যান্ত্রিক বিকাশ শুরু হলে ব্যবসায়ী ও সুদখোর মহাজনরা বিজ্ঞানের সকল নতুন আবিষ্কার থেকে লাভবান হতে থাকে। কেননা সুদভিত্তিক আর্থিক মতবাদগুলো আগে থেকেই তাদেরকে সম্পদ ও প্রতিপত্তির মালিক বানিয়ে রেখেছিল। ফলে তারা নতুন সকল আবিষ্কার, কলাকৌশল ও প্রশাসনিক যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে শিল্প ও ব্যবসায়ে এক নতুন ব্যবস্থার জন্ম দেয়। এ ব্যবস্থাই আধুনিক সভ্যতা, রাজনীতি ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক সর্বাধিক প্রভাবশালী অর্থনৈতিক মতবাদ 'পুঁজিবাদ' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

---

[৭৫] এ্যামবেসেডর ফুয়াদ আল খতীব, *ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা*, অনুবাদ : এ এন এম সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ-সৌদী আরব মৈত্রী সমিতি, ঢাকা, জুলাই – ১৯৮০, পৃ.৬

Dhaka University Institutional Repository

"মূলত পুঁজিবাদের জন্ম হয় সাধারণ ব্যবসায়ী, সুদখোর মহাজন, বিভিন্ন পেশার লোক ও বিজ্ঞানী প্রভৃতি বুর্জোয়া শ্রেণীসমূহকে অস্বাভাবিক ক্ষমতা, সামন্তবাদ এবং গীর্জার সম্পদ থেকে বঞ্চিত করার কারণে।"[৭৬] সামন্ত প্রভূ ও গীর্জার পুরোহিতদের হাতে ইউরোপীয় সমাজের দরিদ্র মানুষ এবং কৃষকদের বঞ্চিত ও নির্যাতিত হওয়াও পুঁজিবাদের জন্মে ভূমিকা রাখে। নিজেদের আর্থিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষার জন্য সুদখোর মহাজন, ব্যবসায়ী ও অন্যান্যরা স্বাধীনতার শ্লোগান তুলে সামন্তবাদের অবসান ও গীর্জার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং মানুষের বাক, কর্ম ও ব্যবসায়ের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য একটি নবতর মতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। ফরাসী বিপ্লবসহ সমসাময়িক কয়েকটি রাজনৈতিক ও শিল্প বিপ্লবের নেপথ্যে তাদের চেষ্টা বিশেষ ভূমিকা রাখে।

বিপ্লব সফল হওয়ার পর বাক, কর্ম ও ব্যবসায়ের স্বাধীনতা নিশ্চিতকারী আন্দোলনের নেতারা ভোল পাল্টে ফেলেন। সামন্তপ্রভূ ও গীর্জার মালিকদের পরিবর্তে তারা ক্ষমতার মালিক হন। কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষ যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে যায়। তারা আগের চেয়ে বেশি নগ্নভাবে বিত্তশালী ক্ষমতাবানদের সেবাদাসে পরিণত হন। রাষ্ট্র সর্বসাধারণে পরিবর্তে পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা ও তাদের সম্পদ বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। পুঁজিপতিরা নিজেদের পণ্য বাজারজাত করার জন্য নতুন বাজার অন্বেষণ করে এবং সস্তায় শ্রম ও কাঁচামাল প্রাপ্তির সম্ভাবনা খুঁজতে থাকে। নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র ও সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে তারা উপনিবেশ সৃষ্টি করে এবং ঔপনিবেশিক শাসনে নির্দয়ভাবে মানুষকে তাদের স্বার্থ রক্ষার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে।

পুঁজিবাদের মূল কথা হল, মানুষের অর্জিত সম্পদের মালিক মানুষ নিজে। তাতে অন্য কারো অধিকার নেই। যে কোন ভাবে সম্পদ উপার্জন এবং তা ভোগ করার স্বাধীনতা পুঁজিবাদ মানুষকে দান করে। এতে কোন নৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় বিধি-নিষেধ না থাকায় এ মতবাদটি মানবিকতা বিবর্জিত মতবাদে পরিণত হয়। আর্থিক মুনাফা অর্জন এ মতবাদে মানুষের সকল কাজের একমাত্র লক্ষ্য নির্ণিত হয়। অন্যের ক্ষতি, অসুবিধা, স্বার্থ বা স্বাস্থ্য হানির কোন আশংকা এ মতবাদে গুরুত্ব পায় না। পুঁজিবাদ আয়-ব্যয়ের উপর থেকে ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ নির্মূলের জন্য একটি শ্লোগান নির্ধারণ করে নিয়েছে। তাহল, 'ধর্ম ঈশ্বরের জন্য, রাষ্ট্র সবার জন্য।'[৭৭]

পুঁজিবাদের এ ঘৃণ্য ধারা ধনীকে আরো ধনী এবং গরীবকে আরো গরীবে পরিণত করেছে। শ্রমশোষণ, অমানবিকতা, ভয়ঙ্কর শ্রেণী বৈষম্য এবং শ্রম অসন্তোষ সৃষ্টি পুঁজিবাদের ফলশ্রুতি। এ ফলাফল মানুষকে আরো একটি বিপ্লবের দিকে ধাবিত করে। এ বিপ্লব পুঁজিপতিদের বিনাশ সাধনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠার বিপ্লব। কিন্তু পদ্ধতিগত কারণে এটি আর্থিক মুক্তি নিশ্চিত করতে না পারলেও নৈরাজ্য, হত্যা, রক্তপাত ও বিশৃংখলা সৃষ্টিতে সফলতার পরিচয় দেয়। এ মতবাদটির নাম কম্যুনিজম বা সমাজতন্ত্র। এ মতবাদটির মূলকথা হল, মালিকানা থাকবে রাষ্ট্রের হাতে। ব্যক্তি কোন কিছুর মালিক হবে না। ইচ্ছা মত উপার্জন বা ভোগ ও ব্যয়ও করতে পারবে না। কাজের বিনিময়ে রাষ্ট্র থেকে ভাতা লাভ করবে। রাষ্ট্র ব্যক্তির নাগরিক সুবিধা ও অধিকার নিশ্চিত করবে। আর ব্যক্তি তার উপর অর্জিত দায়িত্ব পালন করে উৎপাদন ও উন্নতি নিশ্চিত করবে। কম্যুনিজম সম্পূর্ণ বস্তুতান্ত্রিক জীবনাদর্শ ঘোষণা করে। তারা ধর্মকে অস্বীকার করে এবং আফিমের মত একে মানবজাতির জন্য ক্ষতিকর ঘোষণা দেয়। নানা কারণে এ মতবাদটি শেষপর্যন্ত ভয়াবহ ব্যর্থতার শিকার হয়। বিশেষত পুঁজিপতিদের নির্মূল করার পরিবর্তে এ মতবাদটি সে সংখ্যা আরো সীমিত করে তা শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়। এরই পথ ধরে ফ্যাসিবাদ, নাৎসীবাদ প্রভৃতি মতবাদের উদ্ভব ঘটলে মানুষের সমন্বিত মুক্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কোন একটি মতবাদও সাফল্য লাভ করে না। কেননা মতবাদগুলো মানুষের মানবিক দাবি ও অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে সমন্বিত জীবনব্যবস্থা দেয়ার বদলে বিশেষ একটি দিককে গুরুত্ব দেয় এবং অন্যগুলো পুরোপুরি উপেক্ষা করে। ফলে মানুষের জীবনধারার স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হয়।

পৃথিবীতে আগে প্রচলিত ছিল এবং এখনো প্রচলিত আছে এমন কয়েকটি মতবাদ সম্পর্কে উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ থেকে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয় তা হল, মানুষের তৈরী কোন মতবাদই পরিপূর্ণ হতে পারে না। আর পরিপূর্ণ হতে পারে না বলেই তা মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে না। কেননা মানুষের জ্ঞান কখনোই স্বার্থপরতা,

[৭৬] প্রাগুক্ত, পৃ.৭
[৭৭] প্রাগুক্ত, পৃ.৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

সংকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতার ত্রুটিমুক্ত নয়। মানুষের সফলতার জন্য প্রয়োজন তার স্বভাব ও প্রকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তার স্বার্থ ও অধিকারের অতন্দ্র প্রহরী এমন একটি মতবাদ যা সকল বৈষয়িক প্রয়োজনের সাথে সাথে মানুষের অন্তরের চাহিদাও পূরণ করবে। মানুষের পক্ষে এমন একটি ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা শুধু অসম্ভবই না বরং অবাস্তবও। কেননা মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান আর সীমিত সামর্থ্যে এমন একটি কাজ করা সম্ভব নয়। এ কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব যিনি মানবীয় দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা ও স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে এমন হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলাই মানুষের সকল সমস্যার সমাধান হিসেবে ইসলামকে জীবনব্যবস্থা মনোনীত করেছেন। মানুষের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে ইসলামে। তাই একে একমাত্র এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা মনোনীত করা হয়েছে।

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা এ কারণে যে, মানুষের জীবনের সম্ভাব্য সকল সমস্যার সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত সমাধান আছে ইসলামে। মানুষের এমন কোন সমস্যা নেই, জীবনের এমন কোন বিভাগ নেই, যে সম্পর্কে ইসলাম তার কল্যাণময় বিধান প্রবর্তন করে নি। শিক্ষা, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, শাসননীতি প্রভৃতি বিষয়ে ইসলাম দিয়েছে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়ে এর রয়েছে সুনির্দিষ্ট সমাধান। 'পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপক যে জীবন বিধান মানুষের প্রয়োজন, তার সন্ধান লাভ করার জন্য জ্ঞানের অবসাদগ্রস্ততা দূর করে খোলা মন নিয়ে জ্ঞান ও বিবেককে কাজে লাগিয়ে আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করলে দেখা যাবে যে, সে জীবনব্যবস্থাটি হচ্ছে কেবলই ইসলাম। যার মধ্যে কোন বক্রতা, অকল্যাণ ও বিভ্রান্তি নেই। তবে ইসলাম কোন মন্ত্র নয় যা মুখস্থ পড়লেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। আর ইসলাম নিছক কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদতও নয় যা আদায় করলে আর কিছু করার থাকে না। বরং ইসলাম হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতের পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গীণ জীবনব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় দুনিয়াকে নিয়ে মেতে থাকতে বলা হয় নি আবার শুধুই আখিরাতকে ভেবে দুনিয়াকে পরিত্যাগ করারও আদেশ দেয়া হয় নি। বরং এতদুভয়ের মধ্যে যৌক্তিক সমন্বয় সাধনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে –
"আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলো না। তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের ভালবাসেন না।"[৭৮]

মানবতার জন্য ইসলাম আল্লাহ তাআলার এক অবিস্মরণীয় নিআমত। মানুষের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে আল্লাহ তাআলা এ বিধান মেনে চলা বাধ্যতামূলক করেছেন। এ জন্যে করণীয় নির্দেশ করেছেন অত্যন্ত সংক্ষেপে। বলেছেন, "রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর ও যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাকো এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহতো শাস্তি দানে কঠোর।"[৭৯]

ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে আল্লাহ তাআলার ঘোষণায়। কুরআন মাজীদের অসংখ্য স্থানে তিনি আংশিক ইসলাম মেনে চলার তীব্র সমালোচনা করেছেন। এবং বিশ্বমানবের প্রতি পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আংশিক বিশ্বাস বা আনুগত্য যে আসলে কোন আনুগত্য না – বরং তাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ তাই মূর্ত হয়ে উঠেছে আল্লাহর ঘোষণায়। ইরশাদ হয়েছে – "তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের যারা এমন করে তাদের একমাত্র প্রতিফল দুনিয়ার জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে।"[৮০]

মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগের মধ্যে ইসলাম হল সর্বাধিক যৌক্তিক সমন্বয়। এ ব্যবস্থায় জীবনের কোন একটি দিককে অপ্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়া হয় নি আবার প্রয়োজনীয় কোন বিষয়কে গুরুত্বহীন প্রমাণের অপরিণামদর্শিতাও দেখানো হয় নি। মূলত ইসলাম হল বিশ্বাস, ইবাদত, রাজনীতি, নেতৃত্ব, অর্থনীতি, আইন, যুদ্ধ ও শান্তি নীতির প্রশিক্ষণ ও প্রতিষ্ঠার এক নিখুঁত ও কল্যাণময় ব্যবস্থাপনা।

---

[৭৮] আল কুরআন / ২৮: ৭৭
[৭৯] আল কুরআন / ৫৯ : ৭
[৮০] আল কুরআন / ২ : ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম বিশ্বমানবের সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবননির্বাহের আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-ব্যবস্থাপনা। মানুষের জীবনের এমন কোন দিক ও বিভাগ নেই যে বিষয়ে এখানে কোন নির্দেশনা নেই। জীবন সমস্যার যথাযথ ও কল্যাণময় সমাধান নির্দেশে ইসলামের ভূমিকা অবস্মিরণীয়। ইসলামের পূর্ণতার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হল আল কুরআন। আল্লাহ বলেন, "আর তারা তোমার কাছে এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করে না, যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দেই নি।"[৮১]

আল্লাহ তাআলা নিজেই মানুষকে প্রার্থনা শিখিয়েছেন 'আমাদেরকে সরল পথ দেখাও।'[৮২] তারপর কুরআন নাযিল করে তিনি নিজেই বলেছেন, 'এটা সে কিতাব; এতে কোন সন্দেহ নেই। মুত্তাকীদের জন্যে এটা পথনির্দেশ।'[৮৩]
বিষয়টির আরো বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়ে ইরশাদ হয়েছে – "নিশ্চয় এ কুরআন হিদায়াত করে সে পথের দিকে যা সুদৃঢ় এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।"[৮৪]
"রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী হিসেবে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।"[৮৫]

বস্তুত আল্লাহ তাআলা ইসলামকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে পূর্ণতা দেয়ার যে ঘোষণা দিয়েছেন তার মূলভিত্তি কুরআন। ইরশাদ হয়েছে, "আর আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ হিসেবে তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করলাম।"[৮৬]
হাদীসে এসেছে – "আল্লাহর কিতাবই সর্বোত্তম কথা আর মুহাম্মদ (স) এর পথই সর্বোত্তম পথ।"[৮৭]
মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আর্ন্তজাতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয়, সামরিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম তার রীতি-নীতি ও বিধি-বিধান পেশ করেছে। এ সকল বিধান সম্পর্কে আলোচনা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

ব্যক্তি বৃহত্তর মানব সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তা সত্ত্বেও তার নিজস্ব সমস্যা রয়েছে। ব্যক্তির বিশ্বাস, কার্যক্রম দায়িত্ব, ও কর্তব্যের সীমা নির্ধারণ এবং কাজের জন্যে ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে দায়ী করে ইসলাম ব্যক্তিজীবনের সমস্যা নিরসনের উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্যে প্রথমেই ব্যক্তিকে কুফর, শিরক, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি অসার বিশ্বাস থেকে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণের আহ্বান জানিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, "তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে!"[৮৮]
নিজেকে বিশ্বাসী মানুষে পরিণত করা, সদাচার ও ন্যায় নিষ্ঠায় অভ্যস্ত হওয়া ব্যক্তির নিজের জন্যে অত্যন্ত জরুরী। ইরশাদ হয়েছে, " যে সৎকাজ করে সে তার কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে-ই ভোগ করবে, এরপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।"[৮৯]
"যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদের মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং কেউ কারো ভার বহন করবে না। আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকেও শাস্তি দেই না।"[৯০]

---

[৮১] আল কুরআন / ২৫ : ৩৩
[৮২] আল কুরআন / ১: ৫
[৮৩] আল কুরআন / ২ : ২
[৮৪] আল কুরআন / ১৭ : ৯
[৮৫] আল কুরআন / ২ : ১৮৫
[৮৬] আল কুরআন / ১৬ : ৮৯
[৮৭] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, আল জামি আস সহীহ, দেওবন্দ – ১৯৭৫, কিতাবুল ই'তিসাম
[৮৮] আল কুরআন / ৬১ : ১১
[৮৯] আল কুরআন / ৪৫ : ১৫
[৯০] আল কুরআন / ১৭ : ১৫

Dhaka University Institutional Repository

কর্মবিমুখতা ও বৈরাগ্য ব্যক্তিজীবনের অন্যতম সমস্যা। ইসলাম ব্যক্তিকে সাধারণ সংসারী, ধার্মিক এবং কর্মমুখর হওয়ার নির্দেশনা দিয়ে এ সমস্যার নিরসন করে। ইরশাদ হয়েছে – "তোমরা যদি আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিয়ে করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার; আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিক সম্ভাবনা।"[৯১]

"সালাত শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[৯২]

"এরপর আমি তাদের পেছনে অনুগামী করেছিলাম আমার রাসূলগণকে এবং অনুগামী করেছিলাম মারইয়াম তনয় ঈসাকে আর তাকে দিয়েছিলাম ইঞ্জীল এবং তার অনুসারীদের অন্তরে দিয়েছিলাম করুণা ও দয়া। আর সন্ন্যাসবাদ – এটা তো তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল। আমি তাদেরকে এর বিধান দেই নি।"[৯৩]

ব্যক্তি কেন্দ্রিক সম্ভাব্য সমস্যাগুলো সমাধানে ইসলাম তার পূর্ণাঙ্গতা অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ করেছে। ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্ম আর কোন জীবনব্যবস্থা এভাবে ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে বিস্তারিত নীতিমালা প্রণয়ন করে নি।

মাতাপিতা, সন্তান-সন্ততি, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যদের নিয়ে মুসলিম পরিবার গড়ে ওঠে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস, ভালবাসা, সহানুভূতি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি এবং সর্বাত্মক সহযোগী মনোভাব প্রতিষ্ঠাই এ সংস্থার মূল সমস্যা। এ সমস্যা নিরসনে ইসলামের প্রথম হিদায়াত হচ্ছে – "আত্মীয়-স্বজনকে দেবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপচয় করবে না।"[৯৪] ইসলাম বিভিন্নভাবে নিকটাত্মীয়দের নানা রকমের হক নির্ধারণ করে দিয়ে তা আদায়ের পথ নির্দেশ করেছে এবং এর মাধ্যমে পারিবারিক অবকাঠামো, শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ নিশ্চিত করেছে। এখানে পরিবারের প্রতিজন সদস্যকে অন্যের ওপর দায়িত্বশীল বিবেচনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন -

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর আগুন হতে, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না তা যা আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেন। আর তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।"[৯৫]

পারিবারিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম পরিবারের সদস্যদের জন্য আলাদা আলাদাভাবে পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করেছে। যেমন মাতাপিতার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে -

"যে স্তন্য পানকাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু বছর স্তন্য পান করাবে। পিতার কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ পোষণ করা। কাউকেও তার সাধ্যাতীত কাজের ভার দেয়া হয় না। কোন মাকে তার সন্তানের জন্য কোন পিতাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না।"[৯৬]

সন্তানদের জন্যে নির্দেশনা এসেছে - "তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত আর কারো ইবাদত না করতে এবং মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ' বল না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল। মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।"[৯৭]

---

[৯১] আল কুরআন / ৪: ৩
[৯২] আল কুরআন / ৬২ : ১০
[৯৩] আল কুরআন / ৫৭ : ৫৭
[৯৪] আল কুরআন / ১৭ : ২৬
[৯৫] আল কুরআন / ৬৬ : ৬
[৯৬] আল কুরআন / ২ : ২৩৩
[৯৭] আল কুরআন / ১৭ : ২৩-২৪

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার নির্দেশ করে বলা হয়েছে – "নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে।"[৯৮]

এভাবে পরিবার গঠন, পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকারের সীমা নির্দেশ এবং নিবিড় মমতার স্বর্গীয় গ্রন্থনায় সদাচার ও শুভ কামনা দিয়ে ইসলাম পারিবারিক সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পেয়েছে।

মানুষ সামাজিক জীব। আত্মীয়-অনাত্মীয়, মুসলিম-অমুসলিম পাড়া প্রতিবেশী নিয়ে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে তাকে সামাজিক জীবন নির্বাহ করতে হয়। অবিচার, জুলুম, অধিকারহরণ, আত্মসাৎ, হত্যা, চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই, ব্যভিচার ও নানারকম খারাপ আচরণ সামাজিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এ সমস্যা নিরসনে ইসলাম ন্যায়বিচার, সদাচার ও প্রয়োজনীয় দণ্ডবিধানের ঘোষণা দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে –

"হে মুমিনগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা যা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।"[৯৯]

"হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষী হিসেবে, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা মাতাপিতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ তো তার সম্যক খবর রাখেন।"[১০০]

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না; আর মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।"[১০১]

"হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসায় করা বৈধ; আর একে অপরকে হত্যা কর না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।"[১০২]

"আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা কর না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধীকারীকে তো আমি তা প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি; কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই।"[১০৩]

"পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের হাত কেটে দাও; এটা তাদের কাজের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ হতে আদর্শ দণ্ড; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[১০৪]

"ব্যভিচারী নারী এবং ব্যভিচারী পুরুষ – তাদের প্রত্যেককে চাবুকের একশত আঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী হও; মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"[১০৫]

এমনভাবে সহানুভূতি, সদাচার ও ন্যায়নীতির ভিত্তিতে ইসলাম মানুষের সামাজিক জীবনকে সমস্যামুক্ত ও শান্তিপূর্ণ করার সামগ্রিক বিধান দিয়েছে।

---

[৯৮] আল কুরআন / ২ : ২২৮
[৯৯] আল কুরআন / ৫ : ৮
[১০০] আল কুরআন / ৪: ১৩৫
[১০১] আল কুরআন / ৪: ৩৬
[১০২] আল কুরআন / ৪: ২৯
[১০৩] আল কুরআন / ১৭ : ৩৩
[১০৪] আল কুরআন / ৫ : ৩৮
[১০৫] আল কুরআন / ২৪ : ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় জীবনের মূল সমস্যা অনৈক্য, আস্থাহীনতা এবং জাতীয় দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন। এ সমস্যা মূলোৎপাটিত করতে মুসলিম জাতিকে ইসলামে ঐক্যবদ্ধ ও আস্থাশীল থাকার এবং প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে – "তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ তা হতে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার। আর তোমাদের মধ্যে এমন একদল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে; এরাই সফলকাম। তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।"[১০৬] এ ঘোষণায় ইসলাম বিভক্তি, অনৈক্য, দায়িত্বহীনতা প্রভৃতি জাতীয় সমস্যার কল্যাণকর সমাধান দিয়েছে।

বর্ণ ও অঞ্চলগত সংঘাত আন্তর্জাতিক জীবনের মূল সমস্যা। এছাড়াও সাম্রাজ্য বিস্তারের অশুভ বাসনা, জবরদখল, যুদ্ধ বিশ্ব পরিস্থিতিকে অশান্ত করে রাখে। ইসলাম বিশ্বে সকল কালের ও সকল দেশের মানুষকে একই বংশোদ্ভূত ঘোষণা দিয়ে দেশে-দেশে, জাতিতে জাতিতে বর্ণ ও অঞ্চলগত সংঘাতের অবসান ঘটিয়েছে। আল্লাহ বলেন, "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"[১০৭]

শান্তি বজায় রাখতে ইসলাম শান্তিচুক্তি বা সন্ধির নির্দেশনা দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, "তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করে রাখবে। এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে সন্ত্রস্ত করে রাখবে এ ছাড়াও অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না। তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবে, তিনিই সর্বশ্রোতা।"[১০৮] এমনকি মুসলিম জাতি বা রাষ্ট্রকে সাহায্য করার ক্ষেত্রেও চুক্তির মর্যাদা রক্ষার কথা বলা হয়েছে। যাদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ না নেওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে – "যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করে নি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমাদের নেই; আর দীন সম্বন্ধে তারা তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে তবে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।"[১০৯]

এভাবে ইসলাম বিশ্বব্যাপী বিরাজমান অস্থিরতা, ক্ষমতার দম্ভ আর দ্বন্দ্বের বিপরীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্যকর বিধান প্রণয়ন করে তার বিশ্বজনীন ভাবমূর্তিটিকেই সমুজ্জ্বল করে তুলেছে।

ধর্ম নিয়ে সংঘাত, রক্তপাত ও বাড়াবাড়ি বিভিন্ন ধর্মানুসারী মানুষদের জীবন দুর্বিষহ করে রেখেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মানুষের জীবন অশান্তিপূর্ণ করে তুলেছে। এর সমাধানকল্পে ইসলাম স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেছে-
"দীন সম্পর্কে জবরদস্তি নেই; সত্য পথ ভুল পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগূতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহে ঈমান আনবে সে এমন এক মযবূত হাতল ধরবে যা কখনো ভাঙবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা প্রজ্ঞাময়।"[১১০]

---

[১০৬] আল কুরআন / ৩ : ১০৩-১০৫
[১০৭] আল কুরআন / ৪৯ : ১৩
[১০৮] আল কুরআন / ৮ : ৬০-৬১
[১০৯] আল কুরআন / ৮ : ৭২
[১১০] আল কুরআন / ২ : ২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

"বল, হে কাফিররা! আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি। আমি ইবাদতকারী নই তা যার ইবাদত তোমরা করে আসছো আর তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও, যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার।"[১১১]

উক্ত দুটি ঘোষণায় ইসলাম ধর্মীয় স্বাধীনতার অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। যেখানে প্রতিজন ধর্মানুসারী লোক স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম অনুসরণ করতে পারে। ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্ম বা মতাদর্শে পরমত – পরধর্ম সহিষ্ণুতার এমন কোন দৃষ্টান্তমূলক বিধান পাওয়া যায় না। কেবল ইসলামই নিজের ধর্মীয় বিধানাবলী আবশ্যিকভাবে পালনের নির্দেশ দেয়ার পাশাপাশি অন্যের ধর্মীয় অধিকার অক্ষুন্ন রাখার আদেশ দিয়ে ধর্ম সংক্রান্ত সকল সমস্যা সমাধানের পথ অবারিত করেছে।

এক আল্লাহ পরিবর্তে অসংখ্য 'মানুষ প্রভূর প্রভূত্ব মানুষের রাজনৈতিক জীবনের মূল সমস্যা। এ সমস্যা আশরাফুল মাখলুকাত মানুষকে সরাসরি অন্য মানুষের গোলামীতে বাধ্য করে। মানুষ আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে কোন মানুষকে তার জীবন ও জীবিকার মালিক মনে করতে থাকে। সবচেয়ে বড় কথা আদর্শিক দৈন্যতার শিকার এ সকল অপূর্ণ মানুষকেই অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে বেছে নেয়। ফলে রাজনৈতিক জীবনে নেমে আসে অন্তহীন বিশৃংখলা। এ সমস্যা নিরসনে ইসলাম আল্লাহ ছাড়া আর কোন সৃষ্টিরই যে প্রভূত্ব করার যোগ্যতা নেই সে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা ও প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছে । ইরশাদ হচ্ছে – "আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা বা ঘুম স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত তাঁরই। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন তাছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না; তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।"[১১২]

"আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, ফেরেশতাও এবং জ্ঞানীগণও; আল্লাহ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[১১৩]

"বল, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর, যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও; যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয়ই তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তুমি রাতকে দিনে পরিণত কর, দিনকে রাতে পরিণত কর; তুমি মৃত হতে জীবিতের আবির্ভাব ঘটাও আবার জীবিত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবরোপকরণ দান কর।"[১১৪]

মানুষ কখনো প্রভূ হতে পারে না। কেননা যিনি স্রষ্টা প্রভূ হবেন তিনিই। আইন দেয়ার ক্ষমতা তাঁর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। সৃষ্টি যার আইন চলবে তাঁরই। প্রভূত্বও তিনি ছাড়া আর কেউ করতে পারবেন না। ইরশাদ হয়েছে –
"বল, অবশ্যই আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত; অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছো। তোমরা যা তাড়াতাড়ি চাচ্ছো তা আমার নিকট নেই। কর্তৃত্বতো আল্লাহরই। তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং ফয়সালাকারীদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ।"[১১৫]

তাছাড়া পদপ্রার্থিতা, আত্মপ্রচার, ক্ষমতা ও পদের লোভ, স্বেচ্ছাচারিতা, দম্ভ, প্রকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অনুপস্থিতি ও অন্যতম রাজনৈতিক সমস্যা। এগুলোর সমধান ইসলাম দিয়েছে একটি মাত্র ঘোষণায়। ইরশাদ হয়েছে-

---

[১১১] আল কুরআন / ১০৯ : ১-৬
[১১২] আল কুরআন / ২ : ২৫৫
[১১৩] আল কুরআন / ৩ : ১৮
[১১৪] আল কুরআন / ৩ : ২৬-২৭
[১১৫] আল কুরআন / ৬ : ৫৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

"হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী তাদের আনুগত্য কর। কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।"[১১৬]

সম্পদের অসম বন্টন, উপার্জন ও ব্যয়ে হারাম পদ্ধতি অনুসরণ, সম্পদ আত্মসাৎ, সুদ প্রভৃতি হচ্ছে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা। ইসলাম এ সমস্যা সমাধানে শ্রমনির্ভর ও যাকাতভিত্তিক এবং সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা চালু করেছে। এ অর্থব্যবস্থার মূললক্ষ্য মানুষের আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জন, সম্পদের সুষম বন্টন, মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং উৎপাদন ও উপার্জনে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা। এজন্যে মানুষকে হালাল জীবিকা উপার্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে - "হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু আছে বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[১১৭]

"হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমি যে সব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা হতে আহার কর এবং আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা শুধু তারই ইবাদত কর।"[১১৮]

অপচয় নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে "হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে, আহার করবে, পান করবে কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।"[১১৯]

"আত্মীয়-স্বজনকে দেবে তাদের প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্তকে ও মুসাফিরকেও। আর কিছুতেই অপব্যয় কর না। যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।"[১২০]

ধনীদের সম্পদে গরিবদের 'অধিকার' ঘোষণা করে আল্লাহ বলেছেন – "এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক।"[১২১] সুষম বন্টনের জন্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে – "আল্লাহ জনপদের অধিবাসীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, রাসূলের স্বজনগণের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে। রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাকো এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আল্লাহ তো শাস্তি দেয়ায় কঠোর।"[১২২]

অসম অর্থবন্টন রোধে আল্লাহ যাকাত প্রথার প্রবর্তন করেছেন। ইরশাদ হয়েছে – "তোমরা সালাত কায়িম কর ও যাকাত দাও এবং যারা রুকূ করে তাদের সাথে সাথে রুকূ কর।"[১২৩]

অর্থব্যবস্থাকে শোষণমুক্ত রাখতে সব ধরনের সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে – "যারা সুদ খায় তারা সে ব্যক্তিরই মত দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয়তো সুদের মত। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন, সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহর ইখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় আরম্ভ করবে তারাই আগুনের অধিবাসী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না। যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, সালাত কায়িম করে এবং যাকাত দেয়, তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন

---

[১১৬] আল কুরআন / ৪: ৫৯
[১১৭] আল কুরআন / ২ : ১৬৮
[১১৮] আল কুরআন / ২ : ১৭২
[১১৯] আল কুরআন / ৭ : ৩১
[১২০] আল কুরআন / ১৭ : ২৬-২৭
[১২১] আল কুরআন / ৫১ : ১৯
[১২২] আল কুরআন / ৫৯ : ৭
[১২৩] আল কুরআন / ২ : ৪৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

হও। যদি তোমরা না ছাড়ো তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। কিন্তু তোমরা যদি তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিতও হবে না।"[১২৪]

সাধারণভাবে মনে করা হয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য হল 'যোগ্য নাগরিক' তৈরী করা। যদিও নাগরিক এবং তার প্রয়োজনীয় যোগ্যতার সর্বজনগ্রাহ্য কোন সংজ্ঞা ঠিক করা যায় নি। 'কেননা বিভিন্ন জাতির নিকট নাগরিক ও তার যোগ্যতার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা দেখা যায়। কোন দেশে এর অর্থ অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, কোথাও বা এর অর্থ বিদ্রোহ দমনে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করা। কোন কোন দেশে নাগরিক এমন একজন ভাল লোক যে অন্যায় ও বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না। কোথাও সে হয় এমন উপাসক দুনিয়া থেকে যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে, উপেক্ষা করেছে সকল দ্বন্দ্ব আর সংঘর্ষ। কখনো কখনো তাকে দেখা যায় নিজের বর্ণ, ধর্ম, দেশ, জাতি, গোত্র ও বংশের স্বার্থ রক্ষায় উন্মাদ হয়ে যেতে। তা সত্ত্বে প্রযোজ্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাকে 'যোগ্য নাগরিক' হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে দেশ, স্থান, অঞ্চল আর ধর্ম ভেদে শিক্ষার উদ্দেশ্যেও ভিন্নতা আসে, প্রকৃতপক্ষে যা শিক্ষাকে সর্বজনীন হতে দেয় না এবং তাকে অভাবনীয় সংকীর্ণতায় নিক্ষেপ করে। ইসলাম শিক্ষাকে এ সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দেয়। এজন্য সে শিক্ষার মূল লক্ষ্য যোগ্য নাগরিক তৈরী নির্ধারণ না করে 'যোগ্য মানুষ' গড়ার লক্ষ্য ঠিক করে। ফলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ, অঞ্চল, দেশ, সম্প্রদায় ভেদে ইসলামী শিক্ষার লক্ষ্য পরিবর্তিত হয় না। বরং সংকীর্ণ নাগরিকতার দ্বন্দ্ব থেকে মানুষ এখানে তার বিশ্বজনীন পরিচয়ে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

নীতি-আদর্শহীন শিক্ষা এবং অশালীন সংস্কৃতির চর্চা শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানুষের মুল সমস্যা। তাছাড়া অশিক্ষা ও নিরক্ষরতা মানুষকে কুসংস্কারপূর্ণ অন্ধকার জীবনে ঠেলে দেয়। এ সমস্যা সমাধানে ইসলাম সবার জন্যে শিক্ষাগ্রহণ ফরয করেছে এবং নিষিদ্ধ করেছে সকল অশালীন আচরণ। আল্লাহ বলেন, "পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন – সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে – শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।"[১২৫]
অশালীন সংস্কৃতি চর্চা নিষিদ্ধ করে ঘোষণা করে বলা হয়েছে – "যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।"[১২৬]

এভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে পবিত্র সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ এবং শিক্ষাকে অনিবার্য করে ইসলাম শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়রোধে কার্যকর বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে।

শাসকদের উদাসীনতা ও দুঃশাসন, নাগরিকদের অবাধ্যতা ও দায়িত্বহীনতা এবং শাসক ও শাসিতের সম্পর্কহীনতাই রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রধান সমস্যা। এ সমস্যা নিরসনে শাসকদের জন্যে কুরআনের নির্দেশনা হল – "আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতে তবে তারা তোমরা আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। এরপর তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর ভরসা নির্ভর করবে; যারা নির্ভর করে আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।"[১২৭]
কেননা মুসলিমদের বৈশিষ্ট্য হল "যারা তাদের রবের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়িম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কাজ সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিযক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।"[১২৮]

শাসক ও শাসিতের দায়িত্ব নির্দেশ করে আল্লাহ বলেন – "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যার্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার কাজ পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং যারা

---

[১২৪] আল কুরআন / ২ : ২৭৫-২৭৯
[১২৫] আল কুরআন / ৯৬ : ১-৫
[১২৬] আল কুরআন / ২৪ : ১৯
[১২৭] আল কুরআন / ৩ : ১৫৯
[১২৮] আল কুরআন / ৪২ : ৩৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী তাদের; কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রাসূলের নিকট। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতম।"[১২৯]

শাসকের আনুগত্যের কথা বলা হলেও শাসকরা স্বেচ্ছাচারীভাবে তাদের কোন আদেশ মানুষের উপর চাপিয়ে দেবে এমন সুযোগও ইসলাম রাখে নি। বরং ইসলাম সবসময় এ বিষয়টিই নিশ্চিত করেছে যে, হুকুম একমাত্র আল্লাহ তাআলা দিতে পারবেন। তিনি ছাড়া আর কারো হুকুম চলবে না। এ ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়ে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে – "তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশসমূহ ও ছয়দিনে সৃষ্টি করেন; এরপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত দিয়ে আচ্ছাদিত করেন যাতে তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে আর চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই আজ্ঞাধীন, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। মহিমময় বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ।"[১৩০]

এভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিয়ে এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে ইসলাম রাষ্ট্রীয় সমস্যাসমূহ সমাধানের প্রয়াস পেয়েছে।

সামরিক জীবনের মূল সমস্যা হল অন্যায় আক্রমণ ও সীমালঙ্ঘন করা যুদ্ধ। যুদ্ধ শেষে নির্বিচার হত্যা ও লুণ্ঠন এ সমস্যাকে আরো ভয়াবহ এবং অত্যন্ত অমানবিক করে তোলে। এজন্যে সামরিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের হিদায়াত হল – "এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকো যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ তো তার সম্যক দ্রষ্টা।"[১৩১] এভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে চূড়ান্ত পর্যায়ের জিহাদ হিসেবে ইসলামে যুদ্ধ করার নির্দেশ থাকলেও সে যুদ্ধও মানবতা ও মানবিকতার পক্ষেই হয়ে থাকে। নারী, শিশু, বৃদ্ধ, বেসামরিক জনতা এবং আত্মসমর্পণকারী যোদ্ধারা পর্যন্ত মুসলিমদের কাছে বিশেষ নিরাপত্তা লাভ করে। অপ্রয়োজনে ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া বা জনপদ ধ্বংস করা দূরে থাক সাধারণ একটি গাছ কেটে ফেলাকেও সীমালংঘন হিসেবে দেখা হয়েছে। কাজেই সামরিক ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা নিরসনে ইসলাম একটি মানবিক এবং পূর্ণাঙ্গ বিধান দিয়েছে।

নৈতিক অধঃপতন এমন এক সমস্যা যা মানজাতির ধ্বংস ডেকে আনে। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হওয়ার নেপথ্যে তার উন্নত চরিত্র নিঃসন্দেহে সর্বাধিক প্রভাবক বিষয়। ইসলাম তাই মানুষকে সুন্দর নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলার নির্দেশনা দিয়েছে। নীতি ও চরিত্রহীনতার সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের জন্যে ইসলাম মানুষকে নবী-রাসূলগণের আদর্শে এবং আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে – "তোমরা বল, আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি, যা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার বংশধরদের প্রতি নাযিল হয়েছে আর যা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী। তোমরা যাতে ঈমান এনেছো তারা যদি তেমন ঈমান আনে তবে নিশ্চয় তারা হিদায়াত পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তারা নিশ্চয় বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা। আমরা গ্রহণ করলাম আল্লাহর রঙ; রঙে আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর? এবং আমরা তাঁরই ইবাদতকারী।"[১৩২]

মানুষকে নৈতিক স্খলন ও নীতিহীনতা থেকে রক্ষার জন্যে কুরআনে সব রকমের পাপাচার, বিদ্রুপ, উপনামে ডাকা, দোষারোপ, দোষান্বেষণ, ভিত্তিহীন অনুমান, গীবত, অন্যায় ও অশালীন কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে – "হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। কোন নারী অপর কোন নারীকেও যেন উপহাস না করে;

---

[১২৯] আল কুরআন / ৪: ৫৮–৫৯
[১৩০] আল কুরআন / ৭ : ৫৪
[১৩১] আল কুরআন / ৮ : ৩৯
[১৩২] আল কুরআন / ২ : ১৩৬-৩৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন 'দুনিয়া আখিরাতের শস্য ক্ষেত্র।' সে জন্যে ইসলাম মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের দু'জীবনেই সাফল্য ও কল্যাণ লাভের প্রার্থনা শিখিয়েছে। ইরশাদ হয়েছে – "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও, আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা কর।"[১৩৭] দুনিয়ার জীবনকে সবদিক থেকে সুন্দর করার জন্য ইসলাম শুধু আদেশ দিয়ে বা আদর্শ পেশ করেই নিজের দায়িত্ব শেষ করে নি। বরং পৃথিবীতে অনুসরণের জন্য আল কুরআনের মত একটি পরিপূর্ণ সংবিধানও পেশ করেছে।

দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ জীবন নশ্বর। দুনিয়ার জীবন নির্বাহ করার পর মানুষ আখিরাতের অনন্ত জীবনে প্রবেশ করে। এ জীবনের সাফল্যই আসল সফলতা। এ জীবনে ব্যর্থ হওয়া মানে চিরস্থায়ী ধ্বংসে পতিত হওয়া। এ জন্যে ইসলাম মৃত্যু পরবর্তী এ অনন্ত জীবন আখিরাতকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়ার নির্দেশনা দেয়। আল্লাহ বলেন – "হে মুমিনগণ! তোমাদের কী হল যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে অভিযানে বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে ভূতলে ঝুঁকে পড়? তোমরা কী আখিরাতের জীবনের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হয়েছো? আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের ভোগের উপকরণতো অত্যন্ত কম।"[১৩৮]
বস্তুত আল্লাহর নিকট আখিরাতমুখী চেষ্টা, সাধনাই গ্রহণযোগ্য। ইরশাদ হয়েছে - 'কেউ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা এখানেই তাড়াতাড়ি দিয়ে থাকি; পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায়। যারা মুমিন হয়ে আখিরাত কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ চেষ্টা করে তাদের প্রচেষ্টা পুরস্কারযোগ্য।"[১৩৯]

কাজেই মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের যাবতীয় সমস্যা সমাধানে ইসলাম অভ্রান্ত ও কল্যাণময় নির্দেশনা দিয়েছে। যা থেকে যে কোন স্বাভাবিক বিবেকবান মানুষও বুঝতে সক্ষম হবে যে, ইসলাম আল্লাহ মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা না হলে কোন ক্রমেই তা মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের এমন বিস্তারিত ও অভ্রান্ত সমাধান দিতে পারত না। ইসলামের এ সকল নির্দেশ, নির্দেশনা ও বিধি-ব্যবস্থা মানুষের চিরকালীন কল্যাণ ও সফলতা নিশ্চিত করে। তাই বাস্তবজীবনে এ নির্দেশনার অনুশীলন ও অনুসরণ করা হলেই প্রকৃত শান্তি ও মুক্তি লাভ সম্ভব হবে।

ইসলামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ইসলাম মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। পার্থিব, অপার্থিব, জাগতিক, লৌকিক, পারলৌকিক, আধ্যাত্মিক ও আত্মিক জীবনের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে মানুষকে তার পূর্ণ মহিমায় উদ্ভাসিত করে তোলাই ইসলামের লক্ষ্য। পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম বলতে জীবনের এক বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত রূপকেই বুঝানো হয়ে থাকে। জীবনের সামগ্রিক ঐক্য ও সংহতি বিবর্জিত পারলৌকিক কল্যাণই সেখানে ধর্মীয় চেতনার মূল লক্ষ্য। পাশ্চাত্যের এ অর্থে ইসলামকে ধর্ম বলা যায় না। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন এক সামগ্রিক অখণ্ড সত্তা। এর সকল অংশের প্রতিটির সাথে প্রতিটির এক স্বাভাবিক ঐক্য রয়েছে। এ ঐক্য হতে জীবনের বিভিন্ন অংশ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে মানব জীবন অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই ইসলাম ইহলোক, পরলোক, পার্থিব, অপার্থিব, লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে এক অদৃশ্য সেঁতু স্থাপন করে মানুষের আপাতদৃষ্ট সীমিত জীবনকে এক মহাজীবনের সাথে সম্পৃক্ত করে। এক শাশ্বত চিরন্তন জীবনের সাথে অমর বন্ধনে গ্রন্থিত করে। মানব জীবনের মূল্যবোধের চৌহদ্দিকে অসীমলোকে উন্নীত করে।
নীতি বা বিশ্বাসই ইসলামী জীবন দর্শনের শেষ কথা নয়। বরং নীতি ও বিশ্বাস এর প্রাথমিক স্তর। কর্ম হল এ স্তরের পরবর্তী ধাপ। ইসলামের আসল লক্ষ্য হল বিশ্বাস ও কর্মের মিলন ঘটিয়ে জীবনের প্রতিষ্ঠা ও জীবনের গভীরতম সত্যের উপলব্ধি। বিশ্বাস ও কর্মের এমন মণিকাঞ্চনযোগ পৃথিবীর আর কোন ধর্ম, আদর্শ, দর্শনে লক্ষ্য করা যায় না।

---

[১৩৭] আল কুরআন / ২ : ২০১
[১৩৮] আল কুরআন / ৯ : ৩৮
[১৩৯] আল কুরআন / ১৭ : ১৮-১৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন হাদীসের এ সকল ঘোষণা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়, ইসলাম নীতি সর্বস্ব ও কেবল বিশ্বাসভিত্তিক কোন ধর্ম নয়। বরং ইসলাম হল নীতি ও বিশ্বাসের বাস্তব রূপায়নের এক স্বাভাবিক তাগিদ। ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ তাই বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে সে বিশ্বাসের আলোকে কাজ সম্পাদন করা।

মানবজীবনের পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন ধর্মের, এ বিকাশ জীবনের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার বাস্তবায়নের উপর নির্ভরশীল। ইসলাম তাই মানব জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম। মানুষের সামগ্রিক চেতনার পরিপূর্ণ পরিচয়। ইসলাম শুধু একটি ধর্ম নয়। বরং এটি জীবন যাপনের ব্যবস্থা এবং সৎকাজ, সৎচিন্তা ও সত্যবাদিতার ধর্ম। এটি স্বর্গীয় প্রেম, সর্বজনীন বদান্যতা ও আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। মূলত ইসলাম তাত্ত্বিক ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। এটি একটি পরিপূর্ণ সভ্যতা। ইসলামের চেয়ে অন্য কোন ধর্ম বা আদর্শে মানবতার বিকাশের এমন বৃহত্তর সম্ভাবনা নিহিত নেই। ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্ম, আদর্শ, মতবাদ বা দর্শনই অধিকতর বিশুদ্ধতা অথবা মানব জাতির প্রগতিশীল আবেদনের সাথে এত অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

ইসলামী জীবনব্যবস্থা মানুষের স্বভাব ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে এটি যে কোন যুগে উপযোগী, জীবনের গতিশীল যে কোন অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ইসলাম সকল যুগের সকল দেশের স্বাভাবিক ধর্ম। এটি মানুষের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবনের সকল সমস্যার সার্থক সমাধান প্রদান করে। সকল যুগ ও সকল জাতির ক্ষেত্রে ইসলামী নীতিসমূহের রয়েছে বিস্ময়কর উপযোজন। প্রজ্ঞাজনিত জ্ঞানের সাথে এর রয়েছে সামগ্রিক সুসংগতি। মানব হৃদয়ের বদ্ধমূল মৌল সত্যসমূহকে আবেগজাত অভিজ্ঞতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন করার মত কোন অলৌকিক মতবাদ ইসলামে নেই। ইসলাম মানব জীবনের আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ বিকাশের চূড়ান্ত রূপের পরিচয়বাহী। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন – "নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও সাবিঈন হয়েছে – তাদের মধ্য থেকে যে-ই আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে তাদের জন্য তাদের রবের নিকট পুরস্কার আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"[১৪০]

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বজনীন ধর্ম হিসেবে ইসলাম হল মানব জীবনের কর্মময়, সরল, সহজ, বাস্তবধর্মী ও প্রত্যয়দৃপ্ত জীবনব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা মানুষের ভেতরের সাথে তার বাইরের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে। বহির্জাগতিক সমস্যাসমূহও যে মানুষের আন্তর ও আধ্যাত্মিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, মানুষের চরিত্র ও আচরণকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে – ইসলাম সে সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। এ সচেতনতার জন্যই ইসলাম মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের সাথে তার সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনেরও পর্যালোচনা করে। একে তাই বলা যায়, মানবজাতির পূর্ণতর জীবনব্যবস্থা। ফলে ধর্মীয় জীবনে কোন মুসলিম যেমন ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মীয় হুকুম আহকাম পালন করতে পারে না তেমনি ব্যবহারিক জীবনেও কোন মুসলিম মার্কসবাদী বা লেলিনপন্থী হতে পারে না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই তাকে মুসলিম থাকতে হয়। তার চিন্তা, কর্ম, আচরণ, বক্তব্য, লেনদেন বা অন্যকোন কিছুতে কোন রকমের অস্পষ্টতা থাকতে পারে না।

ইসলাম মানবের চিরন্তন ধর্ম। এ কারণেই "কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"[১৪১]

আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয় অস্তিত্বে বিশ্বাস, মৃত্যুর পর পুণরুত্থানে এবং বিচারান্তে অনন্ত পরজীবনে বিশ্বাস এবং সৎকাজে আত্মনিয়োগ। বিশ্বাসের পর্যায়ে আল্লাহতে বিশ্বাসের সাথে যোগসূত্ররূপে ফেরেশতা, কিতাবসমূহ, নবী-রাসূলগণ এবং তাঁর সর্বময় নিয়ন্ত্রণ ও তাকদীরে বিশ্বাসও উপরোক্ত তিনটি মৌলিক উপাদানের সাথে যুক্ত হয়। পৃথিবীর প্রথম মানব ও নবী আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত কুরআনে উল্লিখিত-অনুল্লিখিত সকল নবী-রাসূল পৃথিবীর বিভিন্ন গোত্র ও জাতির কাছে উপরোক্ত তিনটি উপাদান সম্বলিত

---

[১৪০] আল কুরআন / ২: ৬২

[১৪১] আল কুরআন / ৩ : ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম প্রচার করেছিলেন। ইরশাদ হয়েছে – "আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম। আমি তাদের কারো কারো কথা তোমার কাছে বিবৃত করেছি এবং কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করি নি।"[১৪২]

"প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রাসূল। যখন তাদের রাসূল এসেছে তখন ন্যায়বিচারের সাথে তাদের মীমাংসা হয়েছে এবং তাদের প্রতি যুলম করা হয় নি।"[১৪৩]

এ তিনের ভিত্তিতে কুরআন মাজীদ সমসাময়িক ইয়াহূদী, খৃষ্টান, সাবিঈ ও মাজুসী তথা অপরাপর ধর্মাবলম্বী লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিল এবং এ আহ্বানে সাড়া দেয়ার প্রক্ষাপটে তাদের নিরাপত্তা ও মুক্তি নিশ্চিত করেছিল। ইরশাদ হচ্ছে – "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা ইয়াহূদী হয়েছে এবং খৃষ্টান ও সাবিঈন – যারাই আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য পুরস্কার আছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"[১৪৪]
ইসলামের শাশ্বত ও অবিনাশী এ আহ্বান এখনো কার্যকর। অনন্তকাল ধরে তা কার্যকর থাকবে।

আল্লাহ তাআলা ও তাঁর সৃষ্টিজগতের সাথে শান্তি স্থাপনই ইসলামের মর্মবাণী। শান্তি স্থাপনের এ মিশনই ইসলামের অনুসারী মুসলিমদের জীবনাদর্শ, কর্মপ্রেরণা ও গতিশক্তি। আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিজগতের সাথে শান্তি স্থাপনের মাধ্যমে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির সম্যক স্ফুরণ ঘটে বলে ইসলামকে 'দীনে ফিতরাত' বা মানুষের স্বভাবজাত ও সহজাত ধর্ম বলা হয়। ইসলামের শান্তি স্থাপন করা কথাটির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে ইসলামকে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম বা মানুষের ধর্ম কেন বলা হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে বুঝা যায়।

ইসলাম নির্দেশিত শান্তি স্থাপনের বিষয়টি সর্বাত্মক। আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিজগতের প্রতি এটি সমানভাবে প্রযোজ্য। ইসলাম নির্দিষ্ট কোন গণ্ডিতে সীমিত অর্থে শান্তি প্রতিষ্ঠাকে তার লক্ষ্য নির্ধারণ করে না। কোন দেশ, জাতি, সময় বা সুনির্দিষ্ট কোন ভৌগোলিক অঞ্চল নয়। বরং ইসলাম শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায় সমগ্র বিশ্বে, সবসময়। এ সর্বাত্মক ও সামগ্রিক শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যই ইসলামকে যে কোন মতবাদ থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত করে।

আল্লাহর সাথে শান্তি স্থাপনের অর্থ তাঁর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, দেহ-প্রাণ-মনের সমস্ত শক্তি তাঁর অনন্ত শক্তির সাথে মিশিয়ে দেয়া। সুখে-দুখে, জীবনে-মরণে, আনন্দে-নৈরাশ্যে, প্রকাশ্যে-গোপনে – জীবনের সকল অবস্থায় আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ নির্ভরতা ও তাঁর প্রতি সমাহিত চিত্ততা, একমাত্র তাঁরই সাহায্য সহযোগিতা কামনা, দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁকেই একমাত্র পরম বন্ধু বলে গ্রহণ করা এবং সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, বিধানদাতা হিসেবে কেবল তাঁকেই মেনে চলা হল আল্লাহ তাআলার সাথে শান্তি স্থাপন। সহজ কথায়, আল্লাহ তাআলাকে ইবাদতের যোগ্য একমাত্র সত্তা হিসেবে তাঁর নিঃশর্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন আনুগত্য করাই হল তাঁর সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা।

ইসলাম একদিকে যেমন মহান আল্লাহ তাআলার সাথে শান্তি সংস্থাপক অন্যদিকে তেমনি আল্লাহর সৃষ্টিজীব ও জগতের সাথেও নিরন্তর শান্তির সংস্থাপক। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে যে এক নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে, সকল মানুষই যে আল্লাহর খলীফা, তাঁর প্রিয় সৃষ্টি, সকলের মধ্যেই যে আল্লাহর বার্তাবাহক নবী-রাসূলগণ আবির্ভূত হয়েছেন, প্রত্যেক জাতিই যে আল্লাহর নির্দেশ পেয়েছে, ওহী লাভ করেছে – ইসলামের এ বিশ্বাস ও প্রত্যয় আন্তর্জাতিক শান্তি ও শুভেচ্ছার ভিত্তি। পুরো মানবজাতিকে এক পরিবারভুক্ত মনে করাই ইসলামী জীবন পদ্ধতির এক অত্যুজ্জ্বল দিক। দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ধনী, নির্ধন, জ্ঞানী, মূর্খ নির্বেশেষে সকল মানুষের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের স্বীকৃতি হল মানুষে মানুষে শান্তি স্থাপন। দূরের ও নিকটের, আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত-অপরিচিত, প্রতিবেশী, অপ্রতিবেশী, বন্ধু, প্রতিপক্ষ প্রমুখ সকল মানুষের প্রতি আরোপিত মানবিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমেই কেবল বিশ্বশান্তি স্থাপন করা যেতে পারে, অন্য কোন পথে যে নয় – ইসলামের মর্মবাণী থেকে তাও প্রতীয়মান হয়।

---

[১৪২] আল কুরআন / ৪০: ৭৮
[১৪৩] আল কুরআন / ১০ : ৪৭
[১৪৪] আল কুরআন / ২ : ৬২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম যে শান্তি ও সংহতির কথা বলে তা শুধু মানবজাতির জন্য নয় বরং ইতরপ্রাণী, উদ্ভিদ, প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক নানা সৃষ্টিরাজি প্রভৃতির সাথে শান্তি স্থাপনে সহায়ক। মানবেতর প্রাণী, গাছপালা, প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক সৃষ্টিসমূহ মানুষের শারীরিক ও মানসিক গঠন – পরিপোষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে কারণে এগুলোর যত্ন নেওয়া, এগুলোর সংরক্ষণ করা এবং মানুষের উপকারে কাজে লাগার মত যোগ্য করে তোলার দায়িত্বও মানুষের। মানুষ এ সকল প্রাণী, প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক সম্পদ, গাছপালা প্রভৃতি নানা জাতীয় সম্পদের উপর নির্ভর করে। যে জন্যে আল্লাহর এ সৃষ্টিজগতের সাথে শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে মানুষের প্রতি যথাযোগ্য আচরণের পাশাপাশি এ সকল মানবেতর সৃষ্টিরও যথাযোগ্য ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচর্যা প্রয়োজন। শান্তি ইসলামের মর্মবাণী, শান্তি ইসলামের তাৎপর্য – এ শান্তিই হল আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, মানুষের প্রতি পরম প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবেতর সকল সৃষ্টির প্রতি সদাচরণ। এ কারণে ইসলামকে সংজ্ঞায়িত করা যায় সর্বপ্লাবী শান্তির ধর্ম হিসেবে।

আল্লাহপাক মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু বার বার মানুষ ভুল পথে অগ্রসর হয়েছে। তাই মানবজাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দেবার জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসুল প্রেরণ করেছেন। এসব নবী-রাসুল আল্লাহপ্রদত্ত কুরআনী নির্দেশ মুতাবিক মানব সমাজকে সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এভাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল হিসেবে আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা) কে প্রেরণ করেন। তাঁর আবির্ভাবে পূর্ববর্তী সকল কিতাব রহিত হয়ে যায় এবং একমাত্র দিকনির্দেশনা হিসেবে পবিত্র কুরআন মাজীদ হযরত মুহাম্মদ (সা) এর উপর অবতীর্ণ করা হয়। তাঁর প্রচারিত ধর্মই ইসলাম ধর্ম। মূলত ইসলামের মধ্যেই রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ।

মানুষের প্রকৃতি সহজাত ধর্ম হিসেবে ইসলামের রয়েছে বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ব। আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের স্বভাব প্রকৃতি, কাজ করার লক্ষ্য, সহ্য ক্ষমতা, প্রবণতা, মানসিকতা এবং বাস্তবতার ভিত্তিতে গৃহীত বিধি-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন। সৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীর সকল মানুষই তাঁর সমান প্রিয়। ফলে তাঁর পক্ষেই কেবল এমন একটি মতবাদ দেয়া সম্ভব যে মতবাদটি মানুষের মানসিকতা ও স্বভাবের সাথে স্বাভাবিকভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ। ইসলাম যেহেতু আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা তাই এটি যে মানুষের স্বভাবজাত জীবনব্যবস্থা তা সহজেই প্রতীয়মান হয়।

পৃথিবীতে অদ্যাবধি যত আদর্শ, মতবাদ ও ধর্মের কথা জানা যায় তার প্রতিটিই বিশেষ কোন গোত্র, জাতি, অঞ্চল বা সময়ের জন্য প্রবর্তিত হয়েছে। তা বিশেষ কোন সময়ের নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠীরই স্বার্থ রক্ষা করেছে মাত্র। এ ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হল ইসলাম। ইসলাম পৃথিবীর বিশেষ কোন জাতি, অঞ্চল, গোত্র এবং নির্দিষ্ট কোন সময়ের মতাদর্শ নয়। এ হল এমন একটি জীবনব্যবস্থা যা গ্রহণ করার অধিকার পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের এবং কিয়ামাতের পূর্ব পর্যন্ত কোন রকম সংশোধনী ছাড়াই এটি অবিকলভাবে কার্যকর থাকবে। ইসলামের এ বিশ্বজনীনতা ও সর্বকালোপযোগিতার জন্য মানুষের সার্বিক জীবনে এর ব্যাপক তাৎপর্য ও বিপুল গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়।

মানুষের জীবনের পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা হিসেবেও ইসলাম বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর আর কোন ধর্ম, মতাদর্শ বা জীবন দর্শনই পূর্ণাঙ্গ নয়। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মগুলো ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশনা দিলেও রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে নিরব থেকেছে। আবার প্রচলিত বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও দার্শনিক মতবাদসমূহ আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য দিক সম্পর্কে কোন রূপরেখা পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। একমাত্র ইসলামই মানুষের জীবনের সকল দিক সম্পর্কে বিস্তারিত বিজ্ঞানসম্মত ও যৌক্তিক আদর্শ উপস্থাপন করেছে। যে জন্যে ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

ইসলাম একটি মতাদর্শ। সঠিক ও পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে এটি মানুষের বস্তুগত জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ও আন্ত র্জাতিক ক্ষেত্রের সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছে ইসলাম। মোটকথা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য একমাত্র 'ইসলাম' ই দিয়েছে সঠিক পথের সন্ধান। দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে এমন সুসমন্বয় সাধনের জন্য ইসলামের ব্যাপক গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম শুধু ধর্ম নয়। মানব জাতির চিরন্তন জীবন দর্শন, বিধান ও ব্যবস্থা হিসেবেও ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ। জীবন দর্শন, জীবন বিধান এবং জীবনব্যবস্থা হিসেবে একমাত্র ইসলামই দিয়েছে মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান। ইসলামই মানুষকে চলার পথের সঠিক সন্ধান দিয়েছে। এটিই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সন্তুষ্টি অর্জন তথা মানবজীবনের চরম লক্ষ্য হাসিলের একমাত্র পন্থা।

মতাদর্শ হিসেবে ইসলামের ব্যাপকতা অনস্বীকার্য। মানুষের সার্বিক জীবন পথের দিশারী হল ইসলাম। এ কারণে মানুষের জীবনের কোন ক্ষুদ্র দিকও ইসলামের আওতার বাইরে কল্পনা করা যায় না। সাধারণ বিবেচনায় তুচ্ছ একটি বিষয়ের সমাধানও ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দিয়েছে। ইসলাম যেমন রাষ্ট্র পরিচালনার আদর্শ পেশ করেছে সাথে সাথে একজন মানুষ কীভাবে পায়খানা প্রসাব করবে সে সম্পর্কেও হুকুম প্রদান করেছে। জীবনের সকল দিক সম্পর্কে এমন নিখুঁত হুকুম আহকাম দিয়ে ইসলাম তার ব্যাপকতাকে অবিসংবাদিত করে তুলেছে।

পৃথিবীর অপর কোন মতাদর্শ ইসলামের মত ভারসাম্য স্থাপন করতে পারেনি। কেউ হয়তো দুনিয়া নিয়ে আছে, আর কারো কারবার শুধু আধ্যাত্মিক জগত নিয়ে। কেউ কেউ শুধু আর্থিক সমস্যাকে মানুষের মূল সমস্যা হিসেবে দেখেছে। কেউবা জৈবিক সমস্যাকে মানুষের মূল সমস্যা সনাক্ত করে তার সমাধানের জন্যই বিধান প্রণয়ন করেছে। কিন্তু ইসলাম জীবনের কোন আংশিক সমস্যাকে সমস্যা হিসেবে না দেখে গোটা জীবনের মধ্যে একটি অনিবার্য ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করার আদর্শ পেশ করেছে। ফলে ইসলাম প্রদর্শিত পথই সহজ-সরল, ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। একমাত্র ইসলামই মানুষের জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ ভারসাম্য স্থাপনে সক্ষম হয়েছে।

একমাত্র ইসলামই মানবতাকে যাবতীয় সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে। একটি বিপ্লবী আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে একমাত্র ইসলামেই নিহিত আছে মানুষের সার্বিক কল্যান। ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর আর কোন ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা মানুষের মুক্তি নিয়ে এমন বিন্যস্ত আদর্শ পেশ করতে পারে নি। পৃথিবীতে মানুষ যে সকল মতবাদ উদ্ভাবন ও প্রচলন করেছে তার প্রতিটি উদ্ভাবনকারী ব্যক্তি বা জাতির স্বার্থ সংরক্ষণেই প্রধান ভূমিকা রেখেছে। সেগুলো জাতীয় বা আঞ্চলিক মুক্তি নিয়ে কাজ করেছে। ফলে সেগুলো বিশ্বজনীন এবং সর্বকালীন মতাদর্শ হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পায় নি। একমাত্র ইসলামই বিশ্ব মানবতার মুক্তির পথ ও উপায় নির্দেশ করে বিধান প্রণয়ন করেছে।

ইসলাম কোন মনুষ্যসৃষ্ট ধর্ম নয়। এটি স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য এত বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট হুকুম আহকাম প্রণয়ন করে যে, একে তথাকথিত ধর্ম বলার কোন উপায় থাকে না। তখন একে বরং বলা যায় মানুষের কল্যাণে পরিচালিত একটি পরিপূর্ণ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন। ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর আর কোন ধর্ম বা আদর্শ একসাথে এ অনন্য বৈশিষ্ট্য বহন করে না।

একমাত্র ইসলামই হতে পারে সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যত দিনের অনাগত সকল সমস্যা সমাধানযোগ্য একমাত্র জীবনব্যবস্থা। কেননা ইসলাম নিরন্তর গবেষণাকে উদ্বুদ্ধ করে। ফরয সালাতের পর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণাকে অন্য যে কোন সালাতের চেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ ঘোষণা করে ইসলাম এ গবেষণা অব্যাহত রাখার উৎসাহ দেয়। ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্ম, আর কোন আদর্শই এভাবে ভবিষ্যতের সমস্যা নিয়ে গবেষণা করার বা তার আগাম সমাধান চিন্তা করার হুকুম দেয় না।

ইসলাম মানুষ ও প্রকৃতির সাথে সুন্দর সম্পর্ক রচনাকারী মহান আদর্শ। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে – 'আল্লাহ পৃথিবীর সকল কিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন।' এরফলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ নিজে আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির সাথে অভিন্ন চেতনায় উপনীত হতে পারে। প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক সৃষ্টির সাথে কোন রকমের অসাদাচরণ করতে পারে না। প্রয়োজনে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে এর সবই ভোগ ও ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু অপব্যবহার করতে পারে না।

পৃথিবীর সকল ধর্ম ও মতাদর্শের মধ্যে একমাত্র ইসলামই মানুষের প্রকৃত মর্যাদা সংরক্ষণ করার কৃতিত্বের অধিকারী। ইসলাম ঘোষণা করে – মানুষ পৃথিবীর স্রষ্টা নয়। সে প্রভু নয়। মানুষ হল আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। কাজেই সে এত

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চ নয় যে জন্য সে যা খুশি তা করতে পারে। আবার সে এতটা তুচ্ছও নয় যে, মানবেতর কোন প্রাণী বা সৃষ্টির কাছে মাথা নত করতে পারে। বরং মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি। মানুষ যদি কারো কাছে মাথা নত করে তাহলে তা করবে কেবল আল্লাহ তাআলার নিকট। আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ করবে শুধুই আল্লাহর আদেশের। কাজেই যে কাজে আল্লাহর আদেশ ও আনুগত্য লঙ্ঘিত হয় তা করা ইসলাম সমর্থন করে না। কোন মানুষ তা করলে তাকে আর ইসলামের অনুসারী বলা যাবে না।

ইসলাম মানুষের সুখ শান্তির নিশ্চয়তা দেয়। এ মতবাদ এমন বিধান প্রণয়ন করে যা মানুষের সুখে শান্তিতে থাকা অনিবার্য করে তোলে। মানুষ কাঙ্ক্ষিত শান্তি লাভে নির্দ্বিধায় ইসলামের উপর নির্ভর করতে পারে। ইসলাম প্রগতির ধর্ম। চির আধুনিক ধর্ম। যুগের সাথে তাল মিলানো নয় বরং ইসলামের অত্যাধুনিক মতবাদের জন্য যুগই ইসলামের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে বাধ্য হয়। ইসলামকে সঠিকভাবে না বুঝার জন্য অবশ্য কেউ কেউ একে অর্ধসহস্র বছরের পুরোনো মতবাদ হিসেবে অবজ্ঞা করার ধৃষ্টতা দেখায়। তবে ব্যক্তি বিশেষের এমন মূর্খতাপ্রসূত বক্তব্যের জন্য ইসলামের মাহাত্ম্য কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হবে না। বরং এটি মানুষের শান্তি, পূর্ণতা ও প্রগতির শাশ্বত স্মারক হয়ে থাকবে।

ইসলাম জনবিচ্ছিন্ন কোন আধ্যাত্মিক আদর্শ নয় বা এমন কোন দুর্বোধ্য দার্শনিক মতবাদও নয় যা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। বরং ইসলাম এমন একটি মতবাদ যার লক্ষ্য হল আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা। এ জন্য ইসলাম সবার আগে আদর্শ মানুষ গড়ে তোলে। কেননা আদর্শ মানুষ ছাড়া আদর্শ সমাজ গড়ার চিন্তা নিতান্তই কল্পনা বিলাসমাত্র। ইসলামে অর্থহীন কল্পনার কোন অবকাশ নেই। ইসলাম আদর্শে, লক্ষ্যে, কর্মপদ্ধতিতে, নীতি ও নৈতিকতায়, উন্নয়নে, সমৃদ্ধিতে, সহযোগিতা ও হৃদ্যতায় একটি পরিপূর্ণ আদর্শ সমাজ গড়ে তোলে।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ মানব বিপ্লব। এটি শিল্প বিপ্লব বা রুশ বিপ্লব কিংবা এ ধরনের ইতিহাসখ্যাত বিপ্লবগুলোর মত কোন আংশিক বিপ্লব নয়, যার কোন একটি দিকের সফলতা অপরাপর দিকগুলোর জন্য ব্যাপক ক্ষতিকর ও অমঙ্গলজনক বলে প্রতীয়মান হয়। বরং ইসলাম হল এমন একটি পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব যা মানুষের জীবনের সকল দিককে সমন্বিত করে একটি পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক পরিবর্তন সম্ভব করে তোলে। যে পরিবর্তন পুরোপুরি মানুষের স্বার্থ ও কল্যাণের পরিপূরক।

ইসলাম বক্তব্যে ধূম্রজাল তৈরী করে অর্থহীন সমতার কোন আদর্শ পেশ করে না। ইসলাম সাম্যবাদী জীবনব্যবস্থা এ হিসেবে যে, এ মতবাদ মানুষের মধ্যে মর্যাদা ও অধিকারের সমতা প্রতিষ্ঠা করে। তা হল মানুষ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ ও মর্যাদা পাবে। আর একজন মানুষ হিসেবে প্রতিজন মানুষই মানবিক অধিকার পাবেন। এ ক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চল, জাতি, সাদা, কালো, ধনী, গরীব, বেটে, লম্বা ইত্যাদিতে কোন ভেদ করা যাবে না। যোগ্যতা থাকলে যে কোন ব্যক্তি নেতৃত্বের আসন থেকে শুরু করে সকল পর্যায়ে বরিত হতে পারবেন। অযোগ্য কেউ মর্যাদা বা গুরুত্বপূর্ণ পদে বরিত হতে পারবে না। কাজেই ইসলামে সাম্যবাদ মানে এটা নয় যে, সকল মানুষ সমান কাজ করবে আর সমান সুযোগ পাবে। এর অর্থ হল মানুষ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবে এবং কাজ অনুযায়ী মর্যাদা পাবে। কেননা পৃথিবীকে আল্লাহ এভাবেই তৈরি করেছেন যে, এখানে সব শ্রেণীর লোক লাগবে। শুধু মালিক থাকলে পৃথিবী চলবে না। শ্রমিক লাগবে। আবার শুধু শ্রমিকও পৃথিবীর জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হবে না। বরং বিনিয়োগের জন্য মালিক লাগবেই। এভাবে রাষ্ট্রনায়ক যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন মেথর, মুচি, ধোপা, কামার, কুমোর, তাঁতি, জেলে সহ সকল নিম্ন, মধ্য ও উচ্চবিত্তের মানুষ। এদের সবাইকে মর্যাদা ও জীবিকায় সমান করে দেয়া যেমন সঙ্গত নয় তেমনি সম্ভবও নয়। ইসলাম তা করেওনি। বরং ইসলাম সকলের জন্য এ সুযোগ অবারিত রেখেছে যে, সকলেই মানবিক অধিকার ও মর্যাদা পাবে। এরপরে যার যেমন যোগ্যতা সে তেমন কাজ করবে, তেমন মর্যাদা ও সুযোগ ভোগ করবে।
বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম সমাজের ধনীদের সম্পদে গরীবদের জন্য বাধ্যতামূলক অধিকার ঠিক করে দিয়েছে। আবার সকলের জন্য কাজ করা, হালাল উপার্জন করা ফরয করে রেখেছে। এভাবে কর্ম, অধিকার, মর্যাদা ও সুযোগে সমতা রেখে ইসলাম সকল পর্যায়ে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে।

ইসলাম মানুষের দুনিয়ায় শান্তি ও কল্যাণ লাভের বাস্তব উপায় নির্দেশ করে। এটি এমন ধর্ম নয় যা দুনিয়া ত্যাগের আদেশ দেয়। বরং ইসলাম আখিরাতের পরম শান্তিময় জীবন লাভের জন্য দুনিয়ার আমলের উপরেই নির্ভর করার

Dhaka University Institutional Repository

কথা ঘোষণা করে। ইসলামের আদর্শ ও বিশ্বাস অনুসারে আখিরাতে মানুষ কিছুই অর্জন করতে পারবে না। আখিরাতে সে শুধু ভোগ করবে। তাকে যা কিছু অর্জন করার তা করতে হবে পৃথিবীর জীবন থেকে। ফলে ইসলাম মানুষের আখিরাতে মুক্তির স্বার্থেই দুনিয়ার জীবনকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উপস্থাপন করে এবং এখানে শান্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করার সকল হুকুম আহকাম ও নির্দেশনা প্রদান করে।

ইসলাম মানুষের নৈতিক ও আত্মিক উন্নতির জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইসলাম ছাড়া পৃথিবীর আর কোন ধর্ম বা আদর্শ তেমনটি করে নি। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বিপ্লব ও আন্দোলনকে একটি সর্বাত্মক নৈতিক বিপ্লব হিসেবে পরিচালনা করেছিলেন। তিনি প্রকাশ্য যুদ্ধের চেয়েও কঠিনতম যুদ্ধ হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন কু প্রবৃত্তি দমন করাকে এবং তাঁর সকল অনুসারীকে তাকওয়াবান হওয়ার মাধ্যমে আত্মিক উন্নয়নের নির্দেশনা দিয়েছিলেন। মানুষকে আদর্শ ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইসলামের এ উদ্যোগ একে চিরন্তন অনুসরণীয় জীবনব্যবস্থায় পরিণত করেছে।

ইসলাম মানুষের প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। ইসলামী জীবন দর্শনেই মানুষ হল আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা। পৃথিবীর কোন সৃষ্টি, বা কোন প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক সৃষ্টির কাছে সে তার এ শ্রেষ্ঠত্ব বিকিয়ে দিয়ে তার কাছে মাথা নত করবে না। সে কেবল আল্লাহর কাছে মাথা নত করবে। আবার বর্ণ, জন্ম, অর্থ বিত্ত, ক্ষমতা, গায়ের রঙ ইত্যাদির ভিত্তিতে মানুষকে তুচ্ছ বা উচ্চ বলা যাবে না। বরং মানুষ শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন হবে তার কাজে। আল্লাহ তাআলা বলেন – "মানুষকে আমি সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি। এরপর সে নীচ থেকে আরো নীচস্তরে নীত হয়েছে।"[১৪৫]
পাশাপাশি এও বলেছে, যদি কেউ শ্রেষ্ঠ হয় তাহলে তা হবে উত্তম গুণাবলী ও আমলে সালিহ দিয়ে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে – "তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সম্মানিত সে যে বেশি তাকওয়াবান।"[১৪৬]
কাজেই মানুষের প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের আদর্শ হিসেবেও ইসলাম গুরুত্ব পূর্ণ।

বস্তুত মানুষের শান্তিপূর্ণ দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইসলামের গুরুত্ব সীমাহীন। মানুষের পার্থিব ও অপার্থিব কল্যাণ ইসলাম ছাড়া আর কোন জীবনব্যবস্থা এমন নিখুঁতভাবে নিশ্চিত করতে পারে নি। এ কারণেই মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামের বিজয় অনিবার্য।

---

[১৪৫] আল কুরআন / ৯৫ : ৪–৫
[১৪৬] আল কুরআন / ৪৯ : ১৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় :
আধ্যাত্মিকতা পরিচিতি

- ভূমিকা
- আধ্যাত্মিকতা অর্থ
- আধ্যাত্মিকতার সংজ্ঞা
- বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনে আত্মা এবং আধ্যাত্মিকতা : পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার হাজারো সৃষ্টির মধ্যে মানুষের স্বাতন্ত্র্য এখানেই যে, মানুষ আধ্যাত্মিক প্রাণী। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হিসেবেও এটাকে শীর্ষে স্থান দেয়া যেতে পারে। আধুনিক নৃতত্ত্বের একটি বিপুল অংশে আল্লাহর অস্তিত্ব ও ইসলামের অন্যান্য আকীদায় অবিশ্বাস পোষণ করা হলেও মানুষের আধ্যাত্মিকতার বিষয়টি তারাও উপেক্ষা করতে পারে নি। মানুষের ভৌত নৃতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ব্যবহারিক নৃতত্ত্বের আলোচনা শেষে এ বিষয়ে সরল স্বীকারোক্তি দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে – "আমাদের আলোচনা থেকে আদিম মানুষের সামাজিক গঠন মামুলি ও যান্ত্রিক মনে হতে পারে। কিন্তু আদপে তা নয়। আধ্যাত্মিক প্রভাব সমগ্র আদিম সমাজকে ছেয়ে রেখেছে। একটি সমাজের গোষ্ঠী প্যাটার্ন কেমন হবে, তার শক্তিশালী প্রায়োগিক কারণ আছে। তবে গোষ্ঠীগুলোর সৃষ্টি ও পরিপোষণে আধ্যাত্মিক প্রভাবের ভূমিকা কম প্রবল নয়। ধর্মীয় বিশ্বাসের ফলে গোষ্ঠীর উৎপত্তি না একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গোষ্ঠীর উৎপত্তির ফলে ধর্মীয় বিশ্বাসের উদ্ভব – এ প্রশ্নের সহজ উত্তর নেই।"[১৪৭] বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, পরিসংখ্যানগত সমীক্ষা, নানাধরনের নিরীক্ষা বা আদমশুমারী আধ্যাত্মিকতার বিষয়টি প্রমাণ করতে অক্ষম। বাহ্যত কোন বাহ্যিক মানদণ্ড বা পরীক্ষণযন্ত্র এ বিষয়টি সনাক্ত করতে এবং এর কোন কাঠামোগত বিন্যাস তৈরী করে দেখাতে পুরোপুরি অপরাগ। এর বাস মানুষের মনে, যাকে ঘিরে আবর্তিত হয় তার আধ্যাত্মিক জগত। এখানে আধ্যাত্মিকতা বিষয়টি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হবে।

আধ্যাত্মিকতা অর্থ

'আধ্যাত্মিকতা' শব্দটি 'অধ্যাত্ম' শব্দ থেকে উদ্ভূত। অধ্যাত্ম অর্থ হল আত্মবিষয়ক, (অধ্যাত্মদৃষ্টি, অধ্যাত্মলোক), ব্রহ্মবিষয়ক; চিত্তসম্বন্ধীয়; পরব্রহ্ম। এ বিবেচনাতেই অধ্যাত্মতত্ত্ব হল আত্মবিদ্যা বা ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান। আর যিনি এ বিষয়ে অবহিত আছেন তাকে বলা হবে ব্রহ্মজ্ঞানী, পরব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি। এ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে ব্রহ্মবাদ। ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই সকল কিছুর মূল এই দার্শনিক মতের নাম ব্রহ্মবাদ। আমাদের যাবতীয় জ্ঞানই জ্ঞাতার আত্মগত এ সংক্রান্ত মতবাদটি হল অধ্যাত্মবাদ। যিনি এ মতবাদে বিশ্বাস করেন তাকে বলা হয় তাকে বলা হয় অধ্যাত্মবাদী। আর এ মতবাদ সংক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'অধ্যাত্মীয়' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।[১৪৮] অধ্যাত্ম + ইক এর রূপান্তর হল আধ্যাত্মিক। এর অর্থ আত্মা সম্বন্ধীয়, আত্মিক, spiritual , ব্রহ্ম বিষয়ক, মানসিক (আধ্যাত্মিক চিন্তা বা সাধনা)।[১৪৯] আধ্যাত্মিক শব্দের সাথে তা' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে গঠিত 'আধ্যাত্মিকতা' তাই একটি মতবাদ অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে যা আত্মা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরন ও ধারণার ব্যাখ্যা দেয়।

আধ্যাত্মিকতা বিষয়টি মানুষের জীবনের অবিভাজ্য অংশ, অনিবার্য দিক। তবে এর সম্বন্ধ মানুষের শরীরের সাথে যতটা তারচেয়ে অনেকগুণ বেশি তার চেতনার সাথে। বলা হয়েছে, spiritual – connected with the human spirit, rather than the body or physical things; a spiritual experience, spiritual development / growth / needs, a lack of spiritual values in the modern world, we're connected about your spiritual welfare , connected with religion, ; a spiritual leader.[১৫০]

---

[১৪৭] J. Manchip White, *Teach Your Self Anthropology,* (Translated by Mahmuda Islam), Bangla Academy, Dhaka, 1981, pp.123-24

[১৪৮] শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান,* সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯৮, পৃ.১৬-১৭

[১৪৯] প্রাগুক্ত, পৃ.৭১

[১৫০] A S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary,* Oxford University Press. Sixth edition, 2002, p. 1245

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিক শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হিসেবে অভিধানে যে শব্দগুলোর উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলো হল – pertaining to spirit; spiritual , relating to God or the Supreme Being; theological; metaphysical, intellectual; আর আধ্যাত্মিকতা হল spiritualism.[১৫১]

spiritual শব্দটি বিভিন্নভাবে নানা রকম অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন এর অর্থ হল Oof or like the spirit or soul or religion, প্রেতগত বা ভৌতিক, আত্মিক, আধ্যাত্মিক; unworldly, আখিরাতের, জগত-বহির্ভূত, highly refined in thought or feeling, চিন্তায় বা অনুভূতিতে অত্যুচ্চ স্তরের সংস্কৃতিসম্পন্ন, ecclesiastical, যাজকীয়; a spiritual object, আধ্যাত্মিক বিষয় বস্তু বা প্রাণী; আধ্যাত্মিক মতবাদের নাম হল spiritualism, অধ্যাত্মবাদ, আত্মিকবাদ; যারা অধ্যাত্মবাদের সাধক, ধারক বা বিশ্বাসী তাদেরকে বলা হয় spiritualist, আত্মিকতামূলক হল spiritualistic, কাজেই আধ্যাত্মিকতা বা আত্মিকতার প্রতিশব্দ পরিভাষা হতে পারে spirituality. আত্মিক করা; আত্মিকতায় পূর্ণ করা; সংস্কৃত করা; দেহগত কামনা লালসাদি হতে বিমুক্ত করা; আত্মিক তাৎপর্য বের করা হল spiritualize.[১৫২]

বিষয়টির শাব্দিক বিশ্লেষণে এর আরো যে পরিচয় উদঘাটিত হয় তা হল – spiritualism – the belief that people who have died can send messages to living people, usually through a MEDIUM (a person who has special powers). spiritualist – a person who believes that people who have died can send messages to living people. spirituality – the quality of being concerned with religion or the human spirit.[১৫৩]

কাজেই প্রতীয়মান হয়, আধ্যাত্মিকতা একটি বিশেষ চেতনা যার সম্বন্ধ রয়েছে মানুষের মনের সাথে। অথবা মানুষের দৃশ্যমান অবকাঠামোর অভ্যন্তরে যে অদৃশ্য সত্তার উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায় আধ্যাত্মিকতা হল সে সত্তার বিষয়ক জ্ঞান এবং বিধি ব্যবস্থা।

আধ্যাত্মিকতা পরিচিতি

সাধারণভাবে আধ্যাত্মিকতা বলতে মানুষের আত্মিক জগত ও সে সম্পর্কিত চেতনাকে বুঝায়।

মানুষ আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষকে আল্লাহ তাআলা সুন্দরতম শারীরিক অবকাঠামো দিয়ে তৈরী করেছেন। দিয়েছেন ভাল মন্দের জ্ঞান এবং সাথে সাথে দিয়েছেন ভাল মন্দ বিবেচনা করার বিবেক ও বিবেচনাবোধ। মানুষ তার সুন্দর বাহ্যিক অবকাঠামো স্থির রেখেও ভেতরে ভেতরে অনেক চাঞ্চল্য পোষণ করতে পারে। বাইরে একটি মধুর বন্ধুভাব ফুটিয়ে রেখে অন্তরালে একটি ভয়ঙ্কর কুৎসিত শত্রুতা লালন করতে পারে। বন্ধুত্ব, শত্রুতা, ঘৃণা, কাম, ক্রোধ, আশা, বিশ্বাস এসবকিছুই মানুষ লালন করে কিন্তু এর কোন কিছুরই প্রকাশ তার শরীর করে না। এর কোন কিছুরই লালন তার শরীর করতে পারে না। এমনকি শরীরে এগুলোর কোন চিহ্নও থাকে না। বস্তুত আধ্যাত্মিকতা হল মানুষের এ সকল বোধ ও অনুভূতি লালনের এক ভিন্নতর ব্যবস্থা। আল্লাহ তাআলা মানুষকে এ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং এর কারণেই মানুষ শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা পেয়েছে।

আধ্যাত্মিকতার ধারণাটির সাথে আত্মার ধারণাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রসঙ্গত তাই আত্মা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। বলা ভাল, আত্মা অভিধাটি বিশ্লেষণ করেই আধ্যাত্মিকতা পরিভাষাটির পরিচয় ও ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। আত্মা সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ ও বক্তব্য তুলে ধরে এখানে সেগুলোর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে আমরা আধ্যাত্মিকতা বিষয়টির একটি গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রয়াস পাব।

---

[১৫১] Mohammad Ali, Mohammad Moniruzzaman & Jahangir Tareque, ***Bangla Academy Bengali – English Dictionary,*** Bangla Academy Dhaka, June 1994, p.50

[১৫২] Sailendra Biswas, ***Samsad English – Bengali Dictionary,*** Sahitya Samsad, Calcutta, August 1997, p.1085

[১৫৩] A S Hornby, ibid , p. 1245

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

সচেতনতা উন্মেষের পর থেকেই মানুষ আত্মা বা মন সম্বন্ধে ভেবেছে। আত্মা কী? দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক কী? আত্মার অবস্থান কোথায়? মৃত্যুতে যখন দেহের পতন হয়, তখন আত্মার কী হয়? আত্মা কোথায় যায়? আত্মা কি দেহাতিরিক্ত কিছু না দেহের ক্রিয়াবিশেষ? আত্মা কি কোন আধ্যাত্মিক দ্রব্য? আত্মা কি অমর? আত্মার কি বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ আছে, যেমন জীবাত্মা, মানবাত্মা, পরমাত্মা ইত্যাদি? বিভিন্ন শ্রেণীর আত্মার (যদি থেকে থাকে) মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক কী? আত্মার উন্নতি বা অধঃপতন (যে অর্থে আত্মা পবিত্র বা পূণ্যাত্মা এবং কলুষিত বা পাপাত্মা শ্রেণীভুক্ত হয়) বলে কিছু আছে কি? এমনি ধরনের হাজারো প্রশ্ন আত্মাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। আত্মার সঠিক পরিচিতির জন্য অনুধ্যান, আত্মদর্শন বা আত্মনিরীক্ষণ এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও উপকথার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সত্যিকারার্থে আত্মা বা আত্মাকেন্দ্রিক যে কোন প্রশ্ন সবসময়ই কুহেলিকাচ্ছন্ন থেকেছে। সমস্যাটার গভীরে প্রবেশ করার জন্য চিন্তাশীল মানুষ সব যুগেই চেষ্টা করেছে – কিন্তু প্রচ্ছন্নতা ও গূঢ়তার জাল ছিন্ন করে তার মুখোমুখি হতে পারে নি। বিষয়টার জটিলতা, নিগূঢ়তা একদিকে যেমন বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক একইভাবে আত্মা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হওয়াও জরুরী বিবিচিত হয়েছে; কারণ মানুষ নিজেকে জানতে চায় – পরিচিত হতে চায় চূড়ান্ত লক্ষ্য ও পরিণতির সাথে। কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্ত এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তমূলক ও বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা হয় নি। যা হয়েছে তার সাথে ধর্মীয় চিন্তাচেতনার সংযোগ ছিল গভীর এবং তাকে দেখা হয়েছে জীবনের সাথে একীভূত করে। কেবল সত্যানুসন্ধিৎসা নিয়ে তাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়েছে কমই। অধিকাংশ সময় অনুসন্ধিৎসু পর্যবেক্ষক নিজেই নিমজ্জিত হয়ে গেছেন এ সমস্যার গভীরে এবং পথ হারিয়ে ফেলেছেন অন্তহীন কোন চোরাগলিতে।

"দেহাধিষ্ঠিত চৈতন্যময় সত্তা হল আত্মা। জীবাত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম, অধিদেবতা, স্বরূপ, স্বয়ং, আত্মবৎ, শরীর, হৃদয়, মন, স্বভাব প্রভৃতি অর্থ ও ভাব আত্মার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়।"[১২৪]

আত্মা ও আধ্যাত্মিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট চারটি তাৎপর্যপূর্ণ আরবি পরিভাষা হল আকল, কলব, নফস ও রূহ। কলব এর দুটি অর্থ। "একটি হল বক্ষস্থলের বামদিকে অবস্থিত লম্বা ত্রিকোণ মাংসপিণ্ড। এর মাঝখানে শূন্যগর্ভতা আছে, যাতে কালো রক্ত থাকে। এটাই রূহের উৎস ও আকর, কিন্তু এর আকার আকৃতি বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এটা ডাক্তারদের কাজ। এ ধরনের কলব তথা হৃদয় চতুস্পদ জন্তু এমনকি মৃতদের মধ্যেও থাকে। কলবের দ্বিতীয় অর্থ এটি একটি আধ্যাত্মিক লতীফা (সুক্ষ্ম বিষয়), উপরোক্ত শারীরিক কলবের সাথে এ লতীফার সম্পর্ক আছে। এ লতীফাটিই মানুষের স্বরূপ, বোধশক্তির আওতাভুক্ত, আলিম, সম্বোধিত ও তিরস্কৃত। হিসাব নিকাশের সম্পর্কও এর সাথে। শারীরিক কলবের সাথে এ লতীফার সম্পর্ক যে সম্পর্ক তা অনুধাবন করতে অধিকাংশ মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি ঘুরপাক খেয়ে যায়। কেননা শারীরিক কলবের সাথে এর সম্পর্ক গুণীর সাথে গুণাবলীর সম্পর্কের মত অথবা যন্ত্রপাতির সাথে কারিগরের সম্পর্কের মত, অথবা গৃহের সাথে গৃহবাসীর সম্পর্কের মত।"[১২৫]

রূহ শব্দেরও দুটি অর্থ । "এর প্রথম অর্থটি হল রূহ একটি সুক্ষ্ম দেহ, যার উৎস শারীরিক কলবের শূন্যগর্ভ। এ শূন্যগর্ভ থেকে এটা একটা রক্তবাহী ধমনীর মাধ্যমে দেহের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। দেহে এ রূহের ছড়িয়ে পড়া এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে জীবন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় দান করা এমন, যেমন কোন গ্রহে একটি প্রদীপ রেখে দেয়া হলে তার আলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং যেখানেই এ আলো পৌঁছে সে স্থানই উজালা হয়ে যায়। সুতরাং রূহ প্রদীপসদৃশ এবং জীবন আলো সদৃশ। রূহের এ অর্থটি চিকিৎসাবিদগণের পরিভাষার অনুসারী। রূহের দ্বিতীয় অর্থ রূহ মানুষের মধ্যে একটি বোধ সম্পন্ন লতীফা। কলবের দ্বিতীয় অর্থে প্রদত্ত ব্যাখ্যার মত ব্যাখ্যাই এখানেও প্রযোজ্য।
নফস শব্দটি একাধিক অর্থে অভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর একটি অর্থ হল, মানুষের নফস এমন একটি বস্তু যা ক্রোধশক্তি ও কামশক্তিকে অন্তর্ভূক্ত করে। সুফীদের মধ্যে এ অর্থই অধিক প্রচলিত। তাদের মতে, নফসের মধ্যই মানুষের নিন্দনীয় গুণাবলী একত্রিত আছে। এ কারণেই তারা বলেন – নফসের বিরুদ্ধে সাধনা করা এবং নফসকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া উচিত। হাদীসে এ নফস সম্পর্কেই বলা হয়েছে – সর্বপেক্ষা বড় শত্রু হল তোমার নফস, যা

---

[১২৪] শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮
[১২৫] ইমাম গাযালী (রহ), *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ৩য় খণ্ড, ভাষান্তর : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা ২০০৩, পৃ.১৬১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

তোমার পার্শে রয়েছে। নফসের দ্বিতীয় অর্থ নফস একটি খোদায়ী লতীফা, যা অবস্থাভেদে বিভিন্নগুণে গুণান্বিত হয়। বাস্তবে মানুষ এটাই। মানুষ যখন কামনাকে প্রতিরোধ করে তখন এ নফসের চাঞ্চল্য দূর হয়ে যায় এবং আনুগত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন একে বলা হয় নফস মুতমায়িন্না বা প্রশান্ত নফস।

নফসের প্রথম অর্থের দিক দিয়ে তার আল্লাহর কাছে ফিরে আসা কল্পনা করা যায় না। বরং সে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে দূরে চলে যায় এবং শয়তানের দলভুক্ত হয়ে যায়। আর যদি আনুগত্যের উপর নফসের প্রতিষ্ঠা পূর্ণ না হয় কিন্তু কামনা-বাসনা প্রতিরোধ করতে থাকে যে তাকে বলা হয় নফস লাওয়ামা বা তিরস্কারকারী নফস। কেননা সে তার মালিককে ইবাদতে ত্রুটি করতে দেখে তিরস্কার করে।

আর যদি নফস কামনা বাসনা প্রতিরোধ না করে বরং কামপ্রবৃত্তি ও শয়তানের দাস হয়ে যায় তবে তাকে বলে নফস আম্মারা বিসস্ বা জোরেজবরে কুকর্মের আদেশকারী নফস।

আধ্যাত্মিকতার ব্যাখ্যায় আকল শব্দটিও অত্যন্ত তাৎপর্যবহ শব্দ। নফস শব্দের মত এটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর মধ্যে আকলের অন্যতম অর্থ হল একটি শিক্ষামূলক গুণ, যার স্থান কলব। আর দ্বিতীয় আরেকটি অর্থ হল শিক্ষার বোধশক্তি। এমতবস্থায় আকলও উল্লিখিত লতীফা হবে।

সুতরাং আকল বলে কখনো শিক্ষাগুণ এবং কখনো শিক্ষাগুণের পাত্র বুঝানো হয়। যেমন হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম আকল সৃষ্টি করেছেন।' এখানে আকল অর্থ হবে শিক্ষাগুণের পাত্র। কেননা শিক্ষাগুণতো আপনি আপনি বিদ্যমান হতে পারে না। তার বিদ্যমান হওয়ার জন্য পাত্র দরকার। সুতরাং এ পাত্র তার আগে বা তার সাথে সাথে সৃষ্টি হওয়া জরুরী। নতুবা তাকে সম্বোধন করা হবে না। অথচ এ হাদীসেই আল্লাহ তাআলা আকলকে সম্বোধন করে বললেন : সামনে এস। সে সামনে এল। আবার বললেন, পিঠ ফিরিয়ে নাও। সে পিঠ ফিরিয়ে নিল।"[১৫৬]

কাজেই প্রতীয়মান হয় "কলব, নফস, রূহ ও আকল শব্দ চতুষ্টয়ের চারটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ রয়েছে। অর্থাৎ শারীরিক কলব, শারীরিক রূহ, কাম-নফস এবং জ্ঞান। আর এ সবগুলো শব্দের একটি অভিন্ন পঞ্চম অর্থ রয়েছে তা হল মানবীয় বোধশক্তির লতীফা। সুতরাং শব্দ হল চারটি এবং অর্থ পাঁচটি। পঞ্চম অর্থটি প্রত্যেক শব্দের অভিন্ন অর্থ বিধায় প্রত্যেক শব্দের ন্যূনতম দুটি অর্থ । কুরআন মাজীদ ও হাদীসে ব্যবহৃত কলবের অর্থ সে লতীফা যা দিয়ে মানুষ বস্তুনিচয়ের স্বরূপ অবগত হয়। রূপকভাবে এর দ্বারা মানুষের বক্ষস্থিত কলবও বুঝানো হয়। কেননা এ লতীফা ও শারীরিক কলবের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে। শারীরিক কলবের মধ্যস্থতায়ই এ কলব মানুষের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কাজে নিয়োজিত করে। শারীরিক কলব যেন এই লতীফার পাত্র ও বাহন। এ কারণেই সহল তস্তরী বলেন – 'কলব হচ্ছে আরশ এবং বক্ষ হচ্ছে কুরসী। অর্থাৎ শারীরিক কলব ও বক্ষ হচ্ছে লতীফার রাজধানী, যেখান থেকে লতীফার কার্যক্রম শুরু হয়।"[১৫৭]

মহান আল্লাহর সত্তার মতই অপ্রাকৃত ও অবিনশ্বর এ রহস্যময় সত্তা হল আত্মা যা আল্লাহ তাআলার সত্তাজাত বিষয় বা তাঁর বিশেষ ধরনের পরিকল্পনার অংশ। অবশ্য আত্মার গুণাগুণ ও প্রকৃতি এবং বিভিন্ন সময়ে তার অবস্থা বিবেচনা করে আত্মার একটা যুক্তিসঙ্গত স্তর বিন্যাস করা যায়। ধর্মদর্শন ও প্রচলিত বিবেচনায় এ স্তর বিন্যাসে নানারকম পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আত্মা পরমাত্মার ছায়া, তাঁর প্রত্যংশ বা সীমিত রূপ। যে জন্যে আত্মার নিরন্তর অভিযাত্রা পরমাত্মার দিকে। পরমাত্মার সাথে মিলনই আত্মার পরম লক্ষ্য। ধর্মীয় বিবেচনায় এ লক্ষ্য হাসিলের জন্য আত্মাকে তিনটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। স্তর তিনটি হল – আন নাফসুল আম্মারাহ, আন নাফসুল লাওয়ামাহ এবং আন নাফসুল মুতমায়িন্নাহ।

আন নাফসুল আম্মারা হল আত্মার প্রাথমিক স্তর। এ স্তরে পাশবিক প্রবৃত্তি, কাম, ক্রোধ, লোভ, লালসা, হিংসা-দ্বেষ মানবাত্মাকে আবৃত ও আচ্ছন্ন করে রাখে। কুরআন তাই আত্মার এ স্তরকে মন্দ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে। ইরশাদ হচ্ছে– "সে বলল, আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্ম প্রবণ, কিন্তু সে নয় যার প্রতি

---

[১৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ.১৬২-৬৩

[১৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৩-৬৪

Dhaka University Institutional Repository

আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমার প্রতিপালকতো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১৫৮] আত্মা তার এ স্তরে পাপাচার ও আল্লাহ দ্রোহিতায় নিরত হতে পারে। যে জন্য আত্মার এ স্তর থেকে সাধনার মাধ্যমে পরিচ্ছন্ন করে পরবর্তী স্তরে উন্নীত করতে হয়।

আন নাফসুল লাওয়ামাহ হল আত্মার এমন একটি স্তর যে স্তরে আত্মা নৈতিক দোষ গুণ অনুসন্ধান করে। এ স্তরকে তাই আত্মার নৈতিক দোষ গুণ অনুসন্ধানের স্তর বলা হয়। এ স্তরে এসে আত্মা ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম হয়। এটাকে বলা যায় আত্মার আত্মভৎর্সনার স্তর। এ পর্যায়ে আত্মা পাশবিক প্রবৃত্তির উপর তার মানবিক সংগুণাবলীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। ফলশ্রুতিতে যে সৎকর্ম সম্পাদন করে যেমন পরিতৃপ্তি লাভ করে তেমনি অসৎ ও মন্দকাজে গভীর পীড়া অনুভব করে অনুতপ্ত হয়। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে – "আমি শপথ করছি কিয়ামত দিনের, আরো শপথ করছি তিরস্কারকারী আত্মার।[১৫৯]

আন নাফসুল মুতমায়িন্নাহ হল আত্মার পূর্ণতার স্তর। এটাই তৃতীয় বা শেষ স্তর। নিরন্তর সাধনায় পরিশুদ্ধ হয়ে এ স্তরে উন্নীত ও উপনীত আত্মা নৈতিক গুণে গুণান্বিত হয় এবং পূর্ণত্ব লাভের মাধ্যমে ফানাফীল্লাহ বাকাবিল্লাহ প্রক্রিয়ায় পরমাত্মায় লীন হয়ে যায়। এ জন্যেই এ স্তরের আত্মা হল প্রশান্ত আত্মা। ইরশাদ হয়েছে –

"হে নফস মুতমায়িন্নাহ বা প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও, আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"[১৬০]

"যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়; যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে পরম আনন্দ এবং শুভ পরিণাম তাদেরই।"[১৬১]

দার্শনিকগণ আত্মাকে পরমাত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে চিন্তা করেন – যার সবসময়ের কামনা হল পরমাত্মার সাথে মিলিত হওয়ার। এ আকাঙ্ক্ষা ও কামনা পূরণের জন্য একমাত্র উপায় হল ইবাদত ও আধ্যাত্মিক সাধনা। ইবাদত ও আধ্যাত্মিক সাধনার নিরিখে আত্মার তিনটি স্বতন্ত্র স্তর কল্পনা করা হয়। এগুলো হল আলামুল মুলক, আলামুল জাবারূত এবং আলামুল মালাকুত।

আলামুল মুলক হল মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্তর। এ স্তরে রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি আত্মার স্বাভাবিক শক্তিতে বোধগম্য হয়ে ওঠে। এ স্তরের আত্মা সবসময় কু প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়। কুরআনের নফস আম্মারা আর আলামুল মুলক প্রায় একই স্তরের আত্মা।

আলামুল জাবারূত স্তরের আত্মার দ্বিবিধ সম্ভাবনা প্রকটভাবে বিদ্যমান থাকে। এ সময়ে আত্মা কখনো কুপ্রবৃত্তি আবার কখনো বা বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রবৃত্তির তাড়নায় কখনো পাপাচারে লিপ্ত হলে এ স্তরের আত্মা তার জন্য অনুতপ্ত হয়। কুরআনের নফস লাওয়ামাহ এবং আলামুল জাবারূত প্রায়ই অভিন্ন স্তরের আত্মা।

আলামুল মালাকুত আত্মার জ্যোতির্ময়, অলৌকিক ও অপরিবর্তনীয় স্তর। বিপুল শক্তি সম্পন্ন আত্মাই শুধু এ স্তরে প্রবেশ করতে পারে। আত্মার এ স্তরের কোন কিছুই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। এ স্তরে আত্মা সবসময় বিবেকের নির্দেশনা মুতাবিক পরিচালিত হয়। কখনো পাপকাজে লিপ্ত হয় না বা কুপ্রবৃত্তির দ্বারাও তাড়িত হয় না। কুরআন এ স্তরের আত্মাকেই নফস মুতমায়িন্নাহ বলে ব্যাখ্যা করেছে।

উল্লিখিত স্তর তিনটির সাথে কোন কোন দার্শনিক আত্মার আরো তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেন। এগুলো হল –

১. আন নাফসুল মুলহামাহ বা অনুপ্রাণিত আত্মা;
২. আন নাফসুর রাজিয়াহ বা পরিতুষ্ট আত্মা ও
৩. আন নাফসুল মারজিয়াহ বা আল্লাহর নিকট প্রীতিকর আত্মা।

---

[১৫৮] আল কুরআন / ১২ : ৫৩
[১৫৯] আল কুরআন / ৭৫ : ২
[১৬০] আল কুরআন / ৮৯ : ২৭-৩০
[১৬১] আল কুরআন / ১৩ : ২৮-২৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টিতত্ত্ববিদ ও দেহতত্ত্ববিদদের বিবেচনায় আত্মা পরমাত্মার অংশ এবং শেষপর্যন্ত তা পরমাত্মাতেই সংস্থাপিত হবে। কুরআন মাজীদের ঘোষণা – "আমি তোমাদেরকে ভয় দিয়ে, ক্ষুধা দিয়ে এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে অবশ্যই পরীক্ষা করব। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলদেরকে – যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।"[১৬২] আয়াতের এ ঘোষণা এবং প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনা করে তারা আত্মার তিনটি স্তর নির্দেশ করেছেন। এগুলো হল –

১. জীবাত্মা : এ পর্যায়ে আত্মা সকল জীবন্ত সৃষ্টিজীবের মধ্যে সাধারণ অবস্থায় প্রাণশক্তি হিসেবে বিরাজ করে। একে বলা যায় আত্মার প্রাথমিক অবস্থা। এ স্তরে আত্মার বিচার বিবেচনা প্রায়শই থাকে না বললেই চলে।

২. মানবাত্মা : মানুষকে দেয়া বিবেক বুদ্ধি জীবাত্মায় সংস্থাপিত হয়ে জীবাত্মা মানবাত্মায় পরিণত হয়। এ স্তরে সৎ বা অসৎপথে চলার স্বেচ্ছাধিকার লাভ করে।

৩. পরমাত্মা : আত্মার মৌলিক স্তর হল পরমাত্মা। সকল আত্মাই এখান থেকে নিঃসৃত। পরবর্তীতে কঠিন সাধনায় শুদ্ধ হয়ে বিচ্যুতি ও বিচ্ছিন্ন এ আত্মাসমূহের পরমাত্মায় অধিষ্ঠিত হওয়াই পরম আরাধ্য বিষয় হয়ে ওঠে। যে জন্য এ স্তরকে বলা যায় আত্মার সার্বিক ও সামগ্রিক পূর্ণতার স্তর।

তবে স্তর বিন্যাস যেভাবেই হোক, আধ্যাত্মিকতার জগত জুড়ে আত্মার অবস্থান তা একই সাথে আত্মা ও আধ্যাত্মিকতার বিষয়টিই স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রমাণ করে।

বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনে আত্মা এবং আধ্যাত্মিকতা : পর্যালোচনা

ধর্মীয় আচরণ, অনুষ্ঠান, উপাসনা, ইবাদত এবং বিশ্বাস ও আচার-আচরণের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ধারাটি হল আধ্যাত্মিকতা। পৃথিবীর প্রধান এবং অপ্রধান সকল ধর্মেই আত্মা ও আধ্যাত্মিকতা কেন্দ্রিক নীতিমালা, বিধি-ব্যবস্থা ও বক্তব্য বিদ্যমান। প্রায় প্রতিটি ধর্মের পুরো কাঠামোই আধ্যাত্মিক বোধ ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্মসমূহ সাধারণভাবে আত্ম শুদ্ধিতার কথা বলে, যার মূল লক্ষ্য থাকে পরমাত্মার সাথে মিলন বা আখিরাতে সফলতা অর্জন করা। আত্মশুদ্ধি এবং আখিরাতে সফলতার সমগ্র বিষয়টিই একটি আধ্যাত্মিক বিষয়।

আত্মার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল soul, spirit, life[১৬৩] ইত্যাদি। বিভিন্নভাবে শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন, the immaterial part of man regarded as immortal, the ego, a spirit, মূর্ত বা বিমূর্ত প্রেত; the innermost being or nature, গুঢ় সত্তা বা অন্তঃ প্রকৃতি; nobleness of spirit, a complete embodiment, পূর্ণ মূর্তি বা রূপ; essence, সার; the essential part, অপরিহার্য অংশ; an indwelling or animating principle, অন্তর্নিহিত বা সঞ্জীবক নীতি; the moving spirit, inspirer or leader, প্রেরণা, প্রেরণাদাতা, নেতা, পরিচালক[১৬৪] বিভিন্ন অর্থে শব্দটির বিস্তৃত ব্যবহার দেখানো হয়েছে Oxford Dictionary[১৬৫] – তে। যেমন –

spirit of person 1 [c] the spiritual part of a person believed to exist after death: He believed his immortal soul was in peril. The howling wind sounded like the wailing of lost souls (= the spirits of dead people who are not in heaven).

inner character 2 [c] a person's inner character, containing their true thoughts and feelings: there was a feeling of restlessness deep in her soul.

spiritual / moral / artistic qualities 3 [sing] the spiritual and moral qualities of humans in general : the dark side of the human soul 4 [u, c] strong and good human feeling,

---

[১৬২] আল কুরআন / ২ : ১৫৫-৫৬

[১৬৩] Mohammad Ali, Mohammad Moniruzzaman & Jahangir Tareque, ibid, p.49

[১৬৪] Sailendra Biswas, ibid p.1076

[১৬৫] A S Hornby, ibid pp. 1233-34

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

especially that gives a work of art its quality or enables sb to recognize and enjoy that quality: It was a very polished performance, but it lacked soul. 5 [sing] the~of sth a perfect example of a good quality: He is the soul of discretion.

person 6 [c] (becoming old-fashioned) a person of a perticuler type: She's lost her money, poor soul. You're a brave soul. 7 [c] (especilly in negative sentences) a person: There wasn't soul in sight (=nobody was in sight). Don't tell a soul (=do not tell anyone) (literary) a village of 300 souls (=with 300 people living there)

music 8 (also soul music) [u] a type of music that expresses strong emotions, made popular by African American musicians: a soul singer

আরবি ভাষায় আত্মা হল রূহুন, বহুবচন আরওয়াহুন। কুরআন মাজীদে নফসুন, সুদূরুন, ক্বালবুন শব্দ তিনটিকেও কখনো কখনো আত্মা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

বিভিন্ন ধর্মীয় ভাষ্যে আত্মার একটি সুনির্দিষ্ট পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন–

জৈনধর্মে আত্মা হল আধ্যাত্মিক শক্তিধর সত্তা। দেহাতীত যে কোন আধ্যাত্মিক সত্তার মত আত্মাও অসীম ক্ষমতার অধিকারী। এর লয় নেই, ক্ষয় নেই। অবশ্য মুক্ত ও বন্দী অবস্থায় আত্মার প্রকাশগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

যরথ্রুষ্ট ধর্মে আত্মা হল আকারবিহীন, চিরন্তন এক কালাতীত ও স্থানাতীত সত্তা। আকার ও কালে আবদ্ধ না হওয়ায় তা অসীম ক্ষমতার অধিকারী।

বৌদ্ধ ধর্মে একমাত্র আত্মা ছাড়া অনিত্য–অবিনশ্বর আর কিছু নেই। আত্মা জন্মের পূর্বে ছিল, মানুষের মৃত্যুর পর তা আবারো নতুন দেহ ধারণ করে।

হিন্দু ধর্মে আত্মা মানুষের সৎ ও অসৎকাজের নিয়ামক শক্তি। পূণ্য কাজের ফলশ্রুতিতে আত্মা মোক্ষ লাভ করবে অন্যথায় কর্মফল ভোগের জন্য তাকে বারবার বিভিন্ন শ্রেণীতে পূণর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং আত্মা অমর ও স্থায়ী। এর ক্ষমতাও অপরিসীম।

ইয়াহুদী ধর্মে আত্মা হল আধ্যাত্মিক সত্তা এবং চিরন্তন ও অবিনশ্বর এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্যোতি। আধ্যাত্মিকতা, ঐশ্বরিকতা, চিরন্তনতা ও অবিনশ্বরতা এর বৈশিষ্ট্য। মৃত্যু পরবর্তী জীবনে মানুষের পুনরুত্থান হবে এবং তা আত্মার মাধ্যমেই সম্পন্ন হবে। কাজেই আত্মা একটি অমর সত্তা।

বাইবেলে আছে – "আশির্বাদ ধন্য তারা যাদের হৃদয় পবিত্র ও পরিশুদ্ধ এবং তারাই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করবে।"[১৬৬]

খৃষ্টান ধর্ম মতে আত্মা তাই একটি পরিবর্তনশীল সত্তা – যা পরিশুদ্ধ হওয়া বা কলুষিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে।

দার্শনিক প্লেটো বলেন – আত্মা এক আধ্যাত্মিক দ্রব্য এবং এ হিসেবে তা অযৌগিক। কোন অযৌগিক দ্রব্য বিশ্লিষ্ট হতে পারে না। আর যা বিশ্লিষ্ট হতে পারে না, তার ধ্বংস বা মৃত্যু নেই। প্রকৃত জ্ঞান ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা নির্ভর নয় বরং প্রকৃত জ্ঞান শাশ্বত। আত্মা শাশ্বত জ্ঞানের আধার। এর ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট আছে। ঈশ্বরের মত একে তাই অবিনশ্বর বলা যায়। আত্মা সর্বদা একক এবং অবিভাজ্য। এর উপাদান নেই এবং বিচ্ছিন্নতাও নেই। তাই আত্মা হল এমন এক সত্তা যার ধ্বংস নেই, বিভাজন নেই।

মুসলিম দর্শনে মু'তাযিলারা বুদ্ধিবাদী নামে খ্যাত। জ্ঞানোৎপত্তি, কুরআনী বিধানের বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁরা সাধারণ মুসলিমদের বিপরীতে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার উপর গুরুত্বারোপ করেন। আল্লাহ সম্পর্কে মুতাযিলাদের অন্যতম ধারণা হল তিনি পরম প্রজ্ঞাবান। তাঁর প্রতিটি কর্ম ও বিধানাবলী (আদেশ ও নিষেধ উভয়ই) তাঁর মহাবিজ্ঞতার সুস্পষ্ট নিদর্শন। সৃষ্টির মাঝে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ আর মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হল তার প্রজ্ঞা। মানুষ সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তাআলার পরম প্রজ্ঞার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে। মানুষের মধ্যে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ যারা তাদের প্রজ্ঞার মাধ্যমে স্রষ্টার এই মহাবিজ্ঞতা ও পরমপ্রজ্ঞার পরিচয় লাভ করেছে। মানুষের আত্মা হচ্ছে প্রজ্ঞার মূল। পৃথবীতে মানুষ যে আল্লাহর প্রতিনিধি এটা তার প্রজ্ঞার যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে পরিস্ফুট করে তুলতে হবে। মানুষ যখন প্রজ্ঞার বিপরীত কোন

---

[১৬৬] Blessed are those who have a clean heart, they will see God.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

কাজ করে তখন তার আত্মা মলিন ও কালিমাযুক্ত হয়ে যায়। শুধু তাই নয় এমনি ধরনের কাজ মানবপ্রকৃতি, বিশ্বপ্রকৃতি ও স্বর্গীয় বিধানের পরিপন্থী। সে কারণে মানুষ যুক্তি দ্বারা পরিচালিত না হয়ে অন্ধ আবেগ ও মোহের বশে যখন কোন কাজ করে তখন সে তার নিজ প্রকৃতি ও মহাজাগতিক বিধান ও নিয়মাবলীর সাথে এক ধরনের শত্রুতায় লিপ্ত হয়। এটি তার সুস্থ বিকাশ ও মানব সমাজের উন্নতির পরিপন্থী। মানবাত্মার এমনি ধরনের যুক্তিবিরোধী ভূমিকা চূড়ান্ত পর্যায়ে তাকে আল্লাহ দ্রোহীও করে তুলতে পারে। অন্যদিকে প্রজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত অবিকৃত মানবাত্মা স্বচ্ছ-স্বর্গীয় গুণাবলী প্রতিফলনক্ষম আরশির মত। স্বর্গীয় ন্যায়বিচার এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও দায়িত্বের ধারণার আপোষহীণ সমর্থক হিসেবে মুতাযিলারা প্রসিদ্ধ। মানবাত্মা সম্পর্কে মুতাযিলাদের ধারণার মধ্যেও তাদের এ বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রয়েছে।

খুলাফায়ে রাশীদার শাসনামলের শেষের দিকে বিশেষত উসমান (রা) এর খিলাফতকালে একদিকে যেমন মুসলিম রাজত্বের ব্যাপ্তি আরবের সীমানা পেরিয়ে বিভিন্ন অনারবীয় প্রাচীন সংস্কৃতি ও দার্শনিক চিন্তা-লালিত জনপদে প্রবেশ করেছিল, অন্যদিকে ঠিক তেমনি মুসলিম সমাজ ও মনে বিভিন্ন জাতির ও ধর্মের লোকদের জগৎ জিজ্ঞাসা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে গ্রিক দর্শন, পারসিকদের ধর্মমত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ভারতীয় দর্শন সরল ও কঠোর জীবনবাদী আরব মুসলিমদের চিন্তাশীল অংশের কাছে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। মুসলিম সমাজে এর নানা ধরনের বিরূপ ফল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যুগ যুগ ধরে লালিত অনেক বিশ্বাসই প্রশ্নের সম্মুখিন হয়। সাধারণ মুসলিমরা এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে পণ্ডিত সমাজের দ্বারস্থ হন। কিন্তু সংশয়ের এ মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থা থেকে বিদ্বৎজনের একটা অংশ নিজেদের সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে অক্ষম প্রমাণিত হন। এ সব প্রশ্নের সমাধানের জন্য তারা নতুনভাবে কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন শুরু করেন। কিন্তু জীবনবিমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী সেখানেও দেখতে পান নানা ধরনের পরস্পর বিরোধী আয়াত ও হাদীস। "একদল উল্লিখিত সব দর্শন ও জীবনবোধের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অন্যদল নিজেদের ব্যক্তিগত উপলব্ধির আলোকে কুরআন – হাদীসের ব্যাখ্যা দিতে থাকেন। সাধারণ আলিমগণ সযত্নে এদেরকে এড়িয়ে যাওয়া শুরু করেন। কিন্তু তাতে মূল প্রশ্নের কোন সুরাহা হয় না। অবস্থা এ পর্যায়ে গড়ায় যে, মানুষকে প্রায় সপ্রাণ জড়ে পরিণত করা হয়। জাবারিয়ারা মানুষের সক্রিয় ইচ্ছা ও কর্মশক্তিকে অস্বীকার করে।"[১৬৭]

সব দায়িত্ব আল্লাহ এবং জগতে তার প্রতিভূ শাসকের উপর ছেড়ে দিয়ে একটা চরম নৈরাজ্যকর ও অনৈতিক অবস্থার দিকে সমাজকে ঠেলে দেয়া হয়। আলিমগণের একটি অংশ চরম সুবিধাবাদী ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং উচ্ছৃংখল শাসকদের অন্ধ সমর্থক হওয়াকে গৌরবের ব্যাপার বলে মনে করতে থাকেন এবং কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে তা প্রমাণ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। মুসলিম সমাজের এমন একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সংকটকালে কিছু সংখ্যক চিন্তাবিদ বিশুদ্ধ যুক্তির হাতিয়ার নিয়ে অগ্রসর হন। বস্তুত প্রথম হিজরি শতাব্দীর শেষাংশ থেকে তৃতীয় হিজরি শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের স্বর্ণযুগ বলা চলে।[১৬৮]

একথা সত্য যে মুতাযিলারা মুসলিম দার্শনিকদের একটি প্রতিনিধিত্বশীল অংশ এবং তাঁরা যুক্তির সাহায্যে আল্লাহর একত্ব ও স্বর্গীয় গুণাবলী প্রমাণ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন; কিন্তু মানবীয় প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের ধারণাকে অবিমিশ্র ইসলামী ধারণা বলা যাবে না। সম্ভবতঃ উল্লিখিত বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তাদের মানবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে এ ধরনের একটি মিশ্রিত ধারণা উপস্থাপন করার কারণ।

মুতাযিলারা দেখানোর চেষ্টা করেন যে, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ একটি নৈতিক প্রাণী। মহাকালের একটি অংশে তার দুনিয়ার জীবন সীমাবদ্ধ। কিন্তু তার এ সাময়িক কর্মকাণ্ডের ফল জীবনের এ অংশেই নিঃশেষিত হয়ে যায় না। নৈতিক দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হওয়ার কারণে মানুষের ক্রিয়াকর্ম তার পরিণতির নির্ধারক। আল্লাহ পরম ন্যায়বিচারক। জগত পরিচালনায় তিনি খেয়ালী নন। সৃষ্টি জগতে মানুষের অবস্থান বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। জগতের অন্যান্য সব সৃষ্টির মত কতকগুলো ক্ষেত্রে মানুষও আল্লাহ কর্তৃক সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত; আর কতকগুলো ক্ষেত্রে অন্যান্য সৃষ্টিকূলের বিপরীতে সে

---

[১৬৭] Ignaz Goldziher, *Introduction to Islamic Theology and Law,* London, 1981, pp. 77 – 78

[১৬৮] M M Sharif (ed), *A history of muslim philoshophy,* Wiesbaden, OHO Harrassowitz, 1963 p. 219

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার অধিকারী। যুক্তি ও শাস্ত্রের আলোকে মানবপ্রকৃতির এই পরস্পর বিরোধী ভূমিকার সমন্বয় সাধন করা মুতাযিলাদের সামনে অন্যতম জটিল কাজ ছিল।

পরম স্রষ্টা হিসেবে মহাবিশ্বে আল্লাহর নানাধরনের সৃষ্টি রয়েছে। অতীন্দ্রিয় জগতের ফেরেশতা এবং মহাকাশের বিশালায়তন নক্ষত্ররাজি থেকে আরম্ভ করে পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণু পর্যন্ত সবকিছুই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট নিয়মে আপন আপন কাজ করে যাচ্ছে। আল্লাহ বলেন –

"তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশসমূহ ও দুনিয়া ছয়দিনে সৃষ্টি করেন; এরপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিবসকে রাত দিয়ে আচ্ছাদিত করেন যাতে তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে আর চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্ররাজি, যা তাঁরই আজ্ঞাধীন, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। মহিমময় বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ।"[১৬৯]

"সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণে। চাঁদের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল; শেষে তা শুকনো, বাঁকা ও পুরোনো খেজুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে।"[১৭০]

"তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন। এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও পথনির্দেশ করেন। যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন, পরে তাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।"[১৭১]

মহাবিশ্বের এ বিশাল পরিমণ্ডলের অসংখ্য সৃষ্টিরাজির মধ্যে কেউ কোন নিয়ম ভাঙছে না। বিনা দ্বিধায়, বিনা প্রশ্নে অনাদি কাল থেকে আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করে যাচ্ছে। কোন রকমের নিয়মের ব্যাত্যয় ঘটাচ্ছে না। তাদের সে ক্ষমতাও নেই। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে –

"তারা কি চায় আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য দীন – যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে? আর তাঁর দিকেই তারা প্রত্যানীত হবে।"[১৭২]

কিন্তু মানুষকে আল্লাহ অন্যান্য সৃষ্টির মত করে সৃষ্টি করেন নি। তাকে ইচ্ছাশক্তি ও নির্বাচন করার ক্ষমতা দিয়েছেন। দিয়েছেন ভাল মন্দ বিচার করার ক্ষমতা, প্রজ্ঞা ও বিবেক। ইচ্ছাকে কার্যকরী করার জন্য দিয়েছেন কর্মক্ষমতা। সে কর্মক্ষমতা এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত যে, সে ইচ্ছা করলে তার মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলাকে পর্যন্ত অস্বীকার করতে পারে এবং দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ তাআলা মানুষের এ অস্বীকৃতির কারণে সাধারণত তাদের উপর কোন শাস্তি বা এ জাতীয় কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। যেমন ইরশাদ হয়েছে –

"মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে একের পর এক প্রহরী থাকে; তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা পরিবর্তন করে। কোন জাতি সম্পর্কে আল্লাহ যদি অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক নেই।"[১৭৩]

"তাদের জন্য এক নিদর্শন এই যে, আমি তাদের বংশধরদেরকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করিয়েছিলাম এবং তাদের জন্য অনুরূপ যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করে। আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিমজ্জিত করতে পারি; সে অবস্থায় তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না এবং তারা পরিত্রাণও পাবে না। আমার অনুগ্রহ না হলে এবং কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে না দিলে।"[১৭৪]

---

[১৬৯] আল কুরআন / ৭ : ৫৪ .
[১৭০] আল কুরআন / ৩৬ : ৩৮–৪০
[১৭১] আল কুরআন / ৮৭ : ১–৪
[১৭২] আল কুরআন / ৩ : ৮৩
[১৭৩] আল কুরআন / ১৩ : ১১
[১৭৪] আল কুরআন / ৩৬ : ৪১–৪৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

মুতাযিলাদের মতে মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে সৃষ্ট। দেহ জড় এবং প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। আত্মা দেহে অবস্থান করে। কিন্তু আত্মা প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। এখন প্রশ্ন হল জড় দেহ ও আত্মার সাথে কোন ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান? এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মুতাযিলা দার্শনিক ভিন্নমত পোষণ করেন। তবে তাদের আমরা প্রধানত দুভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমত বাশার ইবন আল মুতামারের কথা উল্লেখ করা যায়। তাঁর মতে, দেহ ও আত্মার সম্পর্ক আবশ্যিক। আত্মা ও দেহ মিলেই মানুষ। সুতরাং বিচ্ছিন্ন ও এককভাবে এদের কোন টাকেই মানুষ বলা যাবে না।[১৭৫] কিন্তু অধিকাংশ চিন্তাবিদ এমত গ্রহণ করেন নি। যে কারণে এ মতবাদটি মুতাযিলাদের আত্মা সম্পর্কিত ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে না। কারণ আমরা একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাই যদিও দুনিয়া জীবনে আত্মা ও দেহ একত্রিত থাকে কিন্তু মরণে তারা পৃথক হয়ে যায়। মৃত দেহে যে আত্মা থাকে না এটা সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের কথা; তা না হলে হয় স্ববিরোধিতার নামান্তর। সুতরাং জড় দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক আবশ্যিক হতে পারে না।

দ্বিতীয় মত অধিকাংশ মুতাযিলা চিন্তাবিদ সমর্থন করেন। এ মতের পরিপোষক হলেন আবু আল হুদায়ল ও তার শিষ্য আল নাজ্জাম। এ মত অনুযায়ী দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক আপতিক।[১৭৬] এমনকি যাকে সাধারণত জীবনীশক্তি বলা হয়, আত্মা তা হতেও স্বতন্ত্র। তার মতে, বাশার যাকে আত্মা বলেছেন সেটা দেহ ছাড়া থাকতে পারে না, তা আসলে জীবনী শক্তি, আত্মা নয়।[১৭৭] এ বক্তব্যের সমর্থনে কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করা হয়। ইরশাদ হয়েছে –
"আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসে নি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর তিনি যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলো ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এতে অবশ্যই চিন্তাশীল মানুষের জন্য নিদর্শন রয়েছে।"[১৭৮]

এ আয়াতের আলোকে হুদায়েল বলেন, ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের জীবনী শক্তি লোপ পায় না। কিন্তু আত্মা দেহপিঞ্জর হতে বহির্গমণ করতে পারে। মুতাযিলাদের মতে দেহ ও জীবনীশক্তির মাধ্যমে আত্মা কাজ করে। আত্মার অন্যতম কাজ হল অতীন্দ্রিয় জগতের সাথে পরিচিত হওয়া, সে জগতের জ্ঞান লাভ করা তথা স্বর্গীয় ইচ্ছা ও পরম মূল্যের সন্ধান লাভ করা এবং জীবনীশক্তি ও দেহের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত করা। হুদায়েলের ধারণা, আত্মা তার এ অতীন্দ্রিয় পরিভ্রমণ, নৈতিক মূল্যাবধারণ ও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে দেহ ও জীবনীশক্তির সহায়তা ও তাদের প্রয়োজনের তুলনায় অগ্রাধিকার পায়। এখানে লক্ষণীয় হুদায়েল প্লেটোর বুদ্ধিবৃত্তির অভিজ্ঞতাপূর্ব প্রকৃতি ও আত্মার অমরত্বের ধারণা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।[১৭৯]

নাজ্জামের মতে আত্মা অন্ধকার জড় দেহের মধ্যে এক ধরনের হালকা দেহবিশেষ। দেহের মূলশক্তিই হচ্ছে আত্মা। আত্মাই দেহের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে এবং তখন তাকে মানুষ বলা হয়।[১৮০] নাজ্জাম স্টয়িক ও গ্রিক পরমাণুবাদীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন তা এখানে স্পষ্ট ধরা পড়েছে। কারণ পবিত্র কুরআন বা হাদীসে আত্মাকে এভাবে বর্ণনা করা হয় নি। আত্মা সম্বন্ধে কুরআন মাজীদ বলেছে, এটি একটি স্বর্গীয় আদেশ বিশেষ। যেমন ইরশাদ হয়েছে – "তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত এবং তোমাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে সামান্যই।"[১৮১]

---

[১৭৫] আবুল হাসান আল আশআরী, *মাকালাতুল ইসলামিয়া ওয়া ইখতিলাফুল মুসলিমিন,* দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা এম এ হামিদ, মাকতাবাত আল নাহদা আল মিসরিয়া, কায়রো ১৯৬৩, পৃ. ২৫

[১৭৬] আবু মুহাম্মদ ইবন হাজম, *কিতাবুল ফায়সাল ফীল আহওয়াল মিলাল ওয়ান নিহাল,* ৫ম খণ্ড, কায়রো, ১৯০৩, পৃ.৪৭

[১৭৭] আবুল হাসান আল আশআরী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯–৩০

[১৭৮] আল কুরআন / ৩৯ : ৪২

[১৭৯] Plato, *The Dialogues of Plato,* tr. by B. Jowett, v. I, Clarendon Press, Oxford, 1953, pp.387-89

[১৮০] আল বাগদাদী, *কিতাবুল ফারক বায়না ফারক,* মাতবাত আল মাআরিফ, কায়রো, ১৯১০ পৃ.১১৭

[১৮১] আল কুরআন / ১৭ : ৮৫

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত স্টয়িক দার্শনিকদের থেকে তিনি এ ধারণা লাভ করেন যে, আত্মা জড় দেহের অভ্যন্তরে এক ধরনের হালকা দেহ বিশেষ।[১৮২] আব্দুর রহমান আল ইজি নাজ্জামের মতবাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, আত্মা অনেকগুলো হালকা দেহের আকারে জড় দেহের মাঝে অনেকটা সেভাবে ভেসে বেড়ায় যেভাবে পানির উপর ভেসে বেড়ায় সুগন্ধ। সারা জীবনে এদের কোন পরিবর্তন ঘটে না বা এরা ধ্বংসও হয় না। যদি কোন কারণে কোন অঙ্গ নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে আত্মা বাকী দেহে আশ্রয় নেয়।[১৮৩] নাজ্জাম গ্রিক পরমাণুবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনে করেন যে, আত্মা সারা দেহে পরিব্যাপ্ত অসংখ্য সূক্ষ্ম পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত।[১৮৪] প্লেটো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কোন কোন মুতাযিলা চিন্তাবিদ দেহকে আত্মার কারাগার ও যানবাহন হিসেবে বর্ণনা দেন।[১৮৫]

ইচ্ছাশক্তি ও যুক্তি প্রয়োগ মুতাযিলারা আত্মার প্রধান কাজ বলে বর্ণনা করেন। বস্তুত প্রজ্ঞার মাধ্যমে শাশ্বত সত্য ও চিরন্তন মূল্যবোধের আবিষ্কার আত্মার অন্যতম প্রধান কাজ। আর ইচ্ছাশক্তির কাজ হল জীবনীশক্তি ও দেহের মাধ্যমে নৈতিকবোধ ও দায়িত্ব বাস্তবায়িত করা। অপরদিকে, জীবনীশক্তি আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কামনা বাসনা পূর্ণ করতে প্রলুব্ধ হয়। দেহ আত্মার বাহক হলেও প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কাজ করে। মুতাযিলাদের মতে আত্মার জগত আদর্শের জগত। এখানে প্রজ্ঞা ও নৈতিকতার নিয়ম কার্যকর। কিন্তু জীবনীশক্তির জগত ভিন্ন প্রকৃতির। মনের চাহিদা মেটানোই সেখানে বড় কথা। এ জন্য নৈতিক ও প্রজ্ঞার জগতের নিয়ম সর্বজনীন ও অনপেক্ষ; পক্ষান্তরে ব্যক্তিস্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষার ভিন্নতার জন্য জীবনীশক্তির জগতের নিয়ম ব্যক্তির প্রয়োজনসাপেক্ষ ও আপেক্ষিক। মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহ যেহেতু পরমশুভ ও পরম সত্য, সুতরাং পরম আদর্শের জগতে পরম মূল্যই স্বর্গীয় গুণ বিশেষ। তাই মানুষ প্রজ্ঞার দ্বারা আবিষ্কৃত নৈতিক জীবন যাপন করার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়। তার জীবন যতই নৈতিকতা ও প্রজ্ঞা শাসিত হয়ে ততই সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে এবং এভাবে তাঁর গুণাবলী প্রতিফলনের মাধ্যমে পৃথিবীতে সে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের যথার্থ দাবিদার হবে এবং তার পুরস্কার স্বরূপ আখিরাতে স্বর্গীয় করুণা লাভ করবে।[১৮৬]

মুতাযিলা চিন্তাবিদগণ সাধারণ মুসলিম ও সূফীদের থেকে আত্মার চরম গন্তব্য ও পরম লক্ষ্যের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের ধারণা, সকল সৎকাজ ও নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য হল আল্লাহর শাস্তি হতে নিরাপত্তা লাভ এবং সৎকাজের পুরস্কারস্বরূপ জান্নাত প্রাপ্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। সূফী ও সাধারণ মুসলিমগণ এর সাথে আল্লাহর দর্শন বা দীদার ই ইলাহীকে যুক্ত করেন এবং এটাকেই তারা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অনেক সুফী সাধক এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে অগ্রসর ব্যক্তিরা আল্লাহর দীদারহীন জান্নাতকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তাদের মতে, কেবল শাস্তির ভয়ে ও পুরস্কারের আশায় সৎ ও নৈতিক জীবন যাপন করা সত্যিকারের আল্লাহ প্রেমিক ও আল্লাহ ভক্তের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। সুতরাং সফল ও নিষ্কলুস আত্মার পরম লক্ষ্য হল আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সাথে তাঁর সান্নিধ্য। যেমন এক হাদীসে বলা হয়ে, আখিরাতে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত ব্যক্তিরা আল্লাহকে এমনভাবে দেখবেন যেমন করে পৃথিবীতে তারা পূর্ণিমার চাঁদ বা দিনের সূর্যকে দেখেন।[১৮৭]

মুতাযিলারা মানবাত্মার বাঞ্ছিত ও পরম আরাধ্য আল্লাহর দীদারের সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেন প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত, আল্লাহ নিরাকার, অসীম এবং স্থান ও কালে উর্ধ্বে। কিন্তু যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, আল্লাহকে দেখা সম্ভব তাহলে তাঁকে স্থান ও কালে সীমায়িত করা হয়। এটি আল্লাহর প্রতি নশ্বরত্ব আরোপ এবং তাওহীদ বিরোধী ঘৃণ্য শিরক। দ্বিতীয়ত, যুক্তির এ দাবি কুরআন মাজীদ দিয়েও সমর্থিত। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, কোন চক্ষু আল্লাহকে দেখতে পাবে না। ইরশাদ হয়েছে – "দৃষ্টি তাঁকে অবধারণ করতে পারে না কিন্তু তিনি অবধারণ করেন

---

[১৮২] Ralph M Mclnerny, *A History of Western Philosophy,* University of Notre Dame Press, 1963, pp.89, 316-17

[১৮৩] আব্দুর রহমান আল ইজ্জ, *আল মাওয়াকিফ ফী ইলমিল কালাম,* মাতবাত আল মাআরিফ, কায়রো, ১৯৩৮, পৃ.২৮১

[১৮৪] আবুল হাসান আল আশআরী, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪৭

[১৮৫] Plato, ibid, pp.390-91

[১৮৬] আল শাহরাস্তানী, *কিতাবুল মিলাল ওয়ান নিহাল,* আল আজহার প্রেস, কায়রো, ১৯১০, পৃ.৮৫

[১৮৭] মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান

Dhaka University Institutional Repository

সকল দৃষ্টি এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।"[১৮৮] বিশেষ সম্মানিত রাসূল মূসা (আ) যখন আল্লাহকে দেখতে চাইলেন, তখন আল্লাহ বললেন, তাঁকে দেখা সম্ভব না। যেমন ইরশাদ হচ্ছে – "মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হল এবং তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন, তখন সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও। আমি তোমাকে দেখবো।' তিনি বললেন, তুমি আমাকে কখনোই দেখতে পাবে না। তুমি বরং পাহাড়ের দিকে লক্ষ্য কর, তা স্বস্থানে স্থির থাকলে তবে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল এবং মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লো। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল তখন বলল, মহিমময় তুমি, আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং মুমিনদের মধ্যে আমিই প্রথম।"[১৮৯]

এমনকি মহানবী (সা) যখন মিরাজে গমন করেন, সেখানে সেই উর্ধ্বলোকেও তিনি আল্লাহকে সরাসরি দেখেন নি। যারা মিরাজে মহানবী (সা) আল্লাহকে দেখেছেন বলে বর্ণনা করে তারা অসঙ্গত কথা বলেন বলে উল্লেখ করেছেন উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা)। সুতরাং যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ উভয় দিক দিয়েই একথা প্রমানিত যে, মানুষ আল্লাহকে দেখতে পারে না। অতএব আল্লাহর দর্শন মানবাত্মার লক্ষ্য এ কথা বলা ঠিক নয়। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, মুতাযিলারা মানবাত্মার পরম লক্ষ্য নির্দেশ ও বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগ খণ্ডনের বেলায় যুক্তিকে প্রথমে এনেছেন।

মানবাত্মার উল্লিখিত লক্ষ্য নির্দেশ করার জন্য যারা মুতাযিলাদের হেয় করেন, তাদের প্রতি উত্তরে মুতাযিলারা বলেন, এ সকল ব্যক্তিরা আল্লাহ সম্পর্কিত সঠিক ধারণা এবং মানবাত্মার আসল প্রকৃতি সম্বন্ধে মারাত্মক ভুল ধারণার শিকার। তারা মনে করেন, কোন না কোন ভাবে মানবাত্মাকে স্বর্গীয় সত্তার অংশ মনে করা থেকে এ ধরনের সব বিভ্রান্তির উৎপত্তি। এখানে মনে রাখার মত যে, মুতাযিলারা আল্লাহর সত্তা হতে তাঁর গুণাবলীকে স্বতন্ত্র মনে করার সাধারণ মুসলিমদের ধারণারও বিরোধিতা করেন।[১৯০] তাদের মতে, আল্লাহ শুধু এক বা ওয়াহিদ নন বরং তিনি আহাদ বা অবিভাজ্য, অনন্য ও একক। এককে ভাগ করা যায় যেমন অর্ধ, তৃতীয়াংশ ইত্যাদি। কিন্তু আল্লাহ অবিভাজ্য। আল্লাহর সত্তা এক অখণ্ড অস্তিত্বের স্মারক। তিনি যে অনন্য তাঁর সে অনন্যতা কেবল পরিমাণগত নয়, গুণগতও। মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী পৃথক কিছু নয়, তাঁর গুণাবলী সত্তা হতে অবিভাজ্য। মানুষকে যে আল্লাহর প্রতিনিধি বলা হয়, সেটা মূলগত নয়, সাদৃশ্যমূলকও। সে সাদৃশ্যও মৌলিক, আবশ্যিক ও বাস্তব নয়, বরং গৌণ, আপতিক এবং আদর্শিক। প্রজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত হয়ে পূর্ণ নৈতিক জীবন যাপন করলে মানুষের মধ্যে স্বর্গীয় গুণাবলীর বিকাশ ঘটতে পারে বা মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি এ কথা আল্লাহর ধারণা হতে অনুসৃত হয়, সত্তা হতে নয়। অন্যকথায়, যেমন আগে বলা হয়েছে, অবিকৃত মানবাত্মা প্রজ্ঞার মাধ্যমে পরমমূল্য ও আদর্শ তথা আল্লাহর সন্ধান পেতে পারে এবং নৈতিক জীবন (যা প্রজ্ঞার দাবি ও নিষ্কলুস মানবাত্মার স্বভাব) যাপনের মাধ্যমে সে পরম মূল্য ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে পারে – আত্মাস্থিত প্রজ্ঞার এটা যৌগিক পরিণতি, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তি নয়। সুতরাং স্বচ্ছ মানবাত্মায় স্বর্গীয় গুণাবলীর প্রতিফলনের দাবি আল্লাহর পরম পূর্ণতা ও শুভত্বের ধারণা হতে যৌগিকভাবে অনুসৃত হয়, সৃষ্টগতভাবে বর্তায় না। বস্তুত মানবাত্মা স্বর্গীয় সত্তার অংশ তো হতেই পারে না এমনকি তার থেকে উন্মেষিতও নয়; বরং সম্পূর্ণরূপে কালিকভাবে সৃষ্ট।

এখন প্রশ্ন হল মানবাত্মার কোন দৈশিক মাত্রা আছে কি না? আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাশারের মতে যেহেতু মানবাত্মার সাথে দেহের সম্পর্ক আবশ্যিক, সেজন্য তাঁর ধারণার যৌক্তিক পরিণতি আত্মার দৈশিক মাত্রার সদর্থক ধারণার দিকে নিয়ে যায়; কিন্তু এর বিরুদ্ধে আপত্তি হল, দৈহিক মৃত্যুতে আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সত্য কিন্তু তাতে আত্মার মৃত্যু ঘটে না বা আত্মা বিলুপ্ত হয়ে যায় না। সে জন্য আত্মার দেহাতিরিক্ত অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। এ অর্থে আত্মার দৈশিক গুণ আপতিক, আত্মার অন্তস্থিত আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ নয়। অপরদিকে হুদায়েল ও নাজ্জাম স্টয়িক ও গ্রিক পরমাণুবাদের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আত্মাকে সূক্ষ্ম দেহের সাথে একত্রীভূত করেছেন। আমাদের মনে হয় এ সূক্ষ্ম দেহ জড় অর্থে নয় বরং আধ্যাত্মিক অর্থে। কিন্তু ভাষার মাধ্যমে সূক্ষ্মতার এ

---

[১৮৮] আল কুরআন / ৬ : ১০৩

[১৮৯] আল কুরআন / ৭ : ১৪৩

[১৯০] A S Tritton, *Muslim Theology*, Hyperion Press, Westport, Connecticut, 1981, pp.79-80

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যঞ্জনাকে তারা সুস্পষ্ট করে তুলতে পারেন নি। শেষ অর্থে সূক্ষ্মতাকে গ্রহণ করা হলে এটা স্বীকার করতে হয়ে যে, স্টয়িক ও গ্রিক পরমাণুবাদীদের বর্ণনার ধরনে তারা যুক্তি দিলেও আত্মার প্রকৃতি উন্মোচনে তাদের মৌলিকতা রয়েছে। কেননা সূক্ষ্মতা দ্বারা আধ্যাত্মিকতা বুঝিয়ে থাকলে গতানুগতিক চিন্তা প্রবাহে তারা অভিনবত্ব আনতে সক্ষম হয়েছেন। এখানে আরো একটি জিনিস লক্ষ্যনীয় যে, লিবনিজের প্রায় আটশো বছর আগে এ মুতাযিলা চিন্তাবিদগণ আধ্যাত্মিক পরমাণুর দ্বারা আত্মার প্রকৃতি ও কার্যাবলীর ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।[১৯১] আত্মার এ শেষোক্ত বর্ণনায় দুনিয়া জগতে জড় দেহের আধারে আত্মার সাময়িক অবস্থান হলেও বিশুদ্ধ আত্মার কোন দৈশিক মাত্রা নেই। তবে আত্মা সবসময়ই কোন না কোন ভাবে দেহের অবলম্বনে থাকে। যেমন দুনিয়া জীবনে জড় দেহের আকারে, আলমে বরযখে সূক্ষ্মদেহের আকারে বা শহীদানদের বেলায় সবুজ রঙের পাখির আকৃতিতে এবং পূর্ণশান্তি ভোগ বা পরিপূর্ণ শান্তি ও তৃপ্তি পাওয়ার জন্য পাপ ও পূণ্য অনুযায়ী যথাক্রমে জাহান্নাম ও জান্নাতে আল্লাহর ইচ্ছায় বিশেষ দেহ ধারণ করবে।[১৯২]

জাবারিয়া ও মুরজিয়াদের বিপরীতে মুতাযিলারা সামাজিক শৃংখলা ও নৈতিক শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মানবীয় দায়িত্বের তীক্ষ্ণ অনুভূতি বোধ করতেন। সমাজ যেভাবে চলছে সেভাবেই তাকে চলতে দেয়া যায় না। এটি প্রজ্ঞার দ্বারা আবিস্কৃত নৈতিক নিয়ম বিরোধী। মানবাত্মার লক্ষ্য হচ্ছে নৈতিকতার উৎস স্বর্গীয় গুণাবলীর আবিষ্কার করা। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই প্রজ্ঞা রয়েছে। আর প্রজ্ঞার কাজই হচ্ছে নৈতিকবোধ লাভ করা। এ প্রজ্ঞা তথা নৈতিক বোধই মানুষ ও পশুর মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য করে। মুতাযিলাদের মতে সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে এ প্রজ্ঞা বা নৈতিক চেতনা না থাকতে পারে কিন্তু সুস্থ ও প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের মধ্যে সহজাতভাবেই প্রজ্ঞা রয়েছে। যার মধ্যে প্রজ্ঞা বিকশিত হয় নি সে যেন প্রাপ্ত বয়স্কই হয় নি। প্রজ্ঞার মাধ্যমে আবিস্কৃত নৈতিক বোধের দুটি দিক রয়েছে। একটি হচ্ছে এ চেতনা লাভ করা যে, নৈতিক মূল্যবোধ বাস্তবায়িত করা মানুষ হিসেবে আবশ্যিক। এটি এক ধরনের আদেশ। এটি কান্টের শর্তহীন আদেশের মত।[১৯৩]

লক্ষ্য করার মত, কান্টের প্রায় আটশ বছর আগে মুতাযিলা চিন্তাবিদগণ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার যৌক্তিক পরিণতিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, নৈতিক বিধান এক ধরনের আদেশ স্বরূপ। অপরটি হচ্ছে, নৈতিকতার এ আদেশ প্রতিপালন করা মানুষের ইচ্ছাধীন। যদিও এ আদেশ তার নিজস্ব প্রকৃতির অনুকূল এবং স্বর্গীয় ইচ্ছার প্রতিফলন; কিন্তু এ নৈতিক নিয়ম বাস্তবায়নের জন্য তাকে কেউ জোর করবে না। সে ইচ্ছা করলে এ নিয়ম পালন করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে তা লংঘনও করতে পারে। যুক্তির দাবি ও ইচ্ছার স্বাতন্ত্রের এ দ্বিমুখী দিকই পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বাণীতে ঘোষণা করা হয়েছে। পূর্ণজ্ঞানের অভাবে এবং প্রসঙ্গ বিবেচনা না করার কারণে অনেক সময় তাদের পরস্পরবিরোধী বলে মনে হয়। এজন্য পবিত্র কুরআন ও হাদীসে যেখানে মানুষের বিভিন্ন দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে, সেখানে মানুষকে স্বাধীন কর্তা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, যখন মানুষের নৈতিক দিক ও বিশ্বপ্রকৃতির অন্যান্য জিনিসের কথা বলা হয়েছে, তখন আল্লাহ পাকের অনন্ত শক্তিময়তা, সার্বভৌমত্ব, একচ্ছত্র আধিপত্য ও অনড় নিয়মের উল্লেখ করা হয়েছে।

মুতাযিলারা মানুষের আত্মার প্রচণ্ড ক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তারা মনে করতেন মানুষের সুস্থ আত্মার এত ক্ষমতা যে, মানুষ ওহী ছাড়াই আল্লাহ সম্বন্ধে আবশ্যিক জ্ঞান লাভ করতে পারে। আবশ্যিক জ্ঞান বলতে তাঁরা আল্লাহর অস্তিত্ব এবং পরম শুভত্বের ধারণা বোঝাতেন। প্রজ্ঞায় প্রাপ্ত মৌলিক ও আবশ্যিক এ জ্ঞানকে ওহী আরো স্পষ্ট, দীর্ঘ ও বিস্তৃত করতে পারে।[১৯৪] ওহীর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর আদেশের বিস্তৃত ব্যাখ্যা জানতে পারে। তবে মানুষের উচিত যুক্তির আলোকে এগুলো হৃদয়ঙ্গম করা। তা না হলে মানুষ প্রকৃত ধর্মকেও কেবল জন্মগত উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করবে এবং নির্বিচারভাবে প্রাধিকার গ্রহণ করা হলে তা আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণাকেও প্রচলিত বিশ্বাসে এবং ইসলাম সম্মত

---

[১৯১] W Leibniz, ***The Philosophical Writings of Leibniz,*** J M Dent & Sons Ltd. London – 1973, pp.183, 189-92

[১৯২] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ।

[১৯৩] Immanuel Kant, ***The Fundamental Principles of Metaphysic of Ethics,*** Appleton Cntury Crofts Inc. New York – 1938, pp.29-31, 33, 37-38

[১৯৪] George F. Hourani, ***Islamic Rotionalosm,*** Clarendon Press, Oxford, 1971, pp.24-26

Dhaka University Institutional Repository

আচরণকে লোকাচার ও বংশগত প্রথায় রূপান্তরিত করে ফেলবে। আর সেক্ষেত্রে ধর্মীয় আদেশ পালন হবে আকস্মিক, অসচেতন, অভ্যাসগত অনুকরণ মাত্র। এরূপ নির্বিচার গ্রহণ ইসলাম পদবাচ্য হতে পারে না এবং এ ক্ষেত্রে বংশগত মুসলমান ও বংশগত অমুসলমানের মধ্যে কোন প্রকৃত পার্থক্য থাকতে পারে না। বরং এ ধরনের নির্বিচার বিশ্বাস ও অনুসৃতির কারণে একজনকে জান্নাতে ও অপরজনকে জাহান্নামে দেয়া স্বর্গীয় ন্যায়বিচারের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। অন্যকথায়, একজনের জন্মগত ভাবে মুসলমান হওয়া এবং কোন প্রকার সচেতন প্রয়াস ছাড়াই উত্তরাধিকার সূত্রে যে কতগুলো বিশ্বাস ও আচার লালন করে স্বর্গীয় বিধানের সাথে যার বাহ্যিক ও আকারগত সাদৃশ্য থাকার কারণে সে জান্নাতবাসী হবে। অথচ এ পরিণতির জন্য তার আত্মার কোন সচেতন প্রয়াস নেই। প্রজ্ঞার সাহায্যে স্বাধীনভাবে সে এ পথ অবলম্বন করে নি। অপরদিকে, অন্য একজনের ইসলামী বিধান ও আচরণের উত্তরাধিকার নেই, সে মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে নি এবং প্রজ্ঞার সঠিক প্রয়োগ দ্বারা জ্ঞান অর্জন করে নি। সাধারণ মুসলমানের মতানুসারে তার স্থান হবে জাহান্নামে। তার নিজস্ব ধর্মমত বা জীবনাচারের আন্তরিক অনুসৃতি এ ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন সংঘটিত করবে না। কিন্তু মুতাযিলারা মনে করেন, কেবল জন্মগতভাবে মুসলমান হওয়ার জন্য একজন জান্নাতে যাবে এবং ঠিক একই কারণে অপর একজন অমুসলমান হওয়ার কারণে জাহান্নামে যাবে এটা হতে পারে না। কারণ তাহলে জন্ম নামক ঘটনাটিই কারো কারো জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়ার মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এটি জানা কথা যে, কোন বিশেষ পরিবারে, বংশে, দেশে বা যুগে জন্মগ্রহণ করা কারো আয়ত্বাধীন বিষয় নয়। এর কারণ স্বয়ং আল্লাহ। সুতরাং জন্মগত কারণে একের উপর অন্যের কোন শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে না। শ্রেষ্ঠত্ব নিজস্ব ইচ্ছা ও কর্মশক্তির যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। বস্তুত শ্রেষ্ঠত্বের সত্যিকার মানদণ্ড হল আল্লাহর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি উপলব্ধি করা এবং সচেতনভাবে তাঁর আদেশ পালন করা ও নিষেধ থেকে বিরত থাকা। এটাকে কুরআন মাজীদে ইহসান ও তাকওয়া বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে – "আল্লাহ তাদেরই সাথে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা মুহসিন বা সৎকর্মপরায়ণ।"[১৯৫] আরো বলা হয়েছে – "হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"[১৯৬]

এভাবে যুক্তি দিয়ে মুতাযিলারা দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, আল্লাহ পরম প্রজ্ঞাবান ও ন্যায়বিচারক, তাই তাঁর নিজের কাজের জন্য তিনি মানুষকে দায়ী করে শাস্তি দিতে পারেন না। এটি স্বর্গীয় ন্যায় বিচারের ধারণার পরিপন্থী। সুতরাং জন্মগত কারণে পুরস্কার বা শাস্তি হতে পারে না। শাস্তি বা পুরস্কারের কারণ ভিন্ন কিছু এবং তা অবশ্যই মানুষের ক্ষমতাধীন। আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে, মুতাযিলারা বিশ্বাস করেন যে, কেবল প্রজ্ঞার যথার্থ প্রয়োগ দিয়েই মানুষ আবশ্যকীয় নৈতিক মূল্যবোধ তথা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং জীবনাচার সম্পর্কীয় তাঁর মৌলিক বিধান জানতে পারে যা মুক্তির অপরিহার্য শর্ত। সুতরাং উল্লিখিত ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই জাহান্নামে শাস্তির যোগ্য, কারণ সে তার প্রজ্ঞার যথার্থ ব্যবহার দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও পরম মূল্যের সন্ধান লাভ করে সে অনুসারে জীবন যাপন করে নি। ঠিক একই কারণে দ্বিতীয় ব্যক্তিও শাস্তির যোগ্য। কেবল বাহ্যিক আচরণের সাদৃশ্যের জন্য তার মুক্তি হতে পারে না।

মানবাত্মার ক্ষমতায় মুতাযিলাদের অত্যধিক বিশ্বাস তাদের সাধারণ মানুষের হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার প্রকৃত অবস্থা হতে অনেক দূরে নিয়ে যায়। বিশেষ করে ওহীর প্রয়োজনীয়তাকে ছোটো করে দেখা ও মানুষের আখিরাতের মুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বাসের চেয়ে যুক্তির প্রাধান্যের জন্য তারা সাধারণ মুসলমান ও আলিম সমাজের দ্বারা ভীষণভাবে সমালোচিত হন। তাদের যুক্তি অনুসারে তাদের মতো কিছু সংখ্যক বুদ্ধিবাদী ছাড়া বৃহত্তর মুসলিম জনসাধারণ এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। মুক্তির প্রশস্ত রাজপথ তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে আসে। তাদের যুক্তি থেকে এমন মনে হয় যেন জন্মগত একজন মুসলমানকে বয়ঃপ্রাপ্তির পর প্রথমেই সন্দেহবাদী হয়ে সবকিছু সন্দেহ করতে শুরু করা উচিত।

---

[১৯৫] আল কুরআন / ১৬ : ১২৮

[১৯৬] আল কুরআন / ৪৯ : ১৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

বিখ্যাত চিন্তাবিদ আল গাযালী ও ইবন হাযাম ঈমানের ক্ষেত্রে তাদের এ ধরনের সন্দেহবাদী পদ্ধতির ঢালাও প্রয়োগের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

মুতাযিলাদের এ ধরনের মতের বিরুদ্ধে সাধারণ মুসলিমদের অভিমত হল, ওহীর সাহায্য ছাড়া কেবল নিজস্ব ক্ষমতায় মানবাত্মা পরম সত্যের সন্ধান পেতে পারে না। তা হলে আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণের এ বিস্তৃত ধারা চালু করতেন না। যেমন ইরশাদ হয়েছে – "প্রত্যেক জাতির জন্য আছে একজন রাসূল এবং যখন তাদের রাসূল এসেছে তখন ন্যায়বিচারের সাথে তাদের মীমাংসা করা হয়েছে এবং তাদের প্রতি যুলম করা হয় নি।"[১৯৭]

এমনও নয় যে, এটি কেবল বিস্তৃত জ্ঞান দেয়ার জন্য, যেহেতু মুতাযিলাদের মতে মুক্তির জন্য আবশ্যিক জ্ঞানের জন্য তো নবী প্রেরণের প্রয়োজনই নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, তাদের মতে নবী প্রেরণের আল্লাহ তাআলার এই সচেতন প্রয়াস কেবল একটি অনাবশ্যক গৌণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। অথচ আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন, যে কোন জাতিকে সতর্ক করা বা সঠিক পথের হিদায়াত দেয়া ছাড়া কাউকে তিনি শাস্তি দেন না। যেমন তিনি বলেন – "যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং কেউ কারো ভার বহন করবে না। আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকেও শাস্তি দেই না।"[১৯৮]

সাধারণত প্রজ্ঞা প্রয়োগের তিন রকম ফল দেখা দেয়। প্রথম হল, প্রজ্ঞা প্রয়োগের দ্বারা সত্যিকারার্থেই যথার্থ জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, প্রজ্ঞার প্রয়োগ সত্ত্বেও যথার্থ সত্যের সন্ধান না পাওয়া। প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওয়ায় ব্যর্থতা কয়েক প্রকারের হতে পারে এবং নাস্তিক্যবাদ বা অন্য কোন ইসলাম বিরোধী মতবাদে আস্থা স্থাপনের মাধ্যমে সে প্রয়াসের সমাপ্তি ঘটতে পারে। তৃতীয়ত, শেষ পর্যন্তও সন্দেহবাদী থেকে যাওয়া, কোনে ক্রমেই, কোন সদর্থক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারা। এখন প্রশ্ন হল, যদি জন্মগত একজন মুসলিম সন্দেহ করতে আরম্ভ করে উল্লিখিত তিন অবস্থার শেষের দু অবস্থার কোন একটি অবস্থার শিকার হলে তার পরিণতি কী হবে? এ জন্য কী সাধারণ মানুষের পক্ষে যুক্তি প্রয়োগের এই বিপদ সঙ্কুল পথে না গিয়ে সরলভাবে বিশ্বাস করা ভাল নয়? মানবাত্মার ক্ষমতার উপর নির্বিচারভাবে মাত্রাতিরিক্ত বিশ্বাস পরিশেষে মুতাযিলাদের একটি চরমপন্থী মতবাদে পরিণত করে।

মানবাত্মার পক্ষে ওহীর সাহায্য ছাড়াই পরম নৈতিক জ্ঞান লাভ এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার দাবি মুতাযিলাদের আর একটি জটিল অবস্থার সম্মুখীন করে। তা হল মানুষের মধ্যে যে অনুভূতি ও আবেগের দিকটি আছে যেটি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার দিকে মানুষকে প্রলুব্ধ করে এবং বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার প্রয়োগ করার মত নিরস, ক্লান্তিকর ও কঠোর পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে – সেটি যে প্রজ্ঞার ওপর বিজয়ী হয়ে তাকে নৈতিকতার পরিবর্তে অনৈতিকতা ও ইন্দ্রিয় সেবার দিকে নিয়ে যাবে না তার কী নিশ্চয়তা আছে। এ প্রশ্নের উত্তরকে কেন্দ্র করে মুতাযিলাদের মধ্যে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়। বিখ্যাত মুতাযিলা চিন্তাবিদ আল জুবাঈ এর অভিমত হল, যুক্তিকে এ জন্য যুক্তি বলা হয় যাতে করে মানুষ নিজেকে সংযত করতে পারে। পশু, পাগল বা শিশুরা আবেগের বশে চলে, তারা নিজেদের সংযত করতে পারে না। বস্তুত যুক্তি বা আকল কথাটি উকাল শব্দ থেকে এসেছে। আর আরবিতে উকাল বলা হয় উটের লাগামকে যার দ্বারা অনাকাঙ্ক্ষিত কোন দিকে যাওয়া থেকে উটের গতিকে ফেরানো সম্ভব হয়।[১৯৯]

মুতাযিলাদের মতে, প্রজ্ঞার বিপরীতে রয়েছে পাগলামী। একমাত্র পাগলই যা খুশী তা করতে পারে। তার আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বলে কিছু নেই। কিন্তু একজন সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ যুক্তির নিয়ম মানতে বাধ্য। আগেই উল্লেখ করেছি এ বাধ্যতা আইনের বাধ্যতা নয়, এটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বাধ্যতা। নৈতিক বিধান জানার পরও মানুষ যদি তা ইচ্ছা করে লংঘন করে, তাহলে তার সে বিধান জানা না জানারই শামিল। আধুনিক নীতিশাস্ত্রের অন্যতম আবিষ্কার যে নৈতিক অবধারণ স্বাধীন ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে হতে হবে সে সম্বন্ধে মুতাযিলারা গভীরভাবে সচেতন ছিলেন। কর্তার যদি

---

[১৯৭] আল কুরআন / ১০ : ৪৭

[১৯৮] আল কুরআন / ১৭ : ১৫

[১৯৯] আবুল হাসান আল আশআরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮০

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীন ইচ্ছা না থাকে অথবা যে কাজ করলে তার প্রশংসা এবং বিরত না থাকলে তার নিন্দা করা বা তাকে শাস্তি দেয়া হবে সে কাজ করার বা তা থেকে বিরত থাকার ক্ষমতাই যদি তার না থাকে তাহলে তা হবে স্ববিরোধী। কারো নির্দেশিত কোন কাজ করার ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও যিনি তেমন কোন কাজের আদেশ করেন তিনি বুদ্ধিমান হতে পারেন না এবং সে কাজ সম্পাদিত না হলে সে ব্যক্তিকে যদি কেউ শাস্তি দেন তাহলে তাকে অত্যাচারী ও খেয়ালী বলা ছাড়া উপায় থাকে না। মুতাযিলারা এ যুক্তিকেই আল্লাহর বিধান ও বিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। তারা এ যুক্তির আলোকে দাবি করেন যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা অস্বীকার সংক্রান্ত জাবরিয়াদের মতবাদ ভুল।[২০০]

তারা বলেন, আল্লাহ মানুষকে অনেকগুলো কাজ করার জন্য এবং আরো কতগুলো কাজ না করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। মানুষের পক্ষে এ সকল আদেশ পালন করার ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে এমন আদেশ দেয়া নির্বুদ্ধিতার শামিল। আল্লাহ তাআলা মহাপ্রজ্ঞাবান। তিনি এমন নির্বুদ্ধিতার কাজ করবেন না। সুতরাং মানুষের নিশ্চয়ই আল্লাহর আদেশ প্রতিপালন করার ক্ষমতা আছে।

তাছাড়া আল্লাহ তাঁর আদেশ পালন করলে পুরস্কার এবং অমান্য করলে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও যদি আল্লাহ মানুষকে শাস্তি দেন তাহলে তিনি যালিম হবেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যালিম নন। তিনি পরম ন্যায়বিচারক। সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতা আছে। মানুষের কর্ম প্রকাশিত হয় তার বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে। কর্ম সম্পাদন করার আগে মানুষ কর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা পোষণ করে। অন্তরে এ ইচ্ছা পোষণ, নৈতিক নিয়ম উপলব্ধি এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তার বাস্তবায়ন আত্মার কাজ। আত্মার দৃঢ় ইচ্ছা ছাড়া মানুষ কোন কাজ করতে পারে না বা কোন কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে না। মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আত্মার ইচ্ছাশক্তি প্রকাশের হাতিয়ার বিশেষ। আত্মা ব্যতিত এগুলো অচল, নিস্প্রাণ। এ জন্য আত্মাহীণ দেহ মৃত – সকল কর্মক্ষমতারহিত। লাশ বা মৃতদেহের বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিকই থাকে, কিন্তু আত্মার অবর্তমানে সেগুলো কোন কাজেরই থাকে না। এমন কি আত্মাহীন দেহ নিজের পচনক্রিয়া রোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এখানে লক্ষণীয় যে, আত্মার এ ব্যাখ্যা হুদায়েল আল্লাফ ও নাজ্জাম আত্মা হতে স্বতন্ত্র যে জীবনী শক্তির কথা বলেছেন তার সাথে বিরোধপূর্ণ। কারণ এখানে কেবল আত্মা ও দেহের কথা বলা হচ্ছে, মধ্যবর্তী অন্য কিছুর যেমন জীবনীশক্তি– অস্তিত্ব বা সম্ভাবনা অস্বীকার করা হচ্ছে। অবশ্য আত্মার সক্রিয় ইচ্ছাশক্তি এবং দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সে ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার কর্মশক্তিকে বিশ্বাস মুতাযিলা দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

প্রজ্ঞা ও ইন্দ্রিয়ের পরস্পরবিরোধী দাবির সঙ্গতিবিধান মুতাযিলা দর্শনের অন্যতম জটিল সমস্যা। প্রথম দিকের মুতাযিলাদের মতে, আল্লাহ সম্পর্কে মানুষের ধারণা হতে উদ্ভূত ভীতি তাকে ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন হতে বিরত রেখে প্রজ্ঞা নির্দেশিত সৎ ও কল্যাণধর্মী পথে পরিচালিত করবে। কিন্তু এটি যৌগিক দিক দিয়ে সম্ভব হলেও বাস্তবে অধিকাংশ সময়ই আমরা ইন্দ্রিয়ের কাছে প্রজ্ঞা ও বিবেকের পরাজয় লক্ষ্য করি। বাস্তবে এ ধরনের ব্যাখ্যার দুর্বলতা লক্ষ্য করে পরবর্তীকালীন মুতাযিলারা এটা স্বীকার করেন যে, ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনে বা অন্যকোন কারণে ভীত হয়ে জ্ঞানী মানুষও অন্যায় করতে পারে, সত্য গোপন করতে পারে এমনকি সত্যের প্রকৃত রূপ তার কাছে ধরা নাও পড়তে পারে। এভাবে পরবর্তীকালে মুতাযিলারা প্রজ্ঞার ক্ষমতা সম্পর্কীয় তাদের মূল দাবি হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েন।

ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি মানুষকে নৈতিক ও আদর্শের পথ হতে বিচ্যুত করতে পারে জানা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা কেন মানবাত্মার বিশুদ্ধ উপাদান প্রজ্ঞার সাথে ইন্দ্রিয় ও অনুভূতিকে মিশ্রিত করে দিয়েছেন এ প্রশ্নের উত্তরকে কেন্দ্র করেও মুতাযিলাদের মধ্যে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয়। একদলের মতে, কেবলমাত্র প্রজ্ঞাই বিশুদ্ধ আত্মার আবশ্যিক গুণ বা উপাদান; ইন্দ্রিয়ানুভূতি আত্মা দেহের সাথে জড়িত হওয়ার পর উন্মেষিত হয়। সুতরাং দেহের চাহিদাই ইন্দ্রিয়ানুভূতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অবশ্য শুধু দেহ নিস্প্রাণ হওয়ার জন্য এ ধরনের কোন লক্ষণ দেখা যায় না; আত্মার সহযোগেই বিপরীত প্রকৃতির এ ইন্দ্রিয়ানুভূতি মানবাত্মায় আপতিকভাবে অনুপ্রবেশ করে।

---

[২০০] W M Watt, ***The Formative Period of Islamic Thought,*** Edinburgh University press, 1973, pp.235-36

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

অপরদলের মতে, সৃষ্টিগতভাবেই মানবাত্মার মধ্যে বিপরীতমুখী এ প্রবণতা বর্তমান। তাঁদের মতে এ বিপরীতধর্মী প্রকৃতিই আসলে মানবাত্মার স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের মূলীভূত কারণ। পরস্পরবিরোধী এ প্রবণতা না থাকলে নৈতিকতার, ভাল মন্দের, শুভ অশুভের কোন পার্থক্য থাকে না। কে স্বাধীন ইচ্ছায় আল্লাহর অনুগত এবং অস্বীকারকারী বিদ্রোহী তা প্রমাণেরও কোন যৌক্তিক ভিত্তি থাকে না। এ জন্য ফেরেশতাদের নৈতিকতার কোন প্রশ্ন নেই, কারণ তাদের কোন কামনা নেই, নেই আল্লাহর আদেশের বিপরীতে কিছু করার স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্ষমতা। অপরদিকে, মানুষের অন্তঃস্থিত প্রজ্ঞা ও ইন্দ্রিয়ের দ্বন্দ্বের সময় আল্লাহ যদি হস্তক্ষেপ করতেন তাহলে মানুষের কাজ নৈতিক হত না, তা হত বাধ্যতামূলক। এ জন্য মানুষের কোন প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবিদার হয় তাহলে তা অবশ্যই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হতে হবে। সুতরাং আল্লাহ মানুষকে একদিকে ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতা দিয়েছেন, অপরদিকে এ উভয় ক্ষমতারই দ্বিমাত্রিক দিক রেখেছেন – তথা ভাল মন্দ ইচ্ছা করার এবং সে অনুসারে ভাল কিছু কাজ করার বা মন্দ কোন কাজ থেকে বিরত থাকার স্বাধীনতা দিয়েছেন। বস্তুত ইচ্ছা ও কর্মক্ষমতা না দিয়ে কোন কাজ করার আদেশ দেয়া স্ববিরোধিতার শামিল এবং এ অবস্থায় সে কাজ সংঘটিত হলে পুরস্কার দেয়া বা কাজ সংঘটিত না হলে শাস্তি দেয়া অযৌক্তিক।

সৎকর্ম ও নৈতিকতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ মুতাযিলাদের পাপপূণ্য তথা কর্মফলের ব্যাপারে অতিমাত্রায় আগ্রহী করে তোলে। ফলে স্বর্গীয় শাস্তি ও পুরস্কার তাদের আত্মা সম্পর্কীয় ধারণার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয় এবং কর্মের মূল উৎস ও শক্তি হিসেবে পাপপূণ্যের শাস্তি বা পুরস্কার প্রাপ্তির বিষয়টিও আত্মার উপর এসে বর্তায়। আর পরিপূর্ণ শাস্তি ভোগ বা পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য আখিরাতে আত্মার সাথে দেহের প্রয়োজনীয়তার কথাও তারা উপলব্ধি করেন। এটা তাদের মতে দৈহিক পুনরুত্থান হিসেবে কুরআন – হাদীসে বলা হয়েছে।[২০১]

দুনিয়ার জীবনে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মে হস্তক্ষেপ না করলেও আখিরাতে আল্লাহ তাআলা সুক্ষ্ম ন্যায়বিচার করবেন। যে সকল আত্মা দুনিয়াতে কামনা বাসনাকে অবদমিত করে সৎ ও নৈতিক জীবন যাপন করেছে তারা আখিরাতে জান্নাতে চিরসুখ ও আল্লাহর সন্তোষ লাভ করবে। অপরদিকে, আল্লাহতে বিশ্বাস না করে ইন্দ্রিয় সেবার মাধ্যমে যারা তাদের জীবন কাটিয়ে দেবে, নিজেদের আত্মাকে কলুষিত করার কারণে তারা চিরদিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

এ আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মুতাযিলা দার্শনিকগণ মানবাত্মার প্রকৃতি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোন সুসংহত মতবাদ উপস্থাপন করতে পারেন নি। বিভিন্ন দার্শনিক নানাভাবে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মূল ইসলামী ধারণার সাথে অন্যান্য দার্শনিক ঐতিহ্য মিশ্রিত হয়ে আত্মার সরল আধ্যাত্মিক ধারণা তার আদিরূপ হারিয়ে ফেলেছে। অধিকন্তু, মানবাত্মার মৌল প্রকৃতিকে কেবল প্রজ্ঞার সাথে সমীকরণের ফলে তারা এক জটিল তাত্ত্বিক সমস্যার সম্মুখীন হন, যার কারণে পরবর্তীতে এ ধারণা পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু পরবর্তী মুতাযিলা দার্শনিকগণও কোন সন্তোষজনক বিকল্প ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হন। তারা যদি উপলব্ধি করতেন যে, মানবাত্মার বিভিন্ন স্তর আছে এবং আত্মার প্রকৃতি ভেদে আত্মার প্রকৃতি ও ক্ষমতার বিস্তর পার্থক্য ঘটে তাহলে বোধ হয় মানবাত্মার পরিচয় দান ও স্বর্গীয় ন্যায়বিচার তথা স্বর্গীয় বিধানের সাথে তার সঙ্গতি বিধানের ক্ষেত্রে তাদের বিভ্রান্তিগুলো এড়ানো যেত।

গৌতম বুদ্ধ আত্মা বলতে কোন সত্তা, আধ্যাত্মিক দ্রব্য এমনকি কোন নীতি বা বৃত্তিও বুঝান নি। তাঁর কাছে আত্মা ছিল দেহের একটি ক্রিয়া বিশেষ এবং সময়ের পরিবর্ত নাম বিশেষ। তিনি বিশ্বাস ও প্রচার করতেন মানুষ নিজেই তার সুখ দুঃখের কারণ। মানবীয় ক্ষমতার প্রতি এই সুগভীর ও সুস্থির বিশ্বাসই তাকে প্রেরণা যুগিয়েছিল ঈশ্বরের স্থলে কর্মবাদ ও কর্মচক্রের ধারণাকে সংস্থাপিত করতে এবং কার্যকারণের নিগড়ে মানুষের নিয়তিকে বাধতে। ফলে অন্যান্য ধর্মের বিপরীত নামে যথার্থ মানুষ বলতে তিনি আত্মাকে বুঝান নি।[২০২]

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণ অনেকাংশে বুদ্ধের এই মত গ্রহণ করেছেন। স্বজ্ঞানে বা কাকতালীয়ভাবে তাদের মতের সাথে বুদ্ধের মতের সাদৃশ্যতা প্রমাণিত হয়েছে। আত্মার দেহাতিরিক্ত কোন অস্তিত্ব নেই এবং তা কোন সত্তা শ্রেণীর

---

[২০১] আব্দুর রহীম আল খাযূফ, *কিতাব আল ইনতিসার,* ক্যাথলিক প্রেস, বৈরুত, ১৯৫৭, পৃ.৩৭

[২০২] T. Stcherbatsky, *The Soul Theory of Buddhists,* Delhi, Varanshi, India, 1976, pp.79-80

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

জিনিস নয় বরং দেহের এক ধরনের ক্রিয়া বা ক্ষমতা বিশেষ – সাম্প্রতিক মনোদর্শনে দীর্ঘ বিস্মৃতির পর এ কথা আবারো যে ফিরে এসেছে তার নেপথ্যে বৌদ্ধিক চেতনার সক্রিয় উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায়। বর্তমান চিন্তায় আত্মার এ ধারণাটি ফিরে এসেছে বৈজ্ঞানিক তথ্যনির্ভর ও বিশ্লেষণী দর্শনের চমৎকার শব্দ ও পদ বিন্যাসে শক্তিশালী হয়ে। এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে মানুষের প্রকাশিত, অপ্রকাশিত এবং প্রকাশিতব্য সকল আচরণকে। ফলে তা হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং প্রায় অপ্রতিরোধ্য। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে রাইল মানুষের মনকে আচরণের সাথে মিলিয়ে দেখেছেন। অর্থাৎ তার মতে আচরণ দ্বারা মানসিক ক্রিয়া, প্রক্রিয়া, ঝোঁক বা ঘটনা জানা যায়। অবশ্য তিনি আচরণ বলতে কেবল প্রকাশিত আচরণই বুঝাননি বরং প্রকাশিতব্য আচরণও বুঝিয়েছেন। যেমন একখণ্ড কাঁচ সম্বন্ধে আমরা যখন বলি যে এটা ভঙ্গুর। তখন আমরা এটা বুঝাই না যে, কাঁচটি ভাঙ্গা। বরং আমাদের এ কথার অর্থ হল, কাঁচটির মধ্যে ভেঙ্গে যাওয়ার গুণ আছে। একে যদি মেঝেতে আছরে ফেলা হয় তাহলে এটি মচকে যাবে না বা উড়ে যাবে না বরং ভেঙে যাবে। এমনিভাবে আমরা যদি কারো সম্পর্কে বলি যে, সে ধূমপান করে তাহলে এর মানেও এ নয় যে, সে এখন ধূমপান করছে। বরং এর অর্থ হল তার ধূমপানের অভ্যাস আছে, যা বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রকাশ পায়। এভাবে আচরণ দিয়ে মানুষের মন ব্যাখ্যা করা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের একটি প্রক্রিয়া। এতে বলা হয়, আমরা আমাদের নিজের মনের ব্যাপারে তথা আত্মজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অন্য আর দশজন মানুষ থেকে কোন বিশেষ সুবিধা ভোগ করি না। অপর মানুষকে যেমন আমি তার প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য আচরণ দ্বারা বিচার করি, আমার নিজের বেলায়ও আমি ঠিক আমার প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য আচরণ ব্যবহার করে আমার মনকে জানি। বলা হয়েছে,

'..... Knowledge of what there is to be known about other people is restored to approximate parity with self-knowledge. The sorts of things that I can find out about myself are the same as the sorts of things that I can find about other people and the methods of finding them out are much the same'.[২০৩]

বৌদ্ধ দর্শনে অতীন্দ্রিয় ও স্থায়ী কোন আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করাকে বিভিন্নভাবে অপনোদন করার চেষ্টা করা হয়েছে। বুদ্ধ স্বয়ং চিরন্তন আত্মায় বিশ্বাস করাকে বোকাদের মত বলে উপহাস করেছেন। তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় তিনি এ সম্বন্ধে বলতে যেয়ে অনেক সময় অসহিষ্ণু ও বিরক্ত হয়ে উঠতেন। একটা প্রচণ্ড বিরোধিতা ও বিরূপতা তাঁর শব্দে প্রকাশ পেত। এ ধরনের চিরন্তন আত্মায় বিশ্বাস করাকে বৌদ্ধ দর্শনে 'ভ্রান্ত আত্মাবাদ' বলা হয়েছে।[২০৪] বৌদ্ধদর্শনের সামগ্রিক উদ্দেশ্যের সাথে তার আত্মা সম্পর্কিত মতবাদের অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য এবং সঙ্গতিপূর্ণ পরিণতি লক্ষ্য করে যথার্থই বলা হয়েছে – '.... how carefully and conscientiously this anti – substantialist position had been cherished and up-held.'[২০৫]

বুদ্ধ তার 'Ajatasermon, Bimbasara sermon' এ আমাদের sensation, consciousness, representation (perception), volition প্রভৃতি মানসিক ক্রিয়া, প্রক্রিয়া, ঘটনা এবং sight এর physical analysis করে দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন যে, এদের দ্বারা কোন substantial self প্রমাণিত হয় না।[২০৬]
এ প্রসঙ্গে Vasubandhu[২০৭] এবং Vatsiputriya এর পারস্পারিক আলোচনা উল্লেখ করা যায়। Vatsiputriya চিরন্তন আত্মার পক্ষে যুক্তি দিচ্ছিলেন। আর বসুবন্ধু তাকে দুধ, পানি ইত্যাদি বস্তুর উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা

---

[২০৩] Gilbert Ryle, *The Concept of Mind,* New York, tenth printing, 1968, p.155
[২০৪] T. Stcherbatsky, ibid, p.3
[২০৫] op.cit. p.25
[২০৬] op.cit. p p.25-27
[২০৭] খ্রিষ্টিয় পঞ্চম শতকের প্রখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক। তার Abhidharmakosa বৌদ্ধ দর্শনের একটি প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ। তিনি তার এ গ্রন্থে বৌদ্ধদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ সব মতবাদ বিশেষ করে Vaibhasika মতবাদের ব্যাখ্যা করেন। তার গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের পরিশিষ্টে তিনি 'Astamakosas Thanc Sambaddah Pudgalaviniscayah' নামে একটা অংশ সংযোজিত করেছেন। এ অংশটাতে আত্মার অনস্তিত্ব সম্পর্কে বৌদ্ধ মতবাদ নিয়ে আলোচনা রয়েছে। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে অধ্যাপক Thedore Stcherbatsky, The Soul Theory

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

করছিলেন যে, চিরন্তন আত্মার ধারণা ঠিক নয়। তিনি বলেছিলেন, আমরা কোনে জিনিসকে দুধ বলি বা দুধ কী? দুধের বিশেষ এক ধরনের স্বাদ আছে, রঙ আছে, স্পর্শকাতরতা আছে। আমরা এ ধরনের গুণবিশিষ্ট জিনিসকে দুধ নামে আখ্যায়িত করে থাকি। আমরা যখন দুধ দেখি বলে বলি তখন এর যে বিশেষ রঙ বা যখন স্বাদ নেই সেই বিশেষ স্বাদ একক বা বিচ্ছিন্নভাবে কিন্তু দুধ নয় বরং এদের সামগ্রিক ও সাধারণ নামই দুধ। ঠিক একই কথা আত্মার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন – ' .. just as milk and water are conventional names (for a set of independent elements) for some colours, (smell, taste and touch) taken together, so is the designation `Individual' but a common name for the different elements, which it is composed of'.[২০৮]

বসুবন্ধু তার বক্তব্যের স্বপক্ষে স্বয়ং বুদ্ধের উদ্ধৃতি পেশ করে ঠধঃংরঢ়ঃৎবুধ এর প্রশ্নের চূড়ান্ত ফায়সালা দেন। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে, যদি আত্মা চিরস্থায়ীই হবে তাহলে কেন তথাগত বুদ্ধ বলেছিলেন – 'neither the visible element is the self nor any other element, consciousness included.'[২০৯]

'আমার' 'আমি' 'আমার নিজের' 'আমি নিজে' প্রভৃতি শব্দ আমরা অনেক সময় আত্মার পরিবর্তে এবং আত্মার নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করি। সাধারণভাবে প্রচলিত এ ধরনের শব্দ থেকে মানুষ একটা আধ্যাত্মিক অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে প্রলুব্ধ হয়। বুদ্ধ এ ধরনের শব্দের ব্যবহার, তাদের ভাষাগত ত্রুটি এবং সংস্কার নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এর থেকে অস্তিত্বধর্মী কোন আত্মার অস্তিত্বে উপনীত হওয়াকে তিনি শিশুসুলভ বোকামী বলে মন্তব্য করেছেন।

গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছেন। তিনি খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্ধে উত্তর ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। জগতের দুঃখ যন্ত্রণা গৌতম গভীরভাবে অনুভব করেন। এ দুঃখ কষ্টের প্রকৃত তাৎপর্য কী তা জানার এবং তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার উপায় অন্বেষণের জন্য তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেন। তাঁর বিক্ষুব্ধ হৃদয় শান্তি লাভ করে তখন যখন তিনি বুঝতে পারেন জগত হল সম্পূর্ণ মায়া। এ মায়ার উৎপত্তি হয় তীব্র আবেগ ও কামনা বাসনা থেকে। অবশেষে তিনি এ পরিজ্ঞান লাভ করলেন যে, কামনা–বাসনাই সকল দুঃখের মূল। কাজেই দুঃখ কষ্টের হাত থেকে নিস্কৃতি লাভের পথ বা মুক্তির পথ হল সকল বাসনাকে দমন করা।

এ নব আবিস্কৃত পথ সকলের জন্য। যারাই এর শর্ত পালন করবে তারাই মুক্তিলাভ করবে। ধর্মীয় ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এখানে পাপ থেকে পরিত্রাণের কথা বলা হয় নি। দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণের চিন্তা করা হয়েছে মাত্র। যখন সকল আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা এমনকি বাঁচার আকাঙ্ক্ষাও লোপ পাবে তখনই মানুষ নির্বাণ লাভ করতে পারবে। নির্বাণ হল এক পরিপূর্ণ নিস্পৃহ শান্তির অবস্থা। আগুন যেমন জ্বালানীর অভাবে নিভে যায় তেমন আত্মচেতনার শিখাও কামনা–বাসনারূপ ইন্ধনের অভাবে নিভে যায়। প্রকৃতপক্ষে নির্বাণ মানে লয় নয়। আত্মার পরিসমাপ্তিও নয়। কারণ যা কখনো ছিলই না তার শেষ হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আত্মা সম্পর্কিত অনেক ধারণাই বুদ্ধদেব অস্বীকার করেছেন।
ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আত্মা দ্রব্য হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু বুদ্ধদেব তাও স্বীকার করেন নি। তার মতে, তথাকথিত আত্মা হল মায়া মাত্র। মানুষ কতগুলো কামনা – বাসনার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষ যা করে তার মধ্য দিয়েই মনুষ্যত্বের প্রকাশ লাভ হয়। কর্মযোগই প্রকৃত সত্য। মানুষ যেমন কাজ করে তেমনি সে ফল লাভ করে। তার কর্মের শেষ বর্তমান জন্মে নাও হতে পারে। যতক্ষণ বাসনার নিবৃত্তি না হয় ততক্ষণ জন্ম মৃত্যুর চক্রে মানুষ ঘুরতে থাকে। এমন কি মৃত্যুর পরও পুনর্জন্ম গ্রহণ করলে পরজন্মের কর্মফল ভোগ করতে হয়। সচেতনতা থাকলেই দুঃখ থাকবে। আত্মা না থাকলেও যতক্ষণ পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষা আবেগ ইত্যাদি আবেগ অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ পূনর্জন্মের নিরবিচ্ছিন্ন ধারাটি চলতেই থাকবে। চেতনার উপাদানগুলি মৃত্যুর পর আবার এসে একত্রিত হয়ে নতুন ব্যক্তির সৃষ্টি করবে এবং মানসিক

---

of the Buddists নামে এর ইংরেজি অনুবাদ করেন। পরে ১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লী ও বারানসী থেকে ভারতীয় বিদ্যা প্রকাশন এটাকে দ্বিতীয়বার প্রকাশ করে।

[২০৮] Thedore Stcherbatsky, ibid, p.20

[২০৯] op.cit. p.22

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

দিক থেকে ভূতপূর্ব আত্মার সাথে বর্তমান আত্মার ধারাবাহিকতা থাকবে। এভাবে মানুষকে দুঃখপূর্ণ অনন্ত জীবন লাভ করতে হতে পারে। প্রবৃত্তির নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত ভবচক্রে মানুষ ঘুরতেই থাকবে। এ হল বুদ্ধের সংসার সম্পর্কিত মতবাদ। আত্মার এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া। ঘুরে ফিরে আবার একই সংসারে ফিরে আসা। বুদ্ধ অবশ্য সকলের জন্য আশার বাণী নিয়ে এসেছিলেন। সকলের জন্য ভবচক্র থেকে নিস্কৃতি লাভের উপায় তিনি জানিয়েছেন। কামনা বাসনার অগ্নি নির্বাপিত হলেই মানুষের কাজ শেষ হয়ে যাবে। তখন সে নির্বাণ লাভ করতে পারবে।[২১০]

আত্মা সম্পর্কে গৌতম বুদ্ধের ধারণাটি নানা কারণে পরস্পর বিরোধী মতবাদে ও মন্তব্যে ক্লিষ্ট। আমাদের বিশ্বাস এ অবস্থা বুদ্ধের তৈরী নয়। বরং যারা তার মতের বিশ্লেষণ করেছেন, ব্যাখ্যা দিয়েছেন তারাই এমন পরস্পর বিরোধী অবস্থা তৈরী করেছেন। আত্মা সম্পর্কিত বৌদ্ধ দর্শনের চিন্তা বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়গুলো পাওয়া যায় সে গুলো অনেকটা এ রকম –

আত্মা কোন দ্রব্য নয়। মানুষের আত্মা নেই। যা আছে তা হল মায়া। মানুষের কামনা বাসনা আছে। কামনা বাসনা আছে বলেই মানুষ বেঁচে আছে। মানুষের দুঃখ আছে আর তার এই দুঃখের কারণ হল তার কামনা বাসনা। কামনা বাসনার অবসান ছাড়া মানুষের দুঃখের অবসান নেই। মানুষের দুঃখের অবসান না হলে তার মুক্তি নেই। সে চিরকাল এ সংসারে তার অবশিষ্ট কামনা পুরণ করার জন্য ফিরে ফিরে আসবে। কামনা বাসনার নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত বারবার ফিরে ফিরে আসার এ ধারা কখনোই বন্ধ হবে না।

এ বিশ্লেষণে আবেগ, কামনা, দুঃখ প্রভৃতি এমন কিছু চেতনার কথা বলা হয়েছে কোনভাবেই যাকে প্রদর্শন করা সম্ভব না। বরং এ হল এক ধরনের উপলব্ধি। শরীর এ ধরনের উপলব্ধি ধারণের যোগ্য নয়। কেননা অদৃশ্য–অস্পৃশ্য বিষয় ধারণ করার যোগ্যতা বা ক্ষমতা দেহের নেই। স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায় তা ধারণের যোগ্য কোন কিছু মানুষ অবশ্যই বহন করে। এবং তা যে তার আত্মা তাতে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই প্রকাশ্য বক্তব্যে বৌদ্ধ ধর্মে আত্মাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করে মানুষের আধ্যাত্মিকতার বিষয়টি উপেক্ষা করা হলেও প্রকৃত বিবেচনায় তা আরো মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বস্তুত আধ্যাত্মিকতার উপস্থিতির জন্যই দুঃখ আর নির্বাণ লাভের প্রসঙ্গটি সক্রিয় থাকছে। তা না হলে বৌদ্ধ ধর্মের মূল শিক্ষা কাঠামোটিই মূল্যহীন ও ভঙ্গুর বলে প্রতীয়মান হবে।

বিশ্বজনীন ধর্মসমূহের মধ্যে খৃষ্টধর্ম অন্যতম। অনুসারীর সংখ্যা বিবেচনায় এটি পৃথিবীর বৃহত্তম ধর্ম। হাস্টন স্মিথ বলেন – 'মানুষের সব ধর্মের মধ্যে খৃষ্টধর্মই সবচেয়ে সুদূর প্রসারী এবং তারাই সবচেয়ে বেশি অনুসারী। আজকের দিনে প্রতি তিনজনে একজন খৃষ্টান।

খৃষ্টানদের ধর্ম বিশ্বাসই খৃষ্টধর্ম নামে পরিচিত। 'এ ধর্ম হল ইয়াহুদী ধর্মমতের উপর ভিত্তি করে খৃষ্টের দ্বারা প্রবর্তিত একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম, যে ধর্মে খৃষ্টকে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ বলে গণ্য করা হয়েছে , যে ধর্মে খৃষ্টের আত্মোৎসর্গমূলক মৃত্যুর দ্বারা মানবজাতির প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়েছে এবং যে ধর্ম তার ধর্মীয় এবং নৈতিক পরিসরের মধ্যে সমগ্র মানবজাতিকে অন্তর্ভূক্ত করেছে। এ ধর্ম খৃষ্টের জীবন ও বাণীকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কোন বাধাধরা নিয়ম বা বিধির উপর এ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত নয়। কাজেই মানবজাতির বিবর্তনের সাথে সাথে এ ধর্ম সহজেই সঙ্গতি সাধনে সক্ষম হয়েছে। মানবজাতির সভ্যতাকে সহজেই প্রভাবিত করতে পেরেছে। কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা বা আচার–ব্যবহার রীতিনীতির নিয়ন্ত্রণে এ ধর্ম বাধা পড়ে নি।

খৃষ্টধর্মে মানুষের অমঙ্গল স্বভাবত নৈতিক। এখানে দুঃখ কষ্ট অমঙ্গল নয়। অমঙ্গল হল পাপ। এ ধর্মে মোক্ষ নেতিবাচক। যেমন – 'রক্ত মাংসের সাথে কামনা বাসনাও ধ্বংসকর।[২১১] 'যদি কোন মানুষ আলোকে অনুসরণ করে, সে যেন নিজেকে অন্ধকার করে এবং নিজের ক্রুশ নিজেই গ্রহণ করে।[২১২] কিন্তু এ নেতিবাচক পদ্ধতির একটি সদর্থক উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন, এর ফলে আধ্যাত্মিক জীবন বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ হয়। 'যারা আমার জন্য জীবন দেবে তারা তা

---

[২১০] D. Miall Edwards, *The Philosophy of Religion,* West Bengal State Book Board, January 1989, pp. 107-108

[২১১] Galva. 24

[২১২] Mathis. 16 : 24

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করবে।[২১৩] 'তাদের যাতে জীবন থাকতে পারে, অনন্ত জীবন থাকতে পারে তার জন্যই আমি এসেছিলাম।[২১৪] জীবন ধারণ করতে অস্বীকার করার এটাই হল আদর্শ। অর্থাৎ আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে আত্মোপলব্ধি। কখনো কখনো দমন এবং কৃচ্ছতা সাধনের দিকটির প্রতি যে খৃষ্টধর্মে জোর দেয়া হয়েছে এ কথা সত্য এবং তার ফলে খৃষ্টধর্মের ইতিবাচক দিকটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু আমরা খৃষ্টধর্মের মূল আদর্শ ততক্ষণ উপলব্ধি করতে পারবো না যতক্ষণ না আমরা বুঝতে পারবো যে, খৃষ্টধর্মের আদর্শ মানুষের ইচ্ছাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া নয়। কেবল মানুষের ইচ্ছাকে পবিত্র ও নম্র করে তোলা। তার ফলেই মানুষ ঈশ্বরের রাজত্বে সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে। যীশুখৃষ্টের শিক্ষার প্রধান আদর্শই হল এই ঈশ্বরের রাজত্ব। এ বিষয়ে যত কথাই বলা হোক না কেন এটি মূলত একটি সামাজিক আদর্শ। এর অর্থ হল মানুষ তার জীবনে যেন সে ঈশ্বরের নীতিকে গ্রহণ করে। বুদ্ধের আদর্শ হল সংঘ। এটি একটি অদ্বৈত আদর্শ। এ আদর্শ ব্যক্তিগত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ পার্থক্যকে এভাবে চিহ্নিত করা যায় – 'বুদ্ধ এশিয়াকে শান্ত করে দিয়েছেন আর যীশু ইউরোপকে বিশালতর হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

যীশুখৃষ্টের শিক্ষায় ব্যক্তির সফলতা আর কর্মের পরিণতি একটি আধ্যাত্মিক জগতের কাছে সমর্পিত। যে জগতের অধিশ্বর হলেন ঈশ্বর। যাঁর পক্ষ থেকে মানুষের পরিত্রাতা হিসেবে যীশুখৃষ্ট পৃথিবীতে এসেছেন। কাজেই এ ধর্মে আধ্যাত্মিকতা একটি স্বতঃ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত বিষয়।

হিন্দু ধর্মের দুটি দিক – তত্ত্ব এবং সাধনা। এ ধর্মে শুধু তত্ত্ব আলোচনা করা হয় নি, বরং তত্ত্বের ভিত্তিতে সাধনার দ্বারা তত্ত্বের উপলব্ধির উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হিন্দুধর্ম সাধনার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। কেননা এ ধর্মের শিক্ষানুসারে একমাত্র প্রত্যক্ষানুভূতিতেই ঈশ্বরকে জানা যায়, তার জন্য প্রয়োজন কঠোর সাধনা। এ ধর্ম দু প্রকার – সামান্য ও বিশেষ। এখানে ধর্ম বলতে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্ম বোঝায়। নীতিসম্মত যে সব আচরণ মানুষের করণীয় সেগুলো সামান্য ধর্ম। হিন্দুশাস্ত্রমতে এ সামান্য ধর্মের দশটি লক্ষণ – ধৃতি, ক্ষমা, দম বা শীত, তাপ, সহিষ্ণুতা, অস্তেয় বা চুরি না করা, শৌচ বা দেহমনের নির্মলতা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ। এ সকল কর্ম সম্পাদনে চিত্তশুদ্ধি ঘটে। বিশেষ বিশেষ কালে বিশেষ বিশেষ মানুষের যে সব নীতিসম্মত করণীয় কর্ম সেগুলো হল বিশেষ ধর্ম।[২১৫]

হিন্দুধর্ম মতে ধর্ম সম্পর্কে সংশয় দেখা দিলে বেদ, স্মৃতি, সাধুগণের আচার ব্যবহার এবং বিবেকের অনুমোদনের উপরই নির্ভর করা যুক্তিযুক্ত। এ ধর্ম জীবন যাপনের জন্য উচ্চতর দুটি মার্গ অনুমোদন করে। একটি হল প্রবৃত্তিমার্গ এবং অপরটি নিবৃত্তিমার্গ। প্রথমটি ভোগের, দ্বিতীয়টি ত্যাগের পথ। মানবজীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে এ ধর্ম প্রবৃত্তিমার্গে তিনটি এবং নিবৃত্তিমার্গে একটি লক্ষ্য নিরূপণ করেছে। প্রবৃত্তিমার্গে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং নিবৃত্তিমার্গে মোক্ষ। গৃহাস্থাশ্রম প্রবৃত্তিমার্গ। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম নিবৃত্তিমার্গ। গৃহীর পুরুষার্থ ধর্ম, অর্থ ও কাম এবং সন্ন্যাসীর পুরুষার্থ মোক্ষ। হিন্দুধর্মের চরম লক্ষ্য মোক্ষ। হিন্দুধর্মে সুখই জীবনের চরম লক্ষ্য নয়।

হিন্দুধর্মে ক্ষর আত্মা অপেক্ষা উচ্চতর অক্ষর আত্মা বা অধি আত্মা আছে – এ তত্ত্বের নাম অধ্যাত্মবাদ।[২১৬] হিন্দুধর্মে ব্যক্তির আত্মাকে জীবাত্মা এবং ঈশ্বরকে পরমাত্মারূপে অভিহিত করা হয়েছে। জীবাত্মা পরমাত্মারই প্রকাশ তবু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। জীবাত্মা বলতে সাধারণত বোঝায় দেহধারী আত্মা। জীবাত্মা দেহের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলেও তা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন থেকে আলাদা। আত্মার সাথে দেহের ও মনের পার্থক্য হিন্দুধর্মে মৌলিক পার্থক্য। কাজেই হিন্দুধর্মে আত্মার দুটি রূপের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। অবভাসিক আত্মা ও প্রকৃত আত্মা অর্থাৎ আত্মার বাহ্যরূপ ও আত্মার যথার্থ স্বরূপ। উপনিষদে 'আত্মানাং বিদ্ধি' – আত্মাকে জান বলে যে উপদেশ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে আত্মার স্বরূপকে জানার বিষয়ই বলা হয়েছে।

---

[২১৩] Mathis. 16 : 25

[২১৪] John. 10 : 10

[২১৫] প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *ধর্মদর্শন*, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ১৯৮৯, পৃ.৪৪৫-৪৬

[২১৬] প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬৩

Dhaka University Institutional Repository

আত্মার বাহ্য স্বরূপকে তিন ভাবে জানা যেতে পারে – শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক। জীবাত্মার তিনটি শরীর – স্থূল, সুক্ষ্ম ও কারণ শরীর। এ তিন শরীর পঞ্চ কোষে বিভক্ত – অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষ। মূল শরীর মাতাপিতার কাছ থেকে প্রাপ্ত এবং ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম – এ পাঁচটি ভৌতিক উপাদানের দ্বারা গঠিত। খাদ্যের দ্বারা এর পরিপুষ্টি সাধিত হয় বলে একে আত্মার অন্নময় কোষ বলে অভিহিত করা হয়। জীবাত্মার জাগতিক বস্তুর অভিজ্ঞতা ও ভোগ এ শরীরের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। সুস্থ শরীরকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা যায় না। একে লিঙ্গ শরীরও বলা হয় কারণ আত্মার অস্তিত্ব অনুমানের পক্ষে এটি লিঙ্গ বা চিহ্নের কাজ করে। এ সুক্ষ্ম শরীর ১৭টি উপাদানে গঠিত। এগুলো হল – মন, বুদ্ধি, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি বায়ু। এটি প্রাণময়, মনোময় এবং বিজ্ঞানময় কোষের সমষ্টি। বুদ্ধি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাথে মিলিত হয়ে বিজ্ঞানময় কোষ নামে অভিহিত হয়। মন পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সাথে মিলিত হয়ে মনোময় কোষ এবং পঞ্চপ্রাণ পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সাথে মিলিত হয়ে প্রাণময় কোষ নামে অভিহিত হয়। মৃত্যুতে স্থূল শরীর বিনষ্ট হয়, কিন্তু আত্মা সুক্ষ্ম শরীরকে তার সঙ্গে নিয়ে যায় এবং অতীত কর্মানুসারে নতুন দেহ পরিগ্রহ করে। আত্মা কোন দেহ পরিগ্রহ করবে তা নির্ভর করবে তার অতীত কামনা, বাসনা, চিন্তা ও কাজের উপর, যেগুলো সুক্ষ্ম শরীরে সংরক্ষিত থাকে। তৃতীয় শরীর হল কারণ শরীর। এটি থেকেই স্থূল এবং সুক্ষ্ম শরীরের উদ্ভব এবং তাতেই লীন হয়। কারণ শরীরে কেবলমাত্র আনন্দময় কোষ। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে স্থূল শরীর যেমন অচেতন, সুক্ষ্ম শরীর, কারণ শরীরও তেমনি অচেতন। গভীর ঘুমে স্থূল ও সুক্ষ্ম শরীর কারণ শরীরে লয় প্রাপ্ত হয় বলে একে লয়স্থানও বলা হয়। জীবাত্মা যখন তার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে তখন এসব শরীরকে পরিহার করে। আত্মা একটি অজড় দ্রব্য। চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা আত্মার গুণরূপে আত্মার অন্তর্ভূক্ত। চেতনার চারটি স্তর আছে – বিশ্ব, তৈজস, প্রজ্ঞা এবং তুরীর।

আত্মা তিন প্রকার। এগুলো হল – নিত্য আত্মা, মুক্ত এবং বদ্ধ আত্মা। প্রথম ধরনের আত্মা হল যারা কখনো বদ্ধ ছিল না। যারা চিরমুক্ত। যেমন নারদ, প্রহ্লাদ প্রমুখ। দ্বিতীয় ধরনের আত্মা হল যারা একসময় বদ্ধ ছিলেন কিন্তু এখন মুক্ত যেমন জনক, বশিষ্ঠ। তৃতীয় ধরনের আত্মা হল এ জগতের সাধারণ মানুষ, যারা বদ্ধ। এরা জন্ম – মৃত্যুচক্রে পরিক্রমণ করছেন এবং আত্মার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করে একদিন মোক্ষ লাভ করছেন।

আত্মার যথাযথ স্বরূপের আলোচনায় আগেই বলা হয়েছে, হিন্দুধর্মে আত্মা, দেহ ও মন ইন্দ্রিয় থেকে স্বতন্ত্র। দেহ ও ইন্দ্রিয়ের পরিবর্তন সত্ত্বেও আত্মার স্বরূপের কোন পরিবর্তন হয় না। গভীর নিদ্রাবস্থায় মানুষের মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ক্রিয়া থেকে বিরত হয়। কিন্তু চেতন সত্তারূপে আত্মার অস্তিত্ব তখনো থাকে। আত্মা চেতন প্রক্রিয়ার সমষ্টি নয় বা চেতনার প্রবাহ নয়। আত্মা হল এক শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়, আত্মসচেতন, অবিনাশী, আধ্যাত্মিক সত্তা। তুরীয় অবস্থায় জীবাত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হয়। এটি হল সমাধির অবস্থা যা যোগসাধনার মাধ্যমে লাভ করা যায়। এ অবস্থায় দেহ, ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি কোন কাজ করে না। এ অবস্থায় কোন বাহ্যবস্তু বা আভ্যন্তরীন মানসিক প্রক্রিয়ায় চেতনা থাকে না। কিন্তু এ অবস্থা অচেতন অবস্থা নয় বরং এক প্রশান্তির অবস্থা। এ অবস্থায় আত্মা নিজ স্বরূপে অর্থাৎ শুদ্ধ চেতনারূপে অবস্থান করে। অজ্ঞতাবশতঃ জীব দেহ, মন বা ইন্দ্রিয়কেই আত্মা বলে ভুল করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা শাশ্বত, অবিনাশী এবং অপরিবর্তনীয়। আত্মা শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নিত্য। গীতায় বলা হয়েছে – 'যে আত্মাকে হন্তা বলে জানে এবং তাকে হত বলে মনে করে তারা উভয়েই আত্মতত্ত্ব জানে না। ইনি হত্যা করেন না, হত হনও না।'[২১৭] আত্মা নিত্য, অবিনাশী, অপ্রমেয় বা স্বপ্রকাশ। আত্মা শুদ্ধ চেতনা।

আত্মার এ অবিনাশী চেতনা আর বিশ্বাসের কারণেই হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করে যে জীবের মৃত্যুর পর জীব পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। এ ধর্মে পুনর্জন্মকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কিন্তু সকল ব্যাখ্যাই মৃত্যু পরবর্তী জীবনের অনুকূলে। পুনর্জন্মের অর্থ হল জীবের মৃত্যুর পর আত্মার পুনরায় নতুন দেহ ধারণ করা। যদিও বহু ধর্ম পুনর্জন্মে বিশ্বাসী তবু একমাত্র হিন্দু ধর্মেই এ জন্মান্তরবাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। আত্মার নতুন দেহ ধারণের মূলে রয়েছে আত্মা যে এক শাশ্বত সত্তা, এই ধারণা। বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যদিয়েও আত্মা এক অবিনাশী সত্তা – এ বিশ্বাস না থাকলে জীবের পুনর্জন্মের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সে কারণে হিন্দু জড়বাদী দার্শনিকরা কোন শাশ্বত আত্মার অস্তিত্বে, মৃত্যু পরবর্তী জীবনে এবং আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে না। হিন্দুধর্মে জীবাত্মা এক অপরিবর্তনীয়

[২১৭] শ্রীমদ্ভগবত গীতা ২/২০ : ৯৫

Dhaka University Institutional Repository

সত্তা, যার প্রকৃতি হল ঐশ্বরিক। যেমন আগুন থেকে নির্গত আগুনের ফুলকি আগুনের সাথে অভিন্ন তেমনি যে জীবাত্মা ঈশ্বরের পরমাত্মা থেকে উদ্ভূত তাও ঈশ্বরের সাথে অভিন্ন। জীবাত্মার এ প্রকৃতি স্বীকার করে নিলেই জীবাত্মার জন্মান্তর গ্রহণ ও জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে যে বিবর্তন চলে তার বিবর্তনকে সমর্থন করা চলে। আত্মা নিত্য, শাশ্বত সত্তা হওয়াতে আত্মার জন্ম ও মৃত্যুকে যথাক্রমে সম্পূর্ণ নতুন প্রারম্ভ বা পরিপূর্ণ বিনাশরূপে গ্রহণ করা চলে না বরং জীবাত্মার পুনর্জন্ম অর্থে নতুন দেহ ধারণ এবং মৃত্যু অর্থে জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করা বোঝায়। গীতায় বলা হয়েছে – 'যেমন মানুষ জীর্ণ কাপড় ত্যাগ করে নতুন কাপড় গ্রহণ করে তেমনি আত্মা জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর পরিগ্রহ করে।[২১৮]

আত্মার শাশ্বত প্রকৃতি যেমন জীবের জন্মান্তর গ্রহণ সম্ভব করে তোলে, ঈশ্বরের সঙ্গে জীবাত্মার অভিন্নতা জন্মান্তর গ্রহণের বিষয়টিকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। বেদে, উপনিষদে এবং ভগবতগীতায় বলা হয়েছে যে, জীবাত্মা স্বরূপত ঈশ্বরের সাথে অভিন্ন। কিন্তু জাগতিক বস্তুর প্রতি আসক্তি বশতঃই আত্মাকে দেহ ধারণ করতে হয়। জীবের একাধিক জন্মগ্রহণের কারণ হল ভোগাকাঙ্ক্ষা। গীতায় বলা হয়েছে – 'পুরুষ প্রকৃতির সংসর্গবশতঃ প্রকৃতির গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের ধর্ম সুখ, দুঃখ, মোহাদিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েন এবং আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি কর্তা, আমার কর্ম ইত্যাদি অভিমান করতঃ কর্মনাশে আবদ্ধ হন। এ সকল কর্ম ফলভোগের জন্য তাকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হয়। সুতরাং এ প্রকৃতির সংসর্গ থেকে মুক্ত হতে না পারলে তার জন্মকর্মের বন্ধন থেকে নিস্তার নেই।

আত্মা পরমাত্মা থেকে ভিন্ন এবং দেহ–মন–সংগঠনের সঙ্গে অভিন্ন – এ ভুল ধারণার জন্যই আত্মার পুনঃ পুনঃ দেহধারণ। জীবাত্মা তার যথাযথ স্বরূপ সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয় সত্য কিন্তু জীবাত্মার ঐশ্বরিক প্রকৃতি লুপ্ত হয় না এবং জীবাত্মাকে তার সুপ্ত ঐশ্বরিক প্রকৃতিকে লাভ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। জীব পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণের মধ্য দিয়ে তার লক্ষ্য লাভ করার দিকে চালিত হয়। অর্থাৎ জীবের সাথে তার ঐশ্বরিক প্রকৃতিতে লাভ করার দিকে চালিত হয়। অর্থাৎ জীবের সঙ্গে তার ঐশ্বরিক প্রকৃতির তাদাত্মের উপলব্ধি এ লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত জীবনের পুনর্জন্মের নিরোধ ঘটে না। বস্তুত এ ধারণাই পুনর্জন্মের বিষয়টিকে তাৎপর্যময় করে তোলে। সকল বদ্ধ জীবই এই পুনর্জন্মের অধীন। কাজেই পুনর্জন্ম কোন রহস্যময় অদৃষ্টের খেয়াল খুশির ব্যাপার নয়, এক ঐশ্বরিক পরিকল্পনার বা জগতের নৈতিক শৃংখলার অংশ স্বরূপ।

এভাবে পৃথিবীর প্রধান সকল ধর্মে অভিন্নভাবে মানুষের আত্মা এবং একটি স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিকতার অস্তিত্ব সবসময়ই স্বীকার করা হয়েছে। বলা যায়, এই স্বীকৃতির ভিত্তিতেই ধর্মগুলোর ধারণা, বিশ্বাস, অনুধ্যান, রীতিনীত, আচার–ব্যবহার, জীবন দর্শন প্রভৃতির গতিপথ নির্ধারিত হয়েছে। তবে ধর্মসমূহের অনুসারীদের ব্যাখ্যায় কখনো কখনো এ বিষয়টি অতিরঞ্জিত হয়েছে, কখনো কখনো বিকৃত হয়ে মূল বিষয় থেকে তা এতটাই দূরে সরে গিয়েছে যে, তার বর্তমান রূপটি দেখে এখন অনুমান করাও কঠিন যে, আসলে এর মূল বা আসল প্রকৃতিটি কেমন ছিল!

---

[২১৮] শ্রীমদ্ভগবত গীতা ২/২২

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় :
আল কুরআনে আধ্যাত্মিকতা

- ভূমিকা
- আল কুরআন পরিচিতি
- কুরআনী আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন দিক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা আল্লাহর সৃষ্ট জগতের সেরা সৃষ্টি। দুনিয়াতে মানুষ আল্লাহ তাআলার খলীফা বা প্রতিনিধি (Vice-gerent)। ইরশাদ হয়েছে – "তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। তোমার প্রতিপালক তো শাস্তি প্রদানে দ্রুত আর তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়াময়।"[২১৯]

"তিনি তোমাদেরকে দুনিয়াতে খলীফা করেছেন। তাই কেউ কুফরী করলে এ জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কাফিরদের কুফরী কেবল তাদের প্রতিপালকের ক্রোধই বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের কুফরী তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।"[২২০]

"হে দাউদ! আমি তোমাকে দুনিয়াতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল খুশির অনুসরণ কর না, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচারদিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে।"[২২১]

দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধ হিসেবে মানুষের দায়িত্ব আল্লাহর দেয়া বিধান মেনে চলা ও সে বিধান বাস্তবায়িত করা। ইরশাদ হয়েছে – "আমি সৃষ্টি করেছি জিন্ন এবং মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।"[২২২] মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর সময়ই আল্লাহ তাঁর নীতি অনুসরণ ও বিধান বাস্তবায়নের জন্যে হিদায়াত প্রদানের আশ্বাস দিয়েছিলেন। ইরশাদ হয়েছে – "আমি (আল্লাহ) বললাম, তোমরা সকলেই এ স্থান হতে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা কুফরী করে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারা আগুনের অধিবাসী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে।"[২২৩]

মানুষের দুনিয়ার জীবন শুরু করার পর আল্লাহ তাআলা তাঁর এ আশ্বাস সত্য করে তুলেছেন। আদম (আ) সে জন্যে প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবী। আল্লাহ তাআলা তাঁকে কিতাব দিয়েছেন যেন তিনি নিজেকে ও নিজের সন্তানদের হিদায়াতের আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে পারেন। ক্রমে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। আনুপাতিক হাতে বেড়েছে সমস্যা। প্রবৃত্তির তাড়নায়, শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ বিপথগামী হয়েছে। প্রিয়সৃষ্টির পথভ্রষ্টতায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ব্যথিত হন। তাদের সঠিক পথ দেখানোর জন্যে যুগে যুগে প্রেরণ করেন অসংখ্য নবী-রাসূল। নবী-রাসূলগণ পৃথিবীতে আল্লাহর মূর্তমান রহমত। তাঁরা মানুষের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেন। আল্লাহ তাঁর নবী-রাসূলদের নিকট নাযিল করেন কিতাব। আদম (আ) এর মাধ্যমে এ ক্রমধারা সূচিত হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা) এ ধারা সমাপ্ত করেন। মানব জাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন যুগে নবী-রাসূলগণের নিকট যেসব কিতাব নাযিল করেন তার মধ্যে আল-কুরআন সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ।

ইসলামের সকল আদর্শ, উদ্দেশ্য, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা, হুকুম আহকাম, জীবন দর্শন, জ্ঞান বিজ্ঞান, গবেষণা, দৈনন্দিন জীবন যাপন থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রভৃতি সকল কিছুর উৎস হল মহগ্রন্থ আল কুরআন। এ কিতাবই ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। কুরআন মাজীদ আল্লাহর কালাম হিসেবে আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গে যে বক্তব্য পেশ করেছে স্বাভাবিক কারণেই তা চিরন্তন, শাশ্বত এবং সত্য। মানুষ তা বুঝতে পারুক বা না পারুক – তাতে এর সত্যতা বিঘ্নিত বা ব্যাহত হবে না। বরং এর বিপরীতে পেশকৃত সকল মতবাদই ভ্রান্ত বিবেচিত হবে।

---

[২১৯] আল কুরআন / ৬ : ১৬৫
[২২০] আল কুরআন / ৩৫ : ৩৯
[২২১] আল কুরআন / ৩৮ : ২৬
[২২২] আল কুরআন / ৫১ : ৫৬
[২২৩] আল কুরআন / ২ : ৩৮–৩৯

Dhaka University Institutional Repository

আল কুরআন পরিচিতি

আল কুরআন আল্লাহর কালাম।[২২৪] জিব্রাঈল (আ) এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি এ কালাম নাযিল করেছেন।[২২৫] এর রচনাশৈলী ও বিষয়বিন্যাস স্বতন্ত্র। এর প্রকাশরীতি, ব্যঞ্জনা, অভিব্যক্তি ও আবেদন অনুপম। এর ভাষা অননুকরণীয়। এ গ্রন্থ বিষয়ভিত্তিক ধ্যান-ধারণায় বিরচিত নয়। বক্তব্য উপস্থাপনা ও বিষয়বৈচিত্র্যের কারণে কুরআন অনবদ্য বিশিষ্টতা পেয়েছে।

আল কুরআন আগত-অনাগত সকল মানুষের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। ইরশাদ হয়েছে – "সেদিন আমি উত্থিত করব প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তাদেরই মধ্য হতে তাদের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী এবং তোমাকে আমি আনবো সাক্ষীরূপে এদের বিষয়ে। আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম।"[২২৬]

"ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব আর নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখি উড়ে না কিন্তু তারা তো তোমাদের মত এক একটি উম্মত। কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেই নি; অতঃপর নিজ প্রতিপালকের দিকে তাদেরকে একত্র করা হবে।"[২২৭]

প্রকৃতই আল কুরআনে আছে মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের নির্দেশনা। এ মহাগ্রন্থে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য প্রযোজ্য সকল সমস্যা সমাধানের মূলনীতি পেশ করেছেন।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রথম ও প্রধান অলৌকিকতা হল এ গ্রন্থ নিজের সংশয়, সন্দেহ ও ত্রুটিহীনতার ঘোষণা দিয়েছে। সাধারণভাবে লেখা বইয়ের শুরুতেই মুদ্রণ বা অন্যান্য তথ্যজনিত ত্রুটির জন্যে ক্ষমা চাওয়া হয়। পরবর্তীতে দোষ-ত্রুটি দূর করার জন্যে সহৃদয় পাঠকের সহযোগিতা চাওয়া হয়। কিন্তু কুরআন ভাষণের শুরুতেই সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে – "আলিফ লাম মীম। এটি সে কিতাব; এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এটি পথনির্দেশ।"[২২৮] কুরআনের এ সংশয়হীনতা স্বাভাবিক কারণেই মানুষকে চিরায়ত সত্যের সংশয়হীন নির্দেশনা দিতে সক্ষম।

আল্লাহ তাআলা মানুষের হিদায়াতের জন্য যে সকল কিতাব নাযিল করেছেন সেই কিতাবসমূহের মধ্যে মর্যাদায় কুরআনই সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ বলেন – "যদি আমি এ কুরআন পর্বতের উপর নাযিল করতাম তবে তুমি তাকে আল্লাহর ভয়ে বিনীত এবং বিদীর্ণ দেখতে। আমি এ সমস্ত দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য যাতে তারা চিন্তা করে।"[২২৯] তিনি আরো বলেন – "নিশ্চয় এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। যারা পূত-পবিত্র তারা ছাড়া আর কেউ তা স্পর্শ করে না। এটা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ। তবুও কি তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করবে?"[২৩০]

আল-কুরআনের মর্যাদার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিলের মাস হিসেবে রামাদানকে মর্যাদাসম্পন্ন ঘোষণা দেন। কুরআন নাযিলের রাত পরিণত হয় হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ রাতে। ইরশাদ হয়েছে – "নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাতে; আর মহিমান্বিত রাত সম্বন্ধে তুমি কী জান? মহিমান্বিত রাত হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। সে রাতে ফেরেশতারা ও রূহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি, সে রাতে ভোরের আবির্ভাব পর্যন্ত।"[২৩১]

কুরআন মাজীদের এ উচ্চ মর্যাদার কারণে যে ব্যক্তি কুরআনের বিধি-বিধান মেনে চলবে এবং মানুষকে মানতে বলবে, আখিরাতে আল্লাহ তাআলার কাছেও তার মর্যাদা হবে অত্যন্ত বেশি।

---

[২২৪] আল কুরআন / ২ : ৭৫, ৭ : ১৫৮, ৯ : ৬, ১৮ : ১০৯, ৩১ : ২৭
[২২৫] আল কুরআন / ২৬ : ১৯২ – ৯৪, ৪২ : ৩, ৪৭ : ২
[২২৬] আল কুরআন / ১৬ : ৮৯
[২২৭] আল কুরআন / ৬ : ৩৮
[২২৮] আল কুরআন / ২ : ১-২
[২২৯] আল কুরআন / ৫৯ : ২১
[২৩০] আল কুরআন / ৫৬ : ৭৭-৮১
[২৩১] আল কুরআন / ৯৭ : ১-৫

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআন সর্বজনীন ও সর্বকালীন এক চিরন্তন সত্য মহাগ্রন্থ। এ গ্রন্থের সংশয়হীনতা ও অভ্রান্ত নির্দেশনা এতটাই সুনিশ্চিত ও অকাট্য যে তা সকল কালের ও সকল দেশের মানুষের জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ তাআলা এর সত্যতা খণ্ডনের সর্বাত্মক চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে বলেছেন – "আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা এর অনুরূপ কোন সূরা আন এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর। যদি তোমরা আনয়ন না কর এবং কখনোই তোমরা করতে পারবে না তাহলে সে আগুনকে ভয় কর যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, কাফিরদের জন্য যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।"[২৩২]

কুরআন তার সত্যতা প্রমাণের পক্ষে এ চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে রেখেছে আগত-অনাগত সকল মানুষ, কবি-সাহিত্যিক এবং সৃষ্টিশীল-মননশীল সকল মানুষের জন্য। কিন্তু কুরআন নাযিল পরবর্তী দেড় সহস্রাব্দের পরও এ চ্যালেঞ্জ মুকাবেলা করার মত কোন সংশয়বাদীকে আজো পাওয়া যায় নি। বলা যায় কেউ আজো এর মত করে কোন কিছু রচনা করার সাহস দেখাতে পারে নি। যা প্রমাণ করে, কুরআন কোন মানুষের রচনা নয়। বরং এ হল মানুষের ক্ষমতাতীত এক বিশেষ রচনা। যা কেবল মহান আল্লাহর পক্ষেই প্রণয়ন করা সম্ভব।

কুরআন মাজীদ নির্ভুল ভবিষ্যৎ বক্তা। এ মহাগ্রন্থ ভবিষ্যতের অজানা - অদৃশ্য এবং আপাত বিবেচনায় একেবারেই অসম্ভব অসংখ্য ঘটনা ও বিষয় সম্পর্কে নির্ভুল ভবিষ্যত বাণী প্রদান করেছে। মুসলিমদের মক্কা বিজয়, রোম বিজয়, মহানবী (সা) এর বিরুদ্ধে ইয়াহুদিদের ষড়যন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে কুরআন শতভাগ নিঁখুত ও অকাট্য ভবিষ্যদ্বাণী করে নিজের অলৌকিকত্বকে অবিসংবাদিত করে তুলেছে।

কুরআনকে বলা যায় একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ। আ'দ-সামুদ জাতি বা নমরুদ, ফিরআউন, কারূণ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা ধ্বংস করে দিয়েছেন, যাদের সম্পর্কে লিখিত বা প্রামাণ্য কোন যথার্থ তথ্য অবশিষ্ট নেই, কুরআন মাজীদ তাদের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরেছে। আল্লাহ বলেন – "তোমার নিকট কি পৌঁছেছে সেনাবাহিনীর খবর – ফিরআওন ও ছামূদের? তবু কাফিররা মিথ্যা আরোপ করায় রত; এবং আল্লাহ তাদের অলক্ষ্যে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন। বস্তুত এটা সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।"[২৩৩]

কুরআনে মানুষের উৎপত্তি, পৃথিবীতে আগমন, তাদের বিকাশ ও পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের জীবন, ধর্মপ্রচার, বাধা-বিঘ্ন ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর নিখুঁত বিবরণ এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবনাচার ও সমকালীন পৃথিবীর সর্বাধিক বিশ্বাস্য দলীল হল কুরআন মাজীদ। আল্লাহ বলেন – "আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট এ কুরআন প্রেরণ করে; যদিও এর আগে তুমি অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।"[২৩৪]

যে কোন সাহিত্যিক বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নে আল কুরআন হল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য। এ মহাগ্রন্থটি সম্পূর্ণ পদ্য কিংবা পুরোপুরি গদ্য নয়। বরং এ দুয়ের সংমিশ্রণে এক অভূতপূর্ব গ্রন্থ। শব্দচয়ন, উপমা নির্বাচন, শিল্পমান, ছন্দমূর্ছনা, রচনাশৈলী, অভিনব গ্রন্থনা, প্রাঞ্জল ভাষা, বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব কুরআনকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যে পরিণত করেছে। কুরআনকে অলংকারশাস্ত্রের এক বিশ্বকোষ বলা যায়। বাণী বিন্যাস, হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের শপথ কুরআনের সাহিত্যমানকে অকল্পনীয় উচ্চতায় সমাসীন করেছে।

আল কুরআন সকল ধরনের জ্ঞানের মূল উৎস। সবরকমের জাগতিক, বৈষয়িক ও ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূলনীতি, সূত্র এবং প্রেরণা এ মহাগ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। এ মহাগ্রন্থে ব্যাকরণ, আইন, আধ্যাত্মিক, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থ, রসায়ন, দর্শন, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, তর্কশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র, ফারাইয, নসিহত, বর্ষপঞ্জীসহ জীবনঘনিষ্ঠ সকল প্রয়োজনীয় জ্ঞানের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন -চিকিৎসা বিষয়ে আল্লাহ বলেন – "আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।"[২৩৫]

---

[২৩২] আল কুরআন / ২ : ২৩-২৪
[২৩৩] আল কুরআন / ৮৫ : ১৭-২২
[২৩৪] আল কুরআন / ১২ : ৩
[২৩৫] আল কুরআন / ১৭ : ৮২

Dhaka University Institutional Repository

মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে আছে – "আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। চাঁদের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল; অবশেষে তা শুকনো, বাকা, পুরোনো খেজুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে।"[২৩৬] এ জন্যে কুরআন মাজীদকে আল্লাহ বলেছেন - আল-হিকমা[২৩৭] বা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং আল-হাকীম[২৩৮] বা জ্ঞানগর্ভ, বিজ্ঞানময়।

কুরআন মাজীদ গবেষক-বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও আবিষ্কারের চিরন্তন প্রেরণা। কুরআন বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নেপথ্যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং জ্ঞানবান মানুষকে গবেষণা করার আদেশ প্রদান করে। যেমন ফ্রিজের ধারণাটি পাওয়া যায় উটের পানি জমা করে রাখা পদ্ধতির মধ্যে। আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে দৃষ্টিআকর্ষণ করে বলেন – "তবে কি তারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কীভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?"[২৩৯]
নিরন্তর গবেষণার নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেছেন – "অতএব হে চক্ষুষ্মান লোকেরা! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।"[২৪০]

কুরআন মাজীদ এক অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী দীনী দাওয়াত। মানুষের মনের উপর প্রভাব সৃষ্টি করা বা আল্লাহর ভয় ও ভালবাসা তৈরীতে কুরআন মাজীদের কার্যকারিতা এক কথায় অব্যর্থ। এ কারণেই আল-কুরআনের তিলাওয়াত ব্যক্তির হৃদয় প্রশান্ত ও তৃপ্ত করে। যতবার তিলাওয়াত করা হোক প্রতিবারই এর তিলাওয়াত ব্যক্তিকে নতুন চেতনায়, শ্রেয়তর কল্যাণ চিন্তায় উদ্দীপ্ত করে। বস্তুত আল্লাহর পক্ষ থেকে এ মহাগ্রন্থ শ্রেষ্ঠতম মুজিযা। এ জন্যে এর তিলাওয়াতে মানুষ আল্লাহর যিকরে নিমগ্ন হয়, তাঁর ধ্যানে তন্ময় হয়। আর – "যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।"[২৪১]

কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত ও শ্রবণ এর পাঠক বা শ্রোতাকে ক্লান্ত ও বিরক্ত করে না বরং তাদের হৃদয়ে এক অপার্থিব শান্তি ও তৃপ্তির ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে। উমর বিন খাত্তাব (রা) ছিলেন দুর্ধর্ষ কাফির। হযরত মুহাম্মদ (সা) কে হত্যা করাই তাঁর লক্ষ ছিল। কিন্তু নির্যাতিত বোন ফাতিমার কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুনে তিনি এতটাই বিগলিত হন যে, সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণের জন্য মহানবী (সা) এর নিকটে ছুটে যান।

কুরআন মাজীদের বিশেষত্ব হল এ মহাগ্রন্থখানি অতীত স্বর্গীয় গ্রন্থসমূহের সার-সংক্ষেপ। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) এর ওপর নাযিলকৃত কুরআন মাজীদই মানুষের জন্যে আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কালাম। এতে কেবল পরবর্তী মানুষের জন্যে নির্দেশনাই বিবৃত হয় নি বরং পূর্ববর্তী সকল কিতাবের মূলশিক্ষাও বর্ণনা করা হয়েছে। এ হল অতীত গ্রন্থসমূহের নিখুঁত ও নির্ভুল নির্যাস। আল্লাহ বলেন – "আলিফ লাম মীম, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা তার আগের কিতাবের সমর্থক। আর তিনি অবতীর্ণ করেছেন তাওরাত ও ইনজীল। ইতোপূর্বে মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য; আর তিনি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন। যারা আল্লাহর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রশালী, দণ্ডদাতা।"[২৪২]
এ ছাড়াও আল কুরআনের চারটি মৌলিক পরিচয় আছে। এটি আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল কিতাব, মানবজাতির জন্যে হিদায়াত, সত্যমিথ্যার পার্থক্যকারী এবং মুসলিম জাতির সংবিধান। মানুষের এমন কোন সমস্যা নেই যা সমাধানের মূলনীতি আল-কুরআন পেশ করে নি।

---

[২৩৬] আল কুরআন / ৩৬ : ৩৮–৪০
[২৩৭] আল কুরআন / ১৭: ৩৯
[২৩৮] আল কুরআন / ৩৬ : ১–২
[২৩৯] আল কুরআন / ৮৮ : ১৭
[২৪০] আল কুরআন / ৫৯ : ২
[২৪১] আল কুরআন / ১৩ : ২৮
[২৪২] আল কুরআন / ৩ : ১–৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনী আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন দিক

আল কুরআনে আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গে যে সকল বক্তব্য পেশ করা হয়েছে তাতে ইসলামী আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য এ মহাগ্রন্থ সরাসরি 'আধ্যাত্মিকতা' শিরোনাম ব্যবহার করে কোন বক্তব্য পেশ করে নি। বরং ইসলামের মূলনীতি, হুকুম আহকাম, জীবন দর্শন, সৃষ্টিতত্ত্ব, ইবাদত, ঈমান, আমল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করতে যেয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে এ বিষয়েও বিস্তারিত, বিস্তৃত এবং প্রয়োজনীয় আলোচনা উপস্থাপন করেছে। কুরআনী আলোচনার ধারা থেকেও ইসলামী আধ্যাত্মিকতার ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইসলামে বাহ্যিক সকল কাজের গভীরে যেমন আধ্যাত্মিকতার সক্রিয় উপস্থিতি – কুরআনেও বাহ্যিক বিধানসমূহ বর্ণনা ও বিধি নিষেধ আরোপের গভীরে আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ উল্লেখ করে সেগুলোর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে এখানে আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গে আল কুরআনের বিধান, ভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষিত হল।

এ বিশ্বলোকের দিকে তাকালে দুটি জিনিস পরিদৃষ্ট হয়। একটি হল সৃষ্ট বস্তু অন্যটি হল তাঁর স্রষ্টা।[২৪৩] স্রষ্টার অস্তিত্ব ও পরিচয় পাওয়ার ব্যাপারটা জটিল কোন বিষয় নয় বা এ জন্য কোন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিরও প্রয়োজন নেই।[২৪৪] বরং মানুষ তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মাধ্যমেই তাকে সহজে অনুধাবন করতে পারে। এবং এক সময় উপলব্ধি করতে পারে যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সব কিছুর স্রষ্টা, ঐ মহান আল্লাহ, যার মত আর কিছুই নেই।[২৪৫] তাঁর সম্পর্কে সাধারণ মানুষ যা ধারণা করে তিনি তাঁর অনেক উর্ধ্বে। তাঁর পর্যন্ত কোন মানুষের দৃষ্টি কখনো পৌছায় না। কিন্তু তিনি সব দেখেন। মহান আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের দলীল তার অগণিত সৃষ্টি বস্তুর মতই অগণিত। যেমন আসমান, যমীন, আরশ কুরসি, লাওহ, কলম, গাছপালা, তৃণলতা, পাহাড় পর্বত, নদ-নদী, সাগর, মহাসাগর – এক কথায় দৃশ্যমান ও অদৃশ্য যত কিছু এ মহাবিশ্বে রয়েছে তার সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন যে মহান আল্লাহ এবং তিনি স্ব অস্তিত্বে সর্বদা বিরাজমান এবং চিরঞ্জীব। এটা যখন মানুষ অনুধাবন করতে পারবে তখন তার পক্ষে এ কথা স্বীকার করতে কোন বাধা থাকবে না যে, তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্পর্কে সবসময় অবগত আছেন এবং তিনি দয়াময় ও পরম দয়ালু। তিনিই রাজা, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি ও নিরাপত্তাদাতা, তিনিই আশ্রয়দাতা, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অহঙ্কারের দাবিদার। মানুষ তার সাথে যাকে শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র। তিনি একাধারে স্রষ্টা, উদ্ভাবক, রূপদাতা। ফলে আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তাআলার এ প্রকৃতি ও পরিচয় ইসলামী আধ্যাত্মিকতার প্রথম, প্রধান এবং একমাত্র উৎস। এ থেকেই ইসলামের আধ্যাত্মিক ধারণা বিস্তৃত হয়েছে। গোপন, গভীর, নিবিড় এবং মানুষের একমাত্র অবলম্বন সুমহান সত্তা আল্লাহ তাআলাকে আবিষ্কার, তাঁর ভালবাসা লাভ এবং তাঁকে জানার জন্য মানুষ সাধনায় লিপ্ত হয়েছে। আল্লাহই সাধনার সে পথ ও পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন। আর এ ভাবে আল্লাহর দেখানো সে পথ ও পদ্ধতির আলোকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রূপায়িত হয়েছে ইসলামী আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত প্রতিকৃতি।

আল্লাহ শব্দটি মহাবিশ্বের একমাত্র মহান প্রতিপালক মহাপ্রভুর নাম। কেউ কেউ বলেন, এটাই الاسم الاعظم (ইসমি আযম)। কারণ আল্লাহ শব্দের মধ্যে সকল গুণের সমাবেশ ঘটেছে।[২৪৬] যেমন ইরশাদ হয়েছে – ' তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। তারা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, তাঁরই সকল উত্তম নাম। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[২৪৭]

---

[২৪৩] ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী, *আত তাওহীদ : চিন্তা ক্ষেত্রে ও জীবনে এর তাৎপর্য,* বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ.৯

[২৪৪] মওলানা এ এম এম সিরাজুল ইসলাম, *ঈমান পরিচিতি,* ইসলামিয়া কুতুব মহল, ঢাকা – ২০০১, পৃ.৩১

[২৪৫] সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *দীনীয়াত,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫, পৃ.১

[২৪৬] ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র), *তাফসীরে ইবনে কাছীর,* প্রথম খণ্ড, ইফাবা, মে ১৯৮৮, পৃ.৫৬

[২৪৭] আল কুরআন / ৫৯ : ২২-২৪

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা উল্লিখিত সকল গুণকে 'আল্লাহ' নামের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেখিয়েছেন। অনুরূপভাবে অন্যত্র বলেছেন – "আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সে সকল নামেই ডাকবে; যারা তাঁর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন করবে; তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেয়া হবে।"[২৪৮]
"বল, তোমরা আল্লাহ নামে আহ্বান কর বা রাহমান নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর সকল সুন্দর নামই তো তাঁর। সালাতে স্বর উচ্চ কর না এবং অতিশয় ক্ষীণও কর না; এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর।"[২৪৯]
"আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, সুন্দর সুন্দর নাম তাঁরই।"[২৫০]

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন – "আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তা আয়ত্ত করতে পারবে সে জান্নাতে যাবে।"[২৫১]
ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইবন মাজা কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়েতেও আল্লাহ তাআলার নামের সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য উভয় রিওয়ায়েতে নামের সংখ্যার বিষয়ে বিভিন্নতা রয়েছে। ইমাম রাযী নিজের তাফসীর গ্রন্থে জনৈক বর্ণনাকারী থেকে বর্ণনা করেন যে, "আল্লাহ তাআলার পাঁচহাজার নাম রয়েছে। এক হাজার নাম আল কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর ভেতরে, একহাজার নাম তাওরাত কিতাবে, একহাজার নাম ইঞ্জীল কিতাবে এবং একহাজার নাম যাবূর কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য এক হাজার নাম লওহ মাহফূযে লিখিত রয়েছে।"[২৫২]

আল্লাহ একটি অনন্য নাম। মহাবিশ্বে একক মহান প্রতিপালক প্রভু ভিন্ন অন্য কেউ উক্ত নামে অভিহিত নন। এ কারণেই আরবি ভাষায় এর সম–ধাতুজ কোন সমাপিকা ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয় না। তাই একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, এটি اسم جامد যা গঠনগত দিক দিয়ে একক শব্দ।
ইমাম কুরতুবী এ মতের সমর্থক বিপুল সংখ্যক বিশেষজ্ঞের নাম উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে ইমাম শাফিঈ, খাত্তাবী, ইমামুল হারামাইন, ইমাম গাযালী প্রমুখ সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ রয়েছেন।[২৫৩]

আল্লাহ শব্দের অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী বলেন – আল্লাহ শব্দটি ولـه শব্দ থেকে গঠিত হয়েছে। ولـه শব্দের অর্থ হল সে হয়রান পেরেশান হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শব্দমূল হল الوله অর্থাৎ হতবুদ্ধি হওয়া, বুদ্ধি বিভ্রাট ঘটা। যেমন – رجل واله ও امرأة ولهى او مولوهة অর্থ হল যথাক্রমে মরুপ্রান্তরে হতবুদ্ধি মহিলা ও পুরুষ। যেহেতু আল্লাহ তাআলা গুণাবলীর কুল কিনারা পাওয়ার বিষয়ে তিনি মানুষ ও তার চিন্তাকে হয়রান করে দেন, তাই তাঁর নাম আল্লাহ হয়েছে। উপরোক্ত বিশ্লেষণ অনুসারে আল্লাহ শব্দটির পূর্বের রূপের ওয়াও অক্ষরটি বিলুপ্ত করে তার স্থানে আলিফ বসানো হয়েছে।[২৫৪]

ইমাম রাযী বলেন, জগতে দু ধরনের মানুষ আছে। এক শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ তাআলার মারিফাত ও পরিচয়ের মহাসমুদ্রে পৌঁছে তথায় বিচরণ ও পরিভ্রমণ করে বেড়ান। তারা আল্লাহর নূর ও জ্যোতির জগতে মহাসুখে ঘুরে বেড়ান। আরেক শ্রেণীর লোক আল্লাহ তাআলার মারিফাত হতে বঞ্চিত থেকে বিভ্রান্তির অন্ধকারে হয়রান পেরেশান অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়। এ দু শ্রেণীর মানুষ আধ্যাত্মিক জগতের দু মেরুতে অবস্থান করলেও একটি বিষয়ে তাদের মধ্যে মিল ও সাদৃশ্য রয়েছে। তা হল, উভয় শ্রেণীই আধ্যাত্মিক জগতে ঘূর্ণায়মান ও পরিক্রমশীল রয়েছে। তবে এক শ্রেণীর সে পরিক্রমা ও ঘূর্ণন সুখকর আরেক শ্রেণীর জন্য তা দুঃখজনক। ইমাম রাযীর মতে, উপরোক্ত কারণে ولـه ক্রিয়া হতে আল্লাহ নামটি সৃষ্টি হওয়া যুক্তিযুক্ত।[২৫৫]

---

[২৪৮] আল কুরআন / ৭ : ১৮০
[২৪৯] আল কুরআন / ১৭ : ১১০
[২৫০] আল কুরআন / ২০ : ৮ .
[২৫১] মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, পূর্বোক্ত, কিতাবুত তাওহীদ।
[২৫২] ফখরুদ্দীন রাজী, *আত তাফসীর আল কবীর*, দার আল কুতুব, তেহরান, ১৪২০ হিজরি, পৃ.৫৪
[২৫৩] ইবনে কাছীর (র), প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮
[২৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯
[২৫৫] ফখরুদ্দীন রাজী, প্রাগুক্ত, পৃ.৬২

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মাজীদে ২৭৫১ বার ' আল্লাহ ' নামের উল্লেখ রয়েছে।[২৫৬] এ ছাড়াও মুফরদ ও মুরাক্কাব মিলে অনেকগুলো গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার এ নামসমূহ তাঁর আধ্যাত্মিক পরিচয় প্রকাশে সহায়ক বলে এখানে নামগুলো উল্লেখ করা হল।[২৫৭]

আল্লাহর নাম	*নামের অর্থ*	*কুরআনে উল্লেখ*
ইলাহ	ইলাহ বা উপাস্য	৮০ বার
রব	প্রভূ, প্রতিপালক	১০৭০ বার
রহমান	পরম দয়ালু	৫৭ বার
রাহীম	পরম দয়ালু	১২২ বার
মালিক	অধিপতি	৫ বার
আযীয	পরাক্রমশালী	৮৯ বার
খালিক	সৃষ্টিকর্তা	৮ বার
হাকীম	মহাপ্রজ্ঞাময়	৯৭ বার
হায়্য	চিরঞ্জীব	১৪ বার
কায়্যূম	যিনি অনাদি অনন্তকাল ধরে সৃষ্টির রক্ষক	৩ বার
বসীর	সর্বদ্রষ্টা	৫১ বার
নাসীর	মহাসাহায্যকারী	২৪ বার
খাবীর	সম্যক অবহিত	৪৫ বার
কবীর	সুমহান	৫ বার
কাদীর	মহাশক্তিশালী	৪৫ বার
কাহহার	প্রবল পরাক্রমশালী	৬ বার
গাফফার	মহাক্ষমাশীল	৫ বার
গাফূর	পরম ক্ষমাশীল	৯১ বার
সামী	সর্বশ্রোতা	৪৭ বার
আলীম	প্রজ্ঞাময়	১৬১ বার
হালীম	পরম সহনশীল	১৫ বার
হামীদ	প্রশংসিত	১৭ বার
শাহীদ	সাক্ষী	১৯ বার
রাকীব	তীক্ষ্নদৃষ্টি সম্পন্ন	৪ বার
আযীম	শ্রেষ্ঠ, বিরাট	১১ বার
লাতীফ	সূক্ষদর্শী	৭ বার
ওয়াকীল	কর্মবিধায়ক	১২ বার
হাফীয	রক্ষণাবেক্ষণকারী	৩ বার
ওয়াহীদ	এক	১৮ বার
আফুও	পাপমোচনকরী	৩ বার
রাউফ	পরম মমতাময়	১১ বার
ওয়াসিউ	সর্বব্যাপী	৯ বার
শাকূর	পরম গুণগ্রাহী	৪ বার

[২৫৬] ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুরআন পরিচিতি*, পৃ.৩০, নুরজাহা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, মে ১৯৯২
[২৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ.৩০–৩৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর নাম	নামের অর্থ	কুরআনে উল্লেখ
ওহহাব	মহাদাতা	৩ বার
তাওয়্যাব	পরম তওবা কবূলকারী	১১ বার
মুকতাদির	মহা ক্ষমতাধর	৪ বার
মুনতাকিমূন	কঠোর প্রতিশোধ গ্রহণকারী	৩ বার
কারীব	নিকটবর্তী	২ বার
কাহির	পরাক্রমশালী	২ বার
বারি	উদ্ভাবনকর্তা	২ বার
কুদ্দূস	পবিত্র	২ বার
কভী	মহাশক্তিমান	৯ বার
আলী	মহান	৯ বার
মাওলা	অভিভাবক	১৫ বার
অলী	বন্ধু	৩৫ বার
গণী	অভাবমুক্ত	২০ বার
ওয়াদূদ	প্রেমময়	২ বার
হাদী	পথপ্রদর্শক	২ বার
শাকির	গুণগ্রাহী	২ বার
মুখরিজ	ব্যক্তকারী	২ বার
আলা	সুমহান	৩ বার
সালাম	শান্তি	১ বার
মুমিন	নিরাপত্তাবিধানকর্তা	১ বার
মুহাইমিন	রক্ষাকর্তা	১ বার
জব্বার	প্রবল	১ বার
মুতাকাব্বির	অতীব মহিমান্বিত	১ বার
মুসাওয়ির	রূপদাতা	১ বার
আউয়্যাল	আদি	১ বার
আখির	অন্ত	১ বার
যাহির	ব্যক্ত	১ বার
বাতিন	গুপ্ত	১ বার
কারীম	মহান	১ বার
মাজীদ	পরম সম্মানিত	১ বার
মালিক	সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী	১ বার
মুজীব	উত্তরদাতা	১ বার
আহাদ	এক, অদ্বিতীয়	১ বার
সামাদ	অমুখাপেক্ষী, সকলে যাঁর মুখাপেক্ষী	১ বার
নূর	জ্যোতি	১ বার
আরহামুর রাহিমীন	শ্রেষ্ঠদয়ালু	৪ বার
মুসতায়ন	সহায়স্থল	১ বার
খায়রুর রাহিমীন	উত্তম দয়ালু	২ বার

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর নাম	নামের অর্থ	কুরআনে উল্লেখ
হক	সত্য	১ বার
বার	কৃপাময়	১ বার
খায়র	শ্রেয়	১ বার
আবকা	চিরস্থায়ী	১ বার
ওয়াল	অভিভাবক	১ বার
মুতায়াল	সর্বোচ্চ মর্যাদাবান	১ বার
ফাত্তাহ	শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী	১ বার
মুসিউন	মহাসম্প্রসারণকারী	১ বার
মতীন	পরাক্রান্ত	১ বার
রাযযাক	মহারিযক দাতা	১ বার
খায়রুল হাকিমীন	শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী	৩ বার
আহকামুল হাকিমীন	শ্রেষ্ঠ বিচারক	২ বার
জামিউন নাস	লোকদের সমাবেশকারী	১ বার
রাফীউদ দারাজাত	সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী	১ বার
মুহয়িল মওতা	মৃতকে জীবনদানকারী	২ বার
খায়রুল ওয়ারিছীন	চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী	১ বার
ফালিকুল ইসবাহ	উষার উন্মেষকারী	১ বার
খায়রুল গাফিরীন	শ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল	১ বার
গাফিরুয যানব	পাপ ক্ষমাকারী	১ বার
কাবিলুত তাওব	তওবা কবুলকারী	১ বার
শাদীদুল ইকাব	কঠোর শাস্তিদাতা	১৪ বার
যুত তাওল	মহাশক্তিধর	১ বার
আল্লামুল গুয়ূব	অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত	৪ বার
আলিমুল গায়িব	অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা	১ বার
শাদীদুল আযাব	শাস্তিদানে কঠোর	১ বার
শাদীদুল মিহাল	মহাশক্তিশালী	১ বার
যুল ফাদলিল আযীম	মহাঅনুগ্রহশীল	১৩ বার
যু ইনতিকাম	দণ্ডদাতা	৩ বার
যু রাহমাতিন	দয়ার আধার	৪ বার
যুল কুওয়্যা	শক্তির আধার	১ বার
যু ইকাবিন আলীম	যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদাতা	১ বার
যু মাগফিরাতিন	ক্ষমার আধার	২ বার
যুল আরশ	আরশ অধিপতি	১ বার
যুল কুওয়্যা	শক্তির আধার	১ বার
বাদীউস সামাওয়াত ওয়াল আরদ	আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে অস্তিত্বে আনয়ণকারী	২ বার
মুখরিজুল মায়্যিত মিনাল হায়্যি	জীবন্ত থেকে মৃতকে নির্গতকারী	১ বার
ফালিকুল হাব্বি ওয়ান নাওয়া	শস্য বীজ ও আঁটি উদগতকারী	১ বার
ফায়্যালুল লিমা ইউরিদ	ইচ্ছানুসারে কার্যসম্পাদনকারী	২ বার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর নাম	*নামের অর্থ*	*কুরআনে উল্লেখ*
আলিমুল গায়িব ওয়াশ শাহাদা	অদৃশ্য ও দৃশ্যের সম্যক পরিজ্ঞাত	১০ বার
আলিমু গায়িবিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ	আসমান ও যমীনের অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা	১ বার
ফাতিরুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ	আসমান যমীনের স্রষ্টা	৬ বার
যুল জালালি ওয়াল ইকরাম	মহামহিমময়, মহানুভব	২ বার

আল্লাহ তাআলার এ সকল নাম তাঁর সীমাহীন ক্ষমতা আর অপরিসীম করুণা প্রকাশ করে। পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টি মহান আল্লাহর এ অপরিসীম দয়ার অনেকগুলো কোন রকম কষ্ট ছাড়া অনায়াসেই লাভ করে থাকে। তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া ছাড়া কোন জীবের পক্ষেই মুহূর্তকালও বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আল্লাহর এ অনুগ্রহ ও করুণাধারায় স্নাত প্রতিটি সচেতন বিবেক সহজাত প্রবৃত্তিতেই তাঁর আধ্যাত্মিক উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাঁর সত্তা সম্পর্কিত এমনি ধারার আধ্যাত্মিকতার বিষয়টি নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে – "সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই, যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু, কর্মফল দিবসের মালিক।"[২৫৮]

ইমাম আবু জাফর ইবন জরীর বলেন – "আলহামদুলিল্লাহ বাক্যের তাৎপর্য হল এই যে, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। কারণ তিনি স্বীয় বান্দাগণকে অসংখ্য নিআমতে ও অবদানে বিভূষিত ও ধন্য করেছেন। তিনি তাঁর ইবাদতের জন্য এবং তাঁর আদেশ নিষেধ পালনের জন্য নিজ বান্দাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বৈকল্যহীন ও কার্যোপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাদের বিশ্বময় জীবিকা ছড়িয়ে রেখেছেন। তাঁর নিকট তাদের প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে অগণ্য ও অপরিমেয় সুখকর নিআমত ভোগ করাচ্ছেন। যে আলোকময় পথ চলাে মানুষ আখিরাতে চিরস্থায়ী সুখ ও আনন্দ লাভ করতে পারবে, নিজের কৃপাপরায়ণতার জন্য তিনি তাদেরকে সে পথ দেখিয়েছেন। এমন অজস্র নিআমত দিয়ে তিনি মানুষকে লালন পালন করছেন। তাঁর নিআমাতের সংখ্যা তিনি ছাড়া আর কেউ গুণে শেষ করতে পারে না। এসব নিআমত দানের ক্ষেত্রে তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর যে সকল সৃষ্টিকে মানুষ মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, তাদেরও সে ক্ষেত্রে কোন কর্তৃত্ব নেই বা কৃতিত্ব নেই। তেমনি মানুষ যাদেরকে মাবুদ বানায় নি তাদেরও তাতে কোন কৃতিত্ব নেই বা কর্তৃত্ব নেই। এ সব নিআমত শুধু একক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাগণের প্রতি প্রেরিত হয়েছে। তাই সকল প্রশংসা সকল সময়ে একমাত্র আল্লাহ তাআলারই প্রাপ্য।"[২৫৯]

আল কুরআনে বিবৃত আধ্যাত্মিক বক্তব্য – বিশ্লেষণের মূল সুরটি অত্যন্ত সংক্ষেপে এবং বিপুল তাৎপর্যময়তায় 'আল হামদু লিল্লাহ' এর মধ্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। "উমর (রা) বলেন, আমরা সুবহানাল্লাহ ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর তাৎপর্য জানি। কিন্তু আলহামদু লিল্লাহ' এর তাৎপর্য কী? এতে আলী (রা) বললেন, এটি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাঁর নিজের জন্য মনোনীত ও মনোপূত একটি বাক্য।"[২৬০]

আমরা যার নিকট প্রার্থনা করি, তাঁর প্রশংসা দ্বারা এ দুআ শুরু করা হয়েছে। এর দ্বারা এ শিক্ষাই দেয়া হয়েছে যে, সুষ্ঠু সুরুচিপূর্ণ ও সুসংস্কৃত পন্থায়ই প্রার্থনা করা বাঞ্ছনীয়। মুখ খুলেই নিজের দাবি ও উদ্দেশ্য পেশ করা সৌজন্য ও ভব্যতার পরিপন্থী। বরং যার কাছে প্রার্থনা করতে হবে, প্রথমে তাঁর প্রশংসা করে তাঁর সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা, তাঁর অনুগ্রহ ও উচ্চতর মর্যাদার কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করা ও পরে কোন কিছু দাবি করাই ভদ্রজনোচিত পথ। "প্রশংসা যারই করা হোক না কেনো – দুটি কারণেই তা করা হয়। প্রথমত তার নিজস্ব গুণ – বৈশিষ্ট্য এবং অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য থাকলে। তার এ গুণ বৈশিষ্ট্যের কিরূপ প্রভাব আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে সে কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। দ্বিতীয়ত, আমাদের প্রতি অনুগ্রাহক বলেই আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতার গভীর ভাবধারায় প্লাবিত হয়ে তাঁর সৌন্দর্য বর্ণনা করি। বস্তুত আল্লাহ তাআলার প্রশংসা এ উভয় দিক নিয়েই এবং উভয় কারণেই করতে হয়। আল্লাহর গুণ বৈশিষ্ট্য

---

[২৫৮] আল কুরআন / ১ : ১–৩

[২৫৯] ইবনে কাছীর (র), প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯

[২৬০] প্রাগুক্ত, পৃ.৭১

Dhaka University Institutional Repository

হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে এবং তাঁর অপরিসীম অনুগ্রহের গুরুত্ব অনুভব করলে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসায় পঞ্চমুখ না হয়ে পারা যায় না। উপরন্তু 'প্রশংসা আল্লাহর জন্য' এ শুধু এতটুকু কথাই সব নয় ; প্রকৃত কথা এই যে, যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য। এরূপ কথা দ্বারা এক বিরাট তত্ত্ব উদঘাটিত হয়েছে। এ তত্ত্ব এতই বলিষ্ঠ যে, এর প্রথম আঘাতেই সকল প্রকার সৃষ্টি পূজার মূলোৎপাটন হয়ে গিয়েছে। দুনিয়াতে যেখানেই যে জিনিসেই এবং যে অবস্থায়ই কোন না কোন সৌন্দর্য , বৈশিষ্ট্য ও গুণ বর্তমান আছে, আল্লাহর মহান সত্তাই হচ্ছে তার মূল উৎস। মানুষ, ফেরেশতা, দেবতা, গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতির যতটুকু গুণ বৈশিষ্ট্য আছে, তা কারো নিজস্ব নয়, বরং তা সবই একমাত্র আল্লাহ তাআলারই বিশেষ দান। কাজেই আমরা কৃতজ্ঞ, অনুগৃহীত, উপাসক, বিনীত এবং সেবক হতে পারি একমাত্র তাঁরই, যিনি এ সব গুণ-বৈশিষ্ট্য নিজ ক্ষমতায় সৃষ্টি করেছেন। যারা এ সব গুণের ধারক হয়ে আছে, তাদের প্রশংসা পাওয়ার কোন ই অধিকার নেই। আর আমরাও তা করতে পারি না।"[২৬১]

"আয়াতের 'রব' শব্দটি আরবি ভাষায় তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক – মালিক ও মনিব, দুই – মুরব্বি, প্রতিপালক, পর্যবেক্ষক ও সংরক্ষণকারী, তিন – শাসক, আইনদাতা, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। বস্তুত আল্লাহ তাআলা এ সকল দিক দিয়েই সমগ্র সৃষ্টিলোকের রব।"[২৬২]

আয়াতের রাহমান ও রাহীম শব্দদ্বয় আল্লাহর আধ্যাত্মিক সত্তার এক অপরিসীম তাৎপর্যময় প্রকাশ। কোন জিনিস অত্যধিক মনে হলে আধিক্যবোধক শব্দ দ্বারাই তার কথা বলা মানুষের সাধারণ রীতি। কোন বিষয়ে একটি আধিক্যবোধক শব্দ ব্যবহার করার পর তা যথেষ্ট হয় নি বলে মনে হলে তখন সে অভাব পূরণের জন্য সে সম্পর্কে অনুরূপ অর্থে আরো একটি শব্দ ব্যবহার করা হয়, এটাও একটি স্বাভাবিক নিয়ম। আল্লাহর প্রশংসা প্রসঙ্গে 'রহমান' শব্দ ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গেই রহীম শব্দের অতিরিক্ত প্রয়োগে এ তত্ত্বই নিহিত রয়েছে। রহমান আরবি ভাষায় আধিক্যবোধক শব্দ। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী মানব কূলের উপর এত বেশি, এত ব্যাপক এবং এত সীমা- সংখ্যাহীন যে, বড় বড় আধিক্যবোধক শব্দ প্রয়োগ করেও নিশ্চিত হওয়া যায় না। এ জন্যই তাঁর অসীমতা বুঝানোর জন্য রহীম শব্দও ব্যবহার করা হয়েছে। কারো কোন বিষয়ে অত্যধিক গুণ বুঝানোর জন্য আমরা যেমন সাধারণত একাধিক শব্দ একত্রে প্রয়োগ করে থাকি, এটাও তারই অনুরূপ।[২৬৩]

আয়াতে আল্লাহকে এমন একটি দিনের মালিক বলা হয়েছে, যে দিনের আদি হতে অন্ত পর্যন্ত সকল মানুষকে একত্রিত করে পৃথিবীর জীবনের সকল প্রকার কাজ কর্মের হিসাব গ্রহণ করা হবে। আল্লাহর প্রশংসা প্রসঙ্গে রহমান ও রহীম বলার পর বিচার দিনের মালিক বলায় একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ তাআলা কেবল অনুগ্রহকারী ও মেহেরবানই নন, তিনি সুবিচারকও। আর বিচারকও এমন অপ্রতিদ্বন্দ্বি ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন যে, শেষ বিচারের দিন সর্বময় ক্ষমতা ও সার্বভৌম কর্তৃত্বের মালিক নীতিগত ও বাস্তব উভয় দিক দিয়েই একমাত্র তিনিই হবেন। তাঁর প্রদত্ত শাস্তির চ্যালেঞ্জ করার কোন ক্ষমতাই কারো থাকবে না। তিনি কাউকেও পুরস্কৃত করতে চাইলে তাও কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। অতএব আল্লাহর লালন পালন, মালিকত্ব, অনুগ্রহের দরুন আমরা তাঁকে কেবল ভালই বাসবো না, তাঁর সুবিচারক হওয়ার জন্য তাঁকে ভয়ও করব। কারণ আমরা তীব্রভাবে অনুভব করছি যে, আমাদের পরিণামের ভাল মন্দ সম্পূর্ণ একান্তভাবে আল্লাহর কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে।[২৬৪]

আল্লাহ তাআলার মহান সত্তার প্রকৃতি ও স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর নিম্নোক্ত ঘোষণায়। এখানে তিনি তাঁর অমর, অক্ষয়, অব্যয়, অবিনশ্বর সত্তা সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান করেছেন, যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলার আধ্যাত্মিকতার শাশ্বত স্মারক। ইরশাদ হয়েছে – "ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর,অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমময়, মহানুভব; সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?"[২৬৫]

---

[২৬১] সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, *তাফহীমুল কুরআন,* প্রথম খণ্ড, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, জুলাই ১৯৮০, পৃ.৩০
[২৬২] প্রাগুক্ত
[২৬৩] প্রাগুক্ত
[২৬৪] প্রাগুক্ত পৃ.৩১
[২৬৫] আল কুরআন / ৫৫ : ২৬-২৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

এর অর্থ এই যে, ভূ পৃষ্ঠে যত জিন্ন ও মানব আছে, তারা সবাই ধ্বংসশীল। এ সূরায় জিন্ন ও মানবকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে তাদের প্রসঙ্গই উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জরুরী হয় না যে, আকাশ ও আকাশস্থিত সৃষ্ট বস্তু ধ্বংসশীল নয়। কেননা অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় সমগ্র সৃষ্টিজগতের ধ্বংসশীল হওয়ার বিষয়টিও ব্যক্ত করেছেন। প্রসিদ্ধ তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ এই যে, জিন্ন ও মানবসহ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল। অক্ষয় হয়ে থাকবে কেবল আল্লাহ তাআলার সত্তা।

ধ্বংসশীল হওয়ার অর্থ এরূপও হতে পারে যে, এসব বস্তু এখনো সত্তাগতভাবে ধ্বংসশীল। এগুলোর মধ্যে চিরস্থায়ী হওয়ার যোগ্যতাই নেই। আরেক অর্থ এমনও হতে পারে যে, কিয়ামাতের দিন এগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে।
কোন কোন তাফসীরবিদ 'ওয়াজহু রাব্বিকা'র তাফসীর এরূপ করেছেন যে, সমগ্র সৃষ্ট জগতের মধ্যে একমাত্র সে বস্তুই স্থায়ী যা আল্লাহ তাআলার দিকে আছে। এতে শামিল আছে আল্লাহ তাআলার সত্তার এবং মানুষের সেইসব কর্ম ও অবস্থা, যা আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর সারমর্ম এই যে – মানব, জিন্ন ও ফেরেশতারা যে কাজ আল্লাহ তাআলার জন্য করে সে কাজও চিরস্থায়ী, অক্ষয়। তা কোন সময় ধ্বংস হবে না।[২৬৬]

কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন – ما عندكم ينفدوما عند الله باقى অর্থাৎ তোমাদের কাছে যা কিছু অর্থ সম্পদ শক্তি-সামর্থ্য, সুখ-কষ্ট অথবা ভালবাসা ও শত্রুতা আছে, সব নিঃশেষ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর কাছে যা কিছু আছে, তা অবশিষ্ট থাকবে। আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত মানুষের যে সকল কর্ম ও অবস্থা আছে, সেগুলো ধ্বংস হবে না।[২৬৭]

هو الاول والاخر والظاهر والباطن ج وهو بكل شئ عليم –

তিনিই আদি, তিনিই অন্ত: তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।[২৬৮]
আলোচ্য আয়াতখানি সূরা হাদীদের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি আয়াত। আবূ দাউদ তিরমিযী ও নাসাঈর রিওয়ায়াতে ইরবায ইবন সারিয়া (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে সূরা হাদীদ, হাশর, ছফ, জুমুআ, তাগাবুন প্রভৃতি সূরা পাঠ করতেন। তিনি আরো বলেছেন যে, এসব সূরায় এমন একটি আয়াত আছে যা হাজার আয়াত থেকে শ্রেষ্ঠ।[২৬৯]
ইবন কাসীর বলেন : সে শ্রেষ্ঠ আয়াতটি হচ্ছে সূরা হাদীদের উল্লিখিত আয়াতখানা।[২৭০]
উল্লিখিত সূরা পাঁচটির মধ্যে প্রথম তিনটিতে অর্থাৎ হাদীদ, হাশর ও ছফে 'সাব্বাহা' অতীত পদবাচ্য সহকারে এবং জুমুআ ও তাগাবুনে 'ইউসাব্বিহু' ভবিষ্যত পদবাচ্য সহকারে বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আল্লাহ তাআলার তাসবীহ ও যিকর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সকল কালই অব্যাহত থাকবে।[২৭১]

ইবন আব্বাস (রা) বলেন – "কোন সময় তোমার অন্তরে আল্লাহ তাআলা ও ইসলাম সম্পর্কে শয়তানী কুমন্ত্রণা দেখা দিলে এ আয়াতখানি পাঠ করে নাও।"[২৭২]
এ আয়াতের তাফসীর এবং আউয়াল, আখির, যাহির ও বাতিনের অর্থ সম্পর্কে তাফসীরবিদগণের দশটিরও অধিক উক্তি বর্ণিত আছে। এসব উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই – সবগুলোরই অবকাশ আছে। আউয়াল শব্দের অর্থ তো প্রায় নির্দিষ্ট; অর্থাৎ অস্তিত্বের দিক দিয়ে সকল সৃষ্ট জগতের অগ্রে ও আদি। তিনি ব্যতীত সবকিছুই সৃজিত। তাই তিনি সবার আদি। কারো কারো মতে, আখিরের অর্থ এই যে, সবকিছু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বিদ্যমান থাকবেন। যেমন 'কুল্লু শায়ইন হালিকুন ইল্লাহ ওয়াজহাহু' আয়াতে এর পরিষ্কার উল্লেখ আছে। বিলীনতা দু প্রকার। এক হল যা

---

[২৬৬] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), প্রাগুক্ত, পৃ.১৩১৯
[২৬৭] প্রাগুক্ত
[২৬৮] আল কুরআন / ৫৭ : ৩
[২৬৯] আহমদ ইবন শুআয়ব আন নাসাঈ, *সুনান*, কিতাবু ফাযাইলুল কুরআন, দেওবন্দ, ১৯৮৫
[২৭০] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৩২
[২৭১] প্রাগুক্ত
[২৭২] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

কার্যতঃ বিলীন হয়ে যায়। যেমন কিয়ামতের দিন সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত যা কার্যত বিলীন হয় না, কিন্তু সত্তাগতভাবে বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত নয়। এরূপ বস্তুকে বিদ্যমান অবস্থায়ও ধ্বংসশীল বলা যাবে। এর উদাহরণ হল জান্নাত ও জাহান্নাম এবং এগুলোতে প্রবেশকারী ভাল ও মন্দ মানুষ। তাদের অস্তিত্ব বিলীন হবে না; কিন্তু বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে তারা কখনো মুক্তও হবে না। একমাত্র আল্লাহর সত্তাই এমন যে, পূর্বেও বিলীন ছিল না এবং ভবিষ্যতেও কখনো বিলীন হবে না। তাই তিনিই সবার অন্ত।[২৭৩]

ইমাম গাযালী (র) বলেন – "আল্লাহ তাআলার মারিফাত সবার শেষে হয়। এ দিক দিয়ে তিনি আখির বা অন্ত। মানুষ জ্ঞান ও মারিফাতে ক্রমোন্নতি লাভ করতে থাকে। কিন্তু মানুষের অর্জিত এ সব স্তর আল্লাহর পথের বিভিন্ন মনযিল ছাড়া আর কিছু নয়। এর চূড়ান্ত ও শেষ সীমা হচ্ছে আল্লাহর মারিফাত।"[২৭৪]

যাহির বলতে সে সত্তা বুঝানো হয়েছে, যেসব বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক প্রকাশমান। প্রকাশমান হওয়া অস্তিত্বের একটি শাখা। অতএব, আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব যখন সবার উপরে এবং অগ্রে তখন তাঁর আত্মপ্রকাশও সবার উপরে হবে। জগতে তাঁর চেয়ে অধিক কোন বস্তু প্রকাশমান নয়। তাঁর প্রজ্ঞা ও শক্তিসামর্থ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন বিশ্বের প্রতিটি কণায় কণায় দেদীপ্যমান।[২৭৫]

"আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি দয়াময়, অতি দয়ালু। নিশ্চয়ই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে, যা মানুষের কল্যাণ সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ হতে যে পানি বর্ষণের মাধ্যমে পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বাতাসের দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে। তথাপি মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালবাসার মত তাদেরকে ভালবাসে; কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ভালবাসায় তারা সুদৃঢ়। যালিমেরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেমন বুঝবে, হায়! এখন যদি তারা তেমন বুঝতো যে, সমস্ত শক্তিই আল্লাহর এবং আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর।"[২৭৬]

বিশ্বজাহানে যে বিরাট বিশাল কারখানা দিন রাত মানুষের সামনে কর্মরত রয়েছে, মানুষ যদি তাকে নিছক জন্তুর মত নির্বোধ ও অর্থহীন দৃষ্টিতে না দেখে বরং বুদ্ধি ও বিবেক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এ প্রাকৃতিক নিয়ম ও ব্যবস্থা সম্পর্কে তীক্ষ্ণভাবে চিন্তা করে এবং অন্যায় হঠকারিতা কিংবা কোন অন্ধ বিদ্বেষ যদি তাদের চিন্তাশক্তিকে আচ্ছন্ন করে না রাখে তবে তার পর্যবেক্ষণে যেসব উজ্জ্বল নিদর্শন আসবে, তা হতে সে এ সিদ্ধান্তে অতি সহজেই পৌঁছতে পারবে যে, এ বিরাট–বিশাল বিশ্বব্যবস্থা এক মহান শক্তি সম্পন্ন সত্তার নিয়ন্ত্রণাধীনে চলছে; সকল শক্তি, ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব একমাত্র তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন, আয়ত্তাধীন। অন্য কারো স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারমূলক হস্তক্ষেপ কিংবা বিশ্বপরিচালনার ব্যাপারে কারোই অংশীদারিত্বের কোন অবকাশই এ বিশ্ব ব্যবস্থায় নেই। অতএব মূলত ও প্রকৃতপক্ষে তিনিই একমাত্র প্রভূ – যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের ও সৃষ্টি নিখিলের প্রভূ; তিনি ছাড়া আর কারোই একবিন্দু পরিমাণ ক্ষমতা বা ইখতিয়ার নেই। কাজেই প্রভূত্ব ও উপাস্য হওয়ার ক্ষেত্রে কারো কোন অংশ থাকতে পারে না।[২৭৭]

এ আয়াত আল্লাহর আধ্যাত্মিক সত্তার প্রতি ভালবাসা পোষণের নির্দেশ দেয়। আল্লাহর দয়া, দুনিয়া এবং এর অধিবাসী মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টিজীবের জন্য আল্লাহর নেপথ্য অনুগ্রহের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে সচেতন বিবেককে এ থেকে শিক্ষা নেওয়ার উৎসাহ দেয়। সবচেয়ে বড় কথা, আধ্যাত্মিকতার অনিবার্য দাবি হিসেবে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার জন্য মানুষ তাঁর প্রতি যেমন ভালবাসা পোষণ করে অন্য কারো প্রতি তেমন ভালবাসা পোষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা মানুষের ভালবাসা পাওয়ার হকদার একমাত্র সত্তা হলেন আল্লাহ তাআলা। সৃষ্টিকুলের মধ্যে আর যাকে বা যার

---

[২৭৩] প্রাগুক্ত
[২৭৪] প্রাগুক্ত
[২৭৫] প্রাগুক্ত
[২৭৬] আল কুরআন / ২ : ১৬৩–৬৫
[২৭৭] সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, *তাফহীমুল কুরআন,* প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৫–২৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি মানুষ ভালবাসা পোষণ করবে – তার সবকিছুই হবে আল্লাহর ভালবাসার অনুবর্তী। সে কাউকে ভালবাসবে এ কারণে যে, সে ভালবাসা আল্লাহর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করে, সে কারো প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে এ কারণে যে, সে ঘৃণা আল্লাহর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করে। সে দান করবে, দান করা থেকে বিরত থাকবে, হাসি মুখে কথা বলবে বা রাগ করে কথা বলবে, নির্যাতন করবে বা নির্যাতন সহ্য করবে, সালাত কায়িম করবে বা সালাত কায়িম করা থেকে বিরত থাকবে – সবকিছুই করবে আল্লাহর ভালবাসার কথা চিন্তা করবে। তার যে সকল কাজ আল্লাহর ভালবাসার পক্ষে যায় না, সে কোন ভাবেই সে সকল কাজ করবে না, দুনিয়া স্বার্থ ও সুখ বিবেচনায় সে কাজগুলো যত গুরুত্বপূর্ণ এবং যতটা লাভপূর্ণ বা সুবিধাজনক হোক না কেন!

'ওয়া ইলাহুকুম ইলাহুন ওয়াহিদুন' আল্লাহর তাওহীদের এক জীবন্ত ঘোষণা। বিভিন্নভাবেই আল্লাহ তাআলার তাওহীদ বা একত্ববাদ সপ্রমাণিত রয়েছে।

প্রথমত তিনি একক, সমগ্র বিশ্বে না আছে তাঁর তুলনা, না আছে কোন সমকক্ষ। সুতরাং একক উপাস্য হওয়ার অধিকারও একমাত্র তাঁরই।

দ্বিতীয়ত উপাস্য হওয়ার অধিকারেও তিনি একক। অর্থাৎ তাঁকে ছাড়া আর কেউই ইবাদাতের যোগ্য নয়।

তৃতীয়ত সত্তার দিক দিয়েও তিনি একক। অর্থাৎ অংশী-বিশিষ্ট নন। তিনি অংশী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র। তাঁর বিভক্তি কিংবা ব্যবচ্ছেদ হতে পারে না।

চতুর্থত তিনি তাঁর আদি ও অনন্ত সত্তার দিক দিয়েও একক। তিনি তখনও বিদ্যমান ছিলেন, যখন অন্য কোন কিছুই ছিল না এবং তখনো বিদ্যমান থাকবেন যখন কোন কিছুই থাকবে না। অতএব তিনিই একমাত্র সত্তা যাকে ওয়াহিদ বা এক বলা যেতে পারে। 'ওয়াহিদ' শব্দটিতে উল্লিখিত যাবতীয় দিকের একত্বই বিদ্যমান রয়েছে।[২৭৮]

তারপর আল্লাহ তাআলার প্রকৃত একত্ব সম্পর্কে বাস্তব লক্ষণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপিত হয়েছে, যা জ্ঞানী-নির্জ্ঞান নির্বিশেষে যে কেউই বুঝতে পারে। আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের চিরাচরিত বিবর্তন তাঁরই ক্ষমতার পরিপূর্ণতা ও একত্ববাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তেমনিভাবে পানির উপর নৌকা ও জাহায তথা জলযানসমূহের চলাচলও একটি বিরাট প্রমাণ। পানিকে আল্লাহ তাআলা এমন এক তরল পদার্থ করে সৃষ্টি করেছেন যে, একান্ত তরল ও প্রবাহমান হওয়া সত্ত্বেও তার পিঠের উপর লক্ষ লক্ষ মণ ওজন বিশিষ্ট বিশালকায় জাহায বিরাট ওজনের চাপ নিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলাচল করে। তদুপরি এগুলোকে গতিশীল করে তোলার জন্য বাতাসের গতি ও নিতান্ত রহস্যপূর্ণভাবে সে গতির পরিবর্তন করতে থাকা প্রভৃতি বিষয়ও এদিকেই ইঙ্গিত বহন করে যে, এগুলোর সৃষ্টি ও পরিচালনার পেছনে এক মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞ সত্তা বিদ্যমান। পানীয় পদার্থগুলো তরল না হলে যেমন এ কাজটি সম্ভব হত না, তেমনি বাতাসের মাঝে গতি সৃষ্টি না হলেও জাহায চলতে পারত না; এগুলোর পক্ষে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করা সম্ভবও হত না।

এমনিভাবে আকাশ থেকে পানিকে বিন্দু বিন্দু করে বর্ষণ করা, যাতে কোন কিছুর ক্ষতি সাধন না হয়। যদি এ পানি প্লাবনের আকারে আকাশ থেকে নেমে আসতো তাহলে কোন মানুষ, জীব-জন্তু কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র কিছুই থাকত না। অতঃপর পানি বর্ষণের পর ভূ পৃষ্ঠে তাকে সংরক্ষণ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার ছিল না। যদি তাদেরকে বলা হত, তোমাদের সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনমত ছয়মাসের প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করে রাখ, তাহলে তারা পৃথক পৃথকভাবে কি সে ব্যবস্থা করতে পারত? আর কোন ক্রমে রেখে দিলেও সেগুলোকে পচন কিংবা বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে কেমন করে রক্ষা করত? কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজেই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা পানিকে বিশ্ববাসী মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্য কোথাও উন্মুক্ত খাদ-খন্দে সংরক্ষিত করেছেন, আবার কোথাও ভূমিতে বিস্তৃত বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ভূমির অভ্যন্তরে সংরক্ষণ করেছেন। তারপর এমন এক ফল্গুধারা সমগ্র জমিনে বিছিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষ যে কোন খানে খনন করে পানি বের করে নিতে পারে। আবার এ পানিরই একটা অংশকে জমাট বাঁধা সাগর বানিয়ে তুষার আকারে পাহাড়ের চূড়ায় চাপিয়ে দিয়েছেন যা পতিত কিংবা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একান্ত সংরক্ষিত; অথচ ধীরে ধীরে গলে প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারার মাধ্যমে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে

---

[২৭৮] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), প্রাগুক্ত, পৃ.৮২-৮৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

পড়ে। সারকথা, উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ ক্ষমতার কয়েকটি বিকাশস্থলের বর্ণনার মাধ্যমে তওহীদ বা একত্ববাদই প্রমাণিত হয়েছে।[২৭৯]

"কে সে, যে আল্লাহকে করয ই হাসানা প্রদান করবে? তিনি তার জন্য এটা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। আর আল্লাহ সঙ্কুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তাঁর পানেই তোমরা প্রত্যানীত হবে।"[২৮০]

করয বা ঋণ অর্থ নেক আমল ও আল্লাহর পথে ব্যয় করা। এখানে করয বা ঋণ শব্দটি রূপক অর্থে বলা হয়েছে। অন্যথায় সবকিছুরই তো একমাত্র মালিক আল্লাহই। উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যেভাবে ঋণ পরিশোধ করা ওয়াজিব এমনিভাবে তোমাদের সদ্ব্যয়ের প্রতিদান অবশ্যই দেয়া হবে।
আল্লাহকে ঋণ দেয়ার এ অর্থও বলা হয়েছে যে, তাঁর বান্দাদেরকে ঋণ দেয়া এবং তাদের অভাব পূরণ করা। তাই হাদীসে অভাবীদেরকে ঋণ দেয়ারও অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

"আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি সাড়া দেই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে ঈমান আনুক।"[২৮১]

এ আয়াতের তাৎপর্য হল আল্লাহ মুমিনদেরকে জানাচ্ছেন – "তোমরা যদিও আমাকে দেখতে পাও না; ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাকে অনুভব করতে পার না , কিন্তু সে জন্য আমি তোমাদের নিকট হতে অনেক দূরে অবস্থিত মনে কর না। বস্তুত আমি প্রত্যেকটি মানুষের নিকট অবস্থিত – এত নিকটে যে, সে ইচ্ছা করলে যে কোন সময় আমার নিকট তার আবেদন-নিবেদন পেশ করতে পারে। এমনকি মনে মনেও সে যা কিছু আমার নিকট আবেদন নিবেদন করে আমি তাও শুনতে পাই। শুধু শুনতে পাই তাই নয়, বরং সে সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্তও ঘোষণা করে থাকি। তোমরা নিজেদের অজ্ঞতা, মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার দরুন যে সকল অন্তসারশূন্য অক্ষম ও নিস্প্রাণ সত্তাকে ইলাহ ও রব বানিয়ে নিয়েছো সে সবের নিকট তোমাদের কষ্ট করে যেতে হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমাদের কোন কথাই তারা শুনতে পায় না, তোমাদের আবেদন নিবেদন সম্পর্কে কোন ফয়সালা দেয়ার ক্ষমতাও তাদের নেই। কিন্তু আমি বিশাল বিশ্বজাহানের নিরঙ্কুশ শাসনকর্তা, সমগ্র ক্ষমতা ইখতিয়ারের একচ্ছত্র অধিপতি হয়েও তোমাদের এত নিকটবর্তী যে, তোমরা কোন মাধ্যম, ওসীলা ও সুপারিশ ব্যতীতই এবং সরাসরিভাবে সকল সময়ে ও যে কোন স্থানেই আমার নিকট আবেদন পৌছাতে পার। অতএব, এক একটি অক্ষম, অপদার্থ ও কৃত্রিম খোদার দ্বারে হাতড়ানো ত্যাগ করে তোমাদের এ চরম লাঞ্ছনা হতে মুক্তি লাভ কর এবং আমি তোমাদের যে দাওয়াত – যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তা গ্রহণ করে আমার আদর্শকে দৃঢ়তার সাথে ধারণ কর, আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন কর এবং আমারই দাসত্ব ও আনুগত্যে নিজেকে সোপর্দ কর।"[২৮২]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা 'আমি নিকটেই রয়েছি' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ধীরে-সুস্থে ও নীরবে দুআ করাই উত্তম, উচ্চৈঃস্বরে দুআ করা পছন্দনীয় নয়। ইমাম ইবন কাসীর (র) এ আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, কোন গ্রামের কিছু অধিবাসী রসূল করীম (সা) কে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, যদি আমাদের পরওয়ারদিগার আমাদের নিকটেই থেকে থাকেন, তবে আমরা আস্তে আস্তে দুআ করব। আর যদি দূরে থাকেন তবে উচ্চৈঃস্বরে ডাকব। এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে।[২৮৩]

"তারা যখন মুমিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আবার যখন তারা নিভৃতে একে অন্যের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, আল্লাহ তোমাদের কাছে যা ব্যক্ত করেছেন তোমরা কি তা তাদেরকে বলে দাও? এর

---

[২৭৯] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), প্রাগুক্ত, পৃ.৮৩
[২৮০] আল কুরআন / ২ : ২৪৫
[২৮১] আল কুরআন / ২ : ১৮৬
[২৮২] সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, *তাফহীমুল কুরআন,* প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৯-৪০
[২৮৩] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), প্রাগুক্ত, পৃ.৯৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারা তারা তোমাদের প্রতিপালকের সামনে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করবে; তোমরা কি অনুধাবন কর না? তারা কি জানে না যে, যা তারা গোপন করে কিংবা ঘোষণা করে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা জানেন?"[২৮৪]

اللهُ لا اِله الا هُوَ ج الحى القيومُ ج لا تَاخُذُهُ سِنَةٌ ولانومٌ ط له ما فِىْ السموتِ وما فِىْ الارض ط من ذا الذى يَشْفَعُ عِنْدَه الا باذنه ط يعلمُ ما بَيْنَ ايديهم وما خلفهمْ ج ولايُحيطون بشىءٍ من علمه الا بما شاء ج وسِعَ كُرسيهُ السموتِ والارضَ ج ولا يَئُودُه حِفظُهما ج و هُوَ العلى العَظِيْمُ -

"আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তাছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর কুরসি আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না; আর তিনিই মহান শ্রেষ্ঠ।"[২৮৫]

মর্যাদায় এ আয়াতটি আল কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ আয়াত। একে আয়াতুল কুরসি বলা হয়। হাদীসে এ আয়াতের অনেক ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। মুসনাদ আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে – রাসূল (সা) এটিকে সবচাইতে উত্তম আয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) উবাই ইবন কা'বকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন –কুরআনের মধ্যে কোন আয়াতটি সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ? উবাই বললেন – তা হল আয়াতুল কুরসী।' মহানবী (সা) তা সমর্থন করে বললেন – হে আবুল মানযার! তোমাকে এ উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ।"[২৮৬]

সুনান ই নাসাঈ'র এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হুযুর আকরাম (সা) ইরশাদ করেন – যে লোক প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল কুরসী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কোন অন্তরায় থাকবে না।'[২৮৭] অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে জান্নাতের ফলাফল এবং আরাম আয়েশ উপভোগ করতে পারবে।

এ আয়াতে মহান পরওয়ারদিগার আল্লাহ জাল্লা শানুহুর একক অস্তিত্ব, তওহীদ ও গুণাবলীর বর্ণনা অত্যাশ্চর্য ও অনুপম ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে, যাতে আল্লাহর অস্তিত্ববান হওয়া, জীবিত হওয়া, শ্রবণকারী হওয়া, দর্শক হওয়া, বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া, তাঁর সত্তার অপরিহার্যতা, তাঁর অসীম–অনন্তকাল পর্যন্ত থাকা, সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও উদ্ভাবক হওয়া, যাবতীয় ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া, এমন শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী হওয়া যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে কেউ কোন কথা বলতে না পারে, এমন পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া যাতে সমগ্র বিশ্ব ও তার যাবতীয় বস্তুনিচয়কে সৃষ্টি করা এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের শৃংখলা বজায় রাখতে গিয়ে তাকে কোন ক্লান্তি বা পরিশ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয় না, এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, কোন প্রকাশ্য কিংবা গোপন বস্তু কিংবা কোন অণূ–পরমাণূ বিন্দু–বিসর্গও যাতে বাদ পড়তে না পারে। এ হচ্ছে আয়াতটির মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু।

"এ আয়াতটিতে রয়েছে দশটি বাক্য। প্রথম বাক্য الله لا اله الا هو এতে আল্লাহ শব্দটি অস্তিত্ববাচক নাম। অর্থ সে সত্তা যা সকল পরাকাষ্ঠার অধিকারী ও সবকিছু থেকে মুক্ত। লা ইলাহা ইল্লা হুয়া সে সত্তারই বর্ণনা যে সত্তা ইবাদতের যোগ্য। ইলাহ সে সত্তা ব্যতীত অন্য কেউ নেই।

দ্বিতীয় বাক্য الحى القيوم আরবি ভাষায় হায়্যু অর্থ হচ্ছে জীবিত। আল্লাহর নামের মধ্য থেকে এ নামটি ব্যবহার করে বলে দেওয়া হচ্ছে যে, তিনি সর্বদা জীবিত ও বিদ্যমান থাকবেন। মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। 'কাইয়্যুম' শব্দ কিয়াম হতে উৎপন্ন, এটি ব্যুৎপত্তিগতভাবে আধিক্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি নিজে বিদ্যমান থেকে অন্যকেও বিদ্যমান রাখেন এবং নিয়ন্ত্রণ করেন। কাইয়্যুম আল্লাহর এমন এক বিশেষণ যাতে কোন সৃষ্টি

---

[২৮৪] আল কুরআন / ২ : ৭৬–৭৭

[২৮৫] আল কুরআন / ২ : ২৫৫

[২৮৬] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৮

[২৮৭] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

অংশীদার হতে পারে না। তাঁর সত্তা স্থায়িত্বের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নয়। কেননা যে নিজের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্বের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী, সে অন্যের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবে কীভাবে? সে জন্যই কোন মানুষকে কাইয়্যুম বলা জায়িয নয়। যারা আব্দুল কাইয়্যুম নামকে বিকৃত করে শুধু কাইয়্যুম বলে তারা গোনাহগার হবে।
আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে এ নাম দুটি কারো কারো মতে ইসমি আযম। আলী (রা) বলেছেন যে – বদরের যুদ্ধে আমি একবার চেয়েছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ (সা) কে দেখবো তিনি কি করছেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম, তিনি সিজদায় পড়ে 'ইয়া হায়্যু, ইয়া কাইয়্যুম' বলছেন।

তৃতীয় বাক্য لاتأخذه سنة ولانوم – সিনাতুন এর সীন এর উপর যের দিয়ে উচ্চারণ করলে এর অর্থ হবে তন্দ্রা বা নিদ্রার প্রাথমিক প্রভাব। পূর্ণ নিদ্রাকে বলা হয় নাওম। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলা তন্দ্রা ও নিদ্রা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আগের বাক্যে কাইয়্যুম শব্দে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আসমান ও যমীনের যাবতীয় বস্তুর নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। সমস্ত সৃষ্টিরাজি তাঁর আশ্রয়েই বিদ্যমান। এতে করে হয়তো ধারণা হতে পারে যে, যে সত্তা এত বড় কাজ পরিচালনা করছেন তার কোন সময় ক্লান্তি আসতে পারে এবং কিছু সময় বিশ্রাম ও নিদ্রার জন্য থাকা দরকার। দ্বিতীয় বাক্য দ্বারা সীমিত জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহকে নিজের বা অন্য কোন সৃষ্টির সাথে তুলনা করবে না, নিজের মত মনে করবে না। তিনি সমকক্ষতা ও সকল তুলনার উর্ধ্বে। তাঁর পরিপূর্ণ ক্ষমতার পক্ষে এ সব কাজ করা কঠিন নয়। আবার তাঁর ক্লান্তিরও কোন কারণ নেই। আর তাঁর সত্তা যাবতীয় ক্লান্তি, তন্দ্রা ও নিদ্রার প্রভাব থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

চতুর্থ বাক্য له ما فى السموات وما فى الارض বাক্যের শুরুতে ব্যবহৃত লাম অক্ষর মালিকানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আকাশ এবং যমিনে যা কিছু রয়েছে সে সবই আল্লাহর মালিকানাধীন। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তির মালিক। যেভাবে ইচ্ছা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

পঞ্চম বাক্য من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه অর্থ হচ্ছে এমন কে আছে যে তাঁর সামনে কারো সুপারিশ করতে পারে, তাঁর অনুমতি ব্যতীত? এর তাৎপর্য হল, যখন আল্লাহ তাআলা যাবতীয় সৃষ্টবস্তুর মালিক এবং কোন বস্তু তাঁর চেয়ে বড় নয়, তাই কেউ তাঁর কোন কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করার অধিকারী নয়। তিনি যা কিছু করেন, তাতে কারো আপত্তি করার অধিকার নেই। তবে এমন হতে পারত যে, কেউ কারো জন্য সুপারিশ করে, তাই এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এ ক্ষমতাও কারো নেই। তবে আল্লাহর কিছু খাস বান্দা আছেন, যাঁরা তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে তা করতে পারবেন, অন্যথায় নয়।

ষষ্ঠ বাক্য يعلم ما بين ايديهم وماخلفهم অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা অগ্রপশ্চাত যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে অবগত। অগ্রপশ্চাত বলতে এ অর্থও হতে পারে যে তাদের জন্মের পূর্বে ও জন্মের পরের যাবতীয় অবস্থা ও ঘটনাবলী আল্লাহর জানা আছে। আর এ অর্থও হতে পারে যে, অগ্র বলতে সে অবস্থা বোঝানো হয়েছে যা মানুষের জন্য প্রকাশ্য আর পশ্চাত বলতে বোঝানো হয়েছে যা অদৃশ্য। তাতে অর্থ হবে এই যে, কোন কোন বিষয় মানুষের জ্ঞানের আওতায় রয়েছে কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। কিছু তাদের সামনে প্রকাশ্য আর কিছু গোপন। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে সবই প্রকাশ্য। তাঁর জ্ঞান সে সমস্ত বিষয়ের উপরই পরিব্যাপ্ত। সুতরাং এ দুটিতে কোন বিরোধ নেই। আয়াতের ব্যাপকতায় উভয় দিকই বোঝানো হয়।

সপ্তম বাক্য ولايحيطون بشئ من علمه الا بما شاء অর্থাৎ মানুষ ও সমগ্র সৃষ্টির জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের কোন একটি অংশবিশেষও পরিবেষ্টিত করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যাকে যে পরিমাণ জ্ঞান দান করেন শুধু ততটুকুই সে পেতে পারে। এতে বলা হয়েছে যে, সমগ্র সৃষ্টির অণুপরমাণুর ব্যাপক জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের আওতাভুক্ত, এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। মানুষ অথবা অন্য কোন সৃষ্টি এতে অংশীদার নয়।

অষ্টম বাক্য وسع كرسيه السموات والارض অর্থাৎ তাঁর কুরসি এত বড়, যার মধ্যে সাত আকাশ ও যমীন পরিবেষ্টিত রয়েছে। আল্লাহ উঁচা, বলা বা স্থান ও কাল থেকে মুক্ত। এ ধরনের আয়াতকে মানুষের কার্যকলাপ ও

Dhaka University Institutional Repository

আচার আচরণের সাথে তুলনা করা উচিত নয়। এর অবস্থা পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করা মানবজ্ঞানের উর্ধ্বে। তবে হাদীসের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, আরশ ও কুরশি এত বড় যে, তা সমগ্র আকাশ ও যমিনকে পরিবেষ্টন করে আছে।

নবম বাক্য ولايؤده حفظهما অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ দুটি বিরাট সৃষ্টি, আসমান ও যমীনের হিফাযত করা কোন কঠিন কাজ বলে মনে হয় না। কারণ, এ অসাধারণ ও একক পরিপূর্ণ সত্তার পক্ষে এ কাজটি একান্তই সহজ ও অনায়াসসাধ্য।

দশম বাক্য وهو العلى العظيم তিনি অতি উচ্চ ও অতি মহান। পূর্বের নয়টি বাক্যে আল্লাহর সত্তা ও গুণের বর্ণনা করা হয়েছে। তা দেখার এবং বোঝার পর প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলতে বাধ্য হবে যে, সকল শান-শওকত, বড়ত্ব ও মহত্ব এবং শক্তির একমাত্র মালিক আল্লাহ। এ দশটি বাক্যে আল্লাহর যাত ও সিফাতের পূর্ণ বর্ণনা দেয়া হয়েছে।"[২৮৮]

"আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক।"[২৮৯]
"তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; তিনি প্রবল পরাক্রমশালী , প্রজ্ঞাময়।"[২৯০]

আল্লাহ তাআলার আধ্যাত্মিক সত্তার এটি একটি বিশেষ দিক যে, তা শুধু চিরঞ্জীবই নয় বরং তা বিশ্বজাহানের সকল সত্তার ধারকও বটে। সকলের শেষ আশ্রয় ও ভরসার কেন্দ্রবিন্দু তিনি। মাতৃগর্ভে মানুষের আকৃতি কেমন হবে তা এক রহস্যাবৃত বিষয়। মানুষ ইচ্ছে করলেই সুন্দর, সবল ও আশ্চর্যকান্তিময় মেধাবী সন্তান জন্ম দিতে পারে না। এ জন্যে তাঁকে পুরোপুরি আল্লাহর দয়ার উপর নির্ভর করতে হয়। আল্লাহ তাঁর অসীম আধ্যাত্মিক সত্তার প্রভাবে মানুষের মায়ের গর্ভে তাঁর নিজের ইচ্ছামত আকৃতি গঠন করেন। এ ক্ষেত্রে কারো কিছু করার থাকে না।

"আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, ফেরেশতারা এবং জ্ঞানীগণও; আল্লাহ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২৯১]

এ আয়াতের একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। ইমাম বগভী বলেন – সিরিয়া থেকে দুজন বিশিষ্ট ইয়াহুদী পণ্ডিত একবার মদীনায় আগমন করেন। মদীনার আবাসিক এলাকা দেখে তারা মন্তব্য করেন যে, শেষ যমানার নবী যে রকম লোকালয়ে বসবাস করবেন বলে তওরাতে ভবিস্যদ্বাণী রয়েছে এটা ঠিক সে রকম বলেই মনে হচ্ছে। এরপর তারা জানতে পারেন যে, এখানে একজন মহান ব্যক্তি আছেন, যাঁকে সবাই নবী বলে আখ্যায়িত করে। তারা নবী করীম (সা) এর কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁর প্রতি দৃষ্টি পড়তেই তওরাতে বর্ণিত আখিরী নবীর গুণাবলী তাদের সামনে ভেসে ওঠে। তারা বললেন – আপনি কি মুহাম্মদ? নবী (সা) বললেন : হাঁ, আমি মুহাম্মদ এবং আমি আহমদ। তারা আরো বললেন – আমরা আপনাকে একটি প্রশ্ন করব। যদি আপনি সঠিক উত্তর দেন তবে আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব। নবী (সা) বললেন : প্রশ্ন করুন। তারা বললেন – আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে আল্লাহ তাআলা সম্পর্কিত সর্ববৃহৎ সাক্ষ্য কোনটি? এ প্রশ্নের উত্তরেই আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। নবী করীম (সা) আয়াতটি তিলাওয়াত করে তাদের শুনিয়ে দিলে তারা মুসলিম হয়ে যান।[২৯২]
মুসনাদে আহমাদে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) আরাফাতের ময়দানে এ আয়াত পাঠ করার পর বললেন – হে পরওয়ারদিগার! আমিও এর সাক্ষ্য দাতা।[২৯৩]

"বল, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও; যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। নিশ্চয়ই

---

[২৮৮] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), প্রাগুক্ত, পৃ.১৩৮–৩৯
[২৮৯] আল কুরআন / ৩ : ২
[২৯০] আল কুরআন / ৩ : ৬
[২৯১] আল কুরআন / ৩ : ১৮
[২৯২] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৮
[২৯৩] প্রাগুক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তুমিই রাতকে দিনে পরিণত কর এবং দিনকে রাতে পরিণত কর; তুমিই মৃত হতে জীবিতের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবিত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান কর।"[২৯৪]

এ আয়াতে মুনাজাত ও দুআর ভাষায় অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে জাতিসমূহের উত্থান-পতন ও সাম্রাজ্যের পট পরিবর্তনে আল্লাহ তাআলার অপ্রতিহত শক্তি-সামর্থ্যের বিষয় বর্ণিত হয়েছে এবং পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য বিজয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে জগতের বৈপ্লবিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ, জাতিসমূহের উত্থান-পতনের ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং কওমে নূহ, আদ, সামূদ প্রভৃতি অবাধ্য জাতিগুলোর ধ্বংসকাহিনী সম্পর্কে উদাসীন ও মূর্খ শত্রুদের হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, এরা বাহ্যিক শান-শওকতের পূজা করে। এরা জানে না, জগতের সমস্ত শক্তি ও রাষ্ট্র ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার করায়ত্ত্ব। সম্মান ও অপমান তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি দরিদ্র ও পথের ভিখারীকে রাজ সিংহাসন ও মুকুটের অধিকারী করতে পারেন এবং প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটের হাত থেকে রাষ্ট্র ও ঐশ্বর্য ছিনিয়ে নিতে পারেন। আজ পরিখা খননকারী ক্ষুধার্ত ও নিঃস্বদের আগামীকাল সিরিয়া, ইরাক ও ইয়ামন সাম্রাজ্যের অধিকারী করে দেয়া তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

আয়াতে বলা হয়েছে – 'কল্যাণ তোমার হাতেই'। আয়াতের প্রথম দিকে রাজত্ব দান করা ও ছিনিয়ে নেওয়া এবং সম্মান ও অপমান উভয়দিক উল্লেখ করা হয়েছিল। এ কারণে এখানে স্বাভাবিকভাবেই কল্যাণ ও অকল্যাণ তোমারই হাতে – এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আয়াতে শুধু কল্যাণ তোমার হাতে এ কথা বলা হয়েছে। আয়াতে শুধু কল্যাণ বা খায়র শব্দ ব্যবহার করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে বিষয়কে কোন ব্যক্তি অথবা জাতি অকল্যাণকর বা বিপজ্জনক মনে করে, তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা জাতির জন্য আপাত দৃষ্টিতে অকল্যাণকর ও বিপজ্জনক মনে হলেও পরিণামের সামগ্রিক ফলশ্রুতির দিক দিয়ে তা অকল্যাণকর নাও হতে পারে। মোট কথা, আমরা যে সকল বিষয়কে মন্দ বলি, সেগুলো পুরোপুরি মন্দ নয়, আংশিক মন্দ মাত্র। বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বপালকের দিকে সম্বন্ধ এবং সামগ্রিক উপযোগিতার দিক দিয়ে কোন বস্তুই মন্দ নয়।[২৯৫]

দ্বিতীয় আয়াতটির অনুবাদ এভাবেও করা যায় – 'আপনি ইচ্ছা করলেই রাতের অংশ দিনে প্রবিষ্ট করে দিনকে বর্ধিত করে দেন এবং দিনের অংশ রাতে প্রবিষ্ট করে রাতকেও বাড়িয়ে দেন।'
সবাই জানেন যে, দিন রাতের ছোটো বা বড় হওয়া সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই আয়াতের সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, চন্দ্র, সূর্যসহ আকাশের সকল গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র এ সবই আল্লাহ তাআলার ক্ষমতাধীন। অতএব উপাদান জগত ও অন্যান্য শক্তি যে আল্লাহ তাআলারই ক্ষমতাধীন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

'আপনি জীবিতকে মৃত থেকে বের করেন। যেমন ডিম থেকে বাচ্চা অথবা বীর্য থেকে সন্তান অথবা বীজ থেকে বৃক্ষ বের করেন। পক্ষান্তরে আপনি মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন। যেমন পাখি থেকে ডিম, জীব থেকে বীর্য অথবা বৃক্ষ থেকে ফল ও শুষ্ক বীজ।
জীবিত ও মৃতের ব্যাপক অর্থ নেওয়া হলে জ্ঞানী –মূর্খ, পূণ্যবান-পাপী এবং মুমিন ও কাফির সবাই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এভাবে আল্লাহ তাআলার সর্বব্যাপী ক্ষমতা সমগ্র আত্মা জগত ও আধ্যাত্মিক জগতের উপর সুস্পষ্টরূপে পরিব্যাপ্ত হয়। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলেই কাফিরের ঔরষে মুমিন অথবা মূর্খের ঔরষে জ্ঞানী পয়দা করতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে মুমিনের ঔরষে কাফির এবং জ্ঞানীর ঔরষে মূর্খ পয়দা করতে পারেন। তাঁরই ইচ্ছায় আযরের গৃহে ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ (আ) জন্মগ্রহণ করেন এবং নূহ (আ) এর পুত্র কাফির থেকে যায়। আলিমের জাহিল সন্তান হয় আবার জাহিলের আলিম সন্তান হয়।

---

[২৯৪] আল কুরআন / ৩ : ২৬-২৭
[২৯৫] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), প্রাগুক্ত, পৃ.১৭১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

আয়াতে সমগ্র সৃষ্টজগতের উপর আল্লাহ তাআলার একচ্ছত্র ক্ষমতা কীরূপ প্রাঞ্জল ও মনোরম ধারাবাহিকতার সাথে বর্ণিত হয়েছে উপরোক্ত বিবরণ থেকে সহজেই তা বুঝা যায়। প্রথমেই উপাদান জগত এবং তার শক্তি ও রাজত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। সবশেষে আত্মা ও আধ্যাত্মিকতার বর্ণনা এসেছে। প্রকৃতপক্ষে এটাই সমগ্র বিশ্বশক্তির সর্বোচ্চ শক্তি।[২৯৬] সবশেষে বলা হয়েছে, আপনি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযক দান করেন। কোন সৃষ্টজীব জানতে পারে না – যদিও স্রষ্টার খাতায় তা কড়ায় গণ্ডায় লিখিত থাকে।

ইমাম বাগভীর নিজস্ব সনদে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন – যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পর সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি, شهدالله এবং قل اللهم পাঠ করে আমি তার ঠিকানা জান্নাতে করে দেব, আমার সকাশে স্থান দেব, দৈনিক সত্তর বার তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেব, তার সত্তরটি প্রয়োজন মেটাবো, শত্রুর কবল থেকে আশ্রয় দেব এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাকে জয়ী করব।[২৯৭]
আল্লাহর নিরঙ্কুশ আধিপত্য আর ক্ষমতার বিষয়টি বর্ণনা করে এ ঘোষণার সমর্থনে আরো ইরশাদ করা হয়েছে – "তিনি আপন বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী, তিনি প্রজ্ঞাময়, জ্ঞাতা।[২৯৮]

"তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, তাঁর সন্তান হবে কীভাবে? তাঁর তো কোন স্ত্রী নেই। তিনিই সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক; তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা; সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর; তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক। দৃষ্টি তাঁকে অবধারণ করতে পারে না কিন্তু তিনি অবধারণ করেন সকল দৃষ্টি এবং তিনিই সূক্ষদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।"[২৯৯]

আল্লাহ তাআলা পরম আধ্যাত্মিক সত্তা। তাঁর আধ্যাত্মিকতার বিষয়টিতে স্ত্রী, সন্তান, সংসার এ সবের কোন স্থান নেই। আর তাঁর কাছে কোন বিষয়ই গোপন নেই। তিনি জানেন সবকিছুই। বিশ্বজাহানের তিনি আল্লাহ, রব এবং একমাত্র ইলাহ। তিনি সবকিছু জানেন প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে। কারো কাছে শুনে নয়। কেননা তিনি দেখার গুণে গুণান্বিত। তাঁর দৃষ্টি দেখে সব কিছুই।
মহান আল্লাহর প্রত্যক্ষণের এ ক্ষমতার মধ্যেই তাঁর আধ্যাত্মিকতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি ঘোষণা করেন –
لاتدركه الابصار وهويدرك الابصار وهو اللطيف الخبير
আলোচ্য আয়াতের ابصار শব্দটি بصر শব্দের বহুবচন। এর অর্থ দৃষ্টি এবং দৃষ্টি শক্তি। আয়াতের ادراك শব্দের অর্থ পাওয়া, ধরা, বেষ্টন করা। ইবন আব্বাস (রা) এ স্থলে শব্দটির অর্থ বেষ্টন করা বর্ণনা করেছেন।[৩০০]

এ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় জিন্ন, মানুষ, ফেরেশতারা ও যাবতীয় জীব-জন্তুর দৃষ্টি একত্রিত হয়েও আল্লাহর সত্তাকে বেষ্টন করে দেখতে পারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টজীবের দৃষ্টিকে পূর্ণরূপে দেখেন এবং সবাইকে বেষ্টন করে দেখেন। এ সংক্ষিপ্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলার দুটি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে। প্রথমত সমগ্র সৃষ্টি জগতের কারো বা কোন কিছুর দৃষ্টিই আল্লাহকে বেষ্টন করতে পারে না এমনকি সকল যুগের সমস্ত সৃষ্টির সম্মিলিত দৃষ্টিও তা করতে সক্ষম নয়। দ্বিতীয়তঃ তাঁর দৃষ্টি সমগ্র সৃষ্টজগতকে পরিবেষ্টনকারী। জগতের অণু-কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর দৃষ্টির অন্তরালে নয়। সর্বাবস্থায় এ জ্ঞান এবং জ্ঞানগত পরিবেষ্টনও আল্লাহ তাআলারই বৈশিষ্ট্য। তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্টবস্তুর পক্ষে সমগ্র সৃষ্টজগত ও তার অণু-পরমাণুর এরূপ জ্ঞান লাভ কখনো হয় নি এবং হতে পারেও না। কেননা এটাও আল্লাহ তাআলার সত্তার বিশেষ গুণ।

---

[২৯৬] প্রাগুক্ত
[২৯৭] প্রাগুক্ত
[২৯৮] আল কুরআন / ৬ : ১৮
[২৯৯] আল কুরআন / ৬ : ১০১-১০৩
[৩০০] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), প্রাগুক্ত, পৃ.৪০০

Dhaka University Institutional Repository

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) এর এক রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন – 'এ যাবত পৃথিবীতে যত মানুষ, জিন্ন, ফেরেশতা ও শয়তান জন্মগ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে যত জন্মগ্রহণ করবে, তারা সবাই যদি এক কাতারে দাঁড়িয়ে যায়, তবে সবার সম্মিলিত দৃষ্টি দ্বারাও আল্লাহ তাআলার সত্তাকে পুরোপুরি বেষ্টন করা সম্ভব নয়।[৩০১]

এ বিশেষ গুণটি একমাত্র আল্লাহ তাআলারই হতে পারে। নতুবা আল্লাহ দৃষ্টিকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন যে, ক্ষুদ্রতম জীবের ক্ষুদ্রতম চোখও পৃথিবীর বৃহত্তম মণ্ডলটি অবলোকন করতে পারে এবং চতুর্দিক বেষ্টন করে দেখতে পারে। পৃথিবীর চেয়ে তের কোটি গুণ বড় সূর্য এবং সূর্যের চেয়ে কোটি কোটি গুণ বড় অসংখ্য নক্ষত্র, তারকাপুঞ্জ প্রভৃতি দেখতে সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম চোখেরও কোন অসুবিধা হয় না। কেননা সৃষ্টিজগতের প্রতিটি জীব এবং মানুষের এ দৃষ্টি হল একটি ইন্দ্রিয় বিশেষ। এর দ্বারা শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহেরই জ্ঞান লাভ করা যায়। আল্লাহর পবিত্র সত্তা বুদ্ধি ও ধারণারও বেষ্টনীর উর্ধ্বে। দৃষ্টিশক্তি দিয়ে তাঁর জ্ঞান কীভাবে অর্জিত হতে পারে?

এ প্রেক্ষিতেই আল্লাহ দর্শনের বিষয়টি আলোচনায় চলে আসে। মানুষ আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পারে কি না, এ সম্পর্কে আহলি হকের বিশ্বাস হল, এ জগতে এটা সম্ভব নয়। এ কারণেই মূসা (আ) যখন ربى ارنى বা হে আমার রব! আমাকে দেখা দাও – বলে আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন, তখন তার উত্তরে বলা হয়েছিল لن ترنى বা তুমি কখনোই আমাকে দেখতে পারবে না। মূসা (আ)ই যখন এ উত্তর পেয়েছিলেন তখন অন্য কোন জিন্ন বা মানুষের সাধ্য কী যে তারা মহান আল্লাহ তাআলাকে প্রত্যক্ষ করে!
তবে আখিরাতে মুমিনরা আল্লাহ তাআলার সাক্ষাত লাভ করবে। এ বিষয়টি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।
আখিরাতে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাআলার সাক্ষাত ঘটবে। হাশরে অবস্থান কালে এবং জান্নাতে পৌঁছার পর। জান্নাতীদের জন্য আল্লাহর সাক্ষাতই হবে সবচেয়ে বড় নিআমত।
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ বলবেন – তোমরা যে সব নিআমত প্রাপ্ত হয়েছো এগুলোর চেয়ে আরো কোন নিআমতের প্রয়োজন হলে বল, আমি তাও দেব।' জান্নাতীরা নিবেদন করবে : হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং জান্নাতে স্থান দিয়েছেন। এর বেশি আমরা আর কী চাইবো? তখন মধ্যবর্তী পর্দা সরিয়ে নেওয়া হবে এবং সবার সাথে আল্লাহর সাক্ষাত ঘটবে। এটিই হবে জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিআমত।[৩০২]
অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) এক চন্দ্রালোকিত রাতে সাহাবী (রা) দের সাথে বসে ছিলেন। এ সময় তিনি চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন : আখিরাতে তোমরা তোমাদের রব আল্লাহকে এ চাঁদের মত চাক্ষুষ দেখতে পাবে।[৩০৩]
আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে জান্নাতে বিশেষ মর্যাদা দান করবেন, তাঁদেরকে প্রতিদিন সকাল বিকাল সাক্ষাত দান করবেন।[৩০৪]

মোটকথা এ জগতে কেউ আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করতে পারবে না এবং আখিরাতে সকল জান্নাতী এ নিআমত লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ (সা) মিরাজের রাতে যে সাক্ষাত লাভ করেছেন, তাও প্রকৃতপক্ষে আখিরাতেরই সাক্ষাত। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবন আরাবী বলেন – আকাশ সমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ স্থানই দুনিয়া। আকাশের উপরে আখিরাতের স্থান। সেখানে পৌঁছে যে সাক্ষাত হয়েছে তাকে দুনিয়ার সাক্ষাত বলা যায় না।[৩০৫]

এ পর্যায়ে আরো একটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়। তা হল لاتدركه الابصار আয়াত দিয়ে জানা গেল যে, মানুষ আল্লাহ তাআলাকে দেখতেই পারে না। এমতবস্থায় কিয়ামতে তাঁকে দেখবে কীভাবে?
এর উত্তর হল, আল্লাহকে দেখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য এটা নয়। বরং এর অর্থ এই যে, মানুষের দৃষ্টি তাঁর সত্তাকে বেষ্টন করতে পারে না। কারণ তাঁর সত্তা অসীম এবং মানুষের দৃষ্টি সসীম।

---

[৩০১] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), প্রাগুক্ত, পৃ.৪০০
[৩০২] প্রাগুক্ত, পৃ.৪০১
[৩০৩] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, প্রাগুক্ত
[৩০৪] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), প্রাগুক্ত, পৃ.৪০১
[৩০৫] প্রাগুক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

কিয়ামতে মুমিন বান্দাগণ আল্লাহকে দেখতে পাবেন। তাদের সে প্রত্যক্ষণও বেষ্টন করে হবে না। দুনিয়াতে এরূপ দর্শন সহ্য করার মত ক্ষমতা মানুষের চোখে নেই। তাই দুনিয়াতে কোন অবস্থাতেই তাঁকে দেখা সম্ভব নয়। আখিরাতে এ শক্তি সৃষ্টি করে দেয়া হবে, ফলে দেখা ও সাক্ষাত তখন সম্ভব হবে। কিন্তু দৃষ্টিতে আল্লাহর সত্তাকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে দেখা তখনও হতে পারবে না।

আয়াতের শেষদিকে আল্লাহ তাঁর আরো বিশেষত্ব বর্ণনা করে বলেছেন – وهو اللطيف الخبير

আরবি অভিধানে লতীফ শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি হচ্ছে দয়ালু এবং দ্বিতীয়টি সূক্ষ্ম বস্তু যা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করা যায় না বা জানা যায় না।

খবীর অর্থ যে খবর রাখে। বাক্যের অর্থ হল, আল্লাহ সূক্ষ্ম, তাই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁকে অনুভব করা যায় না এবং তিনি খবর রাখেন। তাই সমগ্র সৃষ্টজগতের কণা পরিমাণ বস্তুও তাঁর জ্ঞান ও খবরের বাইরে নয়। এখানে লতীফ শব্দের অর্থ দয়ালু নেওয়া হলে আলোচ্য বাক্যে এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, তিনি যদিও আমাদের প্রত্যেক কথা ও কাজের খবর রাখেন এবং এজন্য আমাদের গোনাহের কারণে আমাদেরকে পাকড়াও করতে পারেন, কিন্তু তিনি যেহেতু দয়ালু তাই সব গোনাহের কারণেই আমাদেরকে পাকড়াও না করে শুদ্ধ হওয়ার অবকাশ দেন।[৩০৬]

"তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশসমূহ ও দুনিয়া ছয়দিনে সৃষ্টি করেন,অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিনকে রাত দিয়ে আচ্ছাদিত করেন যাতে তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে, আর সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্রসমূহ যা তাঁরই আজ্ঞাধীন, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। মহিমময় বিশ্বজগতের প্রতিপালক। তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের রবকে ডাক; তিনি যালিমদেরকে পসন্দ করেন না।"[৩০৭]

আল্লাহ তাআলা সীমাহীন ক্ষমতার মালিক। তিনি যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে চান, সে জন্যে কেবল 'কুন' বা হও শব্দটি উচ্চারণ করলেই তা সৃষ্টি হয়ে যায়। তারপরও আল্লাহ বিশ্বজাহান সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। এর তাৎপর্য হল, মানুষকে বিশ্বব্যবস্থা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা ও কর্মপক্কতা শিক্ষা দেয়া।[৩০৮]

সহীহ রিওয়ায়িত অনুসারে যে ছয়দিনে জগত সৃষ্টি হয়েছে তা রবিবার থেকে শুরু করে শুক্রবারে শেষ হয়। শনিবারে জগত সৃষ্টির কাজ শুরু হয় নি। কোন কোন আলিম বলেন, সাবত অর্থ হল কর্তন করা। এদিনে কোন কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে এদিনকে ইয়াওমুস সাবত বা শনিবার বলা হয়।[৩০৯]

আলোচ্য আয়াতে আকাশসমূহ ও দুনিয়াসৃষ্টি ছয় দিনে সমাপ্ত করার কথা বলা হয়েছে। এর আরো ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে – "বল, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই যিনি দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন দু দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাচ্ছো? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক! তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা পৃথিবীতে এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ আর চারদিনের মধ্যে তাতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের সমভাবে প্রার্থনাকারীদের জন্য। এরপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধোঁয়া বিশেষ। এরপর তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা আসলাম অনুগত হয়ে। এরপর তিনি আকাশসমূহকে দুদিনে সাত আকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার বিধান ব্যক্ত করলেন এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দিয়ে এবং সুরক্ষিত করলাম। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।"[৩১০]

যে দুদিনে দুনিয়া সৃষ্টি করা হয়েছে তা ছিল রবি ও সোমবার। দ্বিতীয় দুদিন ছিল মঙ্গল ও বুধবার, এ সময়ে পৃথিবীর সাত সরঞ্জাম, পাহাড়, নদী ইত্যাদি সৃষ্টি করা হয়। এরপর সাত আকাশ সৃষ্টি করেন দুদিনে। বাহ্যত এ দুদিন হবে বৃহস্পতি ও শুক্রবার। এভাবে শুক্রবার পর্যন্ত ছয়দিন হল।

---

[৩০৬] প্রাগুক্ত

[৩০৭] আল কুরআন / ৭ : ৫৪-৫৫

[৩০৮] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪৫

[৩০৯] প্রাগুক্ত

[৩১০] আল কুরআন / ৪১ : ৯-১২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

আকাশসমূহ ও দুনিয়াসৃষ্টির পর আল্লাহ তাআলা আরশে সমাসীন হন। আয়াতের استوى শব্দের অর্থ অধিষ্ঠিত হওয়া বা সমাসীন হওয়া। রাজসিংহাসনকে আরশ বলা হয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে আল্লাহর আরশ সম্পর্কে। এর স্বরূপ কী এবং কীভাবে আল্লাহ তাআলা তাতে অধিষ্ঠিত হন?

ইমাম মালিক (র) কে কেউ যখন এর অর্থ জিজ্ঞাস করতেন তখন তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করতেন। তারপর বলতেন, আরশে অধিষ্ঠিত হওয়া বা সমাসীন হওয়ার অর্থটি তো সুস্পষ্ট। কিন্তু এর স্বরূপ ও অবস্থা মানব বুদ্ধি সম্যক ভাবে বুঝতে অক্ষম। এতে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। এর অবস্থা ও স্বরূপ জিজ্ঞাসা করা বিদআত। কেননা সাহাবী (রা) গণ রাসূলুল্লাহ (সা) কে এ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আওযায়ী, লায়স ইবন সাদ, সুফিয়ান ইবন ওয়াইনা, আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক প্রমুখ বলেছেন – যে সকল আয়াতে আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোর প্রতি যেভাবে আছে সেভাবে রেখেই কোন রূপ ব্যাখ্যা ও সদর্থ ছাড়াই বিশ্বাস করা উচিত।[৩১১]

সৃষ্টিকর্তা হওয়া এবং আদেশদাতা হওয়া আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। অন্য কেউ না সামান্যতম বস্তু সৃষ্টি করতে পারে আর না কাউকে আদেশ করার অধিকার রাখে। তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কাউকে কোন বিশেষ বিভাগ বা কার্যভার প্রদান করা হলে তাও বস্তুত আল্লাহরই আদেশ। এ সব বস্তু সৃষ্টি করা তাঁরই কাজ এবং সৃষ্টির পর এগুলোকে কাজে নিয়োগ করাও অন্য কারো সাধ্যের বিষয় নয়; বরং আল্লাহ তাআলারই অসীম শক্তির ফলশ্রুতি।

একমাত্র বিশ্বপালকই যখন অসীম ক্ষমতার মালিক এবং যাবতীয় অনুকম্পা ও নিআমত প্রদানকারী, তখন বিপদাপদ ও অভাব-অনটনে তাঁকেই ডাকা এবং তাঁর কাছেই দুআ প্রার্থনা করা উচিত। তাঁকে ছেড়ে অন্যদিকে মনোনিবেশ করা মূর্খতা এবং বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর। এ পর্যায়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনার বিশেষ ধরন বলে দেয়া হয়েছে।

আরবি ভাষায় দুআ শব্দটির অর্থ দ্বিবিধ – এক হল বিপদাপদ দূরীকরণ ও অভাব পূরণের জন্য কাউকে ডাকা এবং দুই হল যে কোন অবস্থায় কাউকে স্মরণ করা। এ আয়াতে উভয় অর্থই হতে পারে।

প্রথমবস্থায় অর্থ হবে, স্বীয় অভাব-অনটনের সমাধান একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা কর। আর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থ হবে, স্মরণ ও ইবাদত একমাত্র তাঁরই কর।[৩১২]

403787

এরপর বলা হয়েছে – তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর। এ নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট দুআ করার ও তাঁকে স্মরণ করার দুটি গুরুত্বপূর্ণ আদব বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমত অপরাগতা ও অক্ষমতা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে দুআ করা, তা কবুল হওয়ার জন্য জরুরী শর্ত। দুআর ভাষাও অক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বলার ভঙ্গি এবং দুআর আকার – আকৃতি, বিনয় ও নম্রতাসূচক হওয়া চাই। এতে বুঝা যায় যে, আজকাল জনসাধারণ যে ভঙ্গিতে দুআ করে সাধারণত একে দুআ বলাই উচিত নয়। বরং বলা উচিত দুআ পাঠ। কেননা প্রায়ই জানা থাকে না যে, মুখে যে শব্দ উচ্চারণ করা হচ্ছে, তার অর্থ কী? আজকাল সাধারণ মসজিদসমূহে এটি ইমামদের একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাদের কতিপয় আরবি বাক্য মুখস্থ থাকে এবং সালাত শেষে সেগুলো আবৃত্তি করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বয়ং ইমামগণেরও এসব শব্দের অর্থ জানা থাকে না। তাদের যদিও জানা থাকে, কিন্তু মুসল্লীগণ সে বিষয়ে থাকেন একেবারেই অন্ধকারে। তারা অর্থ না জানলেও ইমামের সাথে 'আমীন' 'আমীন' বলতে থাকেন। এ আগাগোড়া প্রহসনের সারমর্ম কতিপয় বাক্যের আবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। দুআ প্রার্থনার যে স্বরূপ তা এ ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। এটা ভিন্ন কথা যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় কৃপায় এসব নিস্প্রাণ বাক্যগুলোও কবুল করে নিতে পারেন। কিন্তু একথা বুঝা দরকার যে, দুআ প্রার্থনা পাঠ করার বিষয় নয়। কাজেই চাওয়ার যথার্থ রীতি অনুযায়ীই চাইতে হবে।

এ ছাড়া যদি কারো নিজের কথার অর্থ জানা থাকে এবং তা বুঝে বলে, কিন্তু বলার ভঙ্গি ও বাহ্যিক অবস্থায় বিনয় ও নম্রতা ফুটে না উঠলে এ দুআও দাবিতে পরিণত হয়, যা করার অধিকার কোন বান্দার নেই।[৩১৩]

---

[৩১১] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪৬

[৩১২] প্রাগুক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

মোটকথা, প্রথম শব্দে দুআর প্রাণ ব্যক্ত হয়েছে যে, স্বীয় অক্ষমতা, দীনতা, হীনতা এবং বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে অভাব-অনটন ব্যক্ত করা। দ্বিতীয় শব্দে আরো একটি নির্দেশ রয়েছে যে, চুপিচুপি ও সংগোপনে দুআ করা উত্তম এবং তা কবূলের নিকটবর্তী। কারণ উচ্চৈস্বরে দুআ চাওয়ার মধ্যে প্রথমত বিনয় ও নম্রতা বিদ্যমান থাকা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ এতে রিয়া ও সুখ্যাতিরও আশংকা রয়েছে। তৃতীয়তঃ এতে প্রকাশ পায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা জানে না যে, আল্লাহ তাআলা শ্রোতা ও মহাজ্ঞানী, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সবই তিনি জানেন এবং সরব ও নিরব সব কথাই শোনেন। এ কারণে খয়বর যুদ্ধের সময় দুআ করতে গিয়ে সাহাবী (রা) গণের আওয়াজ উচ্চ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন – 'তোমরা কোন বধিরকে অথবা অনুপস্থিতকে ডাকাডাকি করছো না যে, এত জোরে বলতে হবে। বরং একজন শ্রোতা ও নিকটবর্তী সম্বোধন করছো। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাকে সজোরে বলা অর্থহীন। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা জনৈক সৎকর্মীর দুআ উল্লেখ করে ইরশাদ করেন – اذ نادى ربه نداء خفيا 'যখন সে তার পালনকর্তাকে অনুচ্চস্বরে ডাকলো।' এতে বুঝা গেল যে, অনুচ্চস্বরে দুআ করা আল্লাহ পছন্দ করেন।

আল্লাহ তাআলার এই বিনীতভাবে প্রার্থনা এবং নিরব দুআ করতে বলার আদেশের মধ্যে তাঁর আধ্যাত্মিক সত্তার স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি সর্বত্র উপস্থিত আছেন। তাঁর উপস্থিতির মানে অবশ্য এটা নয় যে, তিনি স্বশরীরে উপস্থিত আছেন। এর অর্থ হল, তাঁর জ্ঞান পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরামণূ বেষ্টন করে আছে। রাতের অন্ধকারে বা দিনের আলোতে তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি নতুন বীজও কুঁড়ি হয়ে ওঠে না। একটি নতুন ফুলও ফোটে না। একটি পাতাও গাছ থেকে ঝরে পড়ে না। আল্লাহর এ সর্বময় ক্ষমতা ও উপস্থিতির বিষয়টি কুরআন বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছে। যেমন –

"আল্লাহই ঊর্ধ্বদেশে আকাশসমূহ স্থাপন করেছেন খুঁটি ব্যতীত – তোমরা এটা দেখছ। এরপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়মাধীন করলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।"[৩১৪]

"তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, সুতরাং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকারী। এটা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে। তিনি তো অহঙ্কারীকে পসন্দ করেন না।"[৩১৫]

"আল্লাহ বললেন, তোমরা দু ইলাহ গ্রহণ কর না; তিনিই তো একমাত্র ইলাহ। সুতরাং আমাকেই ভয় কর। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই এবং নিরবিচ্ছিন্ন আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য। তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অপরকে ভয় করবে? তোমাদের নিকট যে সমস্ত নিয়ামত রয়েছে তা তো আল্লাহরই নিকট হতে; আবার যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে আহ্বান কর।"[৩১৬]

"যদি আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকত আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে, তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে তা হতে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র, মহান। তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। তারা কি তাঁকে ব্যতীত বহু ইলাহ গ্রহণ করেছে? বল, তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। এটাই আমার সাথে যারা আছে তাদের উপদেশ এবং এটাই উপদেশ ছিল আমার পূর্ববর্তীদের জন্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না, ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নি তার প্রতি এ ওহী ব্যতীত যে, 'আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই; সুতরাং আমারই ইবাদত কর।"[৩১৭]

---

[৩১৩] প্রাগুক্ত।
[৩১৪] আল কুরআন / ১৩ : ২
[৩১৫] আল কুরআন / ১৬ : ২২-২৩
[৩১৬] আল কুরআন / ১৬ : ৫১-৫৩
[৩১৭] আল কুরআন / ২১ : ২২-২৫

Dhaka University Institutional Repository

"আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি এবং তাঁর সাথে অপর কোন ইলাহ নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ স্বীয় সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ কত পবিত্র! তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।"[৩১৮]

"যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি; সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে। আর তারা তাঁর পরিবর্তে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে অন্যদেরকে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট এবং তারা নিজেদের অপকার অথবা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না এবং জীবন ও উত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখে না।"[৩১৯]

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দীন; অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।"[৩২০]

"পৃথিবীর সকল বৃক্ষ যদি কলম হয় আর সমুদ্র হয় কালি এবং এর সাথে আরো সাত সমুদ্র যুক্ত হয়, তবুও আল্লাহর বাণী নিঃশেষিত হবে না। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৩২১]

"আল্লাহ, যিনি আকাশসমূহের, দুনিয়াও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে। এরপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সুপারিশকারীও নেই; তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? তিনি আকাশ হতে দুনিয়াপর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন, এরপর একদিন সমস্ত কিছুই তাঁর সামনে সমুত্থিত হবে – যে দিনের পরিমাপ হবে তোমাদের হিসেবে হাজার বছর। তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।"[৩২২]

"শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান, যারা কঠোর পরিচালক এবং যারা যিকর আবৃত্তিতে রত – নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ এক, যিনি আকাশসমূহ ও দুনিয়া এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুর প্রভূ এবং প্রভূ সকল উদয়স্থলের।"[৩২৩]

"বল, আমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র এবং কোন ইলাহ নেই আল্লাহ ব্যতীত, যিনি এক, যিনি প্রবল প্রতাপশালী। যিনি আকাশসমূহ, দুনিয়া ও তাদের মধ্যবর্তী সকল কিছুর প্রতিপালক, যিনি পরাক্রমশালী, যিনি মহাক্ষমাশীল। বল, এটা এক মহাসংবাদ। যা হতে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো।"[৩২৪]

"বল, হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে বলছো? তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহী হয়েছে, তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার তো কর্ম নিষ্ফল হবেই এবং তুমি অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব তুমি আল্লাহরই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞ হও। তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করে না। কিয়ামতের দিন সমস্ত দুনিয়া থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আকাশসমূহ থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর দক্ষিণ হাতে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে। এবং শিঙ্গায় ফু দেয়া হবে, ফলে যাদেরকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন তারা ছাড়া আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সকলেই মূর্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর আবার শিঙ্গায় ফু দেয়া হবে, সাথে সাথে তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। বিশ্ব তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা পেশ করা হবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি যুলম করা হবে না।"[৩২৫]

"হা মীম। এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট হতে – যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবূল করেন, যিনি শাস্তি দানে কঠোর, শক্তিশালী। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট। কেবল

---

[৩১৮] আল কুরআন / ২৩ : ৯১–৯২
[৩১৯] আল কুরআন / ২৫ : ২–৩
[৩২০] আল কুরআন / ৩০ : ৩০
[৩২১] আল কুরআন / ৩১ : ২৭
[৩২২] আল কুরআন / ৪১ : ৪–৬
[৩২৩] আল কুরআন / ৩৭ : ১–৫
[৩২৪] আল কুরআন / ৩৮ : ৬৫–৬৮
[৩২৫] আল কুরআন / ৩৯ : ৬৪– ৬৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

কাফিররাই আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে; সুতরাং দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।"[৩২৬]

"তিনিই ইলাহ আকাশসমূহে, তিনিই ইলাহ পৃথিবীতে এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। কত মহান তিনি যিনি আকাশসমূহ ও দুনিয়া এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর অধিপতি! কিয়ামাতের জ্ঞান কেবল তাঁরই আছে এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"[৩২৭]

"আর এই যে, সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট, আর এই যে তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান, আর এই যে তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান, আর এই যে, তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল – পুরুষ ও নারী শুক্রবিন্দু হতে, যখন তা স্খলিত হয়, আর এই যে, পুনরুত্থান ঘটাবার দায়িত্ব তাঁরই। আর এই যে, তিনিই অভাবমুক্ত করেন ও সম্পদ দান করেন, আর এই যে, শিরা নক্ষত্রের মালিক তিনি। আর এই যে, তিনিই প্রাচীন আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিলেন এবং ছামূদ সম্প্রদায়কেও; কাউকেও তিনি বাকি রাখেন নি – আর এদের আগে নূহের সম্প্রদায়কেও তারা ছিল অতিশয় যালিম ও অবাধ্য। উল্টানো আবাসভূমিকে নিক্ষেপ করেছিলেন – তাকে আচ্ছন্ন করল কী সর্বগ্রাসী শাস্তি! তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে?"[৩২৮]

আল্লাহ তাআলার সর্বময় ক্ষমতা তাঁর আধ্যাত্মিকতাকেই প্রামাণ্য বিষয় হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থিত করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে সবসময় মানুষের সাথে থাকার বিশেষ ঘোষণাও এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। ইরশাদ হয়েছে –

"আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই; তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত। তিনিই ছয় দিনে আকাশসমূহ ও দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন – তিনি তোমাদের সাথে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই এবং আল্লাহরই দিকে সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে। তিনিই রাতকে প্রবেশ করান দিনে এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে এবং তিনি অন্তর্যামী।"[৩২৯]

"তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত। তারা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, তাঁরই সকল উত্তম নাম। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকলই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞময়।"[৩৩০]

"আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর। এবং তিনি অন্তর্যামী।"[৩৩১]

"তোমাদের প্রতিপালকের মার বড়ই কঠিন। তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান এবং তিনিই ক্ষমাশীল ও প্রেমময়। আরশের অধিকারী ও সম্মানিত। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।"[৩৩২]

---

[৩২৬] আল কুরআন / ৪০: ১–৪
[৩২৭] আল কুরআন / ৪৩ : ৮৪–৮৫
[৩২৮] আল কুরআন / ৫৩ : ৪২–৫৫
[৩২৯] আল কুরআন / ৫৭ : ১–৬
[৩৩০] আল কুরআন / ৫৯ : ২২-২৪
[৩৩১] আল কুরআন / ৬৪ : ৪
[৩৩২] আল কুরআন / ৮৫ : ১২–১৬

Dhaka University Institutional Repository

"বল, তিনিই আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন,সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী; তিনি কাকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয় নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।"[৩৩৩]

"হে মানুষ! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি।"[৩৩৪]

"সকল প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। তা সত্ত্বেও কাফিররা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।"[৩৩৫]

"তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর জ্যোতি নির্বাপিত করতে চায়। কাফিররা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত কিছুই চান না। মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করলেও অপর সমস্ত দীনের উপর জয়যুক্ত করার জন্য তিনিই পথনির্দেশ ও সত্য দীনসহ তাঁর রাসূল প্রেরণ করেছেন।"[৩৩৬]

"আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার যার মধ্যে রয়েছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ; এটা জ্বালানো হয় পূত পবিত্র যায়তুন গাছের তেল দিয়ে যা পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়। আগুন তাকে স্পর্শ না করলেও যেন তার তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে, জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"[৩৩৭]

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দেবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দেবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু।"[৩৩৮]

"তারা আল্লাহর নূর ফুৎকারে নিভাতে চায় কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফিররা তা অপসন্দ করে। তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ সকল দীনের উপর তাকে বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে।"[৩৩৯]

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর – বিশুদ্ধ তওবা; সম্ভবত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কাজগুলো মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ লজ্জা দেবেন না নবীকে এবং তার মুমিন সাথীদেরকে, তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও দক্ষিণ পাশে ধাবিত হবে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[৩৪০]

"পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই এবং যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকেই আল্লাহর দিক। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।"[৩৪১]

আল্লাহ তাআলার আধ্যাত্মিকতার একটি অবিস্মরণীয় দিক হল আল্লাহ তাআলা কথা বলেন। কথা বলার গুণ তাঁর আছে। তবে মানুষের সাথে দুনিয়া জীবনে প্রকাশ্যে ও সরাসরি কথা তিনি বলেন না। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে –

"অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা পূর্বে আমি তোমাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল, যাদের কথা তোমাকে বলি নি। মূসার সাথে আল্লাহ সাক্ষাত বাক্যালাপ করেছিলেন।"[৩৪২]

---

[৩৩৩] আল কুরআন / ১১২ : ১–৪
[৩৩৪] আল কুরআন / ৪: ১৭৪
[৩৩৫] আল কুরআন / ৬ : ১
[৩৩৬] আল কুরআন / ৯ : ৩২–৩৩
[৩৩৭] আল কুরআন / ২৪ : ৩৫
[৩৩৮] আল কুরআন / ৫৭ : ২৮
[৩৩৯] আল কুরআন / ৬১ : ৮–৯
[৩৪০] আল কুরআন / ৬৬ : ৮
[৩৪১] আল কুরআন / ২ : ১১৫
[৩৪২] আল কুরআন / ৪: ১৬৪

Dhaka University Institutional Repository

"স্মরণ কর এ কিতাবে মূসার কথা, সে ছিল বিশেষ মনোনীত এবং সে ছিল রাসূল, নবী। তাকে আমি আহ্বান করেছিলাম তূর পাহাড়ের দক্ষিণ দিক হতে এবং আমি অন্তরঙ্গ আলাপে তাকে নৈকট্য দান করেছিলাম।"[৩৪৩]

আল্লাহ পৃথিবী ধারণ করে আছেন তাঁর অসীম ক্ষমতায়। মানুষ, জীব-জন্তু, প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক সৃষ্টিসমূহ অনুভবও করতে পারছে না কত নিপুণভাবে মহান আল্লাহ তাদের সংরক্ষণের এ বিরাট কাজ কত অবলীলায় সম্পন্ন করছেন। ইরশাদ হয়েছে – "আল্লাহই আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়, তারা স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে তাদেরকে সংরক্ষণ করবে? তিনি তো অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।"[৩৪৪]

আল্লাহর আধ্যাত্মিকতা এমন সর্বব্যাপী যে, প্রশংসা ও স্তুতি কেবল তাঁরই করা যায়। এ জন্য কৃতজ্ঞ মানুষ আল্লাহর প্রশংসা করে। অকৃতজ্ঞ মানুষ তা থেকে বিরত থেকে নিজের ক্ষতিই কেবল করে। অথচ বিশ্বজাহানের প্রতিটি সজিব-নির্জীব সৃষ্টি নিয়ত তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। প্রতিটি বস্তু ও জীবের আল্লাহর সত্তার এমনি ধারার পবিত্রতা ঘোষণার কথা ব্যক্ত করে আল্লাহ তাআলা আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে –

"আসমানে যা আছে ও যমীনে যা আছে সব আল্লাহরই; তোমাদের আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে এবং তোমরা কুফরী করলেও আসমানে যা আছে ও যমীনে যা আছে তা আল্লাহরই এবং আল্লাহ অভাবমুক্ত ও প্রশংসাভাজন।"[৩৪৫]

"সাত আকাশ, দুনিয়া এবং তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না; নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।"[৩৪৬]

"বল, প্রশংসা আল্লাহরই যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি, তাঁর সার্বভৌমত্বে কোন অংশী নেই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না যে কারণে তাঁর অভিভাবকের প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর।"[৩৪৭]

"বল, সকল প্রশংসা আল্লাহরই এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি! শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ না তারা যাদেরকে শরীক করে তারা?"[৩৪৮]

"আর বল, সকল প্রশংসা আল্লাহরই, তিনি তোমাদেরকে শীঘ্রই দেখাবেন তাঁর নিদর্শন; তখন তোমরা তা বুঝতে পারবে। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে তোমার প্রতিপালক গাফিল নন।"[৩৪৯]

"সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে এবং অপরাহ্ণে ও যুহরের সময় আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁরই। তিনিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমিকে পুনর্জীবিত করেন তার মৃত্যুর পর। এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে।"[৩৫০]

"তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর – আকাশসমূহ ও দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন? তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ! বল, সকল প্রশংসা আল্লাহরই, কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই; আল্লাহ, তিনি তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।"[৩৫১]

"সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সকল কিছুরই মালিক এবং আখিরাতেও প্রশংসা তাঁরই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে, যা তা হতে নির্গত হয় এবং যা আকাশ হতে নাযিল হয় এবং কিছু তাতে উত্থিত হয়। তিনিই পরম দয়ালু, অতিশয় ক্ষমাশীল।"[৩৫২]

---

[৩৪৩] আল কুরআন / ১৯ : ৫১-৫২
[৩৪৪] আল কুরআন / ৩৫ : ৪১
[৩৪৫] আল কুরআন / ৪: ১৩১
[৩৪৬] আল কুরআন / ১৭ : ৪৪
[৩৪৭] আল কুরআন / ১৭: ১১১
[৩৪৮] আল কুরআন / ২৭ : ৫৯
[৩৪৯] আল কুরআন / ২৭ : ৯৩
[৩৫০] আল কুরআন / ৩০ : ১৭-১৯
[৩৫১] আল কুরআন / ৪: ২৫-২৬
[৩৫২] আল কুরআন / ৩৪ : ১-২

Dhaka University Institutional Repository

"আর সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য।"[৩৫৩]
"প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আকাশসমূহের প্রতিপালক, পৃথিবীর প্রতিপালক এবং জগতসমূহের প্রতিপালক। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে গৌরব-গরিমা তাঁরই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৩৫৪]
"কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব!"[৩৫৫]
"সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।"[৩৫৬]
"'আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৩৫৭]
"আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে আল্লাহর, যিনি অধিপতি, মহাপবিত্র, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৩৫৮]
"আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আধিপত্য তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁরই; তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[৩৫৯]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মহামহিম অদৃশ্য-অস্পৃশ্য-সর্বময় সত্তা আমাদের কাছে তখনই আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তিনি ঘোষণা করেন, তিনি আছেন পৃথিবীর সকল মানুষের সাথে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা তাঁর অসীম সত্তার মাধ্যমে বেষ্টন করে রেখেছেন পৃথিবীর আপামর জনসাধারণ ও সৃষ্টিরাজিকে। ইরশাদ হচ্ছে –
"আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে ঈমান আনুক যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।"[৩৬০]
"স্মরণ কর – আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন। আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে উল্লিখিত অভিশপ্ত বৃক্ষটি কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি, কিন্তু তা তাদের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।"[৩৬১]
"তিনিই ছয়দিনে আকাশসমূহ ও দুনিয়াসৃষ্টি করেছেন; অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা নামে ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন – তিনি তোমাদের সাথেই আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন।"[৩৬২]
"তুমি কি লক্ষ্য কর না, আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। তারা এরচেয়ে কম হোক বা বেশি হোক তিনি তো তাদের সাথেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন। অতঃপর তারা যা করে; তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সববিষয়ে সম্যক অবগত।"[৩৬৩]

আল্লাহ তাআলা অসীম ক্ষমতাশালী অব্যয়, অক্ষয়, অনন্ত সত্তা। তিনি সকল ক্ষমতার উৎস। আধ্যাত্মিকতারও তিনিই উৎস। তাঁর কাছে প্রকাশ্য ও গোপন বলে কোন বিষয় নেই। তিনি জানেন সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়। মানুষ

---

[৩৫৩] আল কুরআন / ৩৭ : ১৮২
[৩৫৪] আল কুরআন / ৪: ৩৬-৩৭
[৩৫৫] আল কুরআন / ৫৫ : ৭৮
[৩৫৬] আল কুরআন / ৫৬ : ৭৪, ৯৬
[৩৫৭] আল কুরআন / ৫৭ : ১, ৫৯ : ১, ৬১ : ১
[৩৫৮] আল কুরআন / ৬২ : ১
[৩৫৯] আল কুরআন / ৬৪ : ১
[৩৬০] আল কুরআন / ২ : ১৮৬
[৩৬১] আল কুরআন / ১৭ : ৬০
[৩৬২] আল কুরআন / ৫৭ : ৪
[৩৬৩] আল কুরআন / ৫৮ : ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

যা প্রকাশ করে না, মনের গহীনে লুকানো রাখে এমনকি মানুষের অবচেতন যে ভাবনাটি সে নিজেও জানে না তাও জানেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহর আধ্যাত্মিকতার এ এক অসাধারণ দিক। ইরশাদ হচ্ছে –

"তারা কি জানে না যে, যা তারা গোপন রাখে কিংবা ঘোষণা করে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা জানেন?"[৩৬৪]

"আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সমস্ত আল্লাহরই। তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে খুশি শাস্তি দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[৩৬৫]

"আল্লাহ, নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনে কিছুই তাঁর নিকট গোপন থাকে না।"[৩৬৬]

"বল – তোমাদের অন্তরে যা আছে তা যদি তোমরা গোপন কর অথবা ব্যক্ত কর আল্লাহ তা অবগত আছেন এবং আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তাও অবগত আছেন। আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[৩৬৭]

"আসমান ও যমীনে তিনিই আল্লাহ, তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যা অর্জন কর তাও অবগত আছেন।"[৩৬৮]

"দৃষ্টি তাঁকে অবধারণ করতে পারে না, তিনি অবধারণ করেন সকল দৃষ্টি এবং তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।"[৩৬৯]

"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো জান যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি; আকাশসমূহ ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকে না।"[৩৭০]

"তোমাদের মধ্য হতে যারা আগে গত হয়েছে আমি তাদেরকে জানি এবং পরে যারা আসবে তাদেরকেও জানি। তোমার প্রতিপালকই তাদেরকে সমবেত করবেন; তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।"[৩৭১]

"তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর আল্লাহ তা জানেন।"[৩৭২]

"তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন। এ সকলই আছে এক কিতাবে; নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর নিকট সহজ।"[৩৭৩]

"তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন এবং সমস্ত বিষয় আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।"[৩৭৪]

"জেনে রাখ, আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই; তোমরা যাতে লিপ্ত তিনি তা জানেন। যেদিন তারা তাঁর নিকট ফিরে যাবে সেদিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন তারা যা করত। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।"[৩৭৫]

"তাদের অন্তর যা গোপন করে এবং তারা যা প্রকাশ করে তা তোমার প্রতিপালক অবশ্যই জানেন।"[৩৭৬]

"কিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না আগামি কাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সকল বিষয়ে অবহিত।"[৩৭৭]

"তোমরা যেখানেই থাকো না কেন – তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন।"[৩৭৮]

---

[৩৬৪] আল কুরআন / ২ : ৭৭
[৩৬৫] আল কুরআন / ২ : ২৮৪
[৩৬৬] আল কুরআন / ৩ : ৫
[৩৬৭] আল কুরআন / ৩ : ২৯
[৩৬৮] আল কুরআন / ৬ : ৩
[৩৬৯] আল কুরআন / ৬ : ১০৩
[৩৭০] আল কুরআন / ১৪ : ৩৮
[৩৭১] আল কুরআন / ১৫ : ২৪–২৫
[৩৭২] আল কুরআন / ১৬ : ১৯
[৩৭৩] আল কুরআন / ২২ : ৭০
[৩৭৪] আল কুরআন / ২২ : ৭৬
[৩৭৫] আল কুরআন / ২৪ : ৬৪
[৩৭৬] আল কুরআন / ২৭ : ৭৪
[৩৭৭] আল কুরআন / ৩১ : ৩৪
[৩৭৮] আল কুরআন / ৫৭ : ৪

Dhaka University Institutional Repository

"তুমি কি লক্ষ কর না, আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থ জন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যেও হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না। তারা এরচেয়ে কম হোক বা বেশি হোক তিনি তো তাদের সাথেই আছেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন। অতঃপর তারা যা করে; তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন তা জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।"[৩৭৯]

"'আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তিনি জানেন এবং তিনি জানেন তোমরা যা গোপন কর ও তোমরা যা প্রকাশ কর এবং তিনি অন্তর্যামী।"[৩৮০]

"আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ এবং তাদের মত পৃথিবীও, তাদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ; যাতে তারা বুঝতে পারে যে, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।"[৩৮১]

"স্মরণ কর – নবী তার স্ত্রীদের একজনকে গোপনে একটি কথা বলেছিল। এরপর সে যখন তা অন্যকে বলে দিয়েছিল এবং নবীকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন, তখন নবী এ বিষয়ে কিছু ব্যক্ত করল এবং কিছু অব্যক্ত রাখলো। যখন নবী তা তার সে স্ত্রীকে জানালো তখন সে বলল, কে আপনাকে এটা অবহিত করল? নবী বলল – আমাকে অবহিত করেছেন তিনি, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবগত।"[৩৮২]

"যারা দৃষ্টির অগোচরে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যেই বল, তিনি তো অন্তর্যামী।"[৩৮৩]

আল্লাহর সত্তাজাত আধ্যাত্মিকতার একটি অনন্য দিক হল তাওহীদ। তাওহীদ শব্দটি وحد হতে باب تفعيل এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ কাউকে একক বানানো বা কোন এককের স্বীকৃতি প্রদান করা।[৩৮৪] মুতাকাল্লিমীনের পরিভাষায় আল্লাহর ওয়াহদানিয়্যাত বা একত্ব বুঝাতে এ শব্দটি প্রয়োগ করা হয়।[৩৮৫]

এভাবেও শব্দটির অর্থ করা হয় – He asserted or declared, God to be one, He asserted, declared or preferred belief in the unity of God.[৩৮৬]

ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, আল্লাহ তাআলার যাত, সিফাত ও কাজ সর্ব বিষয়ে এক বা অদ্বিতীয় বলে ইয়াকীন পোষণ করা ও মান্য করা[৩৮৭] এবং সাক্ষ্য প্রদান করা যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তারই, তিনি সমস্ত বস্তুর উপর শক্তিশালী।[৩৮৮]

ইমাম তাহাবী (র) এর ভাষায়[৩৮৯] –

توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله تعالى واحد لاشريك له لاشئ مثله ولاشئ يعجزه ولا اله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لايفنى ولايبيد

ইমাম আবূ হানীফা (র) তাঁর আকীদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন[৩৯০] –

---

[৩৭৯] আল কুরআন / ৫৮ : ৭
[৩৮০] আল কুরআন / ৬৪ : ৪
[৩৮১] আল কুরআন / ৬৫ : ১২
[৩৮২] আল কুরআন / ৬৬ : ৩
[৩৮৩] আল কুরআন / ৬৭ : ১২–১৩
[৩৮৪] Edward William Lane, *Arabic English Lexicon*, vol.8, Beirut, Librairie Du Liban, 1980, p.2927
[৩৮৫] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১২শ খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ.৯৭
[৩৮৬] Edward William Lane, ibid, p.2927
[৩৮৭] মোহাম্মদ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, *হাকীকতে তাওহীদ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৫, পৃ.৮ / আব্দুস শহীদ নাসিম, *ঈমানের পরিচয়*, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ.৭২
[৩৮৮] ইমাম গাযালী (র), *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২০৮
[৩৮৯] মওলানা ইউসুফ, *দরসে আকিদাতুত তাহাবী*, উর্দূ শরাহ, আশরাফি বুক ডিপো, যশোর, ১৪০৯ হি, পৃ.৭–৯
[৩৯০] ইমাম আবূ হানীফা (র), *আল ফিকহুল আকবর*, দার আল কুতুব, বৈরুত, ১৪২০হি, পৃ.৩১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

اصل التوحيد مما يصح الاعتقاد عليه يجب ان يقول امنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره من الله تعالى والحساب الميزان والجنة والنار حق كله والله تعالى واحد لامن طريق العدد ولكن من طريق انه لاشريك له

সূরা ইখলাসে তাওহীদের বর্ণনা সুন্দর ভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে।[৩৯১] আল্লাহ তাআলা নিজে তাওহীদের সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন –

قل هو الله احد – الله الصمد – لم يلد ولم يولد – ولم يكن له كفوا احد

"বল – তিনিই আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন; সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কাউকেও জন্ম দেন নি, তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।"[৩৯২]

আর আল্লাহ তাআলার একত্বের অর্থ হচ্ছে তাঁর অস্তিত্বে তিনি একা। তাঁর অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কোন কিছুরই অস্তিত্ব স্থায়ী নয়। তিনি ছাড়া অন্য যা কিছু আছে তা তাঁরই দান এবং তাঁর কাছ থেকেই সাহায্য গ্রহণ করে।[৩৯৩]

আরো ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, এ গোটা বিশ্বের ইলাহ মাত্র একজন। সমগ্র সৃষ্টিজগত তাঁর অসীম ক্ষমতা, গৌরব ও মহত্বের সামনে নতশিরে দণ্ডায়মান।[৩৯৪]

এভাবেও বলা যায় – A Muslim believes that Allah is one and only God and creator of the universe. He has no associate, esluals assistants, son, fatterar and wife.[৩৯৫]

আল কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে – "আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন। কিয়ামতের দিন তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়।"[৩৯৬]

মূলত সত্তাগত দিক থেকে তিনি যেমন এক ও অদ্বিতীয় তেমনি গুণাবলীর দিক থেকেও তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তিনি লা শরীক, তাঁর কোন শরীক নেই। ইবাদত ও উপাসনা লাভের অধিকারেও তাঁর কোন শরীক নেই।[৩৯৭]

এ বিশ্বজগতের সৃষ্টি, প্রতিপালন, শৃঙ্খলা বিধানে তাঁর কোন শরীক বা সহযোগী নেই। ইবাদাতের যোগ্য একমাত্র তিনিই।[৩৯৮] আল্লাহ তাআলা বলেছেন – "আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি দয়াময়, অতি দয়ালু।"[৩৯৯]

আল্লাহ তাআলার একত্বের চেতনাবোধ দিয়ে তাঁর দেখানো পথে জীবন গড়ে তুলতে হবে। নীতি নৈতিকতা ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এ তাওহীদের মূলনীতির আলোকেই।[৪০০]

একাধিক ইলাহ'র সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়ে কুরআন মাজীদ স্পষ্ট ভাষায় বলেছে – "যদি আল্লাহ ব্যতীত বহু ইলাহ থাকত আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব তারা যা বলে তা হতে আরশের অধিপতি আল্লাহ পবিত্র, মহান।"[৪০১]

---

[৩৯১] এ এম এম সিরাজুল ইসলাম, *ঈমান পরিচিতি,* ইসলামিয়া কুরআন মহল, ঢাকা ২০০১, পৃ.৩১

[৩৯২] আল কুরআন / ১১২ :১–৪

[৩৯৩] সাইয়্যেদ কুতুব, *তাফসীরে ফী যিলালিল কুরআন,* দারুশ শরফ, ১৯৮২, বৈরুত, পৃ.৪০০২

[৩৯৪] ইমাম গাযালী, *ইসলামী আকীদা,* অনু. মুহাম্মদ মূসা, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ.৫৭

[৩৯৫] Dr. F.M. Moniruzzaman, The Glorious Islam, Zeenat Books, Dhaka, 1999, p.155

[৩৯৬] আল কুরআন / ১৯ : ৯৩–৯৫

[৩৯৭] মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরীদী, *কুরআন সুন্নাহ ও যুক্তির আলোকে ইসলামী আকীদা,* আল আকাবা পাবলিকেশন্স, ঢাকা ১৪১৯ হি, পৃ.৪৫

[৩৯৮] মাওলানা এ এম এম সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩১

[৩৯৯] আল কুরআন / ২ : ১৬৩

[৪০০] সাইয়্যেদ কুতুব, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫২

[৪০১] আল কুরআন / ২১ : ২২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত একাধিক ইলাহ থাকার ধারণা সম্পূর্ণ অবাস্তব।[৪০২] এ প্রসঙ্গে কুরআন আরো ইরশাদ করেছে – "আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি এবং তাঁর সাথে অপর কোন ইলাহ নেই; যদি থাকত তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তার করত। তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ কত পবিত্র।"[৪০৩]

একাধিক ইলাহ থাকার পেছনে কোন প্রমাণ বা যুক্তি নেই। এতদসত্ত্বেও কোন কোন মানুষ নিজেদের বিবেক বুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে কখনো পাথরের, কখনো পশু, মাছের, গাছের, আগুনের এমনকি নিজের তৈরী মূর্তি পূজায় লিপ্ত হয়েছে। কেউ কেউ মূর্খতা আর অজ্ঞানতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নিজেকেই ইলাহ হওয়ার দাবী করেছে। যেমন ফিরআউন ও নমরূদ।

মহান আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে ধারণা সমগ্র সৃষ্টিকূল থেকে আলাদা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিবেক বুদ্ধির দাবীও হচ্ছে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে ব্যবধান থাকা একান্ত প্রয়োজন। এতটা ব্যবধান থাকা দরকার যা সৃষ্টির পক্ষে অনুমান অসম্ভব। স্রষ্টা কখনো সৃষ্টির অনুরূপ হতে পারে না। ব্যক্তি সত্তার দিক থেকে নয়, বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও নয়।[৪০৪]

যেমন হাদীসে এসেছে, আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, আদম সন্তান আমাকে গাল মন্দ করে অথচ আমাকে গালমন্দ করা তার উচিত নয়। আর সে আমাকে অস্বীকার করে, অথচ তা তার উচিত নয়। আমাকে গালমন্দ করা হচ্ছে আর এ উক্তি যে, আমার সন্তান আছে। আর আমাকে অস্বীকার করা হচ্ছে তার এ উক্তি যে, যেভাবে আল্লাহ আমাকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন সেভাবে কখনো তিনি আমাকে পুনঃ সৃষ্টি করবেন না।"[৪০৫]
অথচ আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে – "তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনেন অতঃপর তিনি একে সৃষ্টি করবেন আবার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৪০৬]

কাজেই আল্লাহ তাআলা চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব ও অবিনশ্বর সত্তা। তাঁর কোন দেহ নেই। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর প্রশ্ন অবান্তর। তিনি কোন জড় পদার্থও নন, অতএব তাঁর কোন অপচয় বা ক্ষয় নেই। তিনি চিরস্থায়ী, সর্বব্যাপী। প্রতিটি জিনিস তাঁর কাছে ফিরে যাবে।[৪০৭] ইরশাদ হয়েছে –
"তুমি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডেকো না, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"[৪০৮]
"তুমি নির্ভর কর তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, যিনি মরবেন না এবং তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত।"[৪০৯]

বস্তুত আল্লাহ তাআলার একক সত্তা ইসলামী আধ্যাত্মিকতার প্রথম এবং প্রধান উৎস। তিনি নিজে গোপন থেকে সকল কিছু প্রকাশ করেছেন। বিশ্বজাহানকে মানুষের বাসোপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। তার সুখ ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছেন। তারপরও তাকে তাঁর হুকুম আহকাম পালনে বাধ্য না করে স্বাধীনতা দিয়েছেন। ইচ্ছে করলে সে হুকুম মেনে নিজের কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে অথবা তাঁর অবাধ্য হয়ে চিরস্থায়ীভাবে নিজের জন্য ধ্বংস বেছে নিতে পারে।
কুরআন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ে যে কথা বলে, যে মতবাদ ও নীতিমালা পেশ করে, যে সকল দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে তার কেন্দ্র হল আত্মা। কেননা আত্মা অদৃশ্য এবং অস্পৃশ্য। কিন্তু মানুষের সকল কাজ গ্রহণীয়

---

[৪০২] মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরীদী, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬
[৪০৩] আল কুরআন / ২৩ : ৯১
[৪০৪] ইমাম গাযালী, *ইসলামী আকীদা,* প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭, ইমাম আবূ হানীফা (র), *আল ফিকহুল আকবর,* প্রাগুক্ত, পৃ.৫৩
[৪০৫] মুহাম্মদ ইসমাঈল বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তাওহীদ।
[৪০৬] আল কুরআন / ৩০ : ২৭
[৪০৭] ইমাম গাযালী, *ইসলামী আকীদা,* প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪
[৪০৮] আল কুরআন / ২৮ : ৮৮
[৪০৯] আল কুরআন / ২৫ : ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

বা কবুল যোগ্য হওয়ার বিষয়টি এই আত্মার উপরই নির্ভর করে। আল কুরআনে এই আত্মা বুঝানোর জন্য তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলো হল রূহ, কলব ও নফস। কোন কোন ক্ষেত্রে শব্দগুলো ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে অভিন্ন অর্থে। কুরআনী বর্ণনায় বিভিন্নভাবে বিষয়টির বিবরণ এসেছে। যেমন –

و يسئلونك عن الروح ط قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا -

"তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত এবং তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।"[৪১০]

রূহ অর্থ হল আত্মা ও আদেশ। জীবের ক্ষেত্রে এর অর্থ আত্মা এবং আল্লাহর ক্ষেত্রে এর অর্থ আদেশ। যেমন روح الله অর্থ আল্লাহর আদেশ। কেননা মানুষের মত আল্লাহর জন্য আত্মার কল্পনা করা যায় না। মানুষের আত্মাও দৃশ্যমান কোন বস্তু নয়। আর মানুষকে এ সম্পর্কে জ্ঞানও দেয়া হয়েছে খুব সীমিত। রূহ জড়জগতের উর্ধ্বের বিষয়, এর ব্যাপার মানুষের বোধগম্য নয়, তাই বিস্তারিত কিছু বলা হয় নি।

এ বিষয়ই এখানে প্রথম প্রণিধানযোগ্য যে, যারা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল তারা কী অর্থে প্রশ্নটা করেছিল? কোন তাফসীরকার বর্ণনার পূর্বাপর ধারা বিশ্লেষণ করে বলেছেন, প্রশ্নটি ওহী, কুরআন অথবা ওহীবাহক জিবরাঈল (আ) সম্পর্কে করা হয়েছে। কেননা এর আগের বিভিন্ন এ জাতীয় প্রশ্নে কুরআন, ওহী ও জিব্রাঈল (আ) এর কথা ফিরে ফিরে এসেছে। এ হিসেবে প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল, আপনার প্রতি ওহী কীভাবে আসে? কে আনে? কুরআন মাজীদ এর উত্তরে শুধু এটুকু বলেছে যে, আল্লাহর নির্দেশে ওহী আসে। ওহীর পূর্ণ বিবরণ দেয়া হয় নি।[৪১১]
কিন্তু যে সকল সহীহ হাদীসে এ আয়াতের শান ই নুযূল বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোতে প্রায় পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে যে, প্রশ্নকারীদের লক্ষ্য ছিল জৈব রূহ। অর্থাৎ রূহ কী? মানবদেহে রূহ কীভাবে আগমন করে? কীভাবে এর দ্বারা জীবজন্তু ও মানুষ জীবিত হয়ে যায়? সহীহ বুখারীতে এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) এর বরাত দিয়ে বর্ণিত হয়েছে – আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, আমি নবী (সা) এর সাথে একটি ক্ষেতের মধ্যে ছিলাম। তিনি একটি খেজুর গাছে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় কিছু সংখ্যক ইহুদি সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, রূহ সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সা) কে জিজ্ঞাসা কর। তাদের কেউ কেউ বলল, কেন জিজ্ঞেস করবে? তিনি কি তোমাদের অনকূল জবাব দেবেন? কেউ কেউ বলল, তা না হোক কিন্তু তিনি এমন জবাবও দেবেন না যা তোমরা অপছন্দ কর। অবশেষে তারা বলল, ঠিক আছে, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর। কাজেই তারা তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। নবী (সা) চুপ করে বসে থাকলেন। তাদের প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না। আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর উপর ওহী নাযিল হবে। আমি নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর যখন ওহী নাযিল শেষ হল, তিনি বলতে থাকলেন – "তোমাকে তারা রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, রূহ আমার প্রতিপালকের আদেশঘটিত এবং তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।"[৪১২]

কুরআনের একটি বিশেষ পরিভাষা হল কুরআন ও ওহীকে 'রূহ' অর্থে ব্যবহার করা। কিন্তু এখানে তাদের প্রশ্নকে ওহী বা কুরআন অর্থে গ্রহণ করা অবান্তর হবে। তবে জৈব ও মানবীয় রূহ সম্পর্কে প্রত্যেকের মনেই প্রশ্ন জন্ম নিয়ে থাকে। এ জন্যই ইবন কাসীর, ইবন জরীর, কুরতুবী, বাহর ই মুহীত, রুহুল মাআনী প্রমুখ তাফসীরকারগণ সাব্যস্ত করেছেন যে, এখানে ইয়াহূদীরা জৈব রূহ সম্পর্কেই প্রশ্ন করেছিল। এর জবাবে কুরআন জানাচ্ছে, রূহ হল রবের আমর।

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী বলেন, রূহ সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে যতটুকু বিষয় বলা জরুরী ছিল এবং যতটুকু বিষয় সাধারণ মানুষের বোধগম্য ছিল আল্লাহ তাআলা ঠিক ততটুকুই বলেছেন। রূহের সম্পূর্ণ স্বরূপ সম্পর্কে যে প্রশ্ন ছিল জবাবে তা বলা হয় নি। কারণ, তা বোঝা সাধারণ লোকের সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল এবং তাদের কোন প্রয়োজন এটা

---

[৪১০] আল কুরআন / ১৭ : ৮৫
[৪১১] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯০
[৪১২] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তাফসীর

Dhaka University Institutional Repository

বোঝার উপরও নির্ভরশীল ছিল না। এখানে রাসূলুল্লাহ (সা) কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে উত্তর দিন, রূহ আমার পালনকর্তার আদেশের অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ রূহ সাধারণ সৃষ্টজীবের মত বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে এবং জন্ম ও বংশ বিস্তারের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করে নি। বরং তা সরাসরি আল্লাহ তাআলার আদেশ দ্বারা সৃজিত। এ জবাব একথা ফুটিয়ে তুলছে যে, রূহকে সাধারণ বস্তু নিচয়ের মাপকাঠিতে পরখ করা যায় না। কাজেই একে সাধারণ বস্তুর মাপকাঠিতে বিচার-বিশ্লেষণের ফলে যে সকল সন্দেহ সংশয় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তার অপনোদন হয়ে যায়। রূহ সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান থাকাই মানুষের জন্য যথেষ্ট। এর বেশি জ্ঞানের উপর তার কোন ধর্মীয় অথবা দুনিয়ার প্রয়োজন আটকা নয়। তাই প্রশ্নের সে অংশটিকে অনর্থক ও বাজে সাব্যস্ত করে জবাব দেয়া হয় নি; বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে এর স্বরূপ বোঝা সাধারণ লোকের কথাই নেই, বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতের পক্ষেও সহজ নয়।[৪১৩]

মানুষ যাতে বিষয়টি নিয়ে বেশি মাতামাতি না করে বা বুঝতে না পেরে বেশি হা হুতাশ না করে সে জন্যে মানুষের অক্ষমতার স্বরূপটিও আয়াতে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে খুবই কম। এর সাথে সাথে প্রয়োজন পরিমাণ উত্তর দিয়ে রূহের স্বরূপ আবিষ্কারের চেষ্টা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করা হয়েছে। বুঝানো হয়েছে, মানুষের জ্ঞান যত বেশিই হোক না কেন, বস্তুনিচয়ের সর্বব্যাপী স্বরূপের দিক দিয়ে তা অল্পই। তাই অনাবশ্যক আলোচনা ও খোঁজাখুঁজিতে লিপ্ত হয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করার কোন মানে নেই। তাছাড়া মানুষকে যতটুকু জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাও তার ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছে করলে তাও ছিনিয়ে নিতে পারেন। কাজেই বর্তমান জ্ঞানের জন্য তার কৃতজ্ঞ থাকা এবং অনর্থক ও বাজে গবেষণায় সময় নষ্ট না করা উচিত। বিশেষতঃ যখন উদ্দেশ্য গবেষণা করা নয় বরং অপরকে পরীক্ষা করা ও লজ্জিত করা তখনতো এমন কাজ করা অবশ্যই গর্হিত কাজ। কেননা এমন একটি কাজ যদি কেউ করে তাহলে আল্লাহ চাইলে তাঁর নিআমত জ্ঞান তুলেও নিতে পারেন। কাজেই রূহ সম্পর্কে এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আমর।

মানুষের আত্মা তথা রূহ, নফস বা কলব অদৃশ্য সত্তা। কিন্তু মানুষের উপর এর প্রভাব অপরিসীম। কুরআন বিভিন্নভাবে বিষয়টি মানুষের বোধগম্য করার প্রয়াস পেয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে –

"যারা কুফরী করেছে তুমি তাদেরকে সতর্ক কর বা না কর তাদের পক্ষে উভয়ই সমান; তারা ঈমান আনবে না। আল্লাহ তাদের কলব ও কান মোহর করে দিয়েছেন, তাদের চোখের উপর আবরণ রয়েছে।"[৪১৪]

এ আয়াতে কলব বলে আল্লাহ বুঝিয়েছেন কাফিরদের হৃদয় বা অন্তর। যা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে। অব্যাহত কুফরী ও অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের কলব বা অন্তরের সত্য উপলব্ধির ক্ষমতা রহিত করেছেন। এটা তাদের কর্মফল। আল্লাহ তা করেন নি। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে ঈমান আনা এবং সত্য উপলব্ধি করা কলব বা হৃদয়ের কাজ। এটা দৃশ্যমান বিষয় নয়। এটা একটি পুরোপুরি আধ্যাত্মিক বিষয়।

অন্য একটি আয়াতে এর সমর্থনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, মোহর করে দেয়ার এ কাজটি তিনি করছেন ইনসাফের কারণে। কেননা সে যেহেতু জেনে শুনে সত্য ত্যাগ করে বাতিলের অনুসরণ করছে, তাই আল্লাহ তার ব্যাপারে ইনসাফ করছেন। এটা আল্লাহর কোন খারাপ কাজ নয়। ইনসাফ তো খুবই ভাল কাজ। আল্লাহ বলেন

فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ط والله لايهدى القوم الفاسقين -

"এরপর তারা যখন বাঁকা পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের কলবকে বাঁকা করে দিলেন। আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে ভালবাসেন না।"[৪১৫]

এ ভাবে আরো ইরশাদ হয়েছে – "তাদের অন্তরে (কলব) ব্যাধি রয়েছে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী।"[৪১৬]

---

৪১৩ মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯১
৪১৪ আল কুরআন / ২ : ৬-৭
৪১৫ আল কুরআন / ৬১ : ৫
৪১৬ আল কুরআন / ২ : ১০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

"এরপরও তোমাদের হৃদয় (কলব) কঠিন হয়ে গেল, তা পাথর কিংবা তারচেয়েও কঠিন। অথচ কতগুলো পাথর এমন যে, তা হতে নদী–নালা প্রবাহিত হয় এবং কতগুলো এমন যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর তা হতে পানি বের হয়, আবার কতগুলো এমন যা আল্লাহর ভয়ে ধ্বসে পড়ে এবং তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ বেখবর নন।"[৪১৭]

"তারা বলেছিল, আমাদের হৃদয় (কলব) আচ্ছাদিত। বরং কুফরীর জন্য আল্লাহ তাদেরকে লানত করেছেন। কাজেই তাদের কম সংখ্যকই ঈমান আনে।"[৪১৮]

"তাদের হৃদয়ে (কলবে) গরুর বাচ্চা প্রেম সিঞ্চিত হয়েছিল।"[৪১৯]

"বল – যে কেউ জিবরীলের শত্র এ জন্য যে, সে আল্লাহর নির্দেশে তোমার কলবে কুরআন পৌঁছে দেয় যা তার আগের কিতাবের সমর্থক এবং যা মুমিনদের জন্য পথনির্দেশক ও শুভ সংবাদ।"[৪২০]

"যারা কিছু জানে না তারা বলে, আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন? কিংবা কোন নিদর্শন আমাদের নিকট আসে না কেন? এভাবে তাদের আগের লোকেরাও ওমন কথাই বলতো। তাদের কলব একই রকম।"[৪২১]

"মানুষের মধ্যে এমন মানুষ আছে দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে যার কথা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং কলবে (অন্তরে) যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে ভীষণ কলহ প্রিয়।"[৪২২]

আল্লাহ তাআলার কাছে বাহ্যিক কাজের যে কোন মূল্য নেই তা তিনি নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন– "তোমরা ভালকাজ, আত্মসংযম ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন হতে বিরত থাকবে এ শপথের জন্য তোমরা আল্লাহর নামকে অজুহাত কর না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। তোমাদের অর্থহীন শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না। কিন্তু তিনি তোমাদের অন্তরের (কলবের) সংকল্পের জন্য দায়ী করবেন। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, ধৈর্যশীল।"[৪২৩]

"যখন ইব্রাহীম বলল – হে আমার রব, কীভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও। তিনি বললেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? তিনি বললেন, কেন করব না? এটা কেবল আমার চিত্ত (কলব) প্রশান্তির জন্য।"[৪২৪]

"তোমরা সাক্ষ্য গোপন কর না, যে কেউ তা গোপন করে তার অন্তর (কলব) পাপী।"[৪২৫]

কলবের মত নফস শব্দটিও অন্তর বা হৃদয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে –

"তা কত খারাপ যার বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে (নফসকে) বিক্রয় করে।"[৪২৬]

"তা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা নিজেদের আত্মাকে (নফসকে) বিক্রয় করেছে, যদি তারা জানতো!"[৪২৭]

"মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আত্ম (নফস) বিক্রি করে থাকে।"[৪২৮]

"স্ত্রী লোকদের নিকট তোমরা ইঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব দিলে অথবা তোমাদের অন্তরে (নফস) গোপন রাখলে তোমাদের কোন পাপ নেই।"[৪২৯]

"আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করার জন্য ধন সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা কোন উচ্চ জমিতে অবস্থিত উদ্যানের সাথে।"[৪৩০]

---

[৪১৭] আল কুরআন / ২ : ৭৪
[৪১৮] আল কুরআন / ২ : ৮৮
[৪১৯] আল কুরআন / ২ : ৯৩
[৪২০] আল কুরআন / ২ : ৯৭
[৪২১] আল কুরআন / ২ : ১১৮
[৪২২] আল কুরআন / ২ : ২০৪
[৪২৩] আল কুরআন / ২ : ২২৩–২৪
[৪২৪] আল কুরআন / ২ : ২৬০
[৪২৫] আল কুরআন / ২ : ২৮৩
[৪২৬] আল কুরআন / ২ : ৯০
[৪২৭] আল কুরআন / ২ : ১০২
[৪২৮] আল কুরআন / ২ : ২০৭
[৪২৯] আল কুরআন / ২ : ২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

"আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমাদের মনে (নফস) যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট হতে গ্রহণ করবেন।"[৪৩১]

আল্লাহ তাআলা এমনি অসংখ্য স্থানে কলব, রূহ ও নফস শব্দ ব্যবহার করে মানুষকে তাদের মধ্যে বিদ্যমান আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে সচেতন করেছেন। বস্তুত কুরআনের এ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত করে, মানুষ মূলত আধ্যাত্মিক প্রাণী। অন্যান্য সৃষ্টির সাথে মানুষের মূল পার্থক্য এ জন্য যে, আল্লাহ তাআলা মানুষের ভেতর আধ্যাত্মিক একটি জগত তৈরী করেছেন কিন্তু আর কোন জীব জন্তুর এ জগতটি নেই। মূলত আধ্যাত্মিক চেতনা এবং এর অনুশীলনই মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদা এনে দিয়েছে।

"তোমাদের প্রতিপালক বলেন – তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা অহঙ্কারবশে আমার ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।"[৪৩২]

"তোমরা ধাবমান হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য – যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী, মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ সৎকর্মপরায়নশীলদের ভালবাসেন। আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি যুলম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করবে? এবং তারা যা করে ফেলে জেনে শুনে তার পুনরাবৃত্তি করে না।"[৪৩৩]
"এরপর আমি বলেছি – তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো মহাক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।"[৪৩৪]

বস্তুত আল কুরআন একটি পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক মহগ্রন্থ। এতে আধ্যাত্মিক সাধনার যে বিবরণ ও পদ্ধতি পেশ করা হয়েছে তা তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা নয়। বরং তা হল আল্লাহর প্রতি ঈমানের ভিত্তিতে অন্তর শুদ্ধ করার সাধনা যা মানুষকে মানবিক পূর্ণতায় প্রোজ্জ্বল করে তোলে। এ আধ্যাত্মিকতা মানুষকে পবিত্র থাকতে, শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে এবং সকল পার্থিব দায়িত্ব আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার প্রেরণা নিয়ে পালনের নির্দেশনা দিয়ে থাকে। এ নির্দেশনার বাইরে যে সাধনাই হোক তা ইসলাম সম্মত হবে না।

---

[৪৩০] আল কুরআন / ২ : ২৬৫
[৪৩১] আল কুরআন / ২ : ২৮৪
[৪৩২] আল কুরআন / ৪০ : ৬০
[৪৩৩] আল কুরআন / ৩: ১৩৩-১৩৫
[৪৩৪] আল কুরআন, ৭১ : ১০-১২

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় :
আল হাদীসে আধ্যাত্মিকতা

- ভূমিকা
- হাদীস পরিচিতি
- হাদীসে ইসলামী আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন দিক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

আল - হাদীস ইসলামী শরীআতের দ্বিতীয় উৎস। আল - কুরআনের মূলনীতিসমূহের বাস্তবরূপ ও ব্যাখ্যা এটি। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা যে জীবন বিধান ও আদর্শ উপস্থাপন করেছেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে সব সময় তা সহজবোধ্য নয়। যে জন্যে এ থেকে তাদের উপকৃত হওয়াও কষ্টকর। হাদীস কুরআনী বক্তব্যসমূহ সর্বসাধারণের উপযোগী করে উপস্থাপন করেছে। হাদীসকে তাই কুরআনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ বলা যায়। কুরআন ইসলামের মূলপ্রদীপ, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। কুরআনকে যদি ইসলাম পরিকল্পিত জীবন প্রাসাদের নকশা মনে করা যায় -তাহলে হাদীস হবে সে নকশা অনুযায়ী নির্মিত প্রাসাদ। যে কারণে ইসলামী জীবন, দর্শন, আদর্শ, উদ্দেশ্য, হুকুম, আহকাম প্রভৃতি বর্ণনায় হাদীস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উৎস। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত আধ্যাত্মিকতা বিষয়েও আল হাদীস কুরআনী বক্তব্যের ব্যাখ্যা পেশ করেছে। ইসলামী আধ্যাত্মিকতার প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ণয় করার জন্য হাদীসের এ সকল ব্যাখ্যা স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়িত হওয়া প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে আল হাদীসের বক্তব্য ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষিত হবে। কুরআনের সাথে সঙ্গতি রেখে তার আলোকে ইসলামী আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত রূপটি নির্দিষ্ট করে তোলার সচেতন প্রয়াস পরিচালিত হবে। প্রসঙ্গত হাদীসের পরিচয় এবং এর গুরুত্ব ও ইতিহাসের উপরও সংক্ষেপে আলোকপাত করা হবে।

হাদীস পরিচিতি

আভিধানিকভাবে হাদীস শব্দটি কাদীম শব্দের বিপরীতার্থক। কাদীম অর্থ প্রাচীন বা পুরনো। কাজেই হাদীস বলতে নতুন ও আধুনিক বিষয়কে বুঝায়।[৪৩৫]

ইমাম রাগিব ইসফাহানী বলেন – কোন একটি অস্তিত্বহীন জিনিসের অস্তিত্ব লাভ করা হচ্ছে হাদীস। জিনিসটি মৌলিক হতে পারে কিংবা অমৌলিকও হতে পারে।[৪৩৬]

কুরআন মাজীদে হাদীস শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন -

হাদীস অর্থ স্বপ্নকালীন কথাবার্তা। কুরআনে এসেছে – وعلمتنى من تاويل الاحاديث 'স্বপ্নের কথার ব্যাখ্যা তুমি আমাকে শিখিয়েছো।[৪৩৭]

হাদীস অর্থ কথা বা বাণী। আল্লাহ বলেন ' فبای حدیث یومنون بعده এরপর তারা কোন কথাকে বিশ্বাস করবে?[৪৩৮]

হাদীস অর্থ হতে পারে নতুন সংবাদ, খবর বা নতুন কথা। কুরআন মাজীদে আছে – هل اتك حديث الجنود 'সেনাবাহিনীর খবর কি তোমার নিকট পৌঁছেছে?[৪৩৯]

অথবা হাদীস অর্থ হল বর্ণনা করা, প্রকাশ করা বা কথা বলা। আল্লাহ বলেন – واما بنعمة ربك فحدث 'তুমি তোমার রবের নিয়ামতের কথা বর্ণনা কর।[৪৪০]

আল্লাহ তাআলা শাব্দিক অর্থে কুরআন মাজীদকেও 'হাদীস' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন – 'আল্লাহ তাআলা পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ কিতাব হিসেবে সুন্দরতম 'হাদীস' নাযিল করেছেন।[৪৪১]

তবে হাদীস শব্দের সাধারণ অর্থ বাণী বা কথা। এ অর্থেই শব্দটির বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আরবি ভাষায় সুন্নাহ, আছার, খবর প্রভৃতি শব্দকে কখনো কখনো হাদীসের পরিবর্তে ব্যবহার হতে দেখা যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লহর দীন মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্যে বিভিন্ন কথা বলতেন, নানা বিষয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেন, বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিষয় তুলে ধরতেন। আবার লোকজনের সাথে সাধারণ

---

[৪৩৫] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২, পৃ.৫

[৪৩৬] রাগিব ইসফাহানী, *আল মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন,* মিসর, ১৪০৪ হি, পৃ.১০৮

[৪৩৭] আল কুরআন / ১২ : ১০১

[৪৩৮] আল কুরআন / ৭ : ১৮৫

[৪৩৯] আল কুরআন / ৮৫ : ১৭

[৪৪০] আল কুরআন / ৯৩ : ১১

[৪৪১] আল কুরআন / ৩৯ : ২৩

Dhaka University Institutional Repository

বাক্যবিনিময়ও করতেন। তাঁর এসব কিছুই হাদীস। তিনি ইসলামের সকল বিধান পালন করেছেন। লোকজনের সাথে লেনদেন করেছেন, প্রয়োজনীয় বৈষয়িক কাজ সম্পাদন করেছেন আর এসকল কাজ সম্পাদন করতে যেয়ে তিনি যে পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তার বিবরণও হাদীস হিসেবে গণ্য হয়।
রাসূলুল্লাহ এর (সা) বিশেষ যত্ন, প্রশিক্ষণ ও চেষ্টায় সাহাবী (রা) দের আখলাক ইসলামী আখলাকে পরিণত করেছেন। এ কারণে তাঁদের সে সকল কথা-কাজও হাদীসেরই অর্ন্তভুক্ত যেগুলো রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়েছে।[৪৪২]

কাজেই সংক্ষেপে হাদীসের যে পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল - রাসূলুল্লাহ (সা) এর কথা, কাজের বিবরণ এবং মৌন সমর্থনই হচ্ছে হাদীস।

'হাদীস এমন জ্ঞান, যার সাহায্যে নবী (সা) এর কথা, কাজ এবং তাঁর অবস্থা জানা যায়।[৪৪৩]
ইবন হাজার আসকালানী ও বিশ্বখ্যাত ছয় মুহাদ্দিসসহ বেশিরভাগ হাদীসবিদ সাহাবী (রা) ও তাবিঈ (র) দের কথা, কাজ ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে 'হাদীস' পরিভাষাটির ব্যবহার যথার্থ বলে মেনে নিয়েছেন। তবে এ ক্ষেত্রে সবাই একমত যে, ব্যক্তি ও প্রকৃতিভেদে সকল হাদীস একই রকম মর্যাদার হবে না। ব্যক্তির মর্যাদাগত পার্থক্যের কারণে হাদীসের গুরুত্ব ও তাৎপর্যেও পার্থক্য হবে।[৪৪৪]

কুরআন মাজীদের সাথে হাদীসের রয়েছে সুগভীর সম্পর্ক। কুরআন ইসলামী জীবনব্যবস্থার হৃদপিণ্ড, হাদীস তার প্রবাহিত ধমনী। বিভিন্নভাবে এ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা যায়।

১. কুরআন ও হাদীস উভয়ই মহান আল্লাহ তাআলার অবিনশ্বর সত্তা থেকে উৎসারিত। অবশ্য কুরআন প্রত্যক্ষ ওহী; কিন্তু হাদীস পরোক্ষ। তা সত্ত্বেও উৎসগত বিবেচনায় কুরআন ও হাদীসের মধ্যে সুগভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।
২. কুরআন মাজীদ ও হাদীস এক এবং অভিন্ন উদ্দেশ্যে আবর্তিত। বিশ্বমানবকে চিরকল্যাণের সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল-সঠিক পথপ্রদর্শনই এদের একমাত্র লক্ষ্য।
৩. কুরআনের পর সকল প্রকারের জ্ঞানের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ জ্ঞান হল হাদীস। কুরআনে যে বিষয়ের বর্ণনা এসেছে, হাদীসে সে বিষয়েরই বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে। হাদীস নুতন কোন বিষয়ের তাৎপর্যহীন আলোচনা পেশ করে নি।
৪. কুরআন মাজীদ ও হাদীস প্রবর্তিত বিধানাবলীর মধ্যেও রয়েছে চমৎকার মিল। কুরআন যে বিষয়কে হালাল ঘোষণা করেছে, হাদীসে তা হারাম ঘোষিত হয় নি। আবার কুরআনে হারাম ঘোষিত কোন বিষয়ও হাদীস হালাল ঘোষণা করে নি।
৫. পবিত্র কুরআনে আল্লাহর আদেশ ও নির্দেশনাবলীর মৌলিক ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। এ সকল মূল আলোচনার শাখা-প্রশাখা, নীতি-পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ এসেছে হাদীসে। অর্থাৎ কুরআন হল মূল আর হাদীস তার শাখা। এর একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করে দেখার উপায় নেই।
৬. হাদীস কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা ও বাস্তবরূপ। যে জন্য হাদীস ছাড়া আল কুরআন বুঝা সম্ভব নয়। আবার কুরআনকে বাদ দিয়ে হাদীসেরও নিজস্ব কোন মূল্য নেই। তাই হাদীস ও কুরআন পরস্পর নির্ভরশীরতার সম্পর্কে গ্রন্থিত।
৭. হিদায়াতের পথে চলা এবং গুমরাহী থেকে বেঁচে থাকা কুরআন ও হাদীস উভয়ই মেনে চলার ওপর নির্ভর করে। কেউ এককভাবে যে কোন একটির ওপর আমল করে হিদায়াতের ওপর টিকে থাকতে পারে না।
৮. কুরআন মাজীদ ও হাদীস একটি অপরটির পরিপূরক। কুরআন ও হাদীস মেনে চলে ব্যক্তি যেমন মুমিন হয়, তেমনি এর যে কোন একটিকে অস্বীকার বা অমান্য করলে সে হয় কাফির। এসব কারণে হাদীসকে কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার উপায় নেই।

---

[৪৪২] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭
[৪৪৩] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, প্রাগুক্ত, মুকাদ্দামা
[৪৪৪] দেখুন : ইবন হাজার আসকালানী, শরহ নুখবাতুল ফিকর এবং সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামি আত তিরমিযী, সুনান নাসাঈ, সুনান আবূ দাউদ, সুনান ইবন মাজাহ হাদীসগ্রন্থগুলোর মুকাদ্দামা।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মাজীদের সাথে হাদীসের অত্যন্ত নিবিড় ও সুদৃঢ় সম্পর্ক থাকলে প্রকৃতপক্ষে কুরআন যেমন হাদীস নয় তেমনি হাদীসও কুরআন নয়। বরং এতদুভয়ের মাঝে বেশ বড় রকমের কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন –

১. আল-কুরআন আল্লাহর কালাম। পক্ষান্তরে সাধারণভাবে হাদীস রাসূলুল্লাহ (সা) এর বাণী হিসেবেই পরিচিত।
২. কুরআন মাজীদ ওহী মাতলু বা পঠিত ওহী। জিব্রাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে এগুলো পাঠ করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ ওহীর মাধ্যমে এটি নাযিল হয়েছে। কিন্তু হাদীস হল গায়র মাতলু বা অপঠিত ওহী। পরোক্ষভাবে এটি নবী (সা) এর অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়েছিল বা তাঁর হৃদয়ে ভাব উদগত করে দেয়া হয়েছে।
৩. কুরআনের শব্দ, ভাষা, ভাব ও অর্থ – সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। কিন্তু হাদীসের শব্দ ও ভাষা রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিজের। এর ভাব ও অর্থ অবশ্য পরোক্ষ ওহীর মাধ্যমে নাযিলকৃত।
৪. আল - কুরআন শাশ্বত ও চিরন্তন। এর ধ্বংস নেই। আল্লাহ তাআলার সত্তার মতই তাঁর এ প্রত্যক্ষ কালামও অবিনশ্বর। কিন্তু হাদীসের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়।
৫. সালাতে কুরআন মাজীদের যে কোন একটি অংশ তিলাওয়াত করা ফরয। এ ছাড়া সালাত শুদ্ধ হয় না। কিন্তু সালাতে হাদীস পাঠ করলে সালাত শুদ্ধ হয় না।
৬. আল-কুরআন রাসূলুল্লাহ (সা) এর মুজিযা। কিন্তু হাদীস কোন মুজিযা নয়।
৭. কুরআন মাজীদের আয়াত তিলাওয়াত করলে প্রতি হরফের জন্যে দশটি করে নেকি পাওয়া যায়। এ নেকি এমনকি আরো বাড়িয়ে দেয়াও হয়। কিন্তু হাদীসের ক্ষেত্রে এমন কোন প্রতিশ্রুতি নেই।
৮. আল-কুরআন ফরয হুকুম সাব্যস্ত করে। পক্ষান্তরে হাদীস ওয়াজিব হুকুম সাব্যস্ত করে।
৯. আল-কুরআন পবিত্রতা ছাড়া স্পর্শ করা যায় না। কিন্তু হাদীসের ক্ষেত্রে এমন কোন নিষেধ নেই।
১০. আল-কুরআনের সব আয়াত ও হুকুমই অকাট্য। কিন্তু সকল হাদীস অকাট্য নয়।
১১. কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহকে কোন সহীহ-গায়রে সহীহ ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় না। কিন্তু সনদ ও মতনের বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন করে হাদীসকে এ রকম শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।
১২. কুরআন সংরক্ষিত আছে আল্লাহর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে লাওহে মাহফুযে। যেমন তিনি বলেন – বস্তুত এটি কুরআন মাজীদ বা সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।[৪৪৫] কিন্তু আল-হাদীসের এমন কোন সংরক্ষক নেই।

পরিভাষাগত দিক থেকে হাদীস ও সুন্নাহ প্রায় অভিন্ন। সুন্নাহ অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি,[৪৪৬] জীবনাদর্শ প্রভৃতি। শেষ পর্যায়ে মুহাদ্দিসগণ অবশ্য হাদীস ও সুন্নাহর মধ্যে কোন পার্থক্য না করে এ পরিভাষা দুইটিকে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন।[৪৪৭] কেননা নবী (সা) এর যে উচ্চারণ আইন ও বিধান এবং আল্লাহ তাআলার মত ও মর্জি প্রকাশ করে তাই হল সুন্নাহ। কুরআন মাজীদে 'উসওয়াতুন হাসানাহ'[৪৪৮] বা মহানতম আদর্শ বলতে সুন্নাহকেই বুঝানো হয়েছে। আবার রাসূলুল্লাহ (সা) এর মহানতম আদর্শ অনুসরণ করতে আল্লাহ তাআলা যে নির্দেশ দিয়েছেন - তা জানা যায় হাদীস থেকে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সুন্নাহ ও হাদীস পরস্পর নির্ভরশীলতার সম্পর্কে সম্পৃক্ত।

ইসলামী শরীআতের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, এখানে হাদীসকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। একে রাখা হয়েছে কুরআন মাজীদের পরেই। শরঈ বিধান প্রণয়ন ও প্রবর্তন এবং মূলনীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণের ক্ষেত্রে হাদীস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় উৎস। বিভিন্নভাবে এ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করা যায়। হাদীস মেনে চলার, হাদীসের অনুসরণ ও অনুশীলন করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। এ নির্দেশ দিয়ে তিনি বলেন –

وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا

"আর রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন – তা থেকে বিরত থাকো।"[৪৪৯]

---

[৪৪৫] আল কুরআন / ৮৫ : ২১-২২
[৪৪৬] মওলানা আবদুর রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬
[৪৪৭] প্রাগুক্ত, পৃ.১৭
[৪৪৮] আল কুরআন / ৩৩ : ২১
[৪৪৯] আল কুরআন / ৫৯ : ৭

Dhaka University Institutional Repository

সে জন্য হাদীস মূলত আল্লাহরই নির্দেশ। কোন মুসলিমই একে উপেক্ষা বা অস্বীকার করতে পারে না।

হাদীসের উৎস আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। রাসূলুল্লাহ (সা) যদিও নিজস্ব শব্দচয়ন ও ভাষা বিন্যাসে একে ব্যক্ত করেছেন কিন্তু এর কোন কিছুই তাঁর নিজস্ব নয়। নিজে থেকে একটি কথাও তিনি বলেন নি। একান্তই নিজের ইচ্ছায় একটি কাজও তিনি করেন নি। তাঁর সকল কথা, কাজ ও তৎপরতার উৎস হলেন আল্লাহ তাআলা। কুরআন মাজীদে এ প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে –

وماينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى

"আর মুহাম্মদ নিজ প্রবৃত্তি থেকে কোন কথা বলেন না। তাঁর নিকট প্রেরিত ওহী ছাড়া এগুলো আর কিছু নয়।"[৪৫০]

আল-কুরআন ইসলামী শরীআতের প্রথম এবং প্রধান উৎস। কেননা এ হল আল্লাহর প্রত্যক্ষ ওহী। হাদীস এ শরীআতের দ্বিতীয় উৎস। কারণ আল্লাহর ওহী হলেও তা প্রত্যক্ষ ওহী নয়। এ হল এক পরোক্ষ ওহী। মহানবী (সা) মানুষের উপযোগী করে এ ওহী নিজস্ব ভাষায় পরিবেশন করেছেন। তা ছাড়া এ হল তার জীবনাদর্শ, বক্তব্য ও জীবনদর্শন। একে বাদ দিয়ে ইসলামী শরীআত গতিহীন ও ব্যর্থ হতে বাধ্য।

হাদীস হল আল কুরআনের সংক্ষিপ্ত মূলনীতি সমূহের ব্যাখ্যা। কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা দানের এ দায়িত্ব নিয়েই মহানবী (সা) আবির্ভূত হয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন –

"আর আপনার নিকট আমি কুরআন নাযিল করেছি। যেন মানুষের সামনে আপনি সে সকল বিষয় বর্ণনা করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা–ভাবনা করে।"[৪৫১]

সাহাবী (রা) গণ কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বিধান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) কে প্রশ্ন করেছেন। তিনি হাদীসে তার জবাব দিয়েছেন। এভাবে হাদীস পরিণত হয়েছে কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা গ্রন্থে। সে জন্য হাদীসের সাহায্য গ্রহণ ছাড়া কুরআন মাজীদের যথাযথ ব্যাখ্যা, অর্থ, এর সঠিক উদ্দেশ্য ও ভাবধারা নিরূপন করা এক কথায় অসম্ভব।

কুরআন মাজীদে সকল ব্যবহারিক বিষয়ের বিস্তারিত বিধান দেয়া হয় নি। কেবল মূলনীতি পেশ করা হয়েছে। ব্যবহারিক দিকের প্রয়োজনীয় বিধান প্রবর্তনের অধিকার দেয়া হয়েছে রাসূলুল্লাহ (সা) কে। আল্লাহ বলেন,

"রাসূল তাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করেন, আর তাদেরকে খারাপ কাজে নিষেধ করেন। তাদের জন্য তিনি ভাল ও উৎকৃষ্ট হালাল করেন এবং নিকৃষ্ট ও মন্দ কাজ হারাম করেন।"[৪৫২] রাসূলুল্লাহ (সা) প্রণীত এসব বিধি–বিধানের প্রামাণ্য দলীল হল হাদীস। কাজেই এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কথা, কাজ, মৌণ সম্মতি, নিদ্রিত ও জাগ্রত অবস্থা এবং অন্যান্য তৎপরতা অত্যন্ত সর্তকতার সাথে নিখুঁতভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। হাদীস তাই রাসূল (সা) এর জীবনাদর্শ ও জীবনদর্শনের বাস্তব প্রতিকৃতি। এর মধ্যেই রাসূল জীবন যেন বিমূর্ত হয়ে উঠেছে। আর বিশ্বমানবের জন্যে অনুসরণীয় আদর্শ হলেন রাসূলুল্লাহ (সা)। আল্লাহ বলেন,

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة

"তোমাদের জন্যে রাসূলের মধ্যে রয়েছে সুন্দরতম আদর্শ।"[৪৫৩] মহানবী (সা) এর জীবনাদর্শের বিপুল গুরুত্বের কারণেও হাদীস গুরুত্বপূর্ণ।

রাসূলুল্লাহ (সা) এর আনুগত্য করা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ বলেন,

"বল, তোমরা আল্লাহর ও রাসূলের আনুগত্য কর। যদি তোমরা এর থেকে বিমুখ হও, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই কাফিরদের ভালবাসেন না।"[৪৫৪]

---

[৪৫০] আল কুরআন / ৫৩ : ৩–৪
[৪৫১] আল কুরআন / ১৬ : ৪৪
[৪৫২] আল কুরআন / ৭ : ১৫৭
[৪৫৩] আল কুরআন / ৩৩:৩১
[৪৫৪] আল কুরআন / ৩ : ৩২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মাজীদের পাশাপাশি হাদীসের পূর্ণ অনুসরণ ও অনুশীলনই হল রাসূল (সা) এর আনুগত্যের অবিকল্প উপায়। যে জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) এর আনুগত্যের মাধ্যম হিসেবেও হাদীসের গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়।

হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল হিসেবে যে সকল বিষয় নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন, হাদীস তার অন্যতম। আল্লাহ বলেন – "তিনি আল্লাহ, যিনি নিরক্ষর লোকদের নিকট তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। রাসূল আল্লাহর আয়াতসমূহ তাদের সম্মুখে তিলাওয়াত করেন। তাদেরকে পরিশুদ্ধ ও সুসংগঠিত করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন কুরআন ও হিকমাহ।"[৪৫৫] আয়াতে হিকমাহ বলে হাদীসের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কুরআন মাজীদের মত হাদীসও বিশ্বমানবকে অভ্রান্ত হিদায়াতের নির্দেশনা দেয়। যে জন্যে হাদীস অনুসরণে সঠিকপথে চলার নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। হাদীস মেনে চলা, অনুসরণ ও অনুশীলন করা আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা) এর প্রতি ভালবাসারই নামান্তর।
মুমিনজীবনে রাসূলপ্রেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ বিষয়। হাদীসের অনুশীলন এ প্রেমের প্রকৃত প্রমাণ পেশ করে বিধায় এর অপরিসীম গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

রাসূলুল্লাহ (সা) নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু তিনি জ্ঞানহীন ছিলেন না বরং আল্লাহ তাআলা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মানুষে পরিণত করেন। যে জন্যে রাসূল (সা) এর বাণী মানুষের প্রয়োজনীয় দুনিয়া ও আখিরাতের জ্ঞানের এক নির্ভরযোগ্য উৎস।

ইতিহাসের প্রামাণ্য উৎস হাদীস। স্বাভাবিকভাবেই হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) এর পবিত্রতম জীবন ও চরিত্র সংরক্ষিত ছিল। সমকালীন মানুষের চিন্তা-ভাবনা, রুচি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সাধনা প্রভৃতির বিবরণও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্ববর্তী নবী – রাসূল ও তাদের উম্মতদের জীবনযাত্রার নির্ভরযোগ্য বিবরণ আছে হাদীসে। তা ছাড়া হাদীস সংরক্ষণ, সংগ্রহ, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ পরবর্তীকালের মানুষের কাছে ইতিহাস চর্চার প্রেরণা হয়ে ওঠে।
বিশ্বাসযোগ্য পদ্ধতি এবং ঈমানী দায়িত্বের সাথে হাদীস সংরক্ষিত হয়েছে। যে জন্যে এরমধ্যে কোন ভুল বা অপ্রামাণ্য তথ্য সংযুক্ত হয় নি। একে তাই বলা যায় ইতিহাসের সর্বাধিক নির্ভরতাসমৃদ্ধ উপাত্ত ও দলীল।

আল্লাহর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের ক্ষেত্রে হাদীস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) এর অনুসরণ করলে আল্লাহর ভালবাসা পাওয়া যাবে। আর রাসুল (সা) এর অনুসরনের অর্থ হল হাদীসের অনুসরণ। আল্লাহ বলেন – "(হে নবী তুমি) বল, যদি তোমরা আল্লাহর ভালবাসা পেতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের ভালবাসবেন।"[৪৫৬]

বিনা প্রশ্নে, নির্দ্বিধায় রাসূলুল্লাহ (সা) এর বিচার-ফায়সালা ও আদেশ নিষেধ মেনে না নিলে মুমিন হওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন- "তোমার রবের কসম, তারা কখনোই মুমিন হতে পারবে না যদি না তারা তাদের পারস্পরিক সকল ব্যাপারে তোমাকে সিদ্ধান্তকারীরূপে মেনে নেয় এবং তোমার ফায়সালা নিঃশর্ত পালন করে।"[৪৫৭]

কুরআন মাজীদে সকল ব্যবহারিক ও আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু তা পালন ও প্রয়োগের বাস্তব রূপটি সেখানে অনুপস্থিত। যে জন্যে কেবল কুরআন মাজীদ অনুসরণ করে ইবাদত সম্পাদন করা প্রায় অসম্ভব। হাদীস এ সকল ইবাদত কখন, কোথায় এবং কীভাবে সম্পাদন করতে হবে তার বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। আল্লাহ তাআলা এর পূর্ণতা ঘোষণা করে বলেছেন –
"আজ তোমাদের জন্যে আমি তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের ওপর আমার নিআমত পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের দীন হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করলাম।"[৪৫৮]

---

[৪৫৫] আল কুরআন / ৬২ : ২১
[৪৫৬] আল কুরআন / ৩ : ৩১
[৪৫৭] আল কুরআন / ৪: ৬৫
[৪৫৮] আল কুরআন / ৫ : ৩

Dhaka University Institutional Repository

হাদীস হল ইসলামী পূর্ণতার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। গতিশীল মানবজীবনে প্রতিনিয়ত উদ্ভূত নানা সমস্যার যৌক্তিক সমাধানের পথ উন্মুক্ত রেখে হাদীসই ইসলামকে পরিপূর্ণতার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

হাদীসের ধর্মীয় গুরুত্ব অপরিসীম। এতে রাসূলুল্লাহ (সা) এর বিধি নিষেধ এবং আল্লাহর আইনের ব্যাখ্যা অর্ন্তভুক্ত থাকে। হাদীস মেনে চলা মানে আল্লাহ তাআলাকে মেনে চলা। একে অস্বীকার করা তাই আল্লাহকে অস্বীকারেরই নামান্তর। কেননা হাদীস রাসূলুল্লাহ (সা) এর মনগড়া কথা নয়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তিনি হাদীস লাভ করেছেন। তাঁর নির্দেশনাতে বিভিন্ন কথা বলেছেন। হাদীসেও তাই আল্লাহ তাআলার কথাই বিবৃত ও বিশ্লেষিত হয়েছি। এ জন্যে কেউ যদি হাদীস অস্বীকার করে সে মুমিন থাকবে না। সে কাফির হয়ে যাবে।

হাদীসের আলোকে আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন দিক

আল হাদীস ইসলামী আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গে বিস্তারিত ও প্রয়োজনীয় বিবরণ উপস্থাপন করেছে। ইসলামী আধ্যাত্মিকতা হল মানুষের অদৃশ্য – অস্পৃশ্য সে চিন্তন ও সাধন জগত যার উপর নির্ভর করে মানুষের দৃশ্যমান কাজের গ্রহণযোগ্যতা বা অগ্রহণযোগ্যতা। হাদীস এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেছে, মানুষের যে সকল আচরণ ও কাজ বাইরে থেকে দেখা যায় না কিন্তু তা তার দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে ভূমিকা রাখে সেগুলো আধ্যাত্মিক কাজ এবং সে সংক্রান্ত যুক্তি, দর্শন, চিন্তা ভাবনাই হল আধ্যাত্মিকতা। যেমন ঈমান। এটি কোন দৃশ্যমান আমল নয়। বলে কয়ে প্রমাণ করার মত কোন স্থুল বস্তুও নয়। অথচ মানুষের সকল কাজ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রেই এটিই হল মূল বিষয়। এ বিবেচনায় হাদীসে আধ্যাত্মিকতার অসংখ্য নজীর ছড়িয়ে –ছিটিয়ে রয়েছে।

ইসলাম মানুষকে পবিত্রতা অর্জনের আদেশ দেয়। আল্লাহ তাআলা মহাপবিত্র সত্তা। তাঁর ইবাদত সম্পাদন বা তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য মানুষকে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। পবিত্রতা দু রকমের। শারীরিক পবিত্রতা এবং আত্মিক পবিত্রতা। ইসলাম দু রকম পবিত্রতাকেই গুরুত্বপূর্ণ মনে করে।

ঈমান মানুষের অন্তর পবিত্র করে। ওযু বা গোসল মানুষের শরীর পবিত্র করে। অথচ এ দুটি পবিত্রতার কোন টিই প্রদর্শন করা বা প্রমাণ করা যায় না। ইসলাম যে পুরোপুরি একটি আধ্যাত্মিকতা কেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থা এ থেকেও তা প্রমাণিত হয়। যেমন কুরআন মাজীদে মুশরিকদেরকে অপবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে। এর কারণ এই নয় যে, তারা শরীরে ময়লা বস্তু বা নোংরা কোন কিছু মেখে জীবন যাপন করে। এর কারণ হল তারা মনের ভেতর শিরকের অপবিত্রতা লালন করে। ইরশাদ হয়েছে –

"মুশরিকরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে কর না। মুশরিক নারী তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও, নিশ্চয় মুমিন ক্রীতদাসী তার চেয়ে ভাল। ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষের সাথে তোমরা বিয়ে দিও না, মুশরিক পুরুষ তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও মুমিন ক্রীতদাস তা অপেক্ষা উত্তম। তারা আগুনের দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানুষের জন্য নিজ বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।"[৪৫৯]

"হে মুমিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র; সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে। যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁর নিজ করুণায় তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"[৪৬০]

"স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে বলেছিল, হে বৎস! আল্লাহ শরীক কর না। নিশ্চয় শিরক চরম যুলম।"[৪৬১]

---

[৪৫৯] আল কুরআন / ২ : ২২১

[৪৬০] আল কুরআন / ৯ : ২৮

[৪৬১] আল কুরআন ৩১ : ১৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্নভাবে পবিত্রতার এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। যাতে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম যে আধ্যাত্মিকতার কথা বলে, তা পুরোপুরি আবর্তিত হয় ব্যক্তির এই আত্মিক ও বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জনের উপর। ইরশাদ হচ্ছে –

আবূ মালিক আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – "পবিত্রতা হল ঈমানের অর্ধেক। 'আলহামদু লিল্লাহ' মানুষের আমলের পাল্লা পূর্ণ করে। সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি' ছওয়াবে আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যে যা আছে তাকে পূর্ণ করে দেয়। সালাত হল আলোক। দান হল তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণিত। প্রত্যেক মানুষ ভোরে উঠে আপন আত্মার ক্রয়-বিক্রয় করে – হয় তাকে মুক্ত করে না হয় তাকে ধ্বংস করে।"[৪৬২]

আব্দুল্লাহ ছুনাবিহী (রা) বলেন – রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – "যখন কোন মুমিন বান্দাহ ওযু করে এবং ওযূতে কুলি করে তখন তার মুখ হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। সে যখন নাক ঝেড়ে পানি ফেলে তখন তার নাক হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। যখন সে তার মুখমণ্ডল ধোয় তখন তার মুখমণ্ডল হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার দু চোখের পাতার নিচ হতেও বের হয়ে যায়। যখন সে তার দু হাত ধোয় তখন তার দু হাত হতেও গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তা দু হাতের নখসমূহের নিচ থেকেও গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। যখন সে মাথা মাসিহ করে তখন তার মাথা হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার দু কান হতেও বের হয়ে যায়। অবশেষে যখন সে তার দু পা ধোয় তখন তার দু পা হতে হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। এমনকি তার দু পায়ের নখসমূহের নিচ থেকেও বের হয়ে যায়। এরপর তার মসজিদের দিকে গমন ও সালাত হয় তার জন্য অতিরিক্ত।"[৪৬৩]

আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত যে, একদিন তিনি অপবিত্র অবস্থায় ছিলেন। এমতবস্থায় মদীনার এক রাস্তায় নবী করীম (সা) এর সাথে তাঁর দেখা হয়ে গেল। তখন তিনি চুপিসারে আড়ালে চলে গেলেন এবং গোসল করলেন। নবী (সা) তাকে খোঁজ করে পেলেন না। পরে তিনি আসলে নবী (সা) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন – হে আবূ হুরায়রা! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তিনি বললেন – ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার সাথে আমার যখন সাক্ষাত হল তখন আমার উপর গোসল ফরয ছিল। এ অবস্থায় আমি গোসল না করা পর্যন্ত আপনার সান্নিধ্যে আসা বা আপনার সাথে সাক্ষাত করা পছন্দ করি নি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন – সুবহানাল্লাহ! মুমিনতো অপবিত্র হয় না![৪৬৪]

অর্থাৎ গোসল ফরয হওয়ার দরুন একজন মানুষ এমন অপবিত্র হয় না যে জন্যে তাকে স্পর্শ করা বা তার সাথে উঠা বসা করা যাবে না। আর মুমিন যেহেতু ঈমানের দিক থেকে পবিত্র, তার কলব যেহেতু শিরক-কুফর-নিফাকের অপবিত্রতায় অপবিত্র নয়, সুতরাং বাহ্যিক এ অপবিত্রতা তাকে অপবিত্র করতে পারে না।

এ হাদীস বিশেষভাবে প্রমাণিত করছে, ইসলামী আধ্যাত্মিকতার মূল কথাই হল আত্মিক পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি অর্জন করা। কেননা বাহ্য পবিত্রতা যতই কমনীয় ও দৃষ্টিনন্দন হোক না কেন – অন্তরে কুফর-শিরক বা নিফাকের অপবিত্রতা থাকলে তা অর্থহীন এবং মিথ্যা হতে বাধ্য।

মুমিনের বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জনের জন্য আল্লাহ তাআলা ওযূ ও গোসলের বিধান দিয়েছেন। কিন্তু ওযূ গোসল অন্তর পরিষ্কার করে না। অন্তরের পবিত্রতা অর্জিত হয় ঈমান দিয়ে। যার অন্তরে কুফর, নিফাক, শিরক, ফিসক ইত্যাদি থাকে সে যতই ওযূ গোসল করুক তাকে পবিত্র বলা যায় না। ইসলামে পবিত্রতার এই দৃষ্টিভঙ্গিই তার আধ্যাত্মিকতার অনিবার্য দিকটি স্পষ্ট করে তোলে।

হাদীসে রাসূল (সা) আত্মার প্রকৃতি, গতি, বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি বর্ণনা করতে যেয়ে যে সকল কথা বলেছেন তাও ইসলামী আধ্যাত্মিকতাকে অনিবার্যভাবে প্রমাণিত করে। যেমন –

---

[৪৬২] মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তাহারাত

[৪৬৩] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, *মিশকাত আল মাসাবীহ*, কিতাবুত তাহারাত, দেওবন্দ, ১৯৮৫

[৪৬৪] মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তাহারাত

Dhaka University Institutional Repository

আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – "রূহ বা আত্মাসমূহ মানবদেহে প্রবেশের আগে আলম ই আরওয়াহে সেনাবাহিনীর মত সমবেত ছিল। তখন যারা পরস্পর পরিচিত ও অন্তরঙ্গ ছিল মানবদেহে প্রবেশের পরও তারা পরস্পরে পরিচিত ও বন্ধুত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। আর যে গুলো সে আদিকালে পরস্পরে অপরিচিত ছিল তারা মানবদেহে প্রবেশের পরও পরস্পরে মতানৈক্য ও অপরিচিত রয়ে গিয়েছে।"[৪৬৫]

ইসলামী আধ্যাত্মিকতার একটি অন্যতম দিক হল আত্মার অবিনশ্বরতা। মানুষের মৃত্যু হয়। মাটিতে কবরস্থ মানুষের শরীর পচে গলে নষ্ট হয়ে যায়। তার অস্থি-হাড় পর্যন্ত মাটির সাথে মিশে যায়। কিন্তু মানুষের আত্মা থাকে জীবিত। রাসূলুল্লাহ (সা) আত্মার এ জীবিত থাকার বিষয়টি বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন। যেমন তিনি মৃত মানুষের কবরগাহে গিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন কথা বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে –

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনার জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে গেলেন এবং মৃত লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন – আসসালামু আলাইকুম হে মুমিনগণের নগরের অধিবাসীরা! আমরাও ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে এসে মিলিত হচ্ছি।' এরপর বললেন, আমরা আকাঙ্ক্ষা, আমি যেন আমাদের ভাইদের দেখতে পাই।' সাহাবী (রা) গণ বললেন – হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন – তোমরা আমার সহচর। আমার ভাইয়েরা তারা যারা এখনো আসে নি।[৪৬৬]

আমরা আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম – 'আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তোমরা তাদের মৃত বল না, বরং তারা জীবিত, তাদের রবের নিকট থেকে তারা জীবিকা পেয়ে থাকে।' উত্তরে ইবন মাসউদ (রা) বললেন – আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞাসা করলে তখন তিনি বলেছেন – তাদের রূহ সবুজ বর্ণের পাখির পেটের মধ্যে স্থাপন করা হয়। তারা আল্লাহর আরশের নিচে ঝুলন্ত দীপাধারের মধ্যে বসবাস করে। এরা জান্নাতের যে কোন জায়গায় অবাধে বিচরণ করতে পারে। পুনরায় তারা এ দীপাধারে ফিরে আসে। এরপর তাদের রব তাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করে বলেন, তোমরা কি কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা রাখ? তারা বলে – আমরা আর কোন জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করব? আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াতে পারি। তাদের রব এভাবে তিনবার জিজ্ঞাসা করবেন। যখন তারা দেখে তাদের একই কথা বারবার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তখন তারা বলে, হে আমাদের রব! আমরা চাচ্ছি যে, আমাদের দেহের মধ্যে আত্মা পুনরায় ফিরিয়ে দিন। আমরা আর একবার আপনার রাস্তায় শহীদ হই। অবশেষে যখন আল্লাহ দেখেন যে, তাদের কোন চাহিদাই নেই, তখন তাদের নিজ নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেন।[৪৬৭]

আবূ তালহা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বদর যুদ্ধের দিন নবী (সা) এর আদেশে চব্বিশজন কুরাইশ নেতার লাশ বদর প্রান্তরের একটি নোংরা ও আবর্জনাপূর্ণ কলুষময় কূপে নিক্ষেপ করা হল। নবী (সা) এর নিয়ম ছিল কোন গোত্র বা কওমের বিরুদ্ধে জয়লাভ করলে সেখানে খোলা মাঠে তিনরাত অবস্থান করা। বদর প্রান্তরে এরূপ অবস্থানের পর তৃতীয় দিনে যাত্রার জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। সওয়ারীসমূহের জিন কসে বাঁধা হল। তখন তিনি পায়ে হেঁটে কিছুদূর এগিয়ে চললেন। সাহাবীগণও পেছনে পেছনে গেলেন। তারা মনে করেছিলেন, তিনি কোন প্রয়োজনে কোথাও যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কূপের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কূপে নিক্ষিপ্ত মরদেহ ও তাদের পিতার নাম ধরে এভাবে ডাকতে শুরু করলেন : হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি এখন বুঝতে পারছো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে এখন খুশী হতে পারতে? আল্লাহ আমাদের সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছিলেন আমরা পুরোপুরিই তা সঠিক পেয়েছি। বল তোমরা কি তোমাদের সাথে কৃত তোমাদের প্রভূর ওয়াদা সঠিক পেয়েছো? আবূ তালহা বর্ণনা করেন, এসময় উমর (রা) বললেন – হে আল্লাহর রাসূল! যে সব দেহে প্রাণ নেই আপনি তাদের সাথে কথা বলছেন। এ কথা শুনে নবী (সা) বললেন – সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! আমি যা

---

[৪৬৫] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব

[৪৬৬] প্রাগুক্ত, কিতাবুত তাহারাত

[৪৬৭] মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইমারাহ

Dhaka University Institutional Repository

বলছি তা তোমরা তাদের চেয়ে বেশি শুনছো না। কাতাদা বলেছেন – নবী (সা) এর কথা শুনানোর জন্য আল্লাহ তাঁদেরকে জীবিত করেছিলেন, তারা যেন ধমকি, লাঞ্ছনা, অপমান, কষ্ট, দুঃখ ও লজ্জা অনুভব করছে।[৪৬৮]

তাকওয়া ও আখলাক হাসানাহ

আল্লাহর সন্তুষ্টি মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় কাম্য ও প্রয়োজনীয় বিষয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি না পেলে জীবন ব্যর্থ ও মিথ্যা হতে বাধ্য। আল্লাহর সন্তুষ্টি হারানোর ভয় তাই মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় ভয়। আল্লাহ যা করতে বলেছেন তা না করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। কাজেই আল্লাহর সন্তুষ্টি হারানোর ভয়ে তিনি যা করতে বলেছেন তা করা এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা না করা হল তাকওয়া। ইসলামী আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত বাহন হল তাকওয়া। উত্তম চরিত্র হল তার প্রকাশ মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বিভিন্ন বাণীতে বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলেছেন। ইরশাদ হয়েছে –

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "তোমরা কি জান, কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তা হল তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জান কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? তা হল দুটি ছিদ্রপথ। একটি মুখ অপরটি লজ্জাস্থান।"[৪৬৯]

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – "যখন মানুষ ঘুম থেকে ওঠে তখন তার অঙ্গসমূহ জিহ্বাকে বিনয়ের সাথে বলে, আমাদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আমরা সবাই তোমার সাথে জড়িত। সুতরাং তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকব। আর তুমি বাঁকা হলে আমরাও বাঁকা হয়ে পড়ব।"[৪৭০]

আলী ইবন হুসায়ন (রা) বলেন – রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হল ঐসব কিছু পরিহার করা যা নিরর্থক।"[৪৭১]

ইসলামের বাহ্যিক বিধি-বিধানসমূহ মেনে চললে কোন ব্যক্তিকে মুসলমান বলার মধ্যে কোন আপত্তি থাকে না। কিন্তু কাউকেও পরিপূর্ণ মুসলিম তখনই বলা যেতে পারে যখন সে অনর্থক কথা, কাজ, দৃষ্টি ও চিন্তা-ভাবনা থেকে বিরত থাকে যা তার দুনিয়া ও আখিরাতের কোন টিতেই কোন কাজে আসবে না। এ কারণেই অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে – একবার সাহাবী (রা)গণের মধ্যে এক ব্যক্তির মৃত্যু হল। তখন জনৈক ব্যক্তি বললেন, তোমাকে জান্নাতের সুসংবাদ। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "তুমি জান না – এমনও তো হতে পারে যে, সে নিরর্থক কথাবার্তা বলেছে অথবা সে এমন ব্যাপারে কার্পণ্য করেছে যা না করলেও তার কোন কিছুই কমে যেত না।[৪৭২]

আবূ যার (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর তাকওয়ার উপদেশ দিচ্ছি। কেননা এটা তোমার যাবতীয় কাজকে অধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত করবে। আমি বললাম, আরো অধিক কিছু বলুন। তিনি বললেন, কুরআন তিলাওয়াত ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার যিকরকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও। এটা তোমার জন্য উর্ধ্ব আকাশে স্মরণযোগ্য এবং পৃথিবীতে তোমার জন্য আলো হবে। আমি আবারো বললাম, আরো অধিক কিছু বলুন। তিনি বললেন – নিরবতা দীর্ঘ কর। কেননা এটা শয়তানকে দূরে সরিয়ে দেবে এবং দীনী কাজে তোমার সহায়ক হবে। আমি আরো আরয করলাম, আরো কিছু বলুন। তিনি বললেন, অধিক হাসা হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখ। কেননা এটা অন্তরকে মেরে ফেলে এবং চেহারার জ্যোতি দূর করে দেয়। আমি আরো আরয করলাম, আরো অধিক কিছু বলুন। তিনি বললেন, ন্যায় কথা বল, যদিও তা কারো কাছে তিক্ত হয়। আরয করলাম, আরো কিছু বলুন। তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় কাজ করতে কোন নিন্দাকারীর ভয় কর না।

---

[৪৬৮] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মাগাযী

[৪৬৯] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব

[৪৭০] প্রাগুক্ত

[৪৭১] প্রাগুক্ত

[৪৭২] প্রাগুক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

আরয করলাম, আরো কিছু বলুন। তিনি বললেন, নিজের মধ্যে যে দোষ-ত্রুটি তুমি জান তা যেন তোমাকে অন্য লোকের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা হতে বিরত রাখে।[৪৭৩]

আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, হে আবূ যার! আমি কি তোমাকে এমন দুটি স্বভাবের কথা বলে দেব না, যা বহন করা খুবই সহজ এবং মাপের পাল্লায় অতীব ভারী? আমি বললাম, জি হাঁ, বলুন। তিনি বললেন, দীর্ঘ নিরবতা ও সচ্চরিত্র। সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! বান্দার এ দুটি কাজের মত উত্তম কাজ আর নেই।[৪৭৪]

উবাদা ইবন সামিত (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – "তোমরা নিজেদের পক্ষ হতে আমাকে ছয়টি বিষয়ের জামানত দাও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জামিন হব। তোমরা যখন কথাবার্তা বল তখন সত্য বলবে। যখন ওয়াদা কর তা পূর্ণ করবে। যখন তোমাদের কাছে আমানত রাখা হয় তা আদায় করবে। নিজেদের লজ্জাস্থানকে হিফাযত করবে। নিজের দৃষ্টিকে অবনমিত রাখবে। নিজের হাতকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে।"[৪৭৫]

আব্দুর রহমান ইবন গনম ও আসমা বিনতি ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন, "তারাই আল্লাহর উত্তম বান্দা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহর স্মরণ হয়। পক্ষান্তরে তারাই আল্লাহর নিকৃষ্ট বান্দা যারা চোগলখরী করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং পূত পবিত্র লোকদের প্রতি অপবাদ আনতে প্রয়াস পায়।"[৪৭৬]

আবূ সাঈদ ও জাবির (রা) তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, গীবত ব্যভিচার হতেও জঘন্য। সাহাবী (রা) গণ আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! গীবত কীভাবে ব্যভিচারের চেয়ে জঘন্য? তিনি বললেন – কোন ব্যক্তি ব্যভিচার করে, এরপর তওবা করে। আল্লাহ তার তওবা কবূল করেন। অপর বর্ণনায় আছে, অতঃপর সে তওবা করে, ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু গীবতকারীকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করেন না, যে পর্যন্ত যার গীবত করা হয়েছে সে ক্ষমা করে দেয়। আনাস (রা) এর বর্ণনায় আছে, নবী (সা) বলেছেন – ব্যভিচারী তওবা করে কিন্তু গীবতকারীর তওবা নাই।[৪৭৭]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন লোক সর্বাপেক্ষা সম্মানিত? তিনি বললেন – যে লোক আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী সেই অধিক সম্মানিত। তারা বললেন – আমরা এ দৃষ্টিকোণ থেকে জিজ্ঞাসা করি নি। তিনি বললেন – সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তিগণ হলেন আল্লাহর নবী ইউসুফ (আ) যিনি আল্লাহর নবী ইয়াকুব (আ) এর পুত্র, যিনি আল্লাহর নবী ইসহাক (আ) এর পুত্র, যিনি আল্লাহর খলীল ইব্রাহীম (আ) এর পুত্র। তাঁরা আবারো বললেন – আমরা এ দৃষ্টিকোণ থেকেও জিজ্ঞাসা করি নি। তখন তিনি বললেন – তবে তোমরা কি আরবদের বংশ সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চাচ্ছো? তারা বললেন – হাঁ। তখন তিনি বললেন – যারা তোমাদের মধ্যে জাহিলিয়া যুগে ভাল ছিল তারা ইসলামী যুগেও ভাল, যখন তারা ইসলামের জ্ঞান অর্জন করে।[৪৭৮]

হাসান বসরী (র) সামূরা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – "মান মর্যাদা হল ধন-সম্পদ আর ভদ্রতা হল তাকওয়া অবলম্বন করা।"[৪৭৯]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন – "সে ব্যক্তি শক্তিশালী নয়, যে প্রতিপক্ষকে মুকাবিলায় পরাভূত করে ফেলে। বস্তুত সে ব্যক্তিই প্রকৃত বীর, যে ক্রোধের সময় নিজেকে আয়ত্ত্বে রাখতে পারে।"[৪৮০]

---

[৪৭৩] প্রাগুক্ত
[৪৭৪] প্রাগুক্ত
[৪৭৫] প্রাগুক্ত
[৪৭৬] প্রাগুক্ত
[৪৭৭] প্রাগুক্ত
[৪৭৮] প্রাগুক্ত
[৪৭৯] প্রাগুক্ত
[৪৮০] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন – "আল্লাহ তাআলা বলেন, অহঙ্কার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার ইযার। সুতরাং যে ব্যক্তি এর কোন একটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করবে আমি তাকে জাহান্নামে ঢুকাবো। অন্য বর্ণনায় আছে, তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।"[৪৮১]

আসমা বিনতি উমাইস (রা) বলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেছেন – "সে বান্দাই সবচেয়ে খারাপ যে নিজেকে অন্যের চেয়ে ভাল মনে করে ও আত্মগরিমা করে এবং সুমহান ও উচ্চ মর্যাদাশীল সত্তাকে ভুলে যায়। সে বান্দাই সবচেয়ে খারাপ যে অন্যের প্রতি অত্যাচার করে এবং সীমালংঘন করে, আর সর্বোচ্চ শক্তিধরকে ভুলে যায়। সে বান্দাই সবচেয়ে মন্দ যে দীনের কাজে গাফিল হয়ে দুনিয়ার কাজে মত্ত হয়ে থাকে আর কবর ও তাতে বিলীন হওয়ার কথা ভুলে যায়। সে বান্দাই সবচেয়ে মন্দ যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে এবং সীমালংঘন করে আর নিজের শুরু ও শেষকে ভুলে থাকে। সে বান্দাই মন্দ যে দীন দিয়ে দুনিয়া অর্জন করে। সে বান্দাই মন্দ যে সন্দেহ তৈরি করে দীনের ব্যাপারে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। সে বান্দাই নিকৃষ্ট যাকে লোভ–লালসা পরিচালিত করে। সে বান্দাই মন্দ যার প্রবৃত্তি তাকে পথভ্রষ্ট করে দেয়। আর সে বান্দাই মন্দ যাকে দুনিয়া মোহ লাঞ্ছনায় ফেলে।"[৪৮২]

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – "তিনটি জিনিস মুক্তিদানকারী এবং তিনটি জিনিস ধ্বংসকারী। মুক্তিদানকারী জিনিসগুলো হল – প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা, আনন্দ ও নিরানন্দ উভয় অবস্থায় সত্য বলা এবং ধনাঢ্যতা ও দরিদ্রতা উভয় অবস্থায় মধ্য পন্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংসকারী জিনিসগুলো হল – প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া, লোভ – লালসার দাস হওয়া এবং কোন ব্যক্তি নিজ অহমিকায় লিপ্ত হওয়া আর এটা হল সবচেয়ে জঘন্য।"[৪৮৩]

আবু যার (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বলেছেন, "তুমি লাল বর্ণ বা কালো বর্ণ বিশিষ্ট হতে উত্তম হবে না বরং তাকওয়া দ্বারা তাদের হতে তোমার মর্যাদা লাভ হবে।"[৪৮৪]

ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলতেন – "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হিদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা ও অমুখাপেক্ষিতা চাই।"[৪৮৫]

মানুষের জন্য সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বিষয় হল আল্লাহর ভালবাসা। আল্লাহর ভালবাসা অর্জনের জন্য তাঁর ভালবাসা পাওয়ার মত উপযুক্ত হতে হয়। ইসলামী আধ্যাত্মিকতার মূল লক্ষ্য মানুষকে আল্লাহ তাআলার ভালবাসার যোগ্য করে তোলা। হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর ভালবাসা, আল্লাহকে ভালবাসা এবং তাঁর ভালবাসা লাভের জন্য তাঁর প্রতি ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা পোষণের নির্দেশনা দিয়েছেন। বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এ ভালবাসার প্রকৃতি। ইরশাদ হয়েছে –

আবূ হরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – "আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন জিবরাঈল (আ)কে ডেকে বলেন – আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি। সুতরাং তুমিও তাকে ভালবাসো। এরপর জিবরাঈল (আ) তাকে ভালবাসতে থাকেন। এরপর আকাশে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ তাআলা অমুক বান্দাকে ভালবাসেন, সুতরাং তোমরা সকলে তাকে ভালবাসো। তখন আকাশের অধিবাসীরা তাকে ভালবাসতে শুরু করে। এরপর সে বান্দার জন্য যমিনেও ভালবাসা দান করা হয়।
আবার আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন তখন জিবরাঈল (আ)কে ডেকে বলেন – আমি অমুক বান্দাকে ঘৃণা করি। সুতরাং তুমিও তাকে ঘৃণা কর। এরপর জিবরাঈল (আ) তাকে ঘৃণা করতে থাকেন। এরপর আকাশে ঘোষণা

---

[৪৮১] প্রাগুক্ত
[৪৮২] প্রাগুক্ত
[৪৮৩] প্রাগুক্ত
[৪৮৪] প্রাগুক্ত
[৪৮৫] ইমাম মুহীউদ্দীন ইয়াহইয়া আন নববী, *রিয়াদুস সালেহীন*, প্রথম খণ্ড, তাকওয়া অধ্যায়, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা–১৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

করে দেন যে, আল্লাহ তাআলা অমুক বান্দাকে ঘৃণা করেন, সুতরাং তোমরা সকলে তাকে ঘৃণা কর। তখন আকাশের অধিবাসীরা তাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। এরপর সে বান্দার জন্য যমিনেও ঘৃণা সৃষ্টি করা হয়।"[৪৮৬]

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "কিয়ামাতের দিন আল্লাহ বলবেন, আমার সুমহান ইজ্জতের খাতিরে যারা পরস্পর ভালবাসা স্থাপন করেছে তারা কোথায়? আমি আজ তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় স্থান দেব। আজ এমন দিন, আমার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া নেই।"[৪৮৭]

মুআয ইবন জাবাল (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ বলেছেন – যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবাসে, আমার উদ্দেশ্যে সমাবেশে মিলিত হয়, আমার উদ্দেশ্যে পরস্পরে সাক্ষাত করে এবং আমার উদ্দেশ্যেই নিজেদের মাল সম্পদ ব্যয় করে – আমার ভালবাসা তাদের জন্য অবধারিত।"[৪৮৮]

আবূ যার (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সামনে এসে বললেন – তোমরা কি জান যে, আল্লাহ তাআলার কাছে কোন কাজ সবচেয়ে প্রিয়? জনৈক ব্যক্তি বলে উঠলো – সালাত ও যাকাত। আরেক জন বলল – জিহাদ। তখন নবী (সা) বললেন – নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কাজ হল একমাত্র আল্লাহর জন্য মহব্বত রাখা এবং আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করা।[৪৮৯]

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন – রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ বলেন – "হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য তুমি তোমার অন্তরকে খালি করে নাও। আমি তোমার অন্তরকে অভাব মুক্তি দিয়ে পরিপূর্ণ করে দেব এবং তোমার দরিদ্রতার পথ বন্ধ করে দেব। আর যদি তা না কর তবে আমি তোমার হাতকে দুনিয়ার ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মেটাব না।"[৪৯০]

সাহল ইবন সাদ (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা) এর খিদমতে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিন যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালবাসবেন এবং মানুষেরা আমাকে ভালবাসবে। তিনি বললেন – "দুনিয়া ত্যাগ কর। আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। মানুষের কাছে যা আছে তার প্রতি লালসা কর না। মানুষ তোমাকে ভালবাসবে।"[৪৯১]

হাদীসের দুনিয়াত্যাগী হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, দুনিয়ার কাজ কর্ম ত্যাগ করা বা বিয়ে–সংসার, ব্যক্তিগত ও জাতীয় দায়িত্ব পালন ছেড়ে দেয়া। বরং এর অর্থ হল দুনিয়ার সম্পদের প্রতি লিপ্সা না করা। আর মানুষের কাছে যা আছে তা হল দুনিয়ার পদমর্যাদা ও দুনিয়ার ধন–দৌলত ইত্যাদি।

আবু উমামা (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন – "আমার বন্ধুদের মধ্যে সেই মুমিনই ঈর্ষার পাত্র যে দুনিয়ার ঝামেলামুক্ত, সালাতের ব্যাপারে সৌভাগ্যবান অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত উত্তমরূপে আদায় করে ও গোপনীয় অবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যে থাকে। মানুষের কাছে অপরিচিত, তার প্রতি অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করা হয় না, তার রিযক প্রয়োজন পরিমাণ হয় এবং তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে। এ কথাগুলো বলে নবী (সা) তুড়ি মারলেন এবং বললেন : এ অবস্থায় হঠাৎ একদিন মৃত্যু তাকে পেয়ে বসে। তার জন্য কান্না করার লোক কম হয় এবং মীরাসী সম্পদও কম ছেড়ে যায়।"[৪৯২]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি খুব সাদাসিধা হালকাভাবে জীবন কাটিয়ে মৃত্যুবরণ করে এমন মুমিন ব্যক্তিই ঈর্ষার পাত্র। কারণ সে আখিরাতে কঠোর হিসাবের মুখোমুখি হবে না।

---

[৪৮৬] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব
[৪৮৭] প্রাগুক্ত
[৪৮৮] প্রাগুক্ত
[৪৮৯] প্রাগুক্ত
[৪৯০] প্রাগুক্ত
[৪৯১] প্রাগুক্ত
[৪৯২] প্রাগুক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন আস (রা) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন – "ইলম হল তিনটি। এ ছাড়া যা আছে তা হল অতিরিক্ত। সে তিনটি হল – দ্ব্যর্থহীন আয়াতসমূহ, প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতসমূহ এবং ন্যায়ভিত্তিক দায়ভাগসমূহ।"[৪৯৩]

উমর ইবন খাত্তাব (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম (সা) পাঁচটি বিষয় হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। ভীরুতা হতে, কৃপণতা হতে, বয়োবৃদ্ধিজনিত দুরবস্থা হতে, অন্তরের মধ্যে সৃষ্ট ফিতনা (হিংসা-বিদ্বেষ) হতে এবং কবরের আযাব হতে।[৪৯৪]

আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন – "হে আল্লাহ! আমি চারটি বিষয় হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এমন ইলম যা উপকারী নয়; এমন কলব যা আল্লাহর ভয়ে ভীত নয়; এমন নফস যা পরিতৃপ্ত নয় এবং এমন দুআ হতে যা কবূল হয় না।"[৪৯৫]

শাকল ইবন হুমায়দ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর খিদমতে নিবেদন করি যে, আমাকে দুআ শিক্ষা দিন। তখন তিনি বলেন – তুমি বল, হে আল্লাহ! আমি কানের অপকর্ম, চোখের দুষ্টুমি, যবানের ধৃষ্টতা, কলবের অপসৃষ্টি এবং বীর্যের অপব্যবহার থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৪৯৬]

আনাস (রা) বলেন, উমর (রা) মুসলিম জনগণের খলীফা থাকা অবস্থায় আমি তাঁর পরিধানের জামার উপরাংশে এবং নিম্নাংশে তালি দেখেছি। আমি উমর (রা) কে দেখেছি তাঁর সামনে এক সা খেজুর রাখা হত। তিনি সব খেজুর নিয়ে নিতেন। এমনকি নিম্নমানের খেজুরটিও। আমি একদিন তাঁর সাথে বের হলাম। তিনি একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। তাঁর ও আমার মাঝে একটি দেয়াল প্রতিবন্ধক ছিল। বাগানের মধ্যে আমি তাঁকে বলতে শুনেছি – 'আহ, হে মুমিনদের আমীর উমর! আল্লাহ শপথ, হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহকে ভয় কর। অন্যথায় আল্লাহ তোমাকে শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করবেন। এক ব্যক্তি এসে উমর (রা) কে সালাম দিলো। তিনি সালামের জওয়াব দিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেমন আছো? সে বলল, আমি আপনার জন্য আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করছি। উমার (রা) বললেন – তোমার কাছে এটাই আশা করেছিলাম।[৪৯৭]

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এর মুক্তদাস আসলাম (রা) বলেন, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এর সাথে সিরিয়া রওয়ানা হলাম। আমরা যখন সিরিয়ার কাছাকাছি পৌঁছলাম, উমর (রা) তখন উট বসিয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের জন্য গেলেন। আমি আমার মাথার পশমী আবরণ খুলে হাওদার মধ্যে রেখে দিলাম। উমর (রা) ফিরে এসে আমার উটের দিকে গেলেন এবং তাতে সওয়ার হয়ে আমার মস্তকাবরণের উপর বসে গেলেন। আমি তাঁর উটে সওয়ার হলাম। অতঃপর আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হলাম। আমাদেরকে যারা স্বাগত জানাতে এসেছিল তারা এ অবস্থায় আমাদের সাথে মিলিত হল। তারা যখন আমার দিকে অগ্রসর হল আমি তাদের ইশারায় উমর (রা) কে দেখিয়ে দিলাম। তারা পরস্পর কানাঘুষা করতে লাগল। উমর (রা) বললেন – এ লোকেরা এমন সওয়ারীর অপেক্ষা করছিল আখিরাতে যাদের কোন অংশ নেই। তিনি এ কথা দিয়ে অনারব অমুসলিম নেতাদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।[৪৯৮]

উলামা কিরামের মতে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে প্রতিটি পাপ থেকে তওবা করা ওয়াজিব। যদি গুনাহ আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে হয় এবং তার সাথে কোন লোকের হক জড়িত না থাকে তবে তা থেকে তওবা করার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। প্রথম শর্তটি হল তওবাকারীকে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হল, সে তার কৃত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হবে। তৃতীয় শর্ত হল, তাকে আবারো সে গুনাহ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। আর যদি অন্য কোন লোকের সাথে গুনাহের কাজটি সংশ্লিষ্ট থাকে তাহলে ইসলামের নীতি অনুযায়ী তা হতে তওবা করার জন্য

---

৪৯৩ *তাজরীদুস সিহাহ,* সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৭, হাদীস, ১৪২, পৃ.১৩১

৪৯৪ সুলায়মান ইবন আশআছ আস সিজিস্তানী, *সুনান,* কিতাবুস সালাত, দিল্লী, ১৯৮৫

৪৯৫ প্রাগুক্ত

৪৯৬ প্রাগুক্ত

৪৯৭ ইমাম মুহাম্মাদ (র), *মুওয়াত্তা,* অনুচ্ছেদ: ধার্মিকতা, কৃচ্ছতা, অল্পে তুষ্টি ও সরলতা, ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট ১৯৮৮

৪৯৮ প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত শর্ত তিনটি ছাড়া আরো একটি অতিরিক্ত শর্ত রয়েছে। এ শর্তটি হল, তওবাকারীকে হকদার ব্যক্তির হক আদায় করতে হবে। যদি কারো ধন সম্পদের হক থাকে অথবা এমন অন্য কিছু থাকে তবে তাকে ফেরত দিতে হবে। কোন অন্যায় দোষারোপ এবং এ জাতীয় কোন কাজ করে থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে বা তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। গীবত বা পরনিন্দার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে মাফ চাইতে হবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, গীবতের বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কিছু জানে না এবং জানলে আরো বেশি কষ্ট পাবে তাহলে যাদের কাছে গীবত করা হয়েছে তাদের কাছে নিজের এ ভুলের স্বীকারোক্তি দিতে হবে এবং মাফ চাইতে হবে। গীবতকৃতের কাছে মাফ না চেয়ে বরং তার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে হবে। তারপর উপরোক্ত তিনটি শর্ত মেনে আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে।

তওবা ইসলামী আধ্যাত্মিকতার একটি উজ্জ্বল দিক। রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্নভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। 'আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশি আনন্দিত হন যার উট মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার পর সে তা ফিরে পেয়েছে।[৪৯৯]

আবূ মূসা আব্দুল্লাহ ইবন কায়স আশআরী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহ তাআলা পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত (কিয়ামাত পর্যন্ত) প্রতিরাতে তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে করে দিনের গোনাহগার তওবা করে। আর তিনি দিনে তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে করে রাতের গুনাহগার তওবা করে।"[৫০০]

ইমরান ইবন হুসায়ন খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। জুহায়না গোত্রের একজন মহিলা যিনার মাধ্যমে গর্ভবতী হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে এসে বলল – হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনার অপরাধ করেছি, আমাকে এর শাস্তি দিন।' রাসূলুল্লাহ (সা) তার অভিভাবককে ডেকে বলে দিলেন – এর সাথে ভাল ব্যবহার করবে। এ সন্তান প্রসব করলে আমার নিকট নিয়ে আসবে।' এ লোকটি তাই করল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে যিনার শাস্তির হুকুম দিলেন। তারপর তার শরীরের কাপড় ভাল করে বেঁধে দেয়া হল এবং হুকুম অনুযায়ী তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হল। রাসূলুল্লাহ (সা) তার জানাযার সালাত পড়লেন। উমর (রা) তাঁকে বললেন – হে আল্লাহর রাসূল (সা)! এত যিনা করেছে। তবুও আপনি এর জানাযার সালাত পড়ছেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন – সে এমন তওবা করেছে যে, চল্লিশজন মদীনাবাসীর মধ্যে ভাগ করে দিলেও তা সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। যে মহিলা তার নিজের প্রাণকে আল্লাহর জন্য স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করে দেয় তার এরূপ তওবার চেয়ে ভাল কোন কাজ তোমার কাছে আছে কি?[৫০১]

তওবা কোন দৃশ্যমান কাজ নয়। একে প্রমাণিত করা বা পরিমাপ করা যায় না। এ হল মানুষের মনের এক বিশেষ অবস্থা। আল্লাহর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি হারানোর আশংকায় কৃতপাপের জন্য অনুশোচনা ও পরিতাপ এবং নতুন করে সে পাপে না জড়ানোর সুদৃঢ় অঙ্গীকার সম্পন্ন করার প্রত্যয়দীপ্ত মানসিকতা।

নিয়ত হল কাজ করার উদ্দেশ্য। এটি কোন দৃশ্যমান বিষয় নয়। কী উদ্দেশ্যে মানুষ কাজ করছে তা তার একান্তই অন্তরের ব্যাপার। ইসলাম মানুষের কাজের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে নিয়তকেই সবচেয়ে বিবেচ্য বিষয় মনে করে। কাজ যাই হোক তার প্রতিফল আল্লাহ দেবেন ব্যক্তি কী উদ্দেশ্যে কাজটি করছে তা বিচার করে। এর ফলে বাহ্যত অনেক ভাল কাজই আখিরাতে ভাল কাজ বিবেচিত নাও হতে পারে। নিয়ত পুরোপুরি একটি আধ্যাত্মিক বিষয়। নিয়তের উপর এ গুরুত্বারোপ ইসলামী আধ্যাত্মিকতারই এক দীপ্ত প্রকাশ। রাসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্নভাবে এ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন –

আলকামা ইবন ওয়াক্কাস লাইসী বলেন, আমি শুনেছি, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) মসজিদের মিম্বরের উপর উঠে বলেছিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, "সব কাজই নিয়ত অনুযায়ী হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত

---

[৪৯৯] ইমাম মুহীউদ্দীন ইয়াহইয়া আন নববী, প্রাগুক্ত, তওবা অনুচ্ছেদ

[৫০০] প্রাগুক্ত

[৫০১] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

করে তাই পায়। কাজেই যার হিজরাত দুনিয়া লাভের বা কোন নারীকে বিয়ে করার নিয়তে হয়েছে তার হিজরাত উক্ত উদ্দেশ্যেই হয়েছে।"[৫০২]

আধ্যাত্মিকতা যে মানুষের আকীদা ও আমলের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করে তার নিদর্শন পাওয়া যায় রাসূলুল্লাহ (সা) এর একটি দীর্ঘ হাদীস থেকে।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন – "কিয়ামাতের দিন বিয়াকারদের মধ্যে প্রথমে যে ব্যক্তির বিচার হবে সে হবে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে এবং আল্লাহ তাকে প্রথমে দুনিয়াতে প্রদত্ত আপন নিআমতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন আর সেও তা স্মরণ করবে। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন – 'তুমি এ নিআমতের বিনিময়ে দুনিয়ায় কী কাজ করেছো? সে উত্তরে বলবে – আল্লাহ! তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি কাফিরদের সাথে লড়াই করেছি, এমনকি শেষপর্যন্ত আমি শহীদ হয়ে গিয়েছি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন – তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য লড়ো নি। বরং তুমি এ জন্য লড়াই করেছিলে যাতে তোমাকে বীরপুরুষ বলা হয়, আর তা তোমাকে বলা হয়েছে। এরপর তার সম্পর্কে ফেরেশতাকে আদেশ দেয়া হবে। সুতরাং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে ইলম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছে। কুরআন পড়েছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ প্রথমে তাকে দুনিয়াতে প্রদত্ত আপন নিআমতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন আর সেও তা স্মরণ করবে। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন – 'তুমি এ নিআমতের বিনিময়ে দুনিয়ায় কী কাজ করেছো? সে উত্তরে বলবে – আমি ইলম শিক্ষা করেছি ও অপরকে শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমাকে খুশি করার জন্য কুরআন পড়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি এ জন্য ইলম শিক্ষা করেছিলে যাতে তোমাকে আলিম বলা হয় এবং এ জন্য কুরআন পড়েছিলে যাতে তোমাকে কারী বলা হয়। আর বা তোমাকে বলাও হয়েছে। এরপর তার সম্পর্কে ফেরেশতাকে আদেশ দেয়া হবে। সুতরাং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ যার রিযক প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন এবং তাকে সব রকমের ধন সম্পদ দান করেছিলেন। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ প্রথমে তাকে দুনিয়াতে প্রদত্ত আপন নিআমতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন আর সেও তা স্মরণ করবে। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন – 'তুমি এ নিআমতের বিনিময়ে দুনিয়ায় কী কাজ করেছো? সে উত্তরে বলবে – এমন কোন রাস্তা বাকি ছিল না যাতে দান করলে তুমি খুশি হবে আর আমি তাতে তোমার খুশির জন্য দান করি নি। তখন আল্লাহ বলবেন – তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি এ উদ্দেশ্যে তা করেছিলে যাতে বলা হয়, সে একজন দানবীর। আর তা বলা হয়েছে। এরপর তার সম্পর্কে ফেরেশতাকে আদেশ দেয়া হবে। সুতরাং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[৫০৩]

নিয়তের শুদ্ধতা ছাড়া কোন ইবাদতই আল্লাহর কাছে ইবাদত বিবেচিত হয় না। ইসলাম নিয়তকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছে যে, কেউ যদি কোন সৎকাজ করার নিয়ত করে কিন্তু যৌক্তিক কারণে তা সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার জন্য তেমন পুরস্কারের ঘোষণাই দেয়া হয় যেমন পুরস্কার সে কাজটি সম্পাদন করলে পেত।

আবূ আব্দুল্লাহ জাবির ইবন আব্দুল্লাহ আল আনসারী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা কোন এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন – "মদীনায় এমন কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে তোমরা যে সমস্ত স্থানে সফর কর এবং যে ময়দান অতিক্রম কর সেখানে তারা তোমাদের সাথেই থাকে। তাদেরকে রোগে আটকে রেখেছে।"[৫০৪]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – "আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চেহারার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না, বরং তোমাদের মনের ও কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করেন।"[৫০৫]

---

[৫০২] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ওহী

[৫০৩] মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইলম

[৫০৪] ইমাম মুহীউদ্দীন ইয়াহইয়া আন নববী, প্রাগুক্ত, ইখলাস ও নিয়ত অনুচ্ছেদ

[৫০৫] প্রাগুক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ বাকরা নুফাই ইবন হারিস সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন – "যখন দুজন মুসলিম তাদের তরবারি নিয়ে পরস্পর মারামারি করে তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই দোযখবাসী হয়।' আবূ বাকরা জিজ্ঞাসা করলেন – হে রাসূলুল্লাহ (সা)! হত্যাকারীর দোযখবাসী হওয়াটা তো বুঝলাম কিন্তু নিহত ব্যক্তির দোযখবাসী হওয়ার কারণ কী? তিনি বললেন – এর কারণ হল এই যে, সে তার প্রতিপক্ষকে হত্যার নিয়ত করেছিল।"[৫০৬]

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন – "সোনা রূপার খনির মত মানবজাতিও নানা গোত্রের খনিরাজি। যারা (যে গোত্র) জাহিলিয়াত যুগে উত্তম ছিলেন, তারা ইসলামী যুগেও উত্তম ছিলেন।"[৫০৭]
এ হাদীসে আল্লাহর রাসূল মনুষ্য প্রকৃতির একটি আধ্যাত্মিক দিক উন্মোচিত করেছেন। ধাতুর খনি যেমন বিভিন্ন হয়ে থাকে, কোন টি সোনার, কোন টি রূপার অর্থাৎ কোন টি উৎকৃষ্ট আর কোন টি নিকৃষ্ট ধাতুর, মানুষের গোত্র ও মর্যাদাও তেমন বিভিন্ন হয়ে থাকে। ইসলাম মানুষের এ গোত্র মর্যাদাকে তখনই স্বীকৃতি দেয় যখন সে দীনের জ্ঞান লাভ করে। ইসলামে মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্বের আসল মাপকাঠি হল দীনের জ্ঞান ও তাকওয়া। আর এর একটিও বাহ্য কোন বিষয় নয়। কাজেই ইসলামে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাটি তার আধ্যাত্মিক উন্নতির উপর নির্ভরশীল।

হাসান বসরী (র) বলেন – "ইলম দু প্রকার। এক প্রকার ইলম হচ্ছে কলব বা অন্তরে, আর এটাই হল উপাকরী ইলম। আর প্রকার ইলম হচ্ছে মুখে, আর এটা হল মানুষের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষে দলীল। (আল্লাহ বলবেন, তোমাকে ইলম দিয়েছিলাম, তুমি এমন করলে কেন?)।"[৫০৮]
হাদীসে অন্তরের যে ইলমের কথা বলা হয়েছে, তা কোন বৈষয়িক ইলম নয়। তা হল অন্তরকে শুদ্ধ করা এবং অন্ত রকে আল্লাহ প্রেমে ডুবিয়ে রাখার ইলম। ইসলামী আধ্যাত্মিকতার এই হল মূল লক্ষ্য। মানুষ তার অন্তর শুদ্ধ করবে এবং পরিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহকে ভালবেসে তাঁর ভালবাসার যোগ্য হবে।

আবূ যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যে বান্দা দুনিয়ার সম্পদ হতে মুখ ফিরিয়ে থাকে আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে সূক্ষ্ম জ্ঞান সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ তার রসনা দিয়ে তা প্রকাশ করেন। দুনিয়ার দোষ ত্রুটি, তার ব্যাধি ও নিরাময় তাকে দেখিয়ে দেন। তাকে দুনিয়া হতে নিরাপদে বের করে দারুস সালামে পৌছে দেন।"[৫০৯]
এ হাদীসে দুনিয়াবিমুখতার যে কথা বলা হয়েছে তা দুনিয়া ত্যাগকে অনিবার্য করে না। এর মানে হল, দুনিয়ার জন্য নিবেদিত হওয়া যাবে না। দুনিয়াকে ব্যবহার করতে হবে আখিরাতে সফলতা পাওয়ার উপায় হিসেবে। লক্ষ্য হবে আখিরাত হাসিল করা। দুনিয়া তার মাধ্যম। কোন ভাবে যেন মাধ্যমই লক্ষ্যে পরিণত না হয় সে দিকে যত্নবান হওয়াই দুনিয়াবিমুখতা। এর তাৎপর্য হল সাধারণ ও সরল জীবন যাপন করা।

আবূ যার (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – "নিশ্চয় সে সফলকাম হয়েছে আল্লাহ তাআলা যার অন্তরকে ঈমানের জন্য খালিছ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা যার হৃদয়কে হিংসা ও মুনাফিকী হতে নিবৃত্ত, রসনাকে সত্যভাষী, নফসকে স্থিতিশীল ও স্বভাবকে সঠিক করেছেন ও তার কানকে বানিয়েছেন সত্য কথা শ্রবণকারী, চোখকে করেছেন সত্য প্রমাণিতাদির প্রতি দৃষ্টিকারী। বস্তুত অন্তর যা সংরক্ষণ করে তার জন্য কান হল চুঙ্গির মত এবং চোখ হল স্থাপনকারী। আর নিশ্চয় ঐ ব্যক্তি সফল হয়েছে যে তার অন্তরকে সত্য কথা সংরক্ষণকারী বানায়।"[৫১০]
এ হাদীসে শুদ্ধ ঈমানকে সফলতার কারণ বলা হয়েছে। অথচ ঈমান হল একটি অস্পৃশ্য, অদৃশ্য বিষয়। যার বসবাস মানুষের অন্তরে। আচরণ বা কথা এর প্রকাশের বাহন হতে পারে কিন্তু ঈমানকে ধারণ করে অন্তর। অন্তরে হিংসা, দ্বেষ, মুনাফিকীর স্থান হতে পারে। ইসলামী আধ্যাত্মিকতার চাহিদা অনুসারে অন্তরকে এ সকল মানবিক ত্রুটি থেকে মুক্ত করে ঈমানের জন্য খালিছ করে নেওয়া না গেলে ঈমান আনা অর্থহীন হয়ে পড়বে।

---

[৫০৬] প্রাগুক্ত
[৫০৭] মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইলম
[৫০৮] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইলম
[৫০৯] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব
[৫১০] প্রাগুক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

শুদ্ধ অন্তর আর আত্মশুদ্ধির লক্ষ্য ছাড়া কোন আমল করা হলে তা কবুল হয় না। বরং এ ক্ষেত্রে অসর্তকতা ও গাফলতিতে মুমিনের আমল তার অজ্ঞাতসারে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা তৈরী হয়। ইব্রাহীম তাইমী (রা) বলেন – "আমি আমার কথাকে আমার কাজের সাথে মিলাতে গিয়েই মিথ্যাবাদী হওয়ার ভয় পেয়েছি।"
ইবন আবু মুলায়কা বলেন – আমি নবী (সা) এর তিরিশ জন সাহাবী (রা) এর সাক্ষাত পেয়েছি। তাদের প্রত্যেকেই নিজের ব্যাপারে মুনাফিকীর ভয় করতেন। তাদের কেউই জিবরীল ও মীকাঈল (আ) এর মত ঈমানদার হওয়ার দাবিও করতেন না। হাসান বসরী (র) থেকে কথিত আছে, ঈমানদারই মুনাফিকীর ভয় করে আর এ ব্যাপারে মুনাফিকই নিশ্চিত থাকে।[৫১১]

সাঈদ ইবন জুবাইর (রা) বলেছেন – আমি ইবন আব্বাস (রা) কে বললাম – নওফ আল বাকালী মনে করে যে, খিযির (আ) এর কাহিনীতে বর্ণিত মূসা বনী ইসরাঈলের কথিত মূসা (আ) নয়, সে অন্য মূসা। ইবন আব্বাস (রা) বলেন – আল্লাহর দুশমন মিথ্যা কথা বলেছে। উবাই ইবন কাআব আমার কাছে নবী (সা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সা) বলেন – মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের সামনে বক্তৃতা দিতে দাঁড়ালে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল – কোন ব্যক্তি সবচেয়ে জ্ঞানী? তিনি বললেন – আমিই সবচেয়ে জ্ঞানী। এতে আল্লাহ তাঁকে তিরস্কার করলেন। কারণ তিনি জ্ঞানকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করেন নি। তারপর আল্লাহ তাঁকে ওহী যোগে জানালেন, সাগরের সঙ্গমস্থলে আমার এক বান্দা আছে। তিনি তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী।'
মূসা (আ) বললেন – প্রভূ আমার! আমি কীভাবে তার সাথে দেখা করতে পারি? তখন তাঁকে বলা হল – 'একটি থলিতে একটি মাছ রাখ। যেখানে তুমি ঐ মাছ হারাবে সেখানেই সে থাকবে।
তারপর মূসা (আ) তাঁর সাথী ইউশা ইবন নূনকে নিয়ে চললেন। থলেতে একটি মাছ বয়ে নিয়ে যেতে যেতে বড় পাথরের কাছে পৌছলেন এবং সেখানে মাথা রেখে শুয়ে ঘুমালেন। মাছটি থলে থেকে বের হয়ে সাগরে সুড়ঙ্গ করে চলে গেল। মূসা ও তাঁর সাথীর জন্য এটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার ছিল। তারপর তারা বাকী দিন ও রাতভর চললেন। পরদিন ভোরে মূসা (আ) সাথীকে বললেন – নাশতা আনতো! আমাদের এ সফরে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'
মূসাকে যে স্থানের কথা বলা হয়েছিল সে স্থান অতিক্রম করার আগে তিনি কোন ক্লান্তিবোধ করেন নি। তার সাথী তাকে বলল – দেখুন আমরা যখন পাথরের চটানে আশ্রয় নিয়েছিলাম আমি তখন মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম।' মূসা বললেন – ঐ স্থানই তো আমরা খোঁজ করছিলাম।
তারপর তারা উভয়ে নিজের পদচিহ্ন ধরে ফিরে এলেন। যখন তারা ঐ পাথরের চটানে পৌছলেন, দেখলেন এক ব্যক্তি কাপড় মুড়ি দিয়ে আছেন। মূসা (আ) সালাম দিলেন। খিযির (আ) বললেন – তোমার এ দেশে সালাম কোথায়?
মূসা (আ) বললেন – আমি মূসা। তিনি বললেন –বনী ইসরাঈলের মূসা? তিনি বললেন – হ্যাঁ, বনী ইসরাঈলের মূসা। এরপর মূসা বললেন – আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন তার কিছুটা আমাকে শিক্ষা দেবেন, এ উদ্দেশ্যে কি আমি আপনার অনুসরণ করব? খিযির বললেন – তুমি কখনই আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না। হে মূসা! আমাকে আল্লাহ যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন আমি তাই রাখি। তুমি তা জান না। আর তোমাকে আল্লাহ যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন তাই তুমি রাখ, আমি তা জানি না।
তিনি বললেন – আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোন ব্যাপারে আপনার অবাধ্য হব না।
তারপর তারা দুজন সাগরের পাড় দিয়ে চলতে লাগলেন। তাদের কোন নৌকা ছিল না। ঐ সময় তাদের কাছ দিয়ে একখানা নৌকা যাচ্ছিলো। তারা তাতে তাদেরকে তুলে নেওয়ার জন্য নৌকার লোকদের বললেন। খিযির (আ) পরিচিত ছিলেন বলে তারা বিনা ভাড়ায় তাদেরকে তুলে নিল। তারপর একটা চড়ুই পাখি এসে নৌকাটির কিনারায় বসলো এবং একবার কি দুবার সাগরে ঠোঁট ডুবিয়ে দিলো। তখন খিযির (আ) বললেন – হে মূসা! তোমার ও আমার জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় এ চড়ুই পাখির ঠোঁটে সাগরের পানির চেয়েও কম।
খিযির (আ) নৌকাটির একখানা তক্তার দিকে গেলেন এবং টেনে খুলে ফেললেন। মূসা (আ) বললেন – এরা বিনা পারিশ্রমিকে আমাদেরকে তুলে নিয়ে এল আর আপনি তাদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য তাদের নৌকা ছিদ্র করে দিলেন?

---

[৫১১] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বললেন – আমি কি বলি নি যে তুমি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না? মূসা বললেন – আমি ভুল করেছি বলে আপনি আমাকে পাকড়াও করবেন না। আর আমার ব্যাপারে আপনি বেশি কঠোর হবেন না।
মূসা (আ) এর প্রথম প্রতিবাদটা ভুল বশত হয়েছিল। তারা আবার চললেন, দেখলেন একটি ছেলে অন্য ছেলেদের সাথে খেলা করছে। তখন খিযির (আ) তার মাথার উপরের দিক নিজ হাতে ধরে তা শরীর থেকে ছিন্ন করে ফেললেন। এতে মূসা (আ) বললেন – আপনি কোন জীব হত্যার বিনিময় ব্যতীত একটা নিরপরাধ জীবকে হত্যা করলেন? তিনি বললেন – আমি কি তোমাকে বলি নি যে, তুমি ধৈর্য ধরে আমার সাথে থাকতে পারবে না?
ইবন উয়াইনা বলেন – খিযির (আ) এর এ কথার মধ্যে 'তোমাকে' শব্দ থাকায় এটা বেশি জোড়াল হয়েছে।
তারা আবার চলতে চলতে এক গ্রামে পৌছুলেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের কাছে খাদ্য চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। সেখানে তারা দেখতে পেলেন যে, একটা দেয়াল খসে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। খিযির (আ) নিজ হাতে সেটাকে সোজাসুজি খাড়া করে দিলেন।
মূসা (আ) বললেন – আপনি ইচ্ছা করলে তো এর জন্য মজুরী নিতে পারতেন। তিনি বললেন – এবার তোমার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ।
নবী (সা) বললেন – আল্লাহ মূসাকে রহম করুক। আমাদের কতইনা ভাল লাগত যদি তিনি ধৈর্য ধরতেন। আর আল্লাহ আমাদের কাছে তাদের দুজনের আরো ব্যাপার বর্ণনা করতেন।[৫১২]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – "যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে তাঁর কসম, তোমাদের কেউ ঈমানদার হয় না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা ও সন্তানের চেয়ে প্রিয়তর হই।[৫১৩] আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন – রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – তোমাদের কেউ ঈমানদার হয় না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, পুত্র এবং সকল মানুষের চেয়েও প্রিয়তর হই।"[৫১৪]

সাদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (সা) একদল লোককে কিছু দান করলেন। সাদ সেখানে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) একজনকে বাদ দিলেন। আমার মতে সে ব্যক্তিই সবচেয়ে যোগ্য ছিল। আমি বললাম – হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অমুককে বাদ দিলেন কেন? আল্লাহর কসম, আমি তো তাকে মুমিন বলে জানি। তিনি (সা) বললেন – না, মুসলিম বল। তখন আমি কিছুক্ষণ চুপ রইলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তাতে বাধ্য হয়ে আবার আমার কথা বললাম – আপনি অমুককে বাদ দিলেন কেন? আল্লাহর কসম, আমি তো তাকে মুমিন বলে জানি। তিনি বললেন – না, মুসলিম বল। এতে আমি কিছুক্ষণ চুপ রইলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি তাতে বাধ্য হয়ে আবার আমার কথা বললাম এবং রসূলুল্লাহ (সা) আবার পূর্বের জবাব দিলেন। তারপর বললেন – হে সাদ! আমি ব্যক্তিবিশেষকে দান করি। অথচ অন্য লোক আমার নিকট তার চেয়ে প্রিয়। এ আশংকায় এমন করি যে, পাছে সে কোন গুনাহের কাজ করে বসলে আল্লাহ তাকে উল্টোমুখে আগুনে ফেলে দেবেন।

অন্তরে বিশ্বাসীকে মুমিন বলে। কাজেই ঈমানের সম্পর্ক হচ্ছে মূলত অন্তরের সাথে। আর বাহ্যিকভাবে আত্মসমর্পণ করে ইসলামের কাজ করলে তাকে মুসলিম বলা হয়। কাজেই বাহ্যিক অবস্থার সাথে ইসলামের সম্পর্ক। এ কারণে নবী (সা) এর কথার তাৎপর্য এই যে, তুমি তো তার অন্তরের খবর রাখ না। কাজেই তাকে মুমিন না বলে মুসলিম বলাই তোমার উচিত।[৫১৫]
রাসূল এখানে সবাইকে দান না করার যে কথা বলেছেন সে কথার অর্থ হল এই যে, যার ঈমান সবল তাকে তো রসূলুল্লাহ (সা) বেশি ভালবাসেন কিন্তু তাকে না দিলে সে মন খারাপ করে কোন গুনাহ অথবা কুফরির দিকে যাবে

---

[৫১২] প্রাগুক্ত
[৫১৩] প্রাগুক্ত
[৫১৪] প্রাগুক্ত
[৫১৫] প্রাগুক্ত, হাশিয়া

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

না। অপর দিকে দুর্বল ঈমানদারকে না নিলে সে হয়তো গুনাহ অথবা কুফরীর দিকে চলে যেতে পারে। তাই তিনি তার ঈমান রক্ষা করার জন্য এবং জাহান্নাম থেকে তার মুক্তি লাভের জন্য তাকে দান করেছেন।[৫১৬]

এ হাদীসে ইসলামী আধ্যাত্মিকতার একটি চমৎকার রূপ অঙ্কিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বাহ্যিক আমলকে ঈমান না বলে ইসলাম বলেছেন। অন্তরের আমলকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যা মানুষকে বাহ্যিক আমলের সাথে সাথে অন্তরের আমল করার ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহী করে তুলবে।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন – আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি – "আল্লাহ তাআলা দয়া মায়াকে এক কত ভাগে ভাগ করে তার নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখেছেন এবং এক ভাগ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। এ এক ভাগের কারণেই প্রাণীকূল একে অপরের প্রতি দয়া–মায়া দেখায়। এমনকি ঘোড়া তার শাবকের ওপর থেকে পা তুলে নেয় তার কষ্ট পাওয়ার আশংকায়।"[৫১৭]

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন – "তোমাদের কেউ এ রূপ বলবে না, আমার মন মানসিকতা কলুষিত হয়ে গেছে। তবে একান্তই যদি বলতে হয় তাহলে বলবে – আমার মন মানসিকতা খারাপ হয়ে গেছে।"[৫১৮]

নবী (সা) এর বাণী : 'করম' হল মুমিনের কলব বা মন। তিনি বলেছেন – "নিঃস্ব হল সে ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন আমলের দিক দিয়ে হবে নিঃস্ব। সত্যিকার বীর হল সে ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। তিনি আরো বলেছেন – আল্লাহ তাআলাই একমাত্র বাদশাহ। তিনি অন্য কারো মালিকানাই খারিজ করে দিয়েছেন।"[৫১৯]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন – "আল্লাহ তাআলার একদল ফেরেশতা আছে যারা আল্লাহর যিকরে রত লোকদের তালাশে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। যখন তারা আল্লাহর যিকরে মশগুল লোকদের দেখতে পায় তখন তাদের একে অন্যকে ডেকে বলে – তোমাদের অভীষ্ট বস্তুর দিকে আস। নবী (সা) বলেন – তখন সে ফেরেশতা ডানা দিয়ে ঐ লোকদের পরিবেষ্টন করে এবং এভাবে দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। নবী (সা) বলেন – তখন আল্লাহর যিকর শেষে মজলিস সমাপ্তির পর ফেরেশতা ফিরে গেলে আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন – আমার বান্দারা কী বলছে? যদিও তিনি তাদের চেয়ে বেশি জানেন। ফেরেশতা জবাব দেয়, তারা আপনার পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করছে এবং প্রশংসা করছে। নবী (সা) বলেন – তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন – তারা কি আমাকে দেখেছে? তারা বলবে – না, আল্লাহর কসম! তারা আপনাকে কখনো দেখে নি। নবী (সা) বলেন – আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করবেন – তারা যদি আমাকে দেখতো তাহলে কী করত? ফেরেশতা বলবেন – যদি তারা আপনাকে দেখতো তাহলে চরম মাত্রায় আপনার ইবাদত করত, আরো বেশি মাহাত্ম্য ঘোষণা করত এবং আরো অধিক আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করত।"

নবী (সা) বলেন – "আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আবারো জিজ্ঞাসা করবেন – তারা আমার কাছে কী চায়? ফেরেশতা বলেন – তারা আপনার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করে। নবী (সা) বলেন – আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করবেন – তারা কি তা দেখেছে? ফেরেশতা বলবে – না, আল্লাহর কসম! হে আমাদের রব! তারা তা দেখে নি। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করবেন – যদি তারা জান্নাত দেখতো তাহলে কী করত? ফেরেশতা জবাব দেবেন – যদি তারা জান্নাত দেখতো তাহলে আরো অধিক ব্যগ্রভাবে তা কামনা করত এবং তা পেতে প্রবল আগ্রহী হত ও তার প্রতি অধিক মাত্রায় আকৃষ্ট হত।

আল্লাহ তাআলা আবারো জিজ্ঞাসা করবেন – কিসের থেকে তারা বাঁচতে চায়? ফেরেশতা বলবেন – জাহান্নাম থেকে। আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করবেন – তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? ফেরেশতারা জবাব দেবেন – না, আল্লাহর কসম!

---

[৫১৬] প্রাগুক্ত, হাশিয়া
[৫১৭] প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব
[৫১৮] প্রাগুক্ত
[৫১৯] প্রাগুক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

তারা তা দেখে নি। আল্লাহ তাআলা বলবেন – তারা তা দেখলে কি করত? ফেরেশতা জবাব দেবেন – তারা জাহান্নাম দেখলে তা থেকে আরো অধিক দূরে পালাত এবং আরো বেশি ভয় করত।"
নবী (সা) বলেন – "তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাকে বলবেন – তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তাদের সবাইকে মাফ দিলাম। নবী (সা) বলেন – একজন ফেরেশতা বলবেন, এদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে যে আল্লাহর স্মরণে রত লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয়,অন্য কোন প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, এ মজলিসের লোকগণ এত মর্যাদাবান যে, তাদের সাথে যারা বসে তারাও বঞ্চিত হয় না।"[৫২০]
হাদীসে ব্যবহৃত শব্দ হল 'আহলুয যিকর। এর বাংলা তরজমা করা হয়েছে – যারা আল্লাহর যিকরে রত। আল্লাহর স্মরণে রত লোক বলে যাদের বুঝানো হয়েছে – তাদের রকম অনেক। যারা সালাত আদায় রত, কুরআন-হাদীস অধ্যয়নরত, ইলম দীন ও ইসলামী জ্ঞানদান ও বিতরণে রত, যে সকল জ্ঞানী ইসলামী জ্ঞান চর্চা ও আলোচনায় রত এবং অনুরূপ কাজে যারা রত – তারা সবাই আহলি যিকরে শামিল। যে কোন কাজ আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধান অনুযায়ী করাও আল্লাহর যিকর। আর যত কাজ আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তাও আল্লাহর যিকর। তাই মুখে যিকর করা, আল্লাহকে সব সময় মনে করা এবং সর্বদা আল্লাহর আদেশ নিষেধ অনুযায়ী চলাকেও আল্লাহর যিকর বলে। তা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাহ, নফল, মুস্তাহাব, হারাম, হালাল – যে কোন পর্যায়ের নির্দেশ হোক না কেন।[৫২১]

আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন – রাসূলুল্লাহ (সা) আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন – "পৃথিবীতে আগন্তুক অথবা পথিকের মত জীবন যাপন কর। ইবন উমর প্রায়ই বলতেন – সন্ধা পর্যন্ত বেঁচে থাকলে সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা কর না। আর সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকলে সন্ধা পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা কর না। এবং সুস্থতা থেকে রোগাক্রান্ত অবস্থার জন্য ও জীবন থেকে মৃত্যুর জন্য কিছু নিয়ে যাও।"[৫২২]
এর অর্থ যতক্ষণ তুমি জীবিত এবং সুস্থ আছো ততক্ষণ মৃত্যু ও অসুস্থ হওয়ার আগেই কিছু ভাল কাজ করে নাও।[৫২৩]

আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সা) একটি চতুর্ভূজ আঁকলেন আর এর মাঝখানে একটি রেখা উপরের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তারপর মাঝখানের রেখাটি ভেতরে লম্বালম্বিভাবে চতুর্ভূজটিকে ছেদ করল। অতঃপর দু পাশ দিয়ে মাঝের রেখার সাথে কয়েকটি ছোটো ছোটো রেখা মিলালেন এবং বললেন – এটা মানুষ এবং চতুর্ভূজটি হল তার বয়সের সীমা যা তাকে ঘিরে রেখেছে। এ বাইরের লাইনটি তার আকাঙ্ক্ষা আর এ ছোটো লাইনগুলো তার বিপদ মুসীবত – যাতে সে আপতিত হয়। যদি সে একটি বিপদ এড়িয়ে যায় পরবর্তী বিপদে পতিত হয়। যদি সে এটিও এড়িয়ে যায়, তৃতীয়টিতে পতিত হয়।"[৫২৪]

আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন – "আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম, অতঃপর এর পরবর্তী যুগের লোকেরা, এরপর তার পরবর্তী যুগের লোকেরা। অতঃপর এমন এক জাতি আসবে যাদের সাক্ষ্য হবে কসমের আগে এবং কসম হবে সাক্ষ্যের আগে।"[৫২৫]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – "ধনী হওয়ার অর্থ সম্পদের প্রাচুর্যই নয়, বরং প্রকৃত সম্পদশালী সেই যার অন্তর সম্পদশালী।"[৫২৬]

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আল্লাহ সে সত্তা যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় উপুড় হয়ে থাকতাম আর কখনো কখনো পেটে পাথর বেঁধে রাখতাম। একদা আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সাহাবী (রা)দের রাস্তায় বসেছিলাম। আবূ বকর (রা) রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে কুরআনের

---

[৫২০] প্রাগুক্ত, কিতাবুদ দাওয়াত
[৫২১] প্রাগুক্ত, হাশিয়া
[৫২২] প্রাগুক্ত, কিতাবুর রিকাক
[৫২৩] প্রাগুক্ত, হাশিয়া
[৫২৪] প্রাগুক্ত
[৫২৫] প্রাগুক্ত
[৫২৬] প্রাগুক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করি। আমি এ উদ্দেশ্যেই তা করি যেন তিনি আমাকে কিছু খেতে দেন। কিন্তু তিনি চলে গেলেন। কিছুই করলেন না। এরপর উমর (রা) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকেও সে একই উদ্দেশ্যে কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করি, কিন্তু তিনিও চলে গেলেন। কিছুই করলেন না। অতঃপর আবুল কাসিম (সা) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি আমাকে দেখে মুচকি হাসলেন। তিনি আমার চেহারা দেখে মনের কথা বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন – হে আবূ হুরায়রা! আমি বললাম, লাব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন – এস। তিনি চললেন। আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি ঘরে প্রবেশ করলে, আমি অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলে আমি প্রবেশ করলাম। তিনি একটি পেয়ালায় কিছু দুধ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এ দুধ কোথা থেকে এসেছে? লোকেরা উত্তর দিলো, অমুক পুরুষ বা অমুক স্ত্রী লোক আপনার জন্য হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়েছে। তিনি বললেন – হে আবূ হির! আমি বললাম, লাব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, যাও, আসহাব ই সুফফার লোকদের এখানে ডেকে আন।

রাবী বলেন – আসহাব ই সুফফা ছিল ইসলামের মেহমান। তাদের ধন–সম্পদ, পরিবার–পরিজন কিছুই ছিল না। আর তাদের এমন আত্মীয় স্বজনও ছিল না তাদের ওপর ভরসা করা যায়। যখন কোন সাদকাহ'র মাল রাসূলুল্লাহ (সা) এর কাছে আসতো তিনি তাদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। নিজে সেখান থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না। আর যদি কোন হাদিয়া (উপঢৌকন) আসতো, তিনি সেখান থেকেও এক অংশ তাদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন এবং নিজে এক অংশ গ্রহণ করতেন।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন – রাসূলুল্লাহ (সা) এর আদেশ শুনে আমি হতাশ হয়ে গেলাম। মনে মনে বললাম, এতটুকু দুধ দ্বারা আসহাব ই সুফফার কী হবে? একমাত্র আমার জন্যই এ দুধ যথেষ্ট ছিল। আমি তা পান করলে, আমার শরীরে শক্তি ফিরে পেতাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) এসে আদেশ করলে আমি তাদেরকে দুধ দিয়ে দেব, তখন আমার জন্য কিছুই থাকবে না। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মানা ছাড়া উপায় নেই। কাজেই আমি আসহাব ই সুফফাকে ডেকে আনলাম। তারা ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে, তাদেরকে অনুমতি দেয়া হল। তারা নিজ নিজ আসন গ্রহণ করল। রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বললেন, হে আবূ হির! আমি বললাম, লাব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! তিনি বললেন – নাও, এ দুধ তাদেরকে দাও। আমি দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে দিতে শুরু করলাম। এক ব্যক্তির হাতে দিলাম, সে পান করে পরিতৃপ্ত হল এবং আমাকে পেয়ালা ফেরত দিলো। আমি অন্য একজনকে দিলাম। সেও পরিতৃপ্তি সহকারে পান করে আমাকে পেয়ালা ফেরত দিলো। আমি তৃতীয় জনকে দিলাম, সেও তাই করল। এমনকি আমি সবশেষে রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট পৌছলাম। সবাই পরিতৃপ্ত হল। তিনি আমার হাত থেকে পেয়ালা নিলেন এবং আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, হে আবূ হির! আমি বললাম, লাব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন – এখন আমি আর তুমি বাকী। আমি বললাম – আপনি ঠিকই বলেছেন। তিনি বললেন – বসো পড় এবং পান কর। আমি বসে পড়লাম এবং পান করলাম। তিনি পুনরায় বললেন – পান কর। আমি পান করলাম। তিনি বলতেই থাকলেন, এমনকি আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, আল্লাহর শপথ! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আমার পেটে আর জায়গা নেই। তিনি বললেন – আমাকে দাও। আমি তাঁকে দিলে তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং বিসমিল্লাহ পড়ে বাকী দুধ পান করলেন।[৫২৭]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – "তোমাদের মধ্যে কেউ তার কাজের দ্বারা নাযাত পাবে না। লোকেরা বলল – আপনিও আপনার কাজের দ্বারা নাযাত পাবেন না? তিনি বললেন – না, আমিও না। তবে আল্লাহ তাঁর রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে রেখেছেন। সুতরাং সঠিক এবং কর্তব্যনিষ্ঠভাবে কাজ করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর, সকাল বিকাল এবং রাতের শেষাংশে আল্লাহর ইবাদত কর। এসব কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর, মধ্যম পন্থাই তোমাদেরকে লক্ষ্যে পৌছাবে।"[৫২৮]

---

[৫২৭] প্রাগুক্ত

[৫২৮] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন – রাসূলুল্লাহ (সা) কে প্রশ্ন করা হল – কোন কাজ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয়? তিনি বললেন – যে কাজ সার্বক্ষণিক ও নিয়মিত করা হয় – যদি তা পরিমাণে কমও হয়। তিনি আরো বলেন – তোমার সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ নিজের উপর টেনে নিও না।[৫২৯]

আলকামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন – আমি উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা) কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা) কীরূপ ইবাদত করতেন, তিনি কি ইবাদতের জন্য কোন দিনকে নির্দিষ্ট করতেন? তিনি বললেন – না। তাঁর ইবাদত ছিল সার্বক্ষণিক ও নিয়মিত। নবী (সা) যা করতে সক্ষম ছিলেন, তোমাদের মধ্যে কে তা করতে সক্ষম হবে?[৫৩০]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন – রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, আল্লাহ বলেন – "যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ ঘোষণা করব। আমি যা কিছু আমার বান্দার উপর ফরয করে দিয়েছি তার দ্বারাই কোন বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারবে না। আমার বান্দারা সবসময় নফল ইবাদত দ্বারাই আমার নৈকট্য লাভ করবে। অবশেষে আমি তাকেই ভালবাসতে থাকি। অতঃপর আমি তার কান হয়ে যাই – যা দিয়ে সে শুনতে পায়; আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়; আমি তার হাত হয়ে যাই – যা দিয়ে সে স্পর্শ করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই – যার সাহায্যে সে চলাফেরা করে। আর সে যদি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় প্রদান করি। আমি যে কাজ করতে চাই তা করতে কোন দ্বিধা–সংকোচ করি না – যতটা দ্বিধা–সংকোচ করি একজন মুমিনের জীবন সম্পর্কে। কেননা সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, অথচ আমি তার বেঁচে থাকাকে অপছন্দ করি।"[৫৩১]

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন – তোমরা 'জুববুল হুযন' থেকে আল্লাহ নিকট পানাহ চাও।' সাহাবী (রা) গণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! জুববুল হুযন কী? তিনি ইরশাদ করলেন – তা হল জাহান্নামের একটি গর্ত, যা হতে জাহান্নাম নিজেই প্রতিদিন ৪০০ বার পানাহ চেয়ে থাকে। তাঁরা আবারো জিজ্ঞাসা করলেন – হে আল্লাহর রাসূল! তাতে কারা প্রবেশ করবে? তিনি বললেন – সে সকল কুরআন অধ্যয়নকারীরা, যারা নিজেদের কাজ অন্যকে দেখিয়ে থাকে।[৫৩২]

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – আমি 'জাওয়ামিউল কালিম' নিয়ে প্রেরিত হয়েছি। আর ভক্তিপূর্ণ ভয় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। একবার নিদ্রিত অবস্থায় আমি দেখতে পেলাম যে, দুনিয়ার ধন–ভাণ্ডারের চাবিকাঠি আমার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বিদায় নিয়েছেন আর তোমরা সে ধন–সম্পদ ব্যবহার (ভোগ) করছো অথবা (মাটি খুঁড়ে) উদ্ধার করছো অথবা তিনি এ ধরনের কোন শব্দ ব্যবহার করেছেন।[৫৩৩]

আতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন – আমি জাবির ইবন আব্দুল্লাহকে বলতে শুনেছি, তার সাথে তখন আরো লোক ছিল। তিনি বলেন – আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাহাবীগণ শুধু হজের ইহরাম বাঁধলাম। তার সাথে উমরার নিয়ত করলাম না। আতা বর্ণনা করেন, জাবির বলেন – নবী (সা) যিলহজ মাসের চার তারিখ সকাল বেলা মক্কায় পৌঁছলেন। যখন আমরাও এসে পৌঁছলাম, নবী (সা) আমাদেরকে ইহরাম খুলে ফেলার হুকুম দিলেন। তিনি বললেন – তোমরা ইহরাম খোলো এবং স্ত্রীদের কাছে যাও।
আতা থেকে বর্ণিত। জাবির বলেন – স্ত্রীদের কাছে যাওয়া তাদের জন্য তিনি ফরয করেন নি। বরং তাদের সাথে সহবাস করাটা বৈধ করেছেন। তিনি জানতে পেরেছেন যে, আমরা বলাবলি করছি, আমাদের ও আরাফাত দিবসের মাঝে পাঁচদিনের বেশি বাকী নেই। অথচ তিনি আমাদেরকে ইহরাম খুলে স্ত্রীদের কাছে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

---

[৫২৯] প্রাগুক্ত
[৫৩০] প্রাগুক্ত
[৫৩১] প্রাগুক্ত
[৫৩২] মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত তিরমিযী, *আল জামি আত তিরমিযী*, কিতাবুল ইলম, দিল্লী, ১৯৮৫
[৫৩৩] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইতিসাম

Dhaka University Institutional Repository

আমরা এ অবস্থায় আরাফাতে পৌঁছবো যে, আমাদের পুরুষাঙ্গ থেকে বীর্য ঝরছে।' আতা বলেন, জাবির হাত নেড়ে ইশারা করে কথাগুলো বলেছিলেন।
নবী (সা) উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন – তোমরা জান, আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি। তোমাদের চেয়ে বেশি সত্যবাদী এবং তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভাল কাজ সম্পাদনকারী। যদি আমার সাথে কুরবানীর পশু না থাকত তবে আমি তোমাদের মতই ইহরাম খুলে ফেলতাম। অতএব তোমরা ইহরাম খুলে ফেলো। যদি আমি আগে জানতাম যা আমি পরে জেনেছি, তবে আমি কুরবানীর পশু আনতাম না। আমরা ইহরাম খুলে ফেললাম, রাসূলের কথা শুনলাম ও তাঁর আনুগত্য করলাম।[৫৩৪]

এ হাদীস প্রমাণিত করে, রাসূলুল্লাহ (সা) করেন নি এমন কোন উপায়ে কেউ যদি আত্মার পবিত্রতা সাধনের বা সাধনার কোন চেষ্টা করে সে আসলে রাসূলের (সা) অনুসরণ করে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) আত্মিক শুদ্ধতা অর্জনের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ পথই অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর চেয়ে কেউ বেশি মুত্তাকী বা মুহসিন হতে পারবে না। কাজেই আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে কোন রকম বাড়াবাড়ি করে সাধনার নতুন কোন পথ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে নিয়ে সে অনুসারে মানুষকে বাইআত করানো কোন মুমিনের কাজ হতে পারে না।

ইসলামী আধ্যাত্মিকতা গৃহ–সংসার বিমুখ কোন সাধনায় বিশ্বাস করে না। ইসলাম এমন ইবাদাতেরও নির্দেশ দেয় না যা করার জন্য লোকদেরকে বনবাসী হতে হয় বা সর্বত্যাগী হতে হয়। ইসলামের মাহাত্ম এখানেই যে এখানে জীবনের সকল দিক সুচারুরূপে সম্পন্ন করার মধ্যেই আধ্যাত্মিকতার চেতনা নিহিত আছে। আবূ উমামা (রা) হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবীজীকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ইবাদাতের উদ্দেশ্যে বনবাসে যাওয়ার অনুমতি দিন। নবী (সা) উত্তরে বললেন – আমার উম্মাতের জন্য বনবাস করে ইবাদত করার প্রয়োজন নেই। মহান আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাই ঐ রূপ ইবাদাতের শামিল।[৫৩৫]

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এ আয়াত তিলাওয়াত করেন – 'যাকে আল্লাহ হিদায়াত দানের ইচ্ছা করেন আল্লাহ তার অন্তর ইসলামের জন্য খুলে দেন'। এ আয়াত তিলাওয়াতের পর তিনি বললেন – 'নিশ্চয় নূর যখন অন্তরে প্রবেশ করে তখন অন্তর খুলে যায়। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল – হে আল্লাহর রাসূল! এর কি কোন অনুভাবনীয় লক্ষণ আছে, যার দ্বারা আমরা বুঝতে পারবো যে অন্তর প্রশস্ত হচ্ছে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন – হ্যাঁ, তার অনুভবযোগ্য পরিচয় হল – অন্তরে দুনিয়ার প্রতি বিরাগ এবং চিরস্থায়ী আবাসস্থলের জন্য অনুরাগ। মৃত্যু আসার আগেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।[৫৩৬]
যার অন্তরে ইসলামের প্রকৃত রূপ ধরা পড়ে তার মনে এ দুনিয়ার প্রতি বিরাগ ও অনীহা তৈরি হয় এবং আখিরাতের প্রতি তার প্রবল অনুরাগ জন্মে। মৃত্যুর পরোয়ানা লাভের আগেই সে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে।[৫৩৭]

বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – "কবর যিয়ারত করা থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছিলাম (তাওহীদের পূর্ণ ধারণা মনে বদ্ধমূল হয়ে যাওয়ার জন্য)। সুতরাং এখন কবর যিয়ারাত করতে পার।"
অপর এক বর্ণনায় আছে – "এখন যদি তোমরা কবর যিয়ারতে যেতে চাও যেতে পার। কেননা কবরসমূহ আখিরাতের কথা নতুনভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়।"[৫৩৮]

মুআয বিন জাবাল (রা)কে ইয়েমেনের গভর্নর নিয়োগ করে পাঠানোর কালে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন – "হে মুআয! বিলাস ব্যসন থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। কেননা আল্লাহর বান্দারা বিলাস ব্যসন প্রিয় হন না।"[৫৩৯]

---

[৫৩৪] প্রাগুক্ত
[৫৩৫] সুলায়মান ইবন আশআছ আস সিজিস্তানী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল জিহাদ
[৫৩৬] আল্লামা জলীল আহসান নদভী, *রাহে আমল*, ২য় খণ্ড, দুনিয়ার প্রতি বিরাগ ও আখিরাতের চিন্তা অধ্যায়, ঢাকা, ১৯৯০
[৫৩৭] প্রাগুক্ত
[৫৩৮] প্রাগুক্ত
[৫৩৯] প্রাগুক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

শাদ্দাদ ইবন আউস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন – "প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিই বুদ্ধিমান যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। নির্বোধ ও অক্ষম হল সে ব্যক্তি যে ব্যক্তি নিজেকে নফসের অধীনে ছেড়ে দিয়েছে এবং আল্লাহর উপর অযথা রহমতের আশা করছে।"[৫৪০]
অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ নিষেধের খেলাফ করে, রাসূলের অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে এবং প্রবৃত্তি পুঁজায় ডুবে থেকে আশা করছে যে আল্লাহ তাকে জান্নাত দেবেন। কুরআন নাযিলের যুগে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সম্প্রদায় অনুরূপ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন কল্পনায় বিভোর ছিল। বর্তমান যুগের অসংখ্য মুসলমানও অনুরূপ আকাশ কুসুম কল্পনার যাদুঘরে বসবাস করছে এবং মনে করছে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশের উপর জীবনের ভিত্তি রচনা না করলেও জান্নাতের নাগাল পাওয়া যাবে।[৫৪১]

রাসূলুল্লাহ (সা) জনগণকে বললেন – 'তোমরা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর প্রতি লজ্জিত থাকো।' আমরা বললাম – হে আল্লাহর রাসূল! আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আল্লাহকে লজ্জা করছি।' রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন – এটি আসল লজ্জা নয়। বরং আল্লাহর প্রতি সত্যিকারের লজ্জা হল – তুমি তোমার মন মগজে উত্থিত সকল চিন্তা ভাবনার হিফাযত করবে। কী খাবার খেয়ে পেট ভরছো তার প্রতি নযর রাখবে। মৃত্যু, মৃত্যুযন্ত্রণা এবং মৃত্যু পরবর্তী ভয়ংকর অবস্থার কথা স্মরণ করবে। এরপর তিনি বললেন – যে ব্যক্তি আখিরাতে সুখের আশা করে দুনিয়ার জীবনের জৌলুস ছেড়ে দিয়ে সর্বক্ষেত্রে আখিরাতকেই প্রাধান্য দেয় এবং যে ব্যক্তি এ সব কাজ করে সত্যিকারার্থে সেই আল্লাহকে লজ্জা করে।[৫৪২]
এ হাদীসে মন মগযে উত্থিত সকল চিন্তা ভাবনার হিফাযত করার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ হল, মনে কোন খারাপ বাসনা ও অনৈতিক চিন্তা উত্থিত হতে না দেয়া। কেননা আল্লাহর প্রতি যার বিশ্বাস আছে সে জানে, এই অপ্রকাশিক গোপন চিন্তাটি আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না। কাজেই আল্লাহকে প্রকৃত পক্ষে লজ্জা করতে হলে এ সকল গোপন অন্যায্য চিন্তা করার ব্যাপারেও করতে হবে। কারণ আল্লাহর কাছে তো গোপন ও প্রকাশ্য বলে আলাদা কোন কাজ নেই। সকল কিছুই তাঁর কাছে প্রকাশ্য।

আবু যর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলাম – হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু উপদেশ দান করুন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন – আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করার। কেননা আল্লাহর ভয় তোমার যাবতীয় কর্মধারাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। আমি বললাম – আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি (সা) বললেন – কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর স্মরণে নিজেকে ব্যাপৃত রাখ। তাহলে আল্লাহ তোমাকে আকাশে স্মরণ করবেন। এ দুটো জিনিস তোমার দুনিয়ার জীবনের ঘোর অন্ধকারে আলোকবর্তিকার কাজ করবে।[৫৪৩]
'আল্লাহ স্মরণ করবেন' – এর অর্থ হল আল্লাহ তোমাকে ভুলে যাবেন না, তিনি তোমার হিফাযত করবেন। আল্লাহর স্মরণ ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মুমিনের দিব্য দৃষ্টি লাভ ঘটে ও জীবন পথের ঘোর অমানিশায় সরল পথের সন্ধান পাওয়া যায়।

আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – পানি লাগলে লোহায় যেমন মরিচা ধরে তেমনি অন্তরেও পাপের কারণে মরিচা পড়ে। জিজ্ঞাসা করা হল – হে আল্লাহর রাসূল! অন্তরের মরিচা দূর করার উপায় কী? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন – অধিক হারে মৃত্যুর কথা স্মরণ ও কুরআন তিলাওয়াত করলে অন্তরের মরিচা দূর হবে।[৫৪৪]

এ হাদীসে ইসলামী আধ্যাত্মিকতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক খুব সহজেই ব্যাখ্যা করেছেন মহানবী (সা)। তিনি আত্মশুদ্ধির কথা বলেছেন। অন্তরকে পাপ মুক্ত করার জন্য মৃত্যুর কথা স্মরণ ও কুরআন তিলাওয়াতের কথা বলেছেন।

---

[৫৪০] প্রাগুক্ত
[৫৪১] প্রাগুক্ত
[৫৪২] প্রাগুক্ত
[৫৪৩] প্রাগুক্ত
[৫৪৪] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ কোন তরীকা নয়, বিশেষ কারো কাছে যাওয়া নয়। কুরআনে যা আছে তা জেনে তা মেনে চলা এবং সবসময় মৃত্যুর কথা মনে রেখে পাপ থেকে বিরত থাকলেই অন্তর শুদ্ধ হবে বলে ইঙ্গিত করেছেন।

মৃত্যুর কথা স্মরণ করার অর্থ হল, জীবনের এই যে অবকাশ; এটাই শেষ অবকাশ। মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে এসে কোন কাজ করার সুযোগ পাওয়া যাবে না। কুরআন তিলাওয়াতের অর্থ হল বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করা। কুরআনে যা কিছু বলা হয়েছে তা বুঝতে চেষ্টা করা ও সে অনুযায়ী আমল করা। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের যেখানেই কুরআন তিলাওয়াতের কথা এসেছে সেখানে উপরোক্ত অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। এ শব্দটির অন্য একটি অর্থও আছে। তাহল কুরআনের তাবলীগ করা ও তাকে অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়া।

আবূ যর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন – রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – আল্লাহ পাক বলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক বিঘত অগ্রসর হয়, আমি তার প্রতি এক হাত অগ্রসর হই। যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক হাত এগিয়ে আসে, আমি তার প্রতি একগজ এগিয়ে যাই। যে ব্যক্তি আমার দিকে পায়ে হেটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে ছুটে যাই।[৫৪৫]
অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে ইচ্ছে করে, তখন আল্লাহ তার চলার পথকে সহজ করে দেন। মানুষ যখন তার দুর্বলতা সত্ত্বেও আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়; তখন আল্লাহ তার প্রতি করুণা বর্ষণ করেন ও এগিয়ে এসে তাকে কাছে টেনে নেন। শিশু যেমন মা–বাবার নিকট যাবার জন্য অগ্রসর হলে দুর্বলতার জন্য যেতে পারে না, মা–বাবা নিজেরাই দৌড়ে এসে কোলে তুলে নেন, তেমনি আল্লাহও তাঁর বান্দাকে কাছে টেনে নেন।

ইসলামী আধ্যাত্মিকতার একটি পরিচিত রূপ হল সহজ, সরল, অবিলাসী জীবন যাপন করা। রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাহাবী (রা)গণ সকলেই অবিলাসী জীবন যাপন করতেন। অবশ্য এর মানে এই নয় যে, তাঁরা জীবনের জন্য অনিবার্য প্রয়োজনকে উপেক্ষা করতেন। তাঁদের মধ্যে যাঁদের সাধ্য ছিল তাঁরা প্রয়োজনীয় ব্যয় ও ভোগই শুধু করতেন। এ জন্য তাঁরা সংসার, সন্তান বা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ত্যাগ করেন নি বা দায়িত্ব পালনে কোন রকমের অবহেলা করেন নি। নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, দক্ষতা ও নিপূনতার তারা ছিলেন বাস্তব দৃষ্টান্ত।
বিভিন্ন বর্ণনায় এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন –

খাব্বাব (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন – আমরা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এসেছিলাম। আল্লাহর দরবারে আমাদের পূর্ণ ছওয়াব জমা হল। আমাদের মধ্যকার কিছু সংখ্যক মুহাজির মৃত্যুবরণ করেছিল এবং আগে তাদের দুনিয়ার পুরস্কার কিছুই পায় নি। মুসআব ইবন উমায়র (রা) তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। উহুদের যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। কাফন দেয়ার জন্য তাঁর গায়ের একটি মোটা কম্বল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সে কম্বলটিও এমন ছোটো ছিল যে, আমরা তার মাথা ঢাকলে পা বেরিয়ে পড়ত আবার পা ঢাকতে চাইলে মাথা বেরিয়ে আসতো। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন – কম্বল দিয়ে মাথা ঢেকে দাও আর ইযখির দিয়ে পা দুটো ঢেকে ফেলো। আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে যারা হিজরতের প্রতিফল দুনিয়াতে পাচ্ছে এবং তারা তা ভোগ করছে।[৫৪৬]
মুসআব (রা) মক্কার একটি অন্যতম ধনী পরিবারের নয়নমণি ছিলেন। অত্যন্ত বিলাস ব্যসনের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত হচ্ছিলো। আরোহণের জন্য তিনি সর্বোত্তম ঘোড়া ব্যবহার করতেন। প্রাতঃ ভ্রমণের জন্য একটি এবং সান্ধ্য ভ্রমণের জন্য ভিন্ন আর একটি ঘোড়া ব্যবহার করতেন। দিনে কয়েকবার পোশাক পরিবর্তন করতেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর আহ্বান শোনার পর পরই তিনি ইসলাম কবূল করেন। পরিণামে কী ঘটবে তার কোন চিন্তাই করলেন না। ইসলাম গ্রহণকারী নও মুসলিমদের শোচনীয় দুরবস্থা তাঁর সামনেই ছিল। তাঁর ইসলাম পূর্ব ও ইসলামপরবর্তী জীবন যাত্রার কথা চিন্তা করে রাসূলুল্লাহ (সা) এর চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু মুসআব (রা) তাঁর অতীতের বিলাসী জীবনের কথা নিজে কখনোই মনে করতেন না। ইসলামোত্তর দুর্দশার জন্য জীবনে একবারও অনুতাপ করেন নি এবং কোন অভিযোগ উত্থাপন করেন নি।

---

[৫৪৫] প্রাগুক্ত, নফল ও তাহাজ্জুদ অধ্যায়
[৫৪৬] প্রাগুক্ত, নবী (সা) এর সঙ্গী সাথীগণের অবস্থা অধ্যায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

আবূ হুরায়রা (রা) বলেছেন – আমি আসহাব ই সুফফার এমন সত্তর জন সদস্যকে দেখেছি যাদের গায়ে জড়ানোর মত কোন চাদর ছিল না। তাদের একটি মাত্র লুঙ্গি কিংবা কম্বল ছিল যা তারা গলায় বেঁধে রাখতেন। এতে কারো অর্ধেক হাটু ঢেকে থাকত আবার কারো গোড়ালি পর্যন্ত পৌছতো। এ অবস্থায় লজ্জাস্থান খুলে যাওয়ার ভয়ে তাঁরা হাত দিয়ে তা ধরে রাখতেন।[৫৪৭]

ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ বর্ণনা করেন; উমর ইবন খাত্তাব (রা) বলতেন – মুমিনের সম্মান হল তার তাকওয়া ও পরহেযগারী অর্জনে, আর ধর্ম হল তার শরাফত ও ভদ্রতা। ভদ্রতা ও চক্ষুলজ্জা হল তার চরিত্র। বাহাদুরী ও ভীরুতা উভয়ই হল জন্মগত গুণ। যাকে ইচ্ছা করেন আল্লাহ এদের একটি দান করেন। ভীরু ও কাপুরুষ ব্যক্তি মাতাপিতাকে বিপদের মুখে ফেলে পালিয়ে যায়। আর বাহাদুর ব্যক্তি এমন ব্যক্তির সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় যার সম্পর্কে সে জানে যে এ ব্যক্তি তাকে আর বাড়ি ফিরতে দেবে না।[৫৪৮]
অর্থাৎ মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মৃত্যুর বিভিন্ন রূপের মধ্যে নিহত হওয়া একটি। শহীদ হল সে ব্যক্তি যে সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের প্রাণ আল্লাহর রাহে তুলে দেয়।

কাজেই আল হাদীসে ইসলামী আধ্যাত্মিকতার একটি পূর্ণাঙ্গরূপ পাওয়া যাচ্ছে। যেখানে আধ্যাত্মিকতাকে জীবন বহির্ভূত কোন বিষয় হিসেবে দেখানো হয় নি। বরং জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিষয় হিসেবে দেখানো হয়েছে। প্রতিটি কাজেই এর উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে। মানুষ যখন কোন কাজ করে তখন তাতে অবলীলায় আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক দিক দুটো চলে আসে। ইসলাম চায় মানুষের কাজের বাহ্যিক রূপটির মত তার আধ্যাত্মিক রূপটি আল্লাহর হুকুম অনুসারে হবে। তাহলে সে সর্বাঙ্গীণ সফলতা লাভ করতে সক্ষম হবে। কাজ করার ক্ষেত্রে বাহ্যিকভাবে আল্লাহর হুকুম মানা আর ভেতরে নিজের ভিন্ন উদ্দেশ্য পোষণ করা হলে সে কাজ কবূলযোগ্য হবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর বাণী ও কাজের মধ্য দিয়ে এ বিষয়টিই সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

---

[৫৪৭] প্রাগুক্ত

[৫৪৮] ইমাম মালিক (র), *মুয়াত্তা*, ইফাবা, সেপ্টেম্বর ১৯৮২, পৃ.৫০১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় :

ইসলামী আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ ও প্রকৃতি

- ভূমিকা
- ঈমান ও আধ্যাত্মিকতা
- ইবাদত ও আধ্যাত্মিকতা
- সালাত
- যাকাত
- সাওম
- হাজ্জ
- আখলাক হাসানাহ ও আধ্যাত্মিকতা
- তাকওয়া
- সিদক ও কিযব
- সবর
- ইহসান
- যিকর
- শোকর
- কর্তব্যপরায়ণতা
- হালাল উপার্জন, হারাম উপার্জন
- তাযকিয়া নফস, তাসাউফ ও আধ্যাত্মিকতা
- তাযকিয়া নফস পরিচিতি
- তাসাউফ পরিচিতি
- তাসাউফের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
- তাসাউফ ও শরীআত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

কুরআন হাদীসে ইসলামী আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে উপস্থাপিত বিবরণ বিস্তারিত বিশ্লেষণ শেষে প্রতীয়মান হয়, ইসলাম মূলত একটি আধ্যাত্মিক জীবনব্যবস্থা। আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি বাহ্যিক আনুগত্য ঘোষণা করা এবং শরীআত নির্ধারিত বিভিন্ন হুকুম আহাকম প্রকাশ্যে পালন করার ব্যবস্থা রাখা হলেও এগুলো নিতান্তই আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য, রাসূলুল্লাহ (সা) এর দ্বিধাহীন অনুসরণ করার জন্য বাহ্যিক এই আনুষ্ঠানিকতাও মহামূল্যবান বিষয়। কিন্তু এর কোন কিছুই অর্থবহ, গ্রহণযোগ্য ও স্বার্থক হয়ে উঠবে না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না আধ্যাত্মিক দিক থেকেই বাহ্যিক এ আনুষ্ঠানিকতাগুলো প্রকৃতার্থেই আল্লাহ তাআলার জন্য হবে। যদি এমন হয় যে, মনের মধ্যে কাজ করে কলুষ–কালিমা, মানুষকে দেখানোর এবং নিজেকে ভাল প্রমাণ করার প্রবল ইচ্ছার জন্যই এ সকল ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতায় নিমগ্ন হওয়া হয় – তাহলে সকল কাজই অর্থহীন এবং প্রতিদান অযোগ্য হয়। বরং এ রকম দ্বিধা ও প্রদর্শনেচ্ছাসম্পন্ন সালাত, যাকাত, হাজ্জ, ঈমান প্রভৃতি আখিরাতে চূড়ান্ত বিবেচনায় ব্যক্তির জন্য মহাক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ঈমান, ইবাদত, আখলাক হাসানাহ সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করলে ইসলামী আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ ও প্রকৃতি সহজেই প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

ঈমান ও আধ্যাত্মিকতা

ইসলামী আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত রূপটি প্রতিভাত হয়ে ওঠে ঈমানের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার মাধ্যমে। কেননা ঈমান পুরোপুরি একটি আধ্যাত্মিক বিষয়। কুরআন মাজীদে, হাদীসে, ইসলামী চিন্তাবিদগণের বিশ্লেষণে বিষয়টি এত সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, এ নিয়ে দ্বিধা, সংশয় বা ভিন্ন ধারণা পোষণের কোন অবকাশ নেই।

ঈমান অর্থ হল আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেয়া, বিশ্বাস করা বা নির্ভর করা। এটি امن মূলধাতু থেকে নির্গত হয়েছে। অতএব امن به এর অর্থ হবে امن المصدق الله من التكذيب অথবা ঈমান এর হামযাটি صيرورت এর জন্য। অতএব امن এর অর্থ হবে امن ذا صار السخص কুরআন মাজীদ ও হাদীসে এ সকল অর্থে ঈমান শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়।

ঈমান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ইরশাদ করেন –

الايمان ان تومن بالله وملائكته ولقائه ورسله وتومن بالبعث

'ঈমান এই যে – তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, আখিরাতে তাঁর সাথে সাক্ষাত ও তাঁর রাসূলগণের উপর বিশ্বাস রাখবে। মরণের পর আবার জীবিত হতে হবে, তাও বিশ্বাস রাখবে।[৫৪৯]

অন্যত্র আছে – রাসূলুল্লাহ (সা) আব্দুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ কী? তারা বলল – আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি (সা) বললেন – "এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মদ তাঁর রাসূল। সালাত কায়িম করা, যাকাত দেয়া এবং রমযানে সাওম পালন করা এবং গনীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ দান করা।"[৫৫০]

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন – "ঈমান হল এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর প্রেরিত নবীগণ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখবে এবং তুমি তাকদীর ও এর ভাল মন্দের প্রতিও ঈমান রাখবে।"[৫৫১]

যে সামগ্রিক বিশ্বাস ও শিক্ষা নিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) দুনিয়ায় আগমন করেছেন এবং যে বিশ্বাস ও আদর্শকে গ্রহণ করার জন্য মানব জাতিকে আহ্বান করেছেন; তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করার নামই ঈমান। এক কথায় আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলের উপস্থাপিত সমগ্র বিশ্বাস ও শিক্ষার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করার নামই

---

[৫৪৯] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান

[৫৫০] প্রাগুক্ত

[৫৫১] মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে ঈমান। এ সংজ্ঞার ভিত্তিতে এ সত্যও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর নবী ও রাসূলগণের প্রতি, আখিরাত ও তাকদীরের ভাল মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। তেমনি রাসূল (সা) এর শিক্ষার প্রতি ঈমানের তাৎপর্য হচ্ছে সালাত, হাজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ফরযিয়াতের উপর বিশ্বাস আনয়ন করা। এমনিভাবে বিনা বিচারে নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করা, ব্যভিচার, সুদ, ঘুষ, প্রতারণা, মিথ্যা কথা বলা, মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া, অশ্লীলতা, নগ্নতা, বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতা ইত্যাদি হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস আনা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। যখন এমনিভাবে মুমিনের মনে ঈমান বাসা বাঁধে তখন এর ফলশ্রুতিতে মুমিন আল্লাহতে আত্মসমর্পণের বাস্তব অনুভূতি লাভ করে।[৫৫২]

ঈমান আল্লাহর এক রহমত ও নিআমত। সকলের পক্ষে এ নিআমত লাভ করা সম্ভব নয়। এ নিআমত তারাই লাভ করতে পারে যাদের উপর আল্লাহ তাআলা রাজি খুশি থাকেন। ইরশাদ হচ্ছে –

"তোমার রব ইচ্ছা করলে দুনিয়াতে যারা আছে তারা সকলে অবশ্যই ঈমান আনতো। তবে কি তুমি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে? আল্লাহর অনুমতি ছাড়া ঈমান আনা কারো সাধ্য নয় এবং যারা অনুধাবন করে না আল্লাহ তাদেরকে কলুষলিপ্ত করেন।"[৫৫৩]

ঈমান তাই জোর করে চাপিয়ে দেয়ার বিষয় নয়। এ হল মানুষের অন্তরের এক বিশেষ অবস্থা। আল্লাহর রহমত হলে এ অবস্থায় উপনীত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে। কিন্তু শুধু ঈমান এনে লাভ নেই যদি না ঈমানের দাবি আদায় করে আমল করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন –

"মানুষ কি মনে করে যে – আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেয়া হবে? আমি তো তাদের আগের লোকদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা মিথ্যাবাদী।"[৫৫৪]

"যারা ঈমান আনে তাদের হৃদয় ভক্তিবিগলিত হওয়ার সময় কি আসে নি, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে? এবং আগে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মত যেন তারা না হয় – বহু কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।"[৫৫৫]

ঈমান একটি অন্তরগত বিষয়। এর লক্ষ্য হল মানুষকে পরিশোধন করা। এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে আল্লাহ তাআলা বলেন– "আর যাতে আল্লাহ মুমিনদেরকে পরিশোধন করতে পারেন এবং কাফিরদের নিশ্চিহ্ন করতে পারেন।"[৫৫৬]

বস্তুত ঈমান হল আল্লাহর জন্য সকল কিছু উৎসর্গ করার ঘোষণা, আত্মবিক্রি করার শর্তহীন চুক্তি। ইরশাদ হয়েছে– "নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন। তাদের জন্য এর বিনিময়ে আছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, হত্যা করে ও নিহত হয়। তওরাত, ইনজীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছো সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই তো মহাসাফল্য।"[৫৫৭]

ঈমান আনা হয় আল্লাহ তাআলার অদৃশ্য সত্তা ও ক্ষমতার প্রতি। তিনি যে যে বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেন কোন প্রত্যক্ষণ ছাড়াই তাতে মানুষ ঈমান আনে। অস্পৃশ্য ও অদৃশ্য এ ঈমান মানুষকে মহিমান্বিত করে। আল্লাহ তার জন্য অভাবিত পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। ইরশাদ হয়েছে – "যারা ঈমান আনে ও ভাল কাজ করে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ-কঙ্কন ও মুক্ত দিয়ে এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। তাদেরকে পবিত্র বাক্যের অনুগামী করা হয়েছিল এবং তারা পরিচালিত হয়েছিল পরম প্রশংসাভাজন আল্লাহর পথে।"[৫৫৮]

---

[৫৫২] অধ্যাপক হাসান আইয়ূব, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮
[৫৫৩] আল কুরআন / ১০ : ৯৯–১০০
[৫৫৪] আল কুরআন / ২৯ : ২–৩
[৫৫৫] আল কুরআন / ৫৭ : ১৬
[৫৫৬] আল কুরআন / ৩, : ১৪১
[৫৫৭] আল কুরআন / ৯ : ১১১
[৫৫৮] আল কুরআন / ২২ : ২৩–২৪

Dhaka University Institutional Repository

ঈমান ও তাকওয়া অনেকটা সমার্থক। ঈমান আনলে তাকওয়া অর্জিত হয়। কেননা ঈমান আনার সাথে সাথে আল্লাহ তাকওয়া অর্জনেরও আদেশ দেন। ঈমান মানুষকে শুধু পরিশুদ্ধই করে না বরং কৃত পাপ মার্জনারও পথ করে দেয়। ইরশাদ হয়েছে – "হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দেবেন দ্বিগুণ পুরস্কার, তিনি তোমাদেরকে দেবেন আলো যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৫৫৯]

"হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের সন্ধান দেব যা তোমাদেরকে রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি হতে? তা হল এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে ঈমান আনবে এবং তোমাদের ধন সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জানতে! আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহে। এটাই মহাসাফল্য। এবং তিনি দান করবেন তোমাদের বাঞ্ছিত আরো একটি অনুগ্রহ – আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও। হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী হও, যেমন মারইয়াম পুত্র ঈসা হাওয়ারীদেরকে বলেছিল – আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? হাওয়ারীরা বলেছিল – আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। এরপর বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনলো এবং একদল কুফরী করল। তখন আমি যারা ঈমান এনেছিল তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় তাদেরকে শক্তিশালী করলাম, ফলে তারা বিজয়ী হল।"[৫৬০]

বস্তুত ঈমান হল মানুষের কাজের গ্রহণযোগ্যতা বিচারের জন্য নির্ধারিত আল্লাহর একমাত্র মাপকাঠি। এ অদৃশ্য মাপকাঠিতেই আল্লাহ মানুষের ভাল কাজ বা খারাপ কাজের প্রতিদান নির্ধারণ করেন। এ জন্য ঈমানহীন মানুষের কাজ ব্যর্থ ও অর্থহীন। ইরশাদ হয়েছে –

"তোমাদের মধ্যে যে কেউ যদি নিজ দীন হতে ফিরে যায় এবং কাফিররূপে মৃত্যুবরণ করে – দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। তারাই আগুনের অধিবাসী। সেখানে তারা স্থায়ী হবে।"[৫৬১]

"আল্লাহ কীভাবে সৎপথে পরিচালিত করবেন সে জাতিকে যারা ঈমান আনা, রাসূলকে সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়া এবং তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর কুফরী করে? আল্লাহ যালিম জাতিকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। এরাই তারা যাদের কর্মফল এই যে, তাদের উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও মানুষ – সকলেরই লা'নত। তারা এতে স্থায়ী হবে, তাদের শাস্তি হাল্কা করা হবে না এবং তাদেরকে বিরামও দেয়া হবে না; তবে এরপর যারা তওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় তারা ছাড়া। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ঈমান আনার পর যারা কুফরী করে ও যাদের সত্য প্রত্যাখ্যান প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে তাদের তওবা কখনো কবূল হবে না। তারাই পথভ্রষ্ট। যারা কুফুরী করে ও কাফির হিসেবেই যাদের মৃত্যু ঘটে তাদের কারো নিকট হতে দুনিয়াপূর্ণ সোনা বিনিময় প্রদান করলেও তা কখনো কবূল করা হবে না। এরাই তারা যাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।"[৫৬২]

মূলত যারা ঈমান আনার ঘোষণা দেয় আবারো কুফরী করে, এরপর ঈমান আনে এবং আবারো কুফরী করে তারা মূলত মৌখিক ঘোষণাই দেয়। ঈমান যে একটি অন্তরের নিষ্ঠাজাত বিষয় তা তারা বুঝতে পারে না। বুঝতে চায়ও না। অন্তরের শুদ্ধতা ও পরিশোধন ছাড়া যে ঈমান গ্রহণ সম্ভব নয় তাও তাদের বোধগম্য হয় না। ইসলামী আধ্যাত্মিকতায় ঈমানের অবস্থানটি এতে করে আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেননা এর ফলে প্রতীয়মান হয়, ঈমান কোন বস্তু না বা বাহ্যিক কোন উপাদান না। এর অবস্থান মানুষের অন্তরে। কাজেই কেউ যদি ঈমান আনা ও ঈমান বর্জনের ধারা ক্রমাগত অব্যাহত রাখে তাহলে বুঝতে হবে ঈমান তার অন্তরে প্রবেশ করে নি। সে মূলত মুনাফিক। মানুষকে ধোঁকা দেয়া বা স্বার্থ হাসিলের জন্যই সে ঈমানের ঘোষণা দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে –

---

[৫৫৯] আল কুরআন / ৫৭ : ২৮
[৫৬০] আল কুরআন / ৬১ : ১০–১৪
[৫৬১] আল কুরআন / ২ : ২১৭
[৫৬২] আল কুরআন / ৩ : ৮৬–৯১

Dhaka University Institutional Repository

"যারা ঈমান আনে ও পরে কুফরী করে, আবার ঈমান আনে; আবার কুফরী করে, এরপর তাদের কুফরী প্রবৃত্তি বাড়তে থাকে, আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথে পরিচালিত করবেন না। মুনাফিকদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।"[৫৬৩]

"মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ দীন হতে ফিরে গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন এক জাতিকে নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন, যারা তাঁকে ভালবাসবে; তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে; তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[৫৬৪]

"যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, সালাত কায়িম করে, তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে, তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও আগে যা নাযিল হয়েছে তাতে যারা ঈমান আনে এবং আখিরাতে যারা ইয়াকীন পোষণ করে।"[৫৬৫]

"পূর্ব – পশ্চিমে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পূণ্য নেই কিন্তু পূণ্য আছে কেউ আল্লাহ, আখিরাত, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীগণে ঈমান আনলে এবং আল্লাহ প্রেমে আত্মীয় স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীদেরকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়িম করলে, যাকাত দিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে, অর্থসঙ্কটে,দুঃখ ক্লেশে ও সংগ্রাম সঙ্কটে ধৈর্য ধারণ করলে।"[৫৬৬]

"যারা ঈমান আনে, যারা হিজরত করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারাই আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরমদয়ালু।"[৫৬৭]

"রাসূল, তার প্রতি তার রবের পক্ষ হতে যা নাযিল হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মুমিনরাও। তাদের সকলে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহ ও রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে। তারা বলে – আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না; আর তারা বলে, আমরা শুনেছি ও পালন করেছি।"[৫৬৮]

"যারা বলে – হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা কর। তারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, ব্যয়কারী ও শেষরাতে ক্ষমাপ্রার্থী।"[৫৬৯]

"যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, যারা ক্রোধ সংবরণকারী, মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল; আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি যুলম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ব্যতীত কে পাপ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করে ফেলে জেনে শুনে তারই পুনরাবৃত্তি করে না।"[৫৭০]

"যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহর স্মরণ করে এবং আকাশসমূহ ও দুনিয়ার সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে এবং বলে – হে আমাদের রব! তুমি এগুলো নিরর্থক সৃষ্টি কর নি। তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা কর।"[৫৭১]

"মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের সামনে পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের রবের উপর নির্ভর করে। যারা সালাত কায়িম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে তারাই প্রকৃত মুমিন।"[৫৭২]

---

[৫৬৩] আল কুরআন / ৪: ১৩৭–৩৮
[৫৬৪] আল কুরআন / ৫ : ৫৪
[৫৬৫] আল কুরআন / ২ : ৩–৪
[৫৬৬] আল কুরআন / ২ : ১৭৭
[৫৬৭] আল কুরআন / ২ : ২১৮
[৫৬৮] আল কুরআন / ২ : ২৮৬
[৫৬৯] আল কুরআন / ৩ : ১৬–১৭
[৫৭০] আল কুরআন / ৩ : ১৩৪–৩৫
[৫৭১] আল কুরআন / ৩ : ১৯১
[৫৭২] আল কুরআন / ৮ : ২–৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারাই প্রকৃত মুমিন; তাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।"[৫৭৩]

"তারা তওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকূকারী, সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশ দাতা, অসৎকাজে নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী; এ মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও।"[৫৭৪]

"যারা আল্লাহকে দেয়া অঙ্গীকার রক্ষা করে, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না, আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আদেশ দিয়েছেন যারা তা অক্ষুন্ন রাখে, ভয় করে তাদের রবকে, ভয় করে কঠোর হিসাবকে, যারা তাদের রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, সালাত কায়িম করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দিয়ে মন্দ দূরীভূত করে – তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।"[৫৭৫]

"যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়; যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, পরম আনন্দ ও শুভ পরিণাম তাদেরই।"[৫৭৬]

"অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়–নম্র, যারা অসার কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাত দেয়ায় সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে নিজেদের স্ত্রী বা অধিকারভুক্ত দাসীদের ছাড়া, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালংঘনকারী হবে। যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, যারা নিজেদের সালাতে যত্নবান থাকে তারা হবে অধিকারী – অধিকারী হবে ফিরদাউসের, যাতে তারা স্থায়ী হবে।"[৫৭৭]

"নিশ্চয় যারা তাদের রবের ভয়ে সন্ত্রস্ত, যারা তাদের রবের আদেশসমূহে ঈমান আনে, যারা তাদের রবের সাথে শরীক করে না, যারা তাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে এ বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা দান করে ভীত কম্পিত হৃদয়ে, তারা কল্যাণকর কাজসমূহ দ্রুত সম্পাদন করে ও তাতে তারা অগ্রগামী হয়।"[৫৭৮]

"সে সকল লোক, যাদেরকে ব্যবসায়–বাণিজ্য ও ক্রয়–বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে ও সালাত কায়িম, যাকাত দেয়া হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।"[৫৭৯]

"মুমিনদের উক্তি তো এই যে – যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তখন তারা বলে – 'আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।' আর তারাই তো সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা হতে সাবধান থাকে। তারাই সফলকাম।"[৫৮০]

"মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে ঈমান আনে এবং রাসূলের সাথে সমষ্টিগত ব্যাপারে একত্র হলে তারা অনুমতি ছাড়া সরে পড়ে না।"[৫৮১]

"রাহমানের বান্দা তো তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে, তাদেরকে অজ্ঞ ব্যক্তিরা যখন সম্বোধন করে, তখন তারা বলে – সালাম। তারা রাত অতিবাহিত করে তাদের রবের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে থেকে, তারা বলে – হে আমাদের রব! আমাদের নিকট হতে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর, জাহান্নামের শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ; নিশ্চয় তা অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাস হিসেবে নিকৃষ্ট। যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না বরং তারা আছে এ দুয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়। তারা আল্লাহর সাথে আর কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না ও ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ

---

[৫৭৩] আল কুরআন / ৮ : ৭৪
[৫৭৪] আল কুরআন / ৯ : ১১২
[৫৭৫] আল কুরআন / ১৩ : ২০–২২
[৫৭৬] আল কুরআন / ১৩ : ২৮–২৯
[৫৭৭] আল কুরআন / ২৩ : ১ – ১১
[৫৭৮] আল কুরআন / ২৩ : ৫৭–৬১
[৫৭৯] আল কুরআন / ২৪ : ৩৭
[৫৮০] আল কুরআন / ২৪ : ৫১–৫২
[৫৮১] আল কুরআন / ২৪ : ৬২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

করে। .... এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না ও অসার কাজের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে। যারা তাদের রবের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে তার প্রতি অন্ধ ও বধিরের মত আচরণ করে না। যারা প্রার্থনা করে – হে আমাদের রব! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান সন্ততি দান করুন যারা আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর হবে এবং আমাদেরকে কর মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য।"[৫৮২]

"যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ হতে বেঁচে থাকে ও ক্রোধাবিষ্ট হলে ক্ষমা করে দেয়। যারা তাদের রবের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়িম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করে, তাদেরকে আমি যে রিযক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।"[৫৮৩]

"তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, পরে সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ।"[৫৮৪]

আল্লাহ তাআলার এ ঘোষণাসমূহ থেকে ঈমানের অন্তর্ভূক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যায়। এগুলো হল, জীবনের যে কোন ব্যাপারে দ্বিধাহীন ও নিঃশর্তভাবে আল্লাহ ও রাসূল (সা) এর ফয়সালা মেনে নেওয়া।

সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা এবং কোন ক্ষেত্রেই যেন এর অন্যথা না হয় সে ব্যাপারে সর্বতোভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা। আল্লাহর আদেশ মেনে ব্যবসায় বাণিজ্য ও ক্রয় বিক্রয় করা এবং এ সকল কাজ করতে যেয়ে আল্লাহ তাআলাকে বিস্মৃত না হওয়া।

আল্লাহর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকা। আল্লাহর সকল আদেশ নিষেধ, হুকুম আহকামে ঈমান পোষণ করা ও মেনে চলা।

আল্লাহর সাথে সৃষ্টি, লালন, জীবিকা ও মৃত্যু দান এবং শক্তি, ক্ষমতা ও ইচ্ছা পূরণে আর কাউকে শরীক না করা।

নিষ্ঠার সাথে করণীয় কাজ সম্পন্ন করা। ভাল ও কল্যাণকরকাজে অগ্রগামী থাকা এবং কোন রকম অবহেলা না করে অলসতা না করে ভাল ও কল্যাণকর কাজসমূহ আগেভাগে সম্পন্ন করা।

সালাত আদায়ে বিনয় – নম্র হওয়া, যত্নবান হওয়া।

রাসূল (সা)এর সাথে কোন সমাবেশে বসলে তাঁর অনুমতি ছাড়া সমাবেশ ত্যাগ না করা। বর্তমানে মুসলিম নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এ হুকুমটি কার্যকর হবে। অর্থাৎ আমীর বা খলীফার কোন সমাবেশ থেকে তাঁর অনুমতি ছাড়া চলে না যাওয়া।

অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়, অসার কাজ কর্ম বর্জন করা। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাকাত দেয়া। স্ত্রী এবং অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া আর সকলের নিকট থেকে যৌনাঙ্গকে হিফাযত করা। এমনকি এ ছাড়া অন্য কারো জন্যে মনে কামনা লালন না করা।

আমানত রক্ষা করা। আল্লাহর যিকর করা এবং প্রশান্তি লাভ করা। আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পালন করা, কোন ধরনের হালাল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করা। আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার আদেশ দিয়েছেন তা অক্ষুন্ন রাখা। পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা। নিরবে অত্যাচার সহ্য না করা বরং অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া ও প্রতিশোধ গ্রহণ করা।

শুধু আল্লাহকেই ভয় করা। তাঁর ভয়ের অংশ হিসেবে হাশরের কঠোর হিসাবকে ভয় করা। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সকল কাজ করা। লোকজনকে জানানোর জন্য নয় বা দানশীল হিসেবে খ্যাতি লাভের জন্যও নয় বরং শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রকাশ্যে ও গোপনে দান করা।

মন্দকে দূর করার জন্য মন্দ কাজ না করা। অন্যায়কে আরেকটি অন্যায় দিয়ে প্রতিহত না করা। বরং মন্দ ও অন্যায়কে সত্য ও সুন্দর দিয়ে প্রতিহত করা বা দূরীভূত করা।

আল্লাহর নিকট তওবা করা। আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহর প্রশংসা করা। সিয়াম পালন করা। সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎকাজে নিষেধ করা। আল্লাহ তাআলা আচরণ ও ভোগ ব্যবহারের যে সীমা ঠিক করে দিয়েছেন তা সংরক্ষণ করা। সকল বিষয়ে, সকল পর্যায়ে আল্লাহর উপর ভরসা করা।

আল্লাহর যিকরে ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া এবং হৃদয়ে এক বিশেষ ভাবাবেগ, ভয় ও আশা তৈরী হওয়া।

---

[৫৮২] আল কুরআন / ২৫ : ৬৩–৬৮, ৭২–৭৪

[৫৮৩] আল কুরআন / ১৩ : ৩৭–৩৯

[৫৮৪] আল কুরআন / ৪৯ : ১৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

ঈমানদারদেরকে আল্লাহর পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই কেবল আল্লাহ ঈমানদার বলে গ্রহণ করবেন। অন্যথায় ঈমান আনার ঘোষণা দিলেও ঈমানদার বলা হবে না।

আল্লাহর স্মরণে হৃদয় ভক্তি বিগলিত হবে। জীবন ও সম্পদ আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করার মানসিকতা তৈরী হবে। আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা। আল্লাহদ্রোহীদের হত্যা করা এবং তা করতে যেয়ে নিজে নিহত হওয়ার জন্য তৈরী থাকা। আমল ই সালিহ বা সৎকাজ করা। আল্লাহকে ভয় করা ও ভালবাসা। রাসূল (সা)কে বিশ্বাস করা ও মেনে চলা। আল্লাহ ও রাসূল (সা) এর প্রতি বিশ্বাস পোষণ করা। জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করা। আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী হওয়া।

একবার ঈমান এনে তার উপর অবিচল থাকা। ঈমান ও কুফরের মধ্যে পালাবদল করে একবার ঈমান ও একবার কুফর আবার একবার কুফর আর একবার ঈমান পোষণ করার দোদুল্যমানতা না রাখা।

আল্লাহকে ভালবাসা। মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর আচরণ করা। আল্লাহর পথে কাজ করতে যেয়ে কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় না করা। গায়ব বা অদৃশ্য বিষয়সমূহে বিশ্বাস পোষণ করা। সালাত কায়িম করা। যাকাত আদায় করা। কিতাবসমূহে বিশ্বাস করা। আখিরাতে সুনিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করা।

নবীগণে বিশ্বাস করা। আল্লাহর ভালবাসায় সম্পদ সুনির্দিষ্ট লোকদের মধ্যে দান করা। প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা। দুঃখ কষ্টে, অভাব অভিযোগে, সংঘর্ষ সংগ্রামে নিপীড়ন নির্যাতনে ধৈর্যধারণ করা। আল্লাহর পথে হিজরত করা। আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করা। নবী–রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস পোষণের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে কোন তারতম্য না করা। আল্লাহ ও রাসূলের আদেশ শোনার সাথে সাথে বিনা প্রশ্নে, বিনাদ্বিধায় সাথে সাথে তা পালন করা। সত্য কথা বলা এবং সত্য পথ অবলম্বন করা।

আনুগত্য করা। শেষ রাতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। সচ্ছল – অসচ্ছল উভয় অবস্থায় দান করা।

ক্রোধ সংবরণ করা। মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা। কোন অশ্লীল বা খারাপ কাজ করে ফেললে কিংবা নিজের প্রতি যুলম হয় এমন কোন আচরণ করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।

একবার কোন অন্যায় করে ফেলার পর জেনে শুনে আবারো সে একই অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি না করা। দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে তথা সবসময় আল্লাহর যিকর করা। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি শৈলী নিয়ে চিন্তাগবেষণা করা। আল্লাহর পবিত্রতা, মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বের ঘোষণা দেয়া। পৃথিবীতে গর্ব অহংকারের সাথে চলাফেরা না করা, বরং নম্রভাবে চলাফেরা করা।

অজ্ঞ লোকদের সাথে অহেতুক তর্ক না করা। কেউ সেধে সেধে তর্ক করতে আসলে তাকে সৌজন্যের সাথে এড়িয়ে যাওয়া। কোন ভাবেই সম্পর্কের অবনতি না করা। রাত দিন আল্লাহ ইবাদতে নিমগ্ন থাকা। জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট অনবরত দুআ করা। ব্যয় করার ক্ষেত্রে কৃপণতা ও অপব্যয়ের পরিবর্তে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা। আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ হত্যাকাণ্ড না ঘটানো।

ব্যভিচার না করা। মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়া। আল্লাহর আয়াত, আদেশ নিষেধ, হুকুম আহকাম বিস্মৃত হয়ে গেলে কেউ যদি তা স্মরণ করিয়ে দেয় তা মেনে নেওয়া এবং খুলুসিয়াতের সাথে পালন করার চেষ্টা করা। সবসময় সৎ সন্তান, স্ত্রী এবং নিজের নৈতিক উন্নতির জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা।

ঈমানের এ বিষয়গুলো রাসূলুল্লাহ (সা)ও বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সকল ক্ষেত্রেই কোন না কোন ভাবে এ বিষয়গুলোই আলোচনায় স্থান পেয়েছে।[৫৮৫]

ঈমান যে একটি পুরোপুরি আধ্যাত্মিক বিষয় তা আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ ঘোষণায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইরশাদ হয়েছে – "বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান আনলাম।' বল, তোমরা ঈমান আন নি। বরং তোমরা বল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। কারণ ঈমান তো এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নি।"[৫৮৬]

---

[৫৮৫] আরো দেখুন : সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম,সুনান ইবন মাজাহ, সুনান আবূ দাউদ, সুনান তিরমিযী, সুনান নাসাঈ, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ময়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, মুসনাদ আহমদ, মিশকাত আল মাসাবীহ – 'কিতাবুল ঈমান'

[৫৮৬] আল কুরআন / ৪৯ : ১৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

সাদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদল লোককে কিছু দান করলেন। সাদ সেখানে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) একজনকে বাদ দিলেন। আমার মতে সে ব্যক্তি ছিল সবচেয়ে যোগ্য। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অমুককে বাদ দিলেন কেন? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে মুমিন বলে জানি। তিনি বললেন – না, মুসলিম বল।[৫৮৭] বস্তুত বাইরের আচরণ বা মৌখিক ঘোষণা নয়, একজন মানুষ ঈমানদার না কি ঈমানদার নয় তা বিচার্য হয়ে উঠবে তার অন্তরের অবস্থা বিবেচনা করে। তবে মানুষ যেহেতু অন্তর্যামী নয় সে কারণে মানুষকে মানুষের মৌখিক ঘোষণা ও দৃশ্যমান আচরণের প্রতিই আস্থা পোষণ করতে হবে। মানুষ বিশ্বাস করবে ও সিদ্ধান্ত নেবে তা দেখে যা অন্যের নিকট থেকে প্রকাশ পায়। এর অন্তরালে অন্য কিছু আছে কি না বা তার মনের মধ্যে কি লুক্কায়িত আছে তা বিবেচনা ও বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব মানুষের নয়। সে দায়িত্ব আল্লাহ তাআলার। মহানবী (সা)ও এ দায়িত্ব আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে – রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন – আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বা আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আর যে ব্যক্তি এটা বলল, তার জান মাল আমার হাত থেকে রক্ষা করল। অবশ্য আইনের দাবি আলাদা অর্থাৎ ইসলামের বিধান অনুসারে দণ্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করলে তা তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে এবং তার প্রকৃত বিচারভার আল্লাহর উপর।[৫৮৮]

কাজেই একজন মানুষ মুমিন কি মুমিন না তার বিবেচনা তার আধ্যাত্মিকতার উপরই নির্ভর করে। সুতরাং প্রতীয়মান হয়, ইসলামে বিশ্বাসের প্রথম ধাপটি থেকে শেষ ধাপ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে একমাত্র ক্রিয়াশীল বিষয় হল আধ্যাত্মিকতা। একে বাদ দেয়া বা উপেক্ষা করা তাই নিতান্তই মূর্খতা এবং আল্লাহ দ্রোহিতা। তবে মনে রাখতে হবে, ইসলামী আধ্যাত্মিকতার জন্য আলাদা করে সাধনা করা, সংসার ত্যাগ করা বা ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক দায়িত্বে অবহেলা করার সুযোগ নেই। বরং সংসারে থেকে, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক দায়িত্ব পালনের মধ্যেই এ সাধনা অব্যাহত রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সাহাবী (রা) গণ এমনই করেছেন। এরচেয়ে বেশি কিছু যে বা যারা করতে যাবেন তারা সাধক হিসেবে খ্যাতি কুড়াতে পারেন, মানুষের কাছে সম্মান পেতে পারেন এমনকি সাধনার বলে হয়তো অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারীও হতে পারেন – কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, তারা রাসূল (সা) এর অনুসারী নন। আর রাসূল (সা) এর অনুসারী না হয়ে মুসলিম বা মুমিন থাকা শুধু অসম্ভবই না বরং অবাস্তবও বটে।

ইবাদত ও আধ্যাত্মিকতা

আল্লাহ তআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। দিয়েছেন আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টি সেরার মর্যাদা। দিয়েছেন সীমাহীন নিয়ামত। তাদের কল্যাণার্থে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর অপরাপর বস্তুসমূহ। আল্লাহ তাআলার মানুষ সৃষ্টি এবং মানুষের জন্য এত কিছুর আয়োজনের নেপথ্য কারণ একটাই। আর তা হল মানুষ তাঁর ইবাদত করবে। আল্লাহ বলেন –

و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون-

"আমি সৃষ্টি করেছি জিন্ন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।"[৫৮৯]

فاقم وجهك للدين حنيفا ط فطرت الله فطر الناس عليها ط لاتبديل لخلق الله ط ذالك الدين القيم ولكن اكثر الناس لايعلمون-

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[৫৯০]

আল্লাহ তাআলা নির্দেশিত এ ইবাদত তাই মানুষের জন্য একটি অবশ্য কর্তব্য। ইবাদত না করে কোন মানুষই আল্লাহর প্রিয়ভাজন হতে পারবে না। কেননা ইবাদত মানে আল্লাহর আনুগত্য, তাঁর রাসূলের (সা) আদর্শ মেনে চলা। এ ছাড়া কোন মানুষই মুসলিম থাকতে পারে না। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক ফরযকৃত এবং মানুষ সৃষ্টির একমাত্র লক্ষ্য

---

[৫৮৭] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান

[৫৮৮] প্রাগুক্ত

[৫৮৯] আল কুরআন / ৫১ : ৫৬

[৫৯০] আল কুরআন / ৩০ : ৩০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে বিবেচিত এই ইবাদত একটি পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্মিক বিষয়। কিছু মৌলিক ইবাদত এবং সে সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইবাদত (عبادة) আরবি পরিভাষা। অর্থ দাসত্ব করা, গোলামি করা বা আনুগত্য করা। নিঃশর্তভাবে কারো আদেশ মেনে চলাকেও ইবাদত বলা যায়। যিনি ইবাদত করেন তাকে আবদ ও আবিদ বলা হয়।

পরিভাষায় – ইবাদত হল আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলা। সুতরাং আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে কাজগুলো করতে বলেছেন তা করা এবং যে সকল কাজ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে বিরত থাকাই ইবাদত। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ইবাদতের লক্ষ্য। সে জন্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে কোন উত্তম কাজই ইবাদত। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ও রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশিত পথে জীবনযাপন করাটা ব্যাপক বিবেচনায় ইবাদতের অন্তর্ভূক্ত।

ইবাদত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ কাজ। মানুষের জীবনধারায় ইবাদতকে উপক্ষো বা অস্বীকার করা যায় না। ইবাদতের জন্য আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। একে বাদ দিলে তাই মানবজাতিকে সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। দুনিয়াতে মানুষ আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি। মানুষকে আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধিত্বের সুমহান ও বিরাট দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। দুনিয়ার সবকিছু দিয়েছেন মানুষের ভোগ, ব্যবহার ও সুখ নিশ্চিত করার জন্য। আল্লাহ বলেন –

هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا -

"তিনি দুনিয়ার সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"[৫৯১]

যে জন্য খুব সহজভাবে যায়, আল্লাহর দেয়া প্রতিনিধিত্বের এই দায়িত্ব পালন করাই ইবাদত। আর এ দায়িত্ব পালন করা কোন ঐচ্ছিক বা নৈর্বাচনিক বিষয় নয়। মানুষের জন্য এ হল অতিআবশ্যক কর্ম। এ কাজে অবহেলা, ব্যর্থতা, উপেক্ষা বা অন্য যে কোন অবাধ্যতা মানুষকে কেবল আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে অযোগ্যই প্রমাণ করে না বরং তার সৃষ্টিকেও অর্থহীন এবং অপ্রয়োজনীয় প্রমাণ করে।

ইবাদত কেবল নিছক উপাসনা নয়। মানুষের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত প্রয়োজনে সম্পাদিত দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজই ইবাদত হতে পারে যদি তা আল্লাহর নির্দেশনানুসারে সম্পন্ন হয়। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন,

فاذا قضيت الصلواة فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

"'সালাত শেষ হলে তোমরা দুনিয়াতে ছড়িয়ে পড়বে ও আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৫৯২]

আয়াতে আল্লাহ তাআলা যেমন সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন, সাথে সাথে জীবিকা অর্জনের নির্দেশও দিয়েছেন। তাঁর একটি নির্দেশ পালন ইবাদত হবে এবং অন্যটি হবে না বা একটি নির্দেশ পালন ফরয হিসেবে গণ্য হবে অন্যটি হবে না তা হতে পারে না। কাজেই সালাত আদায় যেমন ইবাদত তেমনি জীবিকা উপার্জন করাও ইবাদত। সালাত আদায় করা যেমন ফরয তেমনি ফরয হল জীবিকা উপার্জন করা। কাজেই ইবাদত কোন আনুষ্ঠানিক কাজ নয়। সালাত, যাকাত, হাজ্জ, সাওম, দান-সাদকাহ জীবিকা উপার্জন করা, হালাল জিনিস গ্রহণ করা প্রভৃতি ইবাদত নয়। বরং ইবাদত হল আল্লাহর আদেশ মানা। এ জন্যই সালাত আদায় করা যেমন ইবাদত তেমনি সালাত না আদায় করাও ইবাদত। যেমন ফজর, যুহর, আসর, মাগরীব, ইশা সালাত আদায় করা ফরয। নির্ধারিত সময়ে এ সকল সালাত আদায় করা আনুষ্ঠানিক ইবাদত। আবার সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় অথবা ঋতুবর্তী অবস্থায় সালাত আদায় করা হারাম। তখন সালাত আদায় করলে তা আল্লাহর অবাধ্যতার কারণ হবে। ইবাদত হবে না। এমনিভাবে রমযানে সাওম পালন ইবাদত। আবার ঈদের দিন সাওম পালন না করাই ইবাদত। কাজেই দান করা, দান করা থেকে বিরত থাকা, মানুষকে ভালবাসা, মানুষকে ঘৃণা করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা,

---

[৫৯১] আল কুরআন / ২ : ২৯

[৫৯২] আল কুরআন / ৬২ : ১০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

নির্যাতনের শিকার হওয়া বা কাউকে নির্যাতন করা প্রভৃতি সবই ইবাদত হয়ে ওঠে যদি তা আল্লাহর আদেশ মেনে করা হয়। এমনকি আল্লাহর আদেশ মেনে কেউ যদি তার স্ত্রীকে ভালবাসে, মা বাবাকে শ্রদ্ধা করে, সন্তানদের জন্য খরচ করে, উৎসবে আনন্দে পোশাক কিনে দেয় বা কাউকে কোন উপহার দেয় তাহলে তাও ইবাদত হবে। আর আল্লাহর আদেশ না মেনে কেউ যদি সালাত আদায় করে, যাকাত দেয়, হাজ্জ করে বা সাওম পালন করে তাহলে তাও ইবাদত হবে না। যেমন এক শ্রেণীর সালাত আদায়কারীর জন্য আল্লাহ তাআলা ধ্বংস ঘোষণা করেছেন। যাদের সালাত তাদের কোন কাজে লাগে নি বরং তা তাদের ধ্বংসের কারণে পরিণত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে –

فويل للمصلين – الذين هم عن صلاتهم ساهون – الذين هم يراءون ويمنعون الماعون -

"সুতরাং দুর্ভোগ সে সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোটো খাটো সাহায্যদানে বিরত থাকে।"[৫৯৩]

ইসলামী আধ্যাত্মিকতা যে ইবাদাতের মধ্যে কতটা প্রবলভাবে বিদ্যমান এবং তার স্বরূপটি যে কী তা ইবাদতের এ তাৎপর্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আল্লাহর সকল আদেশ প্রতিপালনই ইবাদত যদি তা নিষ্ঠার সাথে কেবল তাঁরই জন্য করা হয়। ইসলামী আধ্যাত্মিকতা হল ইবাদতকে শুধুই আল্লাহর জন্য করার এক বিশেষ প্রক্রিয়া। কেননা কেবল আল্লাহর নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদতেই তাঁর পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি লাভ সম্ভব। আর মানজীবনের পরম আরাধ্য ও একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয় হল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। যে জন্যে ইবাদত সীমাহীন তাৎপর্যবহ ও গুরুত্বপূর্ণ।

মহান আল্লাহ মানুষ কীভাবে তাঁর ইবাদত করবে, কীভাবে অর্জন করবে তাঁর সন্তুষ্টি সে পথও নির্দেশ করেছেন। কুরআন মাজীদে এসেছে,

قل اطيعوا الله والرسول ـ فان تولوا فان الله لايحب الكافرين -

"বল – 'আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হও।' যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তো কাফিরদের ভালবাসেন না।"[৫৯৪]

এ আয়াতের মর্ম হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) কর্তৃক নির্দেশিত পথই ইবাদতের মূল। এ পথ অনুসরণ করে ভাল কাজ করলেই কেবল তা সৎকাজ হিসেবে গণ্য হবে এবং আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। ইসলামী আধ্যাত্মিকতা আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহের ক্ষেত্রে কীভাবে ক্রিয়াশীল এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে তার ভূমিকাটি কেমন তা বিশ্লেষণের জন্য আমরা এ পর্যায়ে ইসলামের চারটি মৌলিক আনুষ্ঠানিক ইবাদত সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করছি।

মৌলিক ইবাদত হল মুল বা প্রধান ইবাদত। যে ইবাদতের ওপর ইসলামের মুলকাঠামো দাঁড়িয়ে থাকবে। অন্যান্য ইবাদত সে কাঠামোর পূর্ণতা বিধান করবে, সৌন্দর্য বাড়াবে এবং সুশোভিত করবে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইসলামের মৌলিক ইবাদত হিসেবে পাঁচ রকমের ইবাদতের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন –

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلعم بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة والحج وصوم رمضان -

ইবন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর স্থাপিত। সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল; সালাত কায়িম করা, যাকাত দেয়া, হাজ্জ করা এবং রমযানের সাওম পালন করা।"[৫৯৫]

এ পাঁচ রকমের ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর একত্ববাদ ও মুহম্মদ (সা) এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়া আকীদাগত বিষয়। এটা কোন আনুষ্ঠানিক ইবাদত নয়। বরং পুরোপুরি একটি আধ্যাত্মিক বিষয়। ঈমান ও আধ্যাত্মিকতা অংশে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। আনুষ্ঠানিক ইবাদত হল সালাত, যাকাত, হাজ্জ ও সাওম। এ জন্যে সাধারণভাবে

---

[৫৯৩] আল কুরআন / ১০৭ : ৪–৭

[৫৯৪] আল কুরআন / ৩ : ৩২

[৫৯৫] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান

Dhaka University Institutional Repository

মৌলিক ইবাদত বলতে এ চারটি ইবাদতকেই বুঝায়। আনুষ্ঠানিক ইবাদত হওয়ার পরও আধ্যাত্মিকতা যে কত তীব্রভাবে এ ইবাদতগুলোর সাথে নিবিষ্ট হয়ে আছে এ পর্যায়ে আমরা সে বিষয়টিই প্রত্যক্ষ করব।

সালাত

সালাত (صلوٰة) অর্থ সান্নিধ্য, নত হওয়া, বিনয়ী হয়ে সম্পর্ক স্থাপন করা। এর একটি আভিধানিক অর্থ ইস্তিকামাত বা বাঁকা কাঠকে তাপ দিয়ে সোজা করা। কেননা সালাত মানুষের হৃদয়ের বক্রতা দূর করে সরল ও সোজা করে দেয় এবং ব্যক্তির পাপ প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করে। ব্যবহারগত ক্ষেত্র ও পাত্রভেদে সালাত শব্দটির চারটি বিশেষ অর্থ রয়েছে। যেমন – শব্দটি যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্যবহৃত হয় তাহলে সালাত অর্থ হবে রহমত, অনুগ্রহ ও দয়া করা।
শব্দটি যদি রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে অর্থ হবে দুরুদ পাঠ করা।
সালাত যদি মানুষের পক্ষ থেকে হয় তাহলে অর্থ হবে ক্ষমা প্রার্থনা, দুআ করা, আবেদন বা প্রার্থনা করা।
ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সালাত হলে তার অর্থ হবে তাসবীহ বা পবিত্রতা বর্ণনা করা।
বাংলায় সালাতের প্রতিশব্দ হিসেবে 'নামায' এর ব্যবহার থাকলেও এটি কিন্তু বাংলা নয়। এটি ফারসি ভাষার শব্দ।

পরিভাষায় – সালাত এক বিশেষ প্রকৃতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত। শরীআত নির্ধারিত নিয়মে যা আদায় করতে হয়। এজন্যে সালাতকে সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে যে, শরীআত নির্ধারিত নিয়মে, সুনির্দিষ্ট সময়ে, কিয়াম, রুকু ও সিজদার মাধ্যমে মহান আল্লাহর আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনই সালাত।

বিস্তারিতভাবে বললে, সূর্যোদয়ের পূর্বে, মধ্যাহ্নের পর, অপরাহ্ন, সূর্যাস্তের পর ও রাতে আল্লাহ নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ, রুকু, সিজদাহ, তাশাহুদ, কিয়াম ও বৈঠকের মাধ্যমে ফরয হিসেবে মুসলিমরা প্রতিদিন পাঁচবার আল্লাহ নির্ধারিত ও রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশিত বিশেষ যে ইবাদত সম্পাদন করেন, তার নাম সালাত। প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত হল মাগরিব, ইশা, ফজর, যুহর ও আছর।

মৌলিক আনুষ্ঠানিক ইবাদত হিসেবে সালাতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা, সম্মিলিত সামাজিক ইবাদত এবং আধ্যাত্মিকতার সুমহান ব্যবস্থাপনা হিসেবে সালাতের এ গুরুত্ব সহজাত এবং স্বাভাবিক।

সালাত একটি ফরয বা অবশ্যকরণীয় ইবাদত। কুরআন মাজীদে অসংখ্য স্থানে আল্লাহ তাআলা সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশ পালন করা ফরয। অস্বীকার করা কুফরি। পালন না করা কবীরা গুনাহ। যে জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা)ও ব্যাপকভাবে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। কেউ যদি সালাতের ফরয হওয়া অস্বীকার করে সে কাফির হয়ে যাবে। আদায় না করলে ভয়াবহ রকমের গুনাহগার হবে।

ইসলামের ধর্মীয় কাঠামো যে পাঁচটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সালাত তার মধ্যে দ্বিতীয়। মূল স্তম্ভ বা বুনিয়াদ ছাড়া কোন ঘর বা স্থাপনার অস্তিত্ব লাভ যেমন সম্ভব নয় তেমনি সালাত বাদ দিয়ে ইসলামকে কল্পনা করা অসম্ভব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – 'সালাত দীনের স্তম্ভ। কাজেই যে ব্যক্তি সালাত কায়িম করল সে ইসলাম কায়িম করল। আর যে তা ছেড়ে দিলো সে ধ্বংস করল ইসলামকেই।'

কোন মানুষ মুমিন কী মুমিন নয় তা জানা যাবে সালাত থেকে। বাহ্যত কেউ সালাত আদায় করলে তাকে মুমিন মনে করা হবে আর আদায় না করলে তাকে মুমিন মনে করা হবে না। বস্তুত ব্যক্তি মুসলিম কি না, সে আল্লাহ ও রাসূল (সা) এর প্রতি ঈমান পোষণ করে কি না তা জানা যায় সালাত থেকে। এ জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন –

واقيموا الصلوٰة ولاتكونوا من المشركين

'তোমরা সালিত কায়িম কর এবং মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ো না।'[৫৯৬]

সালাত কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য রচনা করে। মুমিন সালাত আদায় করে। সম্মিলিতভাবে সামাজিক চেষ্টায় সালাত কায়িমের চেষ্টা করে। আর কাফির সালাত ত্যাগ করে। তাই স্বেচ্ছায় সালাত ত্যাগ করা কুফরীর মত অপরাধ।

---

[৫৯৬] আল কুরআন / ৩০:৩১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে সালাতের এ বিপুল গুরুত্বের কারণেই কেউ যদি আধ্যাত্মিক সাধনা বা কোন পীর-ফকীর-ওলীর মুরীদ হওয়ার কথা বলে সালাত আদায় করতে না চায় বা এমন কোন বক্তব্য দেয় যে, তারা সাধনায় এমন স্তরে উপনীত হয়েছেন যে, তাদের আর সালাত আদায়ের প্রয়োজন নেই – তাহলে কোন প্রমাণ ও বিতর্ক ছাড়াই বুঝে নিতে হবে যে, তারা গুমরাহীর মধ্যে আছে। কেননা আধ্যাত্মিকতার সাধনা কোন মুমিনেরই রাসূলুল্লাহ (সা) এর চেয়ে বেশি হতে পারে না। অথচ সারাজীবনে তিনি জামাআত ছাড়া ফরয সালাত আদায় করেন নি। আর রাতের পর রাত কাটিয়েছেন নফল সালাতে। কাজেই সালাত যেমন ঈমানের বাহ্যিক প্রকাশ তেমনি তা আধ্যাত্মিকতারও বাহ্যিক প্রকাশ। কেননা সালাত ছাড়া কেউ আত্মিক সংশোধনের কাজই শুরু করতে পারবে না। যারা এ ছাড়া আত্মিক সংশোধনের কথা বলে তারা মিথ্যা বলে এবং শয়তানের দোসর হিসেবেই বলে। ইসলামে তাদের কোন স্থান নেই।

যথাযথভাবে সালাত আদায়ে মানুষের মধ্যে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপলব্ধি হয়। তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণের সাথে সাথে ব্যক্তি দুনিয়ার সকল কিছুর সাথে তার সম্পর্ক হারাম করে নেয়। তার সম্পর্ক স্থাপিত হয় শুধু আল্লাহ তাআলার সাথে। রাসূলুল্লাহ (সা) বিষয়টির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করে বলেন – "তুমি এমনভাবে ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে নাও দেখ, তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।"[৫৯৭]
কোন মানুষ যদি সত্যিকারার্থেই আল্লাহর সঙ্গ কামনা করে বা আল্লাহকে পাওয়ার সাধনা করতে চায় তাহলে তার প্রথম এবং প্রধান মাধ্যম হতে পারে সালাত। এ জন্য তাকে আলাদা কোন ধ্যান করার প্রশিক্ষণ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং ফরয ও নফল সালাত বিশেষত তাহাজ্জুদ সালাতের মাধ্যমে সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে।

আল্লাহর আনুগত্য করা মানুষের প্রধান, প্রথম এবং একমাত্র দায়িত্ব। তার অন্যান্য দায়িত্ব এ দায়িত্বেরই অনুবর্তী। যেমন ভাল কাজ করা বা মাতাপিতার খিদমত করাও মানুষের দায়িত্ব তবে সে দায়িত্ব মানুষ এ কারণেই পালন করবে যেহেতু আল্লাহ তাআলা ভাল কাজ ও মাতাপিতার সাথে খিদমত করতে বলেছেন। কাজেই ভাল কাজ করে বা মাতাপিতার খেদমত করেও মানুষ তাই আল্লাহরই আনুগত্য করে।
সালাত মহান আল্লাহর প্রতি মানুষের আনুগত্যের বাস্তব প্রকাশ। এর মাধ্যমে ব্যক্তি নিয়মমত সালাতের জন্য দাঁড়ায়। তার নিজস্ব পদ, পদবী, সামাজিক মর্যাদা, অর্থ, বিত্ত, বৈভব,ক্ষমতা, জ্ঞানগভীরতা প্রভৃতি বাদ দিয়ে আল্লাহর সামনে নিষ্ঠা ও আনুগত্য নিয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহর কুদরতী চরণে প্রতিটি রুকূ ও সিজদায় সে বিনয়ে আনত হয়। তার আত্মসম্মান, অহঙ্কার ও গর্ব আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের কাছে সমর্পণ করে। অন্যকোন ইবাদতেই আল্লাহর প্রতি মানুষের আনুগত্যের এ বিষয়টি এমন স্পষ্ট করে ধরা পড়ে না।

ইবাদতসমূহের মধ্যে সালাত সর্বোত্তম এবং সর্বজনীন। অন্য ইবাদতের কোনটা ধনীদের জন্য, কোনটা সুস্থদের জন্য, কোনটা করতে হয় বছরে মাত্র একবার, কোনটা পালনের মেয়াদ হল সর্বোচ্চ একমাস। কিন্তু সালাত প্রতিদিনের ইবাদত। ধনী, গরীব, সুস্থ, অসুস্থ, পথচারী, প্রবাসী সবার জন্য সালাত আদায় করা ফরয। আল্লাহকে স্মরণ করা, তাঁর বিধানাবলী মেনে চলা বা শয়তানের প্ররোচনা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখায় সালাতের কার্যকারিতা অবিসংবাদিত। এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক আল্লাহর যিকর সম্ভব। আল্লাহ তাআলা বলেন –
واقم الصلواة لذكرى – "আর আমার স্মরণার্থে সালাত কায়িম কর।"[৫৯৮]
অন্যত্র সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর যিকরকে সর্বশ্রেষ্ঠ যিকর বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে –
واقم الصلواة ان الصلواة تنهى عن الفحشاء والمنكر
"আর সালাত কায়িম কর। সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে।"[৫৯৯]
ইসলামী জীবন দর্শনের মূল কথা হল, দুনিয়ার জীবন কোন স্থায়ী জীবন নয়। এ হল একটি নির্ধারিত ও সুনির্দিষ্ট সময়ের ক্ষণস্থায়ী জীবন। এ জীবনের সফলতা, ব্যর্থতা, সুখ-দুঃখ সবকিছু তাই ক্ষণস্থায়ী। চূড়ান্ত বিবেচনায় এগুলো

---

[৫৯৭] মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান
[৫৯৮] আল কুরআন / ২০:১৪
[৫৯৯] আল কুরআন / ২৯ : ৪৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

তাই কোন বিবেচ্য বিষয়ও নয়। চিরস্থায়ী জীবন হল আখিরাতের জীবন। আখিরাতের সুখই প্রকৃত সুখ। আখিরাতের সফলতাই প্রকৃত সফলতা। সালাত ব্যক্তিকে চিরস্থায়ী সফলতা লাভের নিশ্চয়তা প্রদান করে। আল্লাহ বলেন –

قد افلح المومنين – الذين هم فى صلواتهم خاشعون

"অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ, যারা বিনম্র–নম্র নিজেদের সালাতে।"[৬০০]

يايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون

"হে মুমিনগণ! তোমরা রুকূ কর, সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও ভাল কাজ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৬০১]

কিয়ামাতের কঠিন দিনে সালাত মুক্তির ওসীলা হবে। আল্লাহ তাআলা সালাত আদায়কারীদের আযাব ও নিদারুন দুর্দশা থেকে মুক্তি দেবেন। অবর্ণনীয় যন্ত্রণা থেকে তারা রেহাই পাবে। তাদের পক্ষে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে সালাত। সালাতের মাধ্যমে সে নিরাশার অন্ধকারে দেখবে জান্নাতের কাঙ্ক্ষিত দরজা।

আর যারা সালাত আদায় করে নি, সালাতের ব্যাপারে গাফিল ছিল, তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। যেমন কিয়ামাতের দিন সাকার নামক জাহান্নামের অধিবাসীদের জিজ্ঞাসা করা হবে এবং জবাবে তারা বলবে –

ما سلككم فى سقر – قالوا لم نك من المصلين

"তোমাদেরকে কিসে সাকারে নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলাম না।"[৬০২]

বিপরীত পক্ষে সালাত আদায় ব্যক্তির জন্য জান্নাত লাভ নিশ্চিত করে।

সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন – "যে ব্যক্তি ভালভাবে অযু করে রুকূ সিজদায় গভীর মনোযোগসহ নিয়ম মত এবং সময় মত সালাত আদায় করে অবশ্যই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।"[৬০৩] আল্লাহর ক্ষমা ও আখিরাতে সফলতা লাভের পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা সালাত আদায়কারীদের জন্য আরো কিছু পুরস্কারও প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – "যারা সঠিকভাবে সালাত কায়িম করে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা পাঁচটি পুরস্কার প্রদান করবেন। তার জীবিকার কষ্ট দূর করবেন। তার কবরের সওয়াল জওয়াব সহজ করবেন ও কবর আযাব মাফ করবেন। তাকে বিদ্যুতগতিতে পুলসিরাত পার করাবেন ও বিনা হিসেবে জান্নাতে দাখিল করবেন। তাকে হাউজে কাউসারের পানি পান করাবেন।"[৬০৪] একজন মুমিনের জন্য আল্লাহর এ অপরিমাণ নিআমত নিশ্চিত করে সালাত।

মানবাত্মার উৎপত্তি আল্লাহর নিকট থেকে। এর গন্তব্যও মহান আল্লাহর কাছেই।

ইরশাদ হয়েছে – انا لله وانا اليه راجعون – "আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।"[৬০৫] যে জন্যে মানবাত্মা সবসময় আল্লাহ তাআলা সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের জন্য উদগ্রীব থাকে। আল্লাহর নিকট সমর্পিত হওয়া, সম্পূর্ণ নিবেদিত হওয়ার মধ্যেই আত্মার তৃপ্তি ও সফলতা নির্ভর করে। কখনো কখনো প্রবৃত্তির তাড়নায়, শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ ভুল করে, পাপ করে এবং পাপ করতে করতে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয় বটে কিন্তু তা মানুষের প্রকৃত অবস্থা নয়। মানবাত্মার সহজাত আকাঙ্ক্ষা হল আল্লাহর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি। সালাতের মাধ্যমে মানবাত্মা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করে। কাঙ্ক্ষিত প্রিয় সত্তার সান্নিধ্য লাভ করায় আত্মার উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা দূর হয়ে যায়। তার মধ্যে শান্তি বিরাজ করে। ফলে আত্মার সার্বিক অবস্থানে স্থিরতা ও তৃপ্তি নেমে আসে। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন – "আমার চক্ষুর শীতলতা রাখা হয়েছে সালাতের মধ্যে।"[৬০৬]

---

[৬০০] আল কুরআন / ২৩ : ১–২

[৬০১] আল কুরআন / ২২ : ৭৭

[৬০২] আল কুরআন / ৭৪ : ৪২–৪৩

[৬০৩] সুলায়মান ইবন আশআছ আস সিজিস্তানী, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাত

[৬০৪] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাত

[৬০৫] আল কুরআন / ২:১৫৬

[৬০৬] আহমদ ইবন শুআয়ব আন নাসাঈ, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যত্র বিলাল (রা) কে লক্ষ্য করে তিনি বলেন – "হে বিলাল! সালাতের ব্যবস্থা করে তুমি আমাকে শান্তি দাও।"[৬০৭] মহানবী (সা) এর জীবন ও চিন্তাধারা পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যখনই কোন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন, মানসিক দিক দিয়ে উৎকণ্ঠা বা অস্থিরতা অনুভব করেছেন, সাথে সাথে তিনি সালাতে নিমগ্ন হয়েছেন। সালাত আদায়ের মাধ্যমে অন্তরে প্রশান্তি নিয়ে এসেছেন।
সালাত তাই মূলত একটি আত্মিক ও আধ্যাত্মিক ইবাদত। কেননা লোক দেখানোর ইচ্ছা থাকলে তা ইবাদত হয় না। তা ব্যক্তির নাযাতের উসিলা না হয়ে তার ধ্বংসের কারণ হয়। আর তা যদি নিতান্তই আল্লাহর জন্য হয় তা হলে সালাতে মানুষ আত্মিকভাবে পূর্ণতা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

আল্লাহ তাআলা মানুষের মধ্যে দ্বিবিধ প্রবৃত্তি দিয়েছেন। ভাল কাজ করার সুবিবেচনাবোধ আবার হিংসা দ্বেষ ঘৃণা লোভ কাম ক্রোধ প্রভৃতির জন্য কু প্রবৃত্তি। ইসলামে আধ্যাত্মিক সাধনা ও আত্মিক পরিশুদ্ধির মূল লক্ষ্যই হল এই কু প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করা। সালাত মানুষের মধ্যে বিরাজিত বিভিন্ন পাশবিক প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ ও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তার মূলোৎপাটন করে। শয়তান মানুষকে সবসময় প্ররোচনা দিতে থাকে। মানুষের মধ্যেও কাম, ক্রোধ, হিংসা, ঘৃণা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি ক্রিয়াশীল থাকে। এ চতুর্মুখী আক্রমণে মানুষের খারাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। সালাত এ সম্ভাবনাকে পুরোপুরি নস্যাত করে।
প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং সালাতের মধ্যে দেয়া অঙ্গীকার–প্রতিশ্রুতি, তিলাওয়াত, আল্লাহর যিকর মানুষকে ভালকাজে উদ্বুদ্ধ করে। তার মধ্যে প্রবৃত্তির ধ্বংসাত্মক অনুশীলন প্রবণতা হ্রাস পায়। সে প্রতি রাকআতে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সাথে সাথে তাঁর সাহায্যও কামনা করে। সরল সঠিক পথ চায়। তাঁর ইবাদতে নিবিষ্ট থাকার অঙ্গীকার পূণর্ব্যক্ত করে। এভাবে সালাত আদায়কারী কেবল সুন্দর ও সৎ বিষয় নিয়ে ভাবতে থাকে। তার মানসিকতা পুরোপুরি কু প্রবৃত্তিবিরোধী হয়ে ওঠে। ফলে সালাতের আধ্যাত্মিক প্রভাব ব্যক্তিকে কু প্রবৃত্তি মুক্ত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন –

ان الصلواة تنهى عن الفحشاء والمنكر

"নিশ্চয় সালাত অশালীন ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।"[৬০৮]

সালাত মানুষকে আল্লাহর সান্নিধ্য ও নৈকট্যে উপনীত করে। সালাতের শুরুতেই ব্যক্তি পৃথিবীর সকল বিষয়ের সাথে নিজের সম্পর্ক ত্যাগের ঘোষণা দেয়। কুরআন মাজীদে এসেছে –

انى وجهت وجهى للذى فطر السوات والارض حنيفا وما انا من المشركين

"আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশসমূহ ও দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভূক্ত নই।"[৬০৯]

এ ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে ব্যক্তি সালাতের নিয়্যত করে এবং তাকবীর তাহরিমা বলার মাধ্যমে পৃথিবীর সকল কিছুকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়। তার সাথে কেবল আল্লাহর কথাবার্তা বা সম্পর্ক রাখা হালাল থাকে। সালাত অবস্থায় প্রকাশ্যে অন্য কোন কাজ করা যায় না। এমনকি গোপনেও কোন ভিন্ন চিন্তা করার সুযোগ নেই। কেননা সালাত যিনি আদায় করেন তিনি এ বিশ্বাস নিয়েই তা করেন যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা কেবল প্রকাশ্যই সব কিছু দেখেন তা নয়, বরং যা গোপন এবং যা এখনো মানুষ প্রকাশ করে নি তাও তিনি দেখেন।
ফলে সালাত আদায়কারীর চিন্তায় মহান আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কারো উপস্থিতি থাকতে পারে না। কেবল সে থাকে, আর থাকেন আল্লাহ তাআলা। আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে সে বলতে থাকে –

اياك نعبد واياك نستعين – اهدنا الصرط المستقيم

"আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও।"[৬১০]

---

[৬০৭] সুলায়মান ইবন আশআছ আস সিজিস্তানী, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সালাত
[৬০৮] আল কুরআন / ২৯:৪৫
[৬০৯] আল কুরআন / ৬:৭৯
[৬১০] আল কুরআন / ১:৪–৫

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে সালাতের মাধ্যমে ব্যক্তি আত্মিকভাবে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁর সাথে কথোপকথনের সুযোগ পায়। রাসূলুল্লাহ (সা) এ জন্যই সালাতকে মুমিনের মি'রাজ বলে অভিহিত করেছেন।

সালাত মানুষের আত্মা পরিশুদ্ধ করে। পাপের কারণে মানুষের আত্মা কলুষিত হয়। আল্লাহর যিকরে গাফিলতির জন্য বা তাঁকে অবিশ্বাস ও অস্বীকারের জন্য মানুষের আত্মা থাকে অপবিত্র। সালাত এ অপবিত্রতা ও কলুষতা দূর করে। সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর যিকর করা হয় সবচেয়ে বেশি। যে জন্যে সালাতের মাধ্যমে আত্মোন্নয়ন ও আত্মশুদ্ধি লাভ করা সম্ভব। কাজেই আধ্যাত্মিক সাধনার নামে সালাত ত্যাগ করে যারা অন্যপথে সাধনার কথা বলেন তারা যে পুরোপুরি ইসলাম বিরুদ্ধ কথা বলেন তা সহজেই প্রতীয়মান হয়। কেননা ইসলামে সাধনার পথই হল সালাত। যত বেশি সালাত আদায় করা সম্ভব হবে ততই মানুষ সাধনার পথে অগ্রসর হতে পারবে। তার সাথে আল্লাহর সম্পর্ক গভীর এবং নিবিড়তম হবে। তার আত্মা শুদ্ধ হবে।

সালাত মানুষকে সুন্দরতম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী করে তোলে। তার নৈতিক স্খলন ঘটার সম্ভাবনা কম থাকে। সালাতের শান্তিপূর্ণ নিরব অবস্থা মুসলিমকে প্রয়োজনীয় চিন্তা গবেষণার সুযোগ এনে দেয়। এ ক্ষেত্রে তার মধ্যে কোন অস্থিরতা থাকে না। সে নিবিড়ভাবে নিজের অবস্থা ও করণীয় সম্পর্কে ভাবতে পারে। অথবা সঠিক ভাবনায় উপনীত হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার সাহায্য কামনা করতে পারে। ফলে সালাতের মাধ্যমে ব্যক্তি নৈতিকভাবে সুদৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। এবং এ অবস্থায় সে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা আল্লাহর গায়বী সাহায্য লাভ করে। ব্যক্তির চরিত্রে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঈর্ষণীয় দৃঢ়তা আসে। আল্লাহ বলেন –

ان الانسان خلق هلوعا – اذا مسه الخير منوعا – الا المصلين – الذين هم على صلاتهم دائمون-

"মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্তরূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা হুতাশকারী। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ; তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত, যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত।"[৬১১]

বিশ্বজাহানে এবং আকাশসমূহের সকল সৃষ্টি নিজেদের প্রথা ও পদ্ধতি অনুযায়ী আল্লাহর হুকুম পালন করে। একটি সাধারণ পিঁপড়া থেকে শুরু করে অতিকায় এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গ পর্যন্ত সকলেই আল্লাহর হুকুমের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে তাঁর আদেশ পালন করে যায়। কেউ আল্লাহর আদেশের বিপক্ষে কিছু করতে পারে না, করার ক্ষমতাও কারো নেই। তারা সালাত আদায় করে। তাদের সালাত আদায়ের পদ্ধতি মানুষের মত নয়। তবে তারা নিজেদের সালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে জানে। আল্লাহ বলেন –

الم تر ان الله يسبح له من فى السموات الارض والطير صفات ـ كل علم صلاته و تسبيحه ـ

"তুমি কি দেখ না যে, আকাশসমূহ ও দুনিয়াতে যারা আছে তারা এবং উড়ন্ত পাখিরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তার ইবাদতের ও পবিত্রতা ঘোষণার পদ্ধতি।"[৬১২]

তাই সালাত আদায়ের একটি বড় আধ্যাত্মিক দিক হল এর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে তাঁর সকল সৃষ্টির সাথে এক অন্ত হীন আত্মিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। সৃষ্টি হিসেবে সকল কিছুর সাথে মানুষের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এবং প্রকৃতি ও নিসর্গের সকল সৃষ্টির নিঃশর্ত আনুগত্য তাকে আরো বেশি সালাত আদায়ে উদ্বুদ্ধ করে। কাজেই মানুষ নিয়মিত সালাত আদায়ের মাধ্যমে দুনিয়ার সকল সৃষ্টির সাথে একটা অদৃশ্য,আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে।

সালাত সম্মিলিতভাবে সম্পাদন করার মত ইবাদত। একা একা পালন করলে সালাত আদায় হয় বটে তবে সালাতের প্রকৃত দাবি ও শিক্ষা তাতে খানিকটা ব্যাহত হয়। যে জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) ফরয সালাতসমূহ সম্মিলিতভাবে জামাআতের সাথে আদায়ের ব্যাপারেই গুরুত্বারোপ করেছেন। জামাআতে সালাত আদায় একটি সম্পূর্ণ ধর্মীয় সামাজিক ইবাদত প্রক্রিয়া। যে জন্যে সালাতের সামাজিক গুরুত্ব ও প্রভাবের বিষয়টি উপেক্ষা করা যায় না। এর আধ্যাত্মিক প্রভাব কেবল ব্যক্তিকেই নয় বরং সমাজকেও শুদ্ধ করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

---

[৬১১] আল কুরআন / ৭০:১৯–২৩

[৬১২] আল কুরআন / ২৪:৪১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

সালাত সামষ্টিক ইবাদত। পবিত্র পরিবেশে সর্বস্তরের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে এ সময়ে অস্থিরতা ও চঞ্চলতা কাজ করে না। শান্ত-সুন্দর পরিবেশে তারা সালাত আদায় করে। এর প্রভাব তাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনেও পড়ে। তারা শান্তি প্রিয় হয়ে ওঠে। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়। সালাতের পবিত্র শান্ত পরিবেশ তাদেরকে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রেরণা দেয়।

সালাত ব্যক্তির মধ্যে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ চেতনার জন্ম দেয়। সে নৈতিক দিক থেকে পবিত্র হয়ে ওঠে। মন্দ, নিষিদ্ধ ও অশ্লীল আচরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। তার মধ্যে এ সকল অনৈতিক আচরণ প্রতিরোধের মানসিকতা তৈরী হয়। ফলে সমাজ অশালীন আচরণ থেকে মুক্তি পায়। সমাজে নির্লজ্জ ও অশ্লীল কাজ চলতে পারে না।

সালাত আদায় করতে হয় নির্ধারিত সময়ে। নির্দিষ্ট সময়ের আগে বা পরে সালাত আদায় করলে তা কবুল হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন - ان الصلوٰة كانت على المومنين كتابا موقوتا "নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়িম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।"[৬১৩]

এ জন্য ফজরের সময়ে যুহরের সালাত আদায় করলে বা ইশার সময় আছরের সালাত আদায় করলে তা কবুল হবে না। অথবা যে কোন একটি সময়ে সবগুলো সালাত আদায় করে ফেললেও তা সংগত হবে না। সালাত ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে সময়ানুবর্তিতা একটি অবিচ্ছেদ্য শর্ত। সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে তাই মানুষকে সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। বস্তুত নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায়ের এ পদ্ধতি মুসলিমকে সময়ানুবর্তী করে তোলে। সে সমাজের সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করে।

আমরা আগেই দেখিয়েছি, সালাত ইসলামী আধ্যাত্মিকতার একটি বড় অংশ জুড়ে বিপুল ভূমিকা পালন করে। সময় মত সালাত আদায় করা ফরয। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর পুরো জীবনে নির্ধারিত সময়েই সালাত আদায় করেছেন। তিনি ইসলামী আধ্যাত্মিকতারও পথপ্রদর্শক এবং একমাত্র আদর্শ। কাজেই আধ্যাত্মিক সাধনার নামে কেউ যদি সময়ানুবর্তী না হয় বা সালাতসহ অন্যান্য ইবাদত ও বৈষয়িক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে অবহেলা প্রদর্শন করে তাহলে নিঃসন্দেহে তাকে ভণ্ড এবং রাসূলুল্লাহ (সা) এর আদর্শ বিদ্বেষী ব্যক্তিত্ব বলা যাবে।

মনে রাখতে হবে, সাধনা বা ইবাদতে রাসূলুল্লাহ (সা)কে কেউ যদি অতিক্রম করে যেতে চায় বা তিনি করেন নি এমন কোন কাজ করতে চায় - তা কোন ভাবেই ইসলাম সম্মত হবে না। কেননা ইসলাম অনুশীলন ও অনুসরণের ক্ষেত্রে মহানবী (সা) ই হলেন প্রথম এবং শেষ কথা।

সালাত মুমিনদের ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রশিক্ষণ দেয় এবং তাদের মধ্যে একতা গড়ে দেয়। নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত স্থানে একজন ইমামের নেতৃত্বে সালাত আদায় করলে মুসল্লীরা নিজেদের একটি পরিপূর্ণ দেহ ভাবতে পারেন। এক ও অভিন্ন লক্ষ্য তাদেরকে ধর্মীয় ও আত্মিক আত্মীয়তায় গ্রন্থিত করে। নিয়ম মাফিক প্রতিদিন পাঁচবার জামাআতে সালাত আদায় মুসলিমদেরকে পারস্পারিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে। দায়িত্ব ও আন্তরিকতা নিয়ে তারা একে অপরের খোঁজ খবর নেয়। অসুবিধা হলে তার সমাধান দিতে সচেষ্ট হয়। ফলে মুসলিমদের মধ্যে সীসাঢালা প্রাচীরের দৃঢ়তা সম্পন্ন ঐক্য ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠে।

সালাত আদায় মুসলমানদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। তারা দায়িত্ব সচেতন ও কর্তব্যপরায়ন হয়ে ওঠেন। সালাত আদায়কারী সালাতের প্রতিটি অংশে সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি পালন করেন। এর মধ্যে সবগুলো নিয়ম নীতি সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। কোন টা ফরয, কোন টা ওয়াজিব, কোন টা সুন্নাহ আর কোন টা বা মুস্তাহাব। সালাত আদায়কারী এই বিধানগুলোর প্রতিটির প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত থাকে। তারপর দাবি অনুযায়ী গুরুত্বের সাথে হুকুম আহকামগুলো পালন করেন।

সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে হুকুম আহকামের প্রকৃতি সম্পর্কে জানা তার দাবি আদায় করে যথাযথভাবে তা আদায় করার অভ্যাস ব্যক্তিকে তার দায়িত্ব পালনে সচেতন করে তোলে। তার মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়। সে সাধ্যমত সে কাজগুলোই আগে করার চেষ্টা করে যে গুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ফরয কাজ না করে নফল কাজ নিয়ে অহেতুক ব্যস্ত

---

[৬১৩] আল কুরআন / ৪:১০৩

Dhaka University Institutional Repository

থাকে না। ফরয কাজ সম্পন্ন করতে পারলেই নফলের ব্যাপারে যত্নবান হয়। ফরযকে অবহেলা বা উপেক্ষা করে বা ফরয পালনে বাধা তৈরী করে নফল পালনে আত্মনিবেদন করে না।

সালাত আদায়ের মাধ্যমে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার পরম প্রশিক্ষণ লাভ করা যায়। সালাতের প্রতিটি কাজ নির্ধারিত। সময়, কাজ, কিরাআত, তাসবীহ সকল কিছু। নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট ওয়াক্তের সালাত আদায় করা হয়। রুকূ, সিজদা, তাশাহহুদ, তাসবীহ প্রভৃতি কোন ক্ষেত্রেই মুসল্লী নিজের স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ ঘটাতে পারেন না। যখন রুকূ করার কথা তখন রুকূ করা হয়। সিজদার সময় সিজদা। ইমাম রুকূতে গেলে কেউ সিজদায় চলে যায় না আবার ইমাম সিজদায় গেলে কেউ রুকূতে দাঁড়িয়ে থাকেন না। অহেতুক নড়াচড়া করা, বিরক্তি প্রকাশ করা, চিৎকার করে বা অন্য কোন ভাবে শব্দ তৈরী করে পরিবেশ নষ্ট করার কোন চেষ্টা করা হয় না। সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে নিজস্ব দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করা হয়। সালাতে প্রতিদিন পাঁচবার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনের এ প্রশিক্ষণ ব্যক্তিকে সমাজের অন্যান্য দায়িত্ব পালনেরও প্রেরণা দেয়।
কাজেই আধ্যাত্মিক সাধনার নামে যারা সাংসারিক-সামাজিক কর্তব্যসমূহে অবহেলা প্রদর্শন করে বা ঠিকভাবে পালন করে না তারা কোন ভাবেই ইসলামী আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন করেন না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কোন একটি পারিবারিক বা সামাজিক দায়িত্বেও অবহেলা প্রদর্শন করেন নি।

সালাত আদায়ে সমাজের মানুষের মধ্যে মানবিক মর্যাদা ও অধিকারে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সালাতের জামাআতে সালাত আদায়কারীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়। এ সময় রাজা-প্রজা, আমীর-ফকির, ধনী-নির্ধন, সাদা-কালো বা অঞ্চল ও জাতীয়তার কোন ব্যবধান থাকে না। আল্লাহর বান্দা হিসেবে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে তারা সালাত আদায় করে। আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে। প্রতি ওয়াক্ত সালাতের এ প্রশিক্ষণ ব্যক্তির মধ্যে সাম্যবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটায়। সমাজ জীবনে এর প্রভাবে বংশগত গৌরব ও কৌলিন্যের অবসান ঘটে।

সালাত আদায়ের জন্য পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা অনিবার্য। শরীর, পোশাক ও জায়গা পবিত্র – পরিচ্ছন্ন না হলে সালাত আদায় করা যায় না। এ জন্য সালাত আদায়কারীর শরীর, পোশাক ও জায়গা পরিচ্ছন্ন রাখার প্রতি বিশেষ গুরত্ব দিতে হয়। প্রতি ওয়াক্ত সালাতে পরিচ্ছন্ন থাকার এমন বাধ্যবাধকতা সামাজিক পরিবেশকে এমনিতেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তোলে। তাছাড়া ওযু, মিসওয়াক, গোসল ব্যক্তির শারীরিক সুস্থতা নিশ্চিত করে।
কাজেই যারা আধ্যাত্মিক সাধনার কথা বলে নোংরা শরীরে থাকে, পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে না বা নিজেদেরকে আল্লাহর পাগল যাহির করে পরিচ্ছন্নতার হুকুমের উর্ধ্বে ঘোষণা করে তারা যে নিতান্তই মিথ্যাচার করে এবং ভণ্ডামি করে তাতে কোন সন্দেহ থাকে না। কেননা হযরত মুহাম্মদ (সা) এর চেয়ে আল্লাহর প্রতি বেশি ভালবাসা আর কোন মানুষের পক্ষে পোষণ করা সম্ভব নয়। তিনি স্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন পবিত্র জীবন যাপন করেছেন। এরচেয়ে বেশি কিছু করা তাই ইসলাম সম্মত নয়। তা সঠিকও হতে পারে না।

জামাআতে সালাত আদায়ের জন্য ইমাম প্রয়োজন। যোগ্য, দক্ষ, সর্বজনগ্রাহ্য একজন এমন ব্যক্তিকে সাধারণত ইমাম নির্বাচন করা হয় যিনি দীনী ইলম রাখেন এবং তাঁর ইলম অনুসারে আমল করেন। মুসলিমদের জন্য সকল ক্ষেত্রেই ইমাম বা নেতা নির্বাচন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
সালাতের জন্য ইমাম নির্বাচন মুসলমানদেরকে সামাজিক নেতা নির্বাচনে সচেতন করে তোলে। সে ক্ষেত্রেও তারা ইলমে, আমলে দক্ষ এবং সবার নিকট গ্রহণযোগ্য যোগ্য ব্যক্তিকেই নেতা নির্বাচন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

সালাত আদায়কারীরা একজন ইমামের পেছনে সালাত আদায় করেন। নির্দ্বিধায় তার নির্দেশনা অনুযায়ী সালাত শুরু করেন। রুকূ সিজদা করেন এবং সালাত সমাপ্ত করেন। ইমামের আনুগত্য তাদের সমাজের বৃহত্তর অঙ্গনে সমাজ নেতা বা জাতীয় নেতার আনুগত্যের প্রশিক্ষণ দেয়। তারা সবরকম সঙ্গত আইন মেনে চলায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন।

সালাত আদায়কারীরা নিজেদের পছন্দমত দক্ষ ও যোগ্য লোককে তাদের ইমাম নির্বাচিত করে থাকেন। নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর আনুগত্য করেন এবং তিনি ভুল করলে নির্দ্বিধায় তার সংশোধনের জন্য সমালোচনা করেন। কোথাও

Dhaka University Institutional Repository

অসঙ্গতি দেখলে তার জন্য কৈফিয়ত তলব করেন। সমাজের নেতার ক্ষেত্রেও এ চেতনা কাজ করে। ফলে সুস্থ ও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ধারা গড়ে ওঠে।

বস্তুত আনুষ্ঠানিক ইবাদত হলেও সালাত নিছক ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতা নয়। সালাত আদায়কারীর আত্মিক, আধ্যাত্মিক, ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা সুন্দর ও ইসলাম সম্মত করার এ হল এক সমন্বিত ব্যবস্থা। সে জন্য মুসলিম জীবনে সালাতের শিক্ষা বাস্তবায়ন করা অবশ্য কর্তব্য।

সালাত আল্লাহর নিঃশর্ত আনুগত্য শিক্ষা দেয়। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এ সম্মান দিয়েছেন। মানুষকে তাঁর খলীফা নির্বাচিত করেছেন। পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকার ও কল্যাণের জন্য। মানুষ পৃথিবীর সকল কিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর কারো কাছে সে মাথা নত করতে পারে না। সালাতে মানুষ এক আল্লাহর কাছে মাথা নত করার বাস্তব শিক্ষা পায়। মানুষ তার সকল পার্থিব মর্যাদা, পদ, সম্ভ্রম, সম্পত্তি, ক্ষমতা, বিত্ত, শ্রেষ্ঠত্ব,আভিজাত্য, দুর্বলতা, সবলতা প্রভৃতি সবকিছু ভুলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার সামনে সিজদায় আনত হয়। আল্লাহ তাআলার নিকট আনুগত্য প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতি হল সালাত। মুমিন ও কাফিরের মধ্যে সালাত পার্থক্য রচনা করে দেয়। সুতরাং মুমিনের কর্তব্য হল বিনয় ও ভীতির সাথে একনিষ্ঠভাবে সালাত আদায় করা।

সালাতের আধ্যাত্মিক শিক্ষা সীমাহীন। বাহ্যিক ভাবে সালাতকে একটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত মনে হলেও সালাত মূলত পুরোপুরি একটি আধ্যাত্মিক ইবাদত। এর আধ্যাত্মিক শিক্ষা হল- মানুষ সারাক্ষণ দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থাকে। বৈষয়িক বিভিন্ন কাজ তাকে আল্লাহর যিকির থেকে গাফিল রাখে। মানুষের বিপুল ব্যস্ততার মধ্যে সালাতের আহ্বান মানুষকে আল্লাহর স্মরণে ফিরিয়ে আনে। সকল কাজের মধ্যে সে বুঝতে পারে, আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার ব্যাপ্তি থেকে সে কখনোই দূরে থাকতে পারে না। সালাতের মধ্যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতা করে। প্রতি রাকআত সালাতে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে সে আল্লাহর নিকট তাঁর প্রভুত্বের স্বীকৃতি দেয়। তাঁর বিধান মেনে নেওয়ার, তাঁর দাসত্ব করার অঙ্গীকার করে। সে সাহায্য চায় আল্লাহর নিকট, সরল-সহজ ও সঠিক পথ প্রার্থনা করে তাঁরই নিকট। প্রতি রাকআতের এ প্রার্থনা ব্যক্তিকে আল্লাহর সার্বক্ষণিক আনুগত্যের শিক্ষা দেয়। মানুষকে পাপ, অন্যায় ও অশালীন কাজ থেকে দূরে রাখে।
সালাত সবচেয়ে বেশি প্রভাব সৃষ্টি করে মানুষের আত্মার ওপর। সালাত আদায়কালীন সময়ে সালাত আদায়কারী আল্লাহ তাআলার সামনে বেশি দাঁড়াবার অনুভূতি লাভ করে। সে উপলব্ধি করে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়িয়ে সে ইবাদত করছে। এমন সর্বশক্তিমান সেই সত্তা যিনি তাঁর বাহ্যিক দিকটাই শুধু দেখছেন না বরং দেখছেন তাঁর মনের ভেতরের সকল গোপন বিষয়। তার চিন্তায় এখনো যা পুরো আকৃতি লাভ করে নি। তারও প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা আল্লাহ তাআলা। এই উপলব্ধি মন থেকে সকল খারাপ ভাবনা ও অনুচিত প্রবৃত্তি বের করে দেয়। ব্যক্তি নিজেকে আরো বেশি পবিত্র ও শুদ্ধ করার শিক্ষা পায় সালাত থেকে।

জামাআতে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা সালাতকে একটি পুরোপুরি সামাজিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে পরিণত করেছে। সালাত সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেয়। সমাজকে আচরণগত অশালীনতা ও অশ্লীলতা থেকে মুক্ত করার শিক্ষা দেয়। সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধের সুমহান শিক্ষা সালাতের মধ্যে পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিদিন পাঁচবার সালাত আদায়ের বিধান দিয়েছেন। পরম শৃঙ্খলার সাথে সুনির্দিষ্ট সময়ে, সালাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষ সকল সামাজিক কর্তব্য যথাসময়ে এবং শৃঙ্খলার সাথে যথাযথ নিয়ম মেনে সম্পাদন করার শিক্ষা পায়। সালাত সাম্যবাদের সুমহান শিক্ষা দেয়। আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ মর্যাদা ও অধিকার লাভে সমান। ভাষা, অঞ্চল, জাতীয়তা, বর্ণ, অর্থ, বিত্ত প্রভৃতি এ মর্যাদায় কম বেশি করতে পারে না। সালাতে শাসক-শাসিত, ধনী-নির্ধন সকলে এক কাতারে দাঁড়িয়ে মানবিক সমতার এক মহান প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

ঐক্যবদ্ধ থাকার এবং সম্প্রীতি সৃষ্টির শিক্ষা নিহিত রয়েছে সালাতের মধ্যে। একজন ইমামের নিঃশর্ত আনুগত্য, একই সাথে সকল কাজ সম্পাদন এবং ভাবগম্ভীর ও অন্তরঙ্গ পরিবেশে পাশাপাশি অবস্থান মানুষকে বৃহত্তর সমাজে এ ধারা অব্যাহত রাখার প্রেরণা দেয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

সালাত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার ও পবিত্র জীবনযাপনের বাস্তব শিক্ষা দেয়। নোংরা ও অপরিষ্কার শরীরে এবং অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে সালাত আদায় করা যায় না। সালাত আদায়ের স্বার্থেই মুমিনদের তাই শরীর, পোশাক ও পরিবেশ পবিত্র রাখতে হয়।
সালাত গণতান্ত্রিক নেতা নির্বাচন এবং নির্বাচিত নেতার আনুগত্যের শিক্ষা দান করে। সালাতের ইমাম নির্বাচিত হন মুসল্লিদের মতামতের ভিত্তিতে। আবার নির্বাচিত ইমামের অনুসরণে বাধ্যতামূলকভাবে সালাত আদায় করতে হয়। ফলে সালাত যেমন মানুষকে গণতন্ত্রমনা করে তেমনি করে নেতার আনুগত্যমুখী। সুতরাং সামাজিক শান্তি, সমৃদ্ধি, সংহতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সালাতকে ক্রিয়াশীল মনে হয়।

যাকাত

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে যাকাত তৃতীয়। এটি একটি অর্থনৈতিক ইবাদত এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলভিত্তি। শোষণ ও বঞ্চণাহীন সুষম অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যম হিসেবে যাকাত অতুলনীয়। অর্থ সম্পর্কীয় ইবাদত হলেও এর ধর্মীয়, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক আবেদন বিপুল। কুরআন মাজীদের বহু স্থানে সালাত আদায়ের হুকুম দেয়ার পাশাপাশি যাকাত আদায়ের জোড়াল তাগিদ দেয়া হয়েছে।

যাকাত (الزكواة) শব্দটি ক্রিয়ামূল। প্রশংসা করা, প্রাচুর্য লাভ করা বা সংশোধন করা অর্থে শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। তবে এর দুটি প্রসিদ্ধ অর্থ হল التطهير বা পবিত্রকরণ এবং الزيادة বা বৃদ্ধি করণ। পবিত্র করা অর্থে কুরআনে শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন – قد افلح من زكها "নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে।"[৬১৪]
যাকাতের প্রসিদ্ধ এ দুটি অর্থের তাৎপর্য হল, যাকাত আদায় করা হলে ব্যক্তির ধন-সম্পদ থেকে মানুষের হক আদায় করা হয়। ফলে তা হালাল ও পবিত্র হয়। আবার যাকাত আদায় করলে ধনসম্পদ সবশ্রেণীর মানুষের মধ্যে আবর্তিত হয়। ফলে সামষ্টিক ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে, বাড়ে চাহিদা ও উৎপাদন। আর আল্লাহ তাআলাও এতে বরকত দান করেন। যে জন্যে যাকাত দিলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়।
নিসাব পরিমাণ সম্পদ অর্থাৎ ৭.৫ তোলা সোনা বা ৫২.৫ তোলা রূপা কিংবা এর যে কোন একটির সমপরিমাণ অর্থ যদি কোন মুসলিম ব্যক্তির মালিকানায় পূর্ণ একবছর থাকে এবং তা যদি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয় তাহলে শরীআতের নির্ধারণ অনুযায়ী সে সম্পদ থেকে ২.৫% অর্থ নির্দিষ্ট আটটি খাতে কিংবা কোন একটি খাতে দান করতে হয়। বস্তুত শরীআতের নির্দেশনা অনুসারে সম্পদ দানের এ পদ্ধতিই যাকাত।

যাকাত একটি আনুষ্ঠানিক আর্থিক, ধর্মীয়, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক ইবাদত। এর লক্ষ্য শুধুই আর্থিক লেন দেন বা ব্যক্তিক কিংবা সামষ্টিক পর্যায়ে সাহায্য সহযোগিতা নয়। এর লক্ষ্য হল মানুষকে শুদ্ধতম মানুষ করে গড়ে তোলা। মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি হিসেবে দায়িত্ব পালনে যোগ্য করে তোলা। মানুষকে আল্লাহ তাআলার ভালবাসার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। এ সকল তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষ্যই যাকাতকে একটি সমন্বিত ইবাদতে পরিণত করেছে – যার প্রতিটি পর্যায়ে আধ্যাত্মিকতার প্রভাব সুস্পষ্ট। যেমন যাকাত যদি কেউ এ ইচ্ছা করে দান করে যে, মানুষ তাকে দানশীল বলবে, যাকাতদাতা বলবে অথবা কেউ দুনিয়ার কোন স্বার্থ বা সুবিধা আদাযের জন্য যাকাত দেয় তাহলে তার সে যাকাত কবুলতো হবেই না বরং এ জন্য উল্টো তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। কাজেই যথাযথভাবে যাকাত আদায়ের জন্যও আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শুদ্ধতা আর নিয়্যতে একনিষ্ঠতা প্রয়োজন।

যাকাত একটি ফরয ইবাদত। প্রত্যেক স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক ও মুসলিম ব্যক্তি, যার নিকট নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে, যে সম্পদ ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং যার ওপর তার মালিকানার মেয়াদ ন্যূনতম একবছর - এমন ব্যক্তির ওপর যাকাত দেয়া ফরয। যাকাত অস্বীকারকারী কাফির। কোন মুসলিম ব্যক্তি বা দল যাকাত অস্বীকার

[৬১৪] আল কুরআন / ৮৮:১৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে। আবু বকর (রা) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছেন,

والله لو منعونى عقالا كانوا يودونها الى رسول الله صلعم لقاتلتهم على منعه

"রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবদ্দশায় যাকাত হিসেবে আদায় করত বকরী বাঁধার এমন গাছি দড়িও তারা যদি আদায় করতে অস্বীকার করে, আল্লাহর শপথ, তাহলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করব।"[৬১৫]

কুরআন মাজীদের অনেক জায়গায় আল্লাহ তাআলা যাকাত আদায়ের অনিবার্যতা ঘোষণা করেছেন।

ইসলামকে যে পাঁচটি বুনিয়াদ বা মূলস্তম্ভের ওপর অস্তিত্ববান বিবেচনা করা হয় যাকাত তার অন্যতম। ইসলামের বুনিয়াদী ইবাদত হিসেবে তাই যাকাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একে বাদ দিলে ইসলামের মূলকাঠামো বিধ্বস্ত হবে।

যাকাত দেয়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য। যাকাত দিয়ে মুমিন নিজের ঈমানী দৃঢ়তার প্রমাণ পেশ করে। মুশরিকরা যাকাত দেয় না। সে জন্য শিরকের নিদর্শন হল যাকাত না দেয়া। আল্লাহ তাআলা যাকাত না দেয়ার জন্য মুশরিকদের অভিশাপ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন –

وويل للمشركين الذين لايوتون الزكواة وهم بالاخرة هم كافرون

"দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য – যারা যাকাত প্রদান করে না এবং তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী।"[৬১৬]

ব্যক্তি আখিরাতে সফলতা লাভ করবে নাকি তার জীবন ব্যর্থতা ও গ্লানিতে ভরে ওঠবে তা নির্ভর করে তার যাকাত আদায় করা বা না করার ওপর। যাকাত ফরয হওয়ায় ব্যক্তি যদি তা যথাযথভাবে আদায় করে তাহলে সে সাফল্য লাভ করবে। সে পাবে অনন্ত সুখের চিরস্থায়ী নিবাস জান্নাত। আল্লাহ তাআলা বলেছেন –

قد افلح المومنون ..... والذين هم للزكواة فاعلون

"অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ ..... যারা যাকাত দানে সক্রিয়।"[৬১৭]

অপরদিকে যাকাত ফরয হওয়ার পর তা আদায় না করলে আখিরাতে অত্যন্ত খারাপ পরিণতি বরণ করতে হবে। এ রকম লোকদের জন্য আল্লাহ তাআলা চরম শাস্তির অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন –

والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله ، فبشرهم بعذاب اليم

"আর যারা সোনা ও রূপা জমা করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।"[৬১৮]

মানুষের আত্মিক উৎকর্ষ সাধনে যাকাত বিশেষ কার্যকর। দৃশ্যত অর্থ সম্পর্কীয় ইবাদত হলেও এর আধ্যাত্মিক আবেদন বিস্ময়কর। যাকাতের এ পর্যায়ের শিক্ষা ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার পথে এগিয়ে দেয়। যেমন – স্বচ্ছল ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য অর্থ সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে। এ জন্য অত্যন্ত কষ্ট করে মানুষ অর্থ উপার্জন করে। অর্থের উপযোগিতার জন্যেই এর প্রতি মানুষের তীব্র মোহ ও লোভ থাকে। জীবনের পরে তার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বিষয় হয় এটি। কখনো কখনো অতিরিক্ত অর্থলোভ মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়। সে খারাপ ও অন্যায় কাজ করে। আল্লাহর নির্দেশ তার মনে থাকে না। যাকাত অর্থের প্রতি মানুষের এই মোহ ও লোভের কবর রচনা করে। বাহ্যত বিনা লাভে নিঃস্বার্থভাবে একটা বিপুল অঙ্কের অর্থ যাকাত হিসেবে তাকে আদায় করতে হয়। ফলে তার অন্তরে তীব্র মোহ ও লোভ আসন করে নিতে পারে না। কেননা, আল্লাহর নির্দেশে যে যাকাত দেয় সে জানে ধনসম্পদ আল্লাহর নিআমত। এগুলো নিতান্তই পরীক্ষার উপাদান মাত্র, আল্লাহ বলেন,

انما اموالكم واولادكم فتنة ، و الله عنده اجر عظيم

'তোমাদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ; আর আল্লাহ; তাঁরই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।'[৬১৯]

কাজেই যাকাত আদায় করে মুমিন সম্পদের মোহ থেকে মুক্তি পায় ও আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। আল্লাহ বলেন,

---

৬১৫ ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, যাকাত অধ্যায়

৬১৬ আল কুরআন / ৪১:৬–৭

৬১৭ আল কুরআন / ২৩:১–৪

৬১৮ আল কুরআন / ৯:৩৪

৬১৯ আল কুরআন / ৬৪:১৫

Dhaka University Institutional Repository

وفى اموالهم حق للسائل والمحروم
'এবং তাদের ধন সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক।[৬২০]

যাকাত মানুষের সম্পদ পবিত্র করে। কেননা ধনী ব্যক্তির সম্পদে যাকাত দরিদ্রের অধিকার। যতক্ষণ না এ অধিকার আদায় করা হয় ততক্ষণ সম্পদ থাকে অপবিত্র। এজন্যেই মহানবী (সা) বলেছেন –

من ادى زكوة ماله فقد ذهب عنه شره
'যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত আদায় করে, সে তার সম্পদের দোষ দূর করে দেয়।'[৬২১]

যাকাতের আধ্যাত্মিক শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর দ্বারা ব্যক্তির আত্মা পবিত্র হয়। কেননা যাকাত আদায় করে সে তা প্রচার করতে পারে না। এজন্যে গর্ব করতে পারে না। এমনকি যাকে যাকাতের অর্থ দিয়েছে তার নিকট থেকে কোন উপকারও আশা করতে পারে না। এসব করলে যাকাত দান অর্থহীন হয়ে যায়। ফলে অনিবার্যভাবেই যাকাতদাতা এ সকল পাশবিক প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে পবিত্র রাখেন।

এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেন – خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
'তাদের সম্পদ হতে সদকা গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।[৬২২]

আল্লাহর ভালবাসা হারানোর ভয়ে এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা জন্মানো ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় আল্লাহ নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা ও আদেশকৃত কাজসমূহ করার ক্ষেত্রেও যাকাত ভূমিকা পালন করে। এ প্রক্রিয়াটির নাম হল তাকওয়া। কাজেই যাকাত তাকওয়া অর্জনে কার্যকর।

ধন-সম্পদ মানুষের অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও সামাজিক প্রতিপত্তির মাধ্যম এটি। তীব্র আল্লাহ প্রেমের কারণেই ব্যক্তি এ সম্পদ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী বাহ্যত কোন লাভ ছাড়াই দান করে।

কুরআন মাজীদে এসেছে –'واتى المال على حبه' – 'আল্লাহ প্রেমে ধনসম্পদ দান করে।[৬২৩]

অন্যত্র বলা হয়েছে –ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا
'খাবারের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাবার দান করে।[৬২৪]

বস্তুত যাকাত দিয়ে ব্যক্তি সম্পদের ভালবাসার চেয়ে আল্লাহর প্রতি তাঁর নিঃসীম ভালবাসারই প্রমাণ পেশ করে।

যাকাত মানুষকে দানশীল ও উদার হওয়ার শিক্ষা দেয়। দুনিয়ার কোন স্বার্থ এবং কোন ধরনের প্রত্যক্ষ উপকার ছাড়া কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যক্তি শরীআত নির্ধারিত নিয়ম মত তার সম্পদের একটা বিপুল অংশ যাকাত হিসেবে আদায় করে। ফলে সে কৃপণতার জঘন্য ত্রুটি থেকে মুক্তি পায়। তার মধ্যে দানশীলতার অভ্যাস গড়ে ওঠে। পরিণতিতে সে হয় সফল মানুষ। আল্লাহ বলেন –

ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون -
'যারা অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।[৬২৫]

যাকাত সামষ্টিক ইবাদত। সমাজের ধনী ও গরীব মানুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে এটি সম্পন্ন হয়। সে জন্যে সামাজিক ক্ষেত্রে যাকাতের গুরুত্ব ও প্রভাব রয়েছে।

সমাজের মুসলিম জনগোষ্ঠী এক সুমহান আদর্শিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। যাকাতের মাধ্যমে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব যথাযথ রূপ ও সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এজন্যেই আল্লাহ বলেন –

---

[৬২০] আল কুরআন / ৫১:১৯
[৬২১] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, যাকাত অধ্যায়
[৬২২] আল কুরআন / ৯:১০৩
[৬২৩] আল কুরআন / ২:১৭৭
[৬২৪] আল কুরআন / ৭৬:৮
[৬২৫] আল কুরআন/৬৪:১৬

Dhaka University Institutional Repository

فان تابوا واقاموا الصلوٰة واتوا الزكوٰة فاخوانكم فى الدين

'এরপর তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়িম করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দীন সম্পর্কে ভাই।'[৬২৬]

যাকাত সমাজের নিঃস্ব, দরিদ্র ও ভাগ্য বিড়ম্বিত লোকদের প্রতি ধনীদের সহানুভূতি সৃষ্টি করে। যাকাত দেয়া ধনীর দায়িত্ব। দরিদ্রদের প্রতি এটা তার দয়া নয়। যথাযথভাবে এ কর্তব্য পালনের জন্যে ধনীও অধিকতর হকদার যাকাতগ্রহীতা খুঁজে বের করে। এ কাজে সে গরীব-দুঃখী মানুষের গভীর দুঃখ ও অভাব-অভিযোগের সাথে পরিচিত হয়। আবার গরীব মানুষও তার আন্তরিকতা ও মমত্বে মুগ্ধ হয়। ফলে সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। তারা একে অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে।

যাকাতের সুপ্রভাবে সমাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। অর্থাভাবে বাধ্য হয়ে মানুষ অন্যায় করে। চুরি, ডাকাতি বা ছিনতাইয়ে লিপ্ত হয়। হারাম উপার্জনে আত্মনিয়োগ করে। ফলে সমাজে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয়। মানুষ তার জীবন ও সম্পদ নিয়ে শঙ্কাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। যাকাত মানুষের কর্মসংস্থান করে, অভাব দূর করে, অভাবী ও বেকার লোকদের হারাম উপার্জন এবং চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের কবল থেকে সমাজকে নিরাপত্তা দেয়।

যাকাত জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও অঞ্চল নির্বিশেষে সমাজের সব মানুষের কল্যাণসাধন করে। ধনীদের যাকাতলব্ধ অর্থ গরীবদের আর্থিক প্রয়োজন পূরণের পর যদি উদ্বৃত্ত হয় তাহলে সে অর্থে সমাজের বিভিন্ন কল্যাণমূলক ও জনহিতকর কার্যাবলী সম্পাদন করা যায়। কেননা কুরআন মাজীদে যাকাত বন্টনের যে আটটি খাত উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে "ফী সাবিলিল্লাহ' বা আল্লাহর পথে ব্যয়। কুরআনের বিভিন্ন নির্দেশনা, হাদীসে বিবৃত ব্যাখ্যা এবং মহানবী (সা) ও সাহাবী (রা) দের জীবন দর্শন থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, মানুষের কল্যাণের পথই হল ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহর পথ এবং এ মানুষ কেবল মুসলিম নয় অথবা কেবল অমুসলিমও নয়। বরং যে কোন মানুষের কল্যাণই ফী সাবীলিল্লাহে ব্যয়। কাজেই যাকাত সর্বজনীন কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

যাকাত সমাজের মানুষকে এবং সমাজকে সমৃদ্ধ করে। মানুষ অভাবমুক্ত ও সচ্ছল হলে সমাজও অভাবমুক্ত এবং সচ্ছল হবে। দরিদ্রতার কষাঘাতে জীবন জর্জরিত না থাকলে মানুষের পক্ষে বিভিন্ন মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ও পরিচর্যায় মনোযোগ দেয়া সম্ভব হবে। অনটনহীন জীবন হলে মানুষ তার মেধা সৃষ্টি ও উদ্ভাবনের কাজে ব্যয় করতে সক্ষম হবে। ফলে কেবল অর্থনৈতিক বিবেচনাতেই নয় বরং সামগ্রিক বিবেচনাতেই মানবসমাজ সমৃদ্ধ এবং উন্নত হবে। সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে কাঙ্ক্ষিত শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্বস্তি। মানুষের বেঁচে থাকা আনন্দময় বিবেচিত হবে।

অন্যান্য মৌলিক ইবাদতের তুলনায় অর্থ সম্পর্কীয় বিষয়ে কেবল যাকাতেরই প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। সে জন্যে এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজের সকল মানুষের অধিকার আছে সচ্ছলভাবে বসবাসের। ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চল ও জাতীয়তা নির্বিশেষে সকলেই সমাজের কাছে আপদকালীন সময়ে আর্থিক সহযোগিতা পাবার অধিকার রাখে। যাকাত এ দাবি পূরণের অব্যর্থ মাধ্যম। এর মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্ভরতা ও নিরাপত্তা লাভ করে। আল্লাহ তাআলার ঘোষণায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেন,

انما الصدقٰت للفقراء والمسٰكين والعٰملين عليها والمولفة قلوبهم وفى الرقاب الغرمين وفى سبيل الله وابن السبيل ط فريضة من الله ط والله عليم حكيم

'সদকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও যাকাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'[৬২৭]

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদন লাভের অধিকার মানুষের জন্মগত মানবিক মৌলিক অধিকার। মানুষ নিজস্ব চেষ্টা ও উপার্জনে এ অধিকার পূরণে ব্যর্থ হলে এর দায়িত্ব সমাজের ওপর বর্তায়। যাকাতের অর্থে সমাজ এ দায়িত্ব পালন করতে পারে। ফলে ব্যক্তি মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। ন্যূনতম চাহিদা

---

[৬২৬] আল কুরআন / ৯:১১

[৬২৭] আল কুরআন / ৯:৬০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

পূরণের জন্য অমানবিক কোন কাজ করতে হয় না। মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে মানবতার চরম অবমাননা করতে হয় না। তাকে মানবেতর জীবনযাপন করতে হয় না। বরং যাকাতের অর্থে সে স্বাবলম্বী হতে পারে।

যাকাত মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত করে। মানুষ অর্থ পেলে প্রথমেই তার ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করে। তারপর ক্রমান্বয়ে পোশাক, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং সবার শেষে বিনোদনের ব্যবস্থা করে। যাকাত মানুষের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ তুলে দেয় বলে সে জীবনের এ সকল চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া সমাজে নিরাপত্তা এবং পরিবারে শান্তি থাকে বলে মানুষ তার সৃজনশীল ক্ষমতা ও উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগাতে পারে। তার মেধা ও মনন শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের চিন্তায় অস্থির থাকে না। কোন ধরনের নিরাপত্তাহীনতাও তাকে ক্লিষ্ট করে না। ফলে নিশ্চিন্তে সে মানবতার উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনে কাজ করে যেতে পারে। এর ফলে সার্বিকভাবে মানুষের জীবন মান বৃদ্ধি পায়।

সমাজের সকল মানুষ সমান অর্থসম্পদের মালিক হবে না। এক্ষেত্রে বৈষম্য ও পার্থক্য থাকবেই। কিন্তু এ বৈষম্য অমানবিক ও অযৌক্তিক হয়ে ওঠে তখনি যখন একটি বিশেষ শ্রেণীর কাছে সম্পদ পুঞ্জিভূত হয় আর অপর একটি শ্রেণী নিঃস্ব হয়ে পড়ে। সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার জন্যে এ অব্যবস্থা কাম্য নয়। যাকাত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে বিপুল ও অপ্রয়োজনীয় অর্থের পাহাড় গড়ে অন্যদের বঞ্চিত ও নিঃস্ব রাখার পথ বন্ধ করে। এর মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট সম্পদ আবর্তিত হয়। যাকাতের বিধানও এ লক্ষ্যেই প্রবর্তিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন – যাকাতলব্ধ অর্থ পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহ ও ব্যয় করা হলে সমাজে অভাব-অনটন থাকবে না। কেননা, সমাজের ধনীদের নিকট থেকে যাকাত সংগ্রহ করে তা গরীবদের সচ্ছলতার জন্যেই ব্যয় করা হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন –

توخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم
'যাকাত তাদের ধনীদের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হবে আর তা ব্যয় করা হবে তাদের গরীবদের মধ্যেই।'[৩২৮]

বেকার সমস্যা একটি মারাত্মক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা। কর্মহীন যুবশক্তি জাতীয় বিপর্যয়ের প্রধান কারণ। এ অবস্থা নিরসনে যাকাত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রীয়ভাবে সংগৃহীত যাকাতের বিপুল পরিমাণ অর্থে ছোটো–বড় শিল্প–কারখানা গড়ে তোলা যায়। এতে করে নুতন নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যাকাতের হকদার লোকদের এ সকল কাজে নিয়োগ করা যায়। আবার ব্যক্তিগত পর্যায়েও যাকাত কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে। যাকাতের হকদার ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে দিয়ে অথবা জীবিকা অর্জনের কোন পদ্ধতি দিয়ে যাকাত তাকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে। ফলে যুবশক্তি বেকার থাকে না। তারা যোগ্য কাজ পেয়ে জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখতে পারে।

ভিক্ষা একটি নিন্দনীয় পেশা। ভিক্ষাবৃত্তি একটি গুরুতর সামাজিক ব্যাধি। এর ফলে ব্যাপক শ্রমশক্তির অপচয় হয়। এ বৃত্তি পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয় ঘটায়। যাকাতের অর্থে ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তুলে ভিক্ষাবৃত্তি রোধ করা যায়।

তা সত্ত্বেও ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে ঋণ করতে হয়। যদি অবস্থা এমন হয় ব্যক্তি বা রাষ্ট্রের পক্ষে সে ঋণ পরিশোধ অসম্ভব হয়ে পড়ে সে ক্ষেত্রে যাকাতের অর্থে ঋণমুক্ত হওয়া সম্ভব।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস যাকাত। যার ওপর যাকাত ফরয হবে সে ব্যক্তি ২.৫% হারে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যাকাতের অর্থ জমা দেবে। এভাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে। পরে পরিকল্পিতভাবে ব্যয়ের মাধ্যমে এ অর্থ অধিকতর লাভজনক অর্থে পরিণত করা সম্ভব হবে।
যাকাতের অর্থ সবশ্রেণীর মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। তারা এ অর্থে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনেন। ফলে বাজার চাহিদা সৃষ্টি হয়। বাজারে দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি হলে তার উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হয়। আবার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে কাঁচামালের সরবরাহ বাড়াতে হয়। ফলে জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় গতিশীলতা আসে।

---

[৩২৮] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, কিতাবুয যাকাত

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত সম্পদে প্রাচুর্য এনে দেয়। অভাব-অনটন নির্মূল করে যাকাত মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কর্মসংস্থান ও উৎপাদন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎকৃষ্ট উপস্থাপনায় উদ্বুদ্ধ করে। সে ভাল থাকতে চায়, ভাল খেতে চায়। তার জীবন মানে আসে পরিবর্তন। এতে করে অর্থব্যবস্থার সকল বিভাগে গতিশীলতা আসে। ফলে বৃদ্ধি পায় মোট সম্পদ। এজন্যেই আল্লাহ বলেন –

وما اتيتم من ربا ليربوا فى اموال الناس فلايربوا عند الله ج وما اتيتم من زكواة تريدون وجه الله فاولئك هم الصاغرون

'মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাকো তাই বৃদ্ধি পায়; তারাই সমৃদ্ধিশালী।'[৬২৯]

বস্তুত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে যাকাত হল আল্লাহর দেয়া এক অসাধারণ ব্যবস্থা। এর যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নই কেবল সব মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করতে পারে। পাশাপাশি নিশ্চিত করে আখিরাতের সাফল্য।

মানুষ নিজের ক্ষমতা ব্যয় করে অর্থোপার্জন করে। নিজস্ব বুদ্ধি ও শক্তিতে তার সম্পদের প্রাচুর্য আসে। কিন্তু এই শক্তি, ক্ষমতা ও বুদ্ধি মানুষ সৃষ্টি করেনি। আল্লাহ তাআলা তাকে এগুলো দিয়েছেন। আবার সে যা অর্জন ও উপার্জন করে তাও তার তৈরী নয়। আল্লাহ তাআলার তৈরী জিনিসই সে উপার্জন করে। সুতরাং মানুষের উচিত নয় সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা। তার উচিত নয় নিজস্ব মালিকানাধীন বিষয় মনে করে সম্পদকে স্বেচ্ছাচারিতার সাথে ব্যয় করা। বরং অর্থ সম্পদ তার নিকট আল্লাহর আমানত। আল্লাহর বিধান অনুসারে তার এ সম্পদ ব্যয় ও ব্যবহার করা উচিত। এ সম্পদে আল্লাহ তাআলা অপরের যে সকল হক নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা আন্তরিকতা ও সততার সাথে আদায় করা উচিত। যাকাত শিক্ষা দেয়, ফরয ইবাদত হিসেবে নির্ধারিত পরিমাণের অর্থ আদায়ই মূল কথা নয়। বরং আল্লাহর প্রতি ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ও আখিরাতে সাফল্য লাভের জন্যেই মানুষের যাকাত আদায় করা কর্তব্য।

জীবনের চেয়েও মানুষের নিকট প্রিয় বিষয় হল সম্পদ। অমানুষিক পরিশ্রম ও অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে মানুষ অর্থোপার্জন করে। কিন্তু এই অর্থোপার্জনের মোহ যেন মানুষের অন্তরকে কলুষিত না করে যাকাত সে শিক্ষা প্রদান করে। যাকাত শিক্ষা দেয় অর্থ বিত্ত ও সম্পদের প্রতি মানুষের ভালবাসা কখনোই এত প্রবল হবে না যাতে মানুষ আল্লাহর বিধান ভুলে যেতে পারে। পৃথিবীর বেশিরভাগ সংঘাত, সংঘর্ষ, কলহ, হিংসা বিদ্বেষ ও নগ্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেখানে অর্থ নিয়ে সেখানে যাকাত মানুষকে এ সকল থেকে মুক্ত থাকার শিক্ষা দেয়। কেননা, যাকাতদাতা বুঝতে পারে সম্পদ হল আল্লাহর নিআমত। এ নিআমত তিনি যখন খুশি তখন প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। সুতরাং এ নিয়ে দ্বন্দ-কলহে লিপ্ত হওয়া, ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ ও লালন করা নিতান্তই মূর্খতা মাত্র। যে জন্যে যাকাত অন্তরকে সম্পদের মোহমুক্ত করা এবং কৃপণতা থেকে মুক্ত হওয়ার শিক্ষা দেয়।

যাকাত পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি, নিরাপত্তা বিধান, সর্বজনীন কল্যানসাধন এবং সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেয়। যাকাত ব্যবস্থায় বিত্তহীন মুসলিমকে অর্থ সাহায্য করা বিত্তশালী মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক। এ অর্থ দান বিত্তহীনের প্রতি তার দয়া নয়। এ হল বিত্তহীনকে আল্লাহ প্রদত্ত অধিকার। এ প্রক্রিয়ায় যাকাত দিয়ে মুসলিম পরস্পর সহযোগী ও সহানুভূতিশীল সমাজ গড়ার শিক্ষা পায়। যাকাত ভিত্তিক সমাজে কেউ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে না। কেননা, যাকাত সকলকে কাজ করার ক্ষেত্র তৈরী করে দেয়। অভাব থাকে না। ফলে অনেক সামাজিক অপরাধ কমে যায়। যাকাত শেখায় অপরাধমুক্ত নিরাপদ সমাজ গড়ার পদ্ধতি। যাকাত মূলত ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার বাস্তব শিক্ষা দেয়। কেননা, যাকাত আদায় ও বিতরণের যে বিধান কেবল পুরোপুরি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা চালু থাকলেই তার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। সে কারণে যাকাতের বিধান ব্যক্তিকে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রেরণা দেয়।

যাকাতের অর্থনৈতিক শিক্ষা হল সম্পদ বিত্তশালী মানুষের হাতে পুঞ্জিভূত রাখা যাবে না। বরং সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট অর্থের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে। কেননা সম্পদ যদি গুটি কয়েক মানুষের হাতে জমা থাকে তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যহত হয়। কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে পড়ে। উৎপাদন ও বিপণন কমে যায়। জাতীয় আয়

---

[৬২৯] আল কুরআন / ৩০:৩৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

হ্রাস পায়। সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য তীব্র আকার ধারণ করে। অভাব অনটন দরিদ্রতা মানুষের আর্থিক জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। এ সকল বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য প্রতিহত করার জন্যেই সহমর্মিতা ও সহযোগিতার প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর যাকাত ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করতে হবে।

সাওম

সাওম (صوم) অর্থ বিরত থাকা বা আত্মসংযম করা। সিয়াম (صيام) শব্দটি এর সমার্থক। 'মাসানী' গ্রন্থে আছে – সাওম ও সিয়াম উভয় শব্দই মাসদার। এর প্রচলিত নাম 'রোযা' ফার্সি ভাষার শব্দ। অর্থ জ্বালিয়ে দেয়া, নির্বাপিত করা। সাওম মানুষের জৈবিক চাহিদা ও রিপুর অসৎ কামনা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নির্বাপিত করে।

ইমাম রাগিব ইস্পাহানী বলেন – সাওম অর্থ امساك عن الفعل বা কাজ থেকে বিরত থাকা। এ জন্যে সফর থেকে বিরত থাকা ঘোড়াকে সাইম (صائم) বলা হয়।[৬৩০]
বস্তুত ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহের মধ্যে সাওম এক বিশেষ প্রকৃতির দৈহিক ও আত্মিক ইবাদত। বিভিন্নভাবে একে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বক্তব্য প্রকাশের পদ্ধতিগত ভিন্নতা বাদ দিলে এ সংজ্ঞাগুলো মূলত অভিন্ন। যেমন – রমযান মাসে সাওমের নিয়তে সুবহি সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনক্রিয়া থেকে বিরত থাকাই সাওম। প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ প্রতিজন মুসলিমের ওপর সাওম ফরয।

আধ্যাত্মিক ইবাদতের দৃষ্টিতে মৌলিক ইবাদতগুলোর মধ্যে সাওম বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। কেননা দৃশ্যতঃ বাহ্যিক ইবাদত হলেও সাওম মূলত আত্মিক ইবাদত, আধ্যাত্মিক ইবাদত। আল্লাহ তাআলা তাকওয়া অর্জন, আত্মসংযম ও আত্মসংশোধনের দুর্লভ গুণ তৈরীর জন্যই মৌলিক এ ইবাদতটির বিধান প্রদান করেছেন।

মুসলিম জাতির জন্যে আল্লাহ তাআলা যে ইবাদতসমূহ পালন করার ফরয করেছেন সাওম তার অন্যতম। কুরআন মাজীদে তিনি বলেছেন –
يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
'হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেয়া হয়েছিল, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।[৬৩১]
যে জন্যে চান্দ্রসনের রমযান মাসে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ, স্থায়ী অধিবাসী (মুকিম) এবং বিবেকবান মুসলিমের ওপর সিয়াম পালন ফরয। শরীআতসম্মত কারণ ছাড়া সিয়াম পালন না করা ভয়ানক অন্যায়। সঙ্গত কারণ থাকলে পরে কোন মাসে তা কাযা করতে হবে। কেউ সাওম অস্বীকার করলে সে কাফির হবে।

ইসলামের মূল অবকাঠামো যে পাঁচটি বুনিয়াদ বা স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তার মধ্যে সাওম অন্যতম। দৈহিক ও আত্মিক ইবাদতের এ হল এক অসাধারণ সমন্বয়। সাওমকে বাদ দিয়ে ইসলামকে কল্পনা করা যায় না। কেননা এ হল এমন একটি ইবাদত যা আল্লাহ তাআলা মানুষের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য সকল যুগেই ফরয করেছিলেন। সকল মানুষের জন্যই এ রীতি পালনের বিধান দিয়েছিলেন। এমনকি যে সকল ধর্ম বাতিল, সত্য ধর্ম বিকৃত হয়ে যে সকল ধর্ম অস্তিত্ব লাভ করেছে কিংবা যে ধর্মগুলো জাতীয় বা উপজাতীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে সেগুলোতেও উপবাসের বিধান বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়। এর কারণ একটাই, তা হল মানুষের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে এ হল এক অব্যর্থ ব্যবস্থাপনা। সঙ্গত কারণেই তা ইসলামের বুনিয়াদী আমলে পরিণত হয়েছে। যদিও অন্যান্য ধর্মের উপবাস ব্রতের সাথে ইসলামের সিয়ামের কেবল উপবাস করা ছাড়া অন্য কোন দিকে মিল নেই। বিশেষত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং দর্শনে সিয়াম ও উপবাসব্রত সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।

সাওম পালন করলে ব্যক্তি অসীম পুণ্য লাভ করে। সিয়াম সাধনায় মানুষের পূর্বে করা বিভিন্ন ধরনের গুনাহ মাফ হয়। এর মাধ্যমে মানুষ তাসবীহ – তাহলীল পাঠ করে। তওবা ইস্তিগফার করে। পূর্বকৃত পাপের জন্যে অনুশোচনায় দগ্ধ

---

[৬৩০] ইমাম রাগিব ইস্পাহানী, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৮
[৬৩১] আল কুরআন / ২:১৮৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

হয় এবং নতুনভাবে কোন গুনাহে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করে। ফলে আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন,

من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

'যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্মবিচারের সাথে রমযানে সাওম পালন করে তার পূর্বকৃত সকল গুনাহ ক্ষমা করা হয়।[৬৩২]

রমযান মাসকে বলা হয় রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস। এর প্রথম দশদিন সাওম পালনকারীদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ রহমত অবিরত ধারায় বর্ষিত হতে থাকে। দ্বিতীয় দশদিন আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করেন। ব্যক্তি তার বিভিন্ন রকমের অপরাধের জন্যে তওবা করলে এ সময়ে তা কবুলের বিশেষ সুযোগ রয়েছে। আর শেষ দশদিন হল আযাব থেকে নাজাতের সময়। এ সময় আল্লাহ জাহান্নামীদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিদের শাস্তি মওকুফ করে দেন। এ মাসের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন – 'তোমাদের নিকট বরকতময় রমযান মাস এসেছে, যে মাসে আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর সাওম ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশসমূহের সকল দরোজা খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়। বিদ্রোহী শয়তানদের এ মাসে শৃঙ্খলিত করা হয়। রমযান মাসে এমন একটি রাত আছে যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে প্রকৃতই বঞ্চিত হয়েছে (সকল কল্যাণ থেকে)।[৬৩৩]

মানবজাতির জন্যে কিয়ামত এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর এ সময়ে সকল মানুষ এক জায়গায় সমবেত হবে। সূর্য অত্যন্ত নিকটবর্তী হবে। প্রচণ্ডতম সূর্যতাপ থেকে বাঁচার জন্য কোন ছায়া থাকবে না। এমন অসহনীয় অবস্থায় সাওমের কল্যাণে সাওম পালনকারীরা পাবে আরশের ছায়া। সেখানে তারা পরম শান্তিতে বিচারের অপেক্ষা করবে। আবার বিচার কাজের ক্ষেত্রে তারা বিশেষ সুবিধা পাবে। সাওম তাদের মুক্তির জন্যে সুপারিশ করবে এবং সে সুপারিশ গৃহীত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

الصيام القران يشفعان للعبد يقول الصيام اى رب انى منعه الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه و يقول القران اى رب انى منعه من النوم بالليل فشفعنى فيه فيشفعان

'সাওম ও কুরআন বান্দার জন্যে সুপারিশ করবে। সাওম বলবে, হে প্রভু! আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার ও যৌনকামনা থেকে বিরত রেখেছি। কাজেই তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। আর কুরআন বলবে হে প্রভু! আমি তাকে রাতের বেলায় ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, কাজেই তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল করুন। অতঃপর তাদের উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।[৬৩৪]

সাওম মানুষকে জান্নাতে প্রবেশের উপযুক্ত করে তোলে। সে ধৈর্যধারণ করতে শেখে। তার মধ্যে প্রয়োজনীয় সদগুণাবলীর বিকাশ ঘটে। আল্লাহ তাআলার পানাহার ও যৌনাচার না করার বৈশিষ্ট্যের সাথে সে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে হলেও একীভূত হয়। এসব কারণে সাওম ব্যক্তির জান্নাত লাভের কারণে পরিণত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন –

وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة

'আর রমযান হল ধৈর্যের মাস এবং ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত।[৬৩৫]

অন্যত্র তিনি বলেন – জান্নাতের আটটি দরোজা আছে। এর একটির নাম রায়্যান। সাওম পালনকারী ছাড়া কেউই এ দরোজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।[৬৩৬]

সাওমের মূললক্ষ্য হল তাকওয়া অর্জন করা। তাকওয়া অর্জনের উদ্দেশ্যেই সাওম ফরয করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন –

---

[৬৩২] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সাওম / মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সাওম

[৬৩৩] মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত তিরমিযী, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সাওম / সুলায়মান ইবন আশআছ আস সিজিস্তানী, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সাওম

[৬৩৪] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সাওম

[৬৩৫] প্রাগুক্ত

[৬৩৬] প্রাগুক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

يايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

'হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দেয়া হয়েছিল, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার।[৬৩৭]

বস্তুত পদ্ধতিগত কারণেই সাওম একটি তাকওয়া নির্ভর ইবাদত। মানুষ সাওমকালীন সময়ে পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকে। তাকওয়া না থাকলে সে গোপনে এ কাজগুলো করতে পারে। দুনিয়ার সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে তার পক্ষে খাদ্য গ্রহণ বা যৌনাচারে লিপ্ত হওয়া খুবই সহজ। কিন্তু তাকওয়ার জন্যেই সাওমের মধ্যে এ কাজটি করা হয় না। কেননা ব্যক্তি জানে, সবার অলক্ষ্যে কাজ করা হলেও আল্লাহ তাআলা দেখেন সবসময়ই। এভাবে সাওম মানুষের মধ্যে তাকওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় গুণ তৈরী করে।

যথাযথভাবে পালন করা সাওম কেবল আল্লাহর জন্যেই হয়ে থাকে। এতে লোক দেখানোর ইচ্ছে প্রবল হতে পারে না। ব্যক্তি বিশেষ পরিচর্যায় তার মিথ্যাচার ও গীবতের অভ্যাস রমযান মাসেই ত্যাগ করে। কারো সাথে ঝগড়া করে না। তার মধ্যে আল্লাহর নির্দেশ ও ভালবাসাই কার্যকর থাকে। ফলে সাওমের মাধ্যমে সে আল্লাহ তাআলার বিপুল সন্তুষ্টি ও ভালবাসা লাভ করে। যেমন হাদীসে কুদসীতে তিনি ইরশাদ করেন –

كل عمل ابن ادم يضاعف له الاجر عشرة من اضعاف الى سبع مائة ضعف، قال الله تعالى الا الصوم فانه لى وانا اجزى به

'আদম সন্তানের প্রতিটি আমলের প্রতিদান দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ বলেন – শুধু সাওম ব্যতীত। নিশ্চয়ই সাওম আমার জন্য আর আমিই এর প্রতিদান দেব।[৬৩৮]

আল্লাহ তাআলা পরম সত্তা। তাঁর সাক্ষাত ও সান্নিধ্য লাভ মানুষের জন্যে এক পরম পাওয়া। তিনি সব সুন্দরের উৎস, সকল সৎগুণাবলীর সমন্বয়। তাঁর দিদার লাভ হল চূড়ান্ত সাফল্য। তাকওয়াবান সকল মানুষেরই প্রথম প্রার্থনা হয় আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করা। সাওম এ প্রার্থনা পূরণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। সাওমের মাধ্যমে সাওম পালনকারী আল্লাহর সাক্ষাত লাভের নিশ্চয়তা পায়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন –

للصائم فرحتان فرحة عند فطره و فرحة عند لقاء ربه

'সাওম পালনকারীর জন্যে দুটো আনন্দ। একটি আনন্দ তার ইফতারের সময় অপর আনন্দ তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়।[৬৩৯]

সাওম পালনের সময়ে ব্যক্তি পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকে। মিথ্যাচার, গীবত, অশালীন কথাবার্তা বা ঝগড়া সাওমের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে বলে সে এগুলোতেও লিপ্ত হয় না। পাশাপাশি সে যেখানে হালাল পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকে সেখানে হারাম ভোগ-সম্ভোগ নিয়ে চিন্তা করার অবকাশও তার থাকে না। এভাবে সাওম পালনের মাধ্যমে সে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও জৈবিক পাশবিক কামনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। বদঅভ্যাস ও খারাপ আচরণ থেকে সে মানুষকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখে। মানুষ সুন্দর চরিত্র অনুশীলন করে আধ্যাত্মিক সাধনায় অনেক দূর অগ্রসর হতে পারে।

সাওম সমাজের বিত্তবান মানুষদের মনে বিত্তহীনদের জন্যে প্রবল ভালবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে। স্বাভাবিকভাবে সম্পদশালী মানুষের না খেয়ে থাকার দরকার হয় না। সে জন্যে সে বুঝতে পারে না অনাহারে থাকার কষ্ট কেমন। সাওমের মাধ্যমে বিত্তশালী বিত্তহীন নির্বিশেষে সবাই সুবহি সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন রকম খাদ্য গ্রহণ করে না। এর ফলে সমাজের ধনী মানুষগুলো ক্ষুধার তীব্র কষ্ট সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করে। যার ফলে সমাজের অনাহারী সদস্যদের দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারে তাদের মধ্যে গভীর সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। সে তাদের প্রতি তীব্র ভালবাস পোষণ করে। রাসূলুল্লাহ (সা) এজন্যেই বলেছেন – والشهر المواساة

---

[৬৩৭] আল কুরআন / ২:১৮৩

[৬৩৮] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সাওম / মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সাওম

[৬৩৯] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আর (রমযান মাস হল) সহানুভূতি ও সহমর্মিতার মাস।[৬৪০]

সাওম বিত্তবান মুসলিমদের পক্ষ থেকে দরিদ্র মানুষের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। নিবিড় উপলব্ধি ও গভীর ভালবাসার সাথে দরিদ্র ভাইদের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে সচেষ্ট হয়। আত্মীয় বা প্রতিবেশী কিংবা শুধু মুসলিম ভাই হিসেবে তারা যে অধিকার পাওয়ার যোগ্য তা আদায়ে সচেষ্ট হয়। বিত্তবানদের সহযোগিতায় দুঃখী-দরিদ্র মানুষেরা তাদের দুঃখ ভুলে যেতে পারে।

সহযোগিতা ও ভালবাসাপূর্ণ সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার অব্যর্থ হাতিয়ার সাওম। সাওম ব্যক্তিকে মিথ্যাচার, হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া, অশ্লীলতা, পরনিন্দা প্রভৃতি পাপাচার থেকে দূরে রাখে। আর তার মধ্যে তৈরী করে সহানুভূতি, ভালবাসা, সহযোগিতা মনস্কতা, তাকওয়া ও সংযম। ফলে গড়ে ওঠে একদল আদর্শ লোক। যারা একটি কাঙ্ক্ষিত আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করে।

সাধারণত রমযান মাসে যাকাত বন্টন করা হয়। অন্যান্য মাসের তুলনায় রমযান মাসের দানে বহুগুন বেশি সওয়াব বলে এ সময়ে দানের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। আর সওমের শেষের দিকে এসে শরীআতের নির্ধারণ অনুযায়ী ব্যক্তি তার নিজের ও পরিবারের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করে। রমযান মাসের এ বিভিন্ন ধরনের অর্থ গরীব মানুষদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ফলে বাজার চাহিদা সৃষ্টি হয়। বৃদ্ধি পায় কাঁচামাল সরবরাহের সুযোগ। বেড়ে যায় উৎপাদন। গরীব মানুষ পায় নতুন কাজ। অর্থ আবর্তিত হতে থাকে সবার মধ্যে। এভাবে সাওম সমাজের লোকদের মধ্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক উপযোগ তৈরী করে।

রমযান মাসে পৃথিবীর সকল অঞ্চলের মুসলিম সিয়াম সাধানায় আত্মনিয়োগ করে। এক্ষেত্রে ধনী-নির্ধন, রাজা-প্রজা, বর্ণ, অঞ্চল বা জাতীয়তায় কোন প্রভেদ করা হয় না। রমযান শেষে ঈদুল ফিতরের সর্বজনীন ও পবিত্র উৎসব হয়। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ পবিত্র ও আন্তরিক পরিবেশে ঈদগাহে সালাত আদায় করে। পরম মমতায় একে অন্যের সাথে কোলাকুলি করে। ফলে সাধারণভাবে সকল মুসলিম ঐক্য ও সাম্যের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

সাওম পালনকারীর আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর সাথে তার বন্ধুত্ব ও ভালবাসা বৃদ্ধি করে দেয়ার ক্ষেত্রে সাওম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সময়ে বিপুল সওয়াব লাভের জন্যে এক মুসলিম অন্য মুসলিমকে সাহরি ইফতার খাওয়ায়। এক পরিবার অন্য পরিবারে খাবার তৈরী করে পাঠায়। ঈদের দিন সাধারণভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেককে আপ্যায়ন করে। এতে সমাজের মুসলিমদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় ও বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সময়ের কাজ সময়ে সম্পন্ন করা এবং নিয়ম মেনে সম্পন্ন করার মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা হল সাওম। এ সময়ে ব্যক্তি যথাসময়ে সাহরি ও ইফতার করে। সাওম পালনের প্রতিটা মুহূর্তে প্রয়োজনীয় বিধান পালন করে। তার খাওয়া, ঘুমানো, সালাত আদায় প্রভৃতি সবকিছুতেই পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। যা সমাজকে সুশৃঙ্খল করে তোলে।

সাওম মানুষকে পরিমিত ও নিয়মিত আহারের শিক্ষাদান করে যা দৈহিক সুস্থতার অবিকল্প উপায়। তাছাড়া এক মাসের সিয়াম সাধনা তার পাকস্থলীকে আরো কর্মক্ষম করে তোলে। এভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রভাবক শক্তি হিসেবে বিরাজ করে সাওম মানুষকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেয়।

সাওমের ধর্মীয় শিক্ষা হল সাওম একটি ফরয ইবাদত। সাওম পালন না করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। ব্যক্তি ভয়ানক অপরাধ করে নিজেকে আখিরাতের অকল্পনীয় আযাবের যোগ্য করে তোলে। সাওম অস্বীকার করলে কাফির হতে হয়। তখন অপরাপর কাফিরদের মতই স্থায়ী আবাস হয় জাহান্নাম।

সাওম ব্যক্তির আত্মাকে পরিশোধিত করে তার উৎকর্ষ সাধন করে। এর মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে মানুষের আত্মা মানবিক স্তরের সীমাবদ্ধতা ও চাহিদা অতিক্রম করে। সে ভোগ থেকে বিরত থাকে। তার মধ্যে আল্লাহর যিকর ও তাকওয়ার পূর্ণ রূপ ফুটে ওঠে। এর মাধ্যমে সে আত্মনিগ্রহ করে না বা দৈহিক ও আত্মিক শক্তির মৃত্যুও ঘটায় না।

---

[৬৪০] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুস সাওম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

বরং মানবিক চাহিদা ও দাবি পূর্ণ করে করে আত্মার মধ্যে যে কলুষ কালিমা জমা হয়, সাওম তা দূর করে। ফলে আত্মা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন বদঅভ্যাস ত্যাগ করে সাওম উন্নত নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলার শিক্ষা দেয়। এ সময়ে পানাহার থেকে বিরত থাকতে হয় বলে সহজেই ধূমপান ছেড়ে দেয়া যায়। শক্তি ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি পানাহার বা যৌনাচারে লিপ্ত না হয়ে সুন্দরতম সংযমের অনুশীলন করে । তার মধ্যে সবর বা ধৈর্যশীলতার দুলর্ভ গুণ স্থান করে নেয়। সাওমলব্ধ তাকওয়া তাকে হিংসা, পরনিন্দা ও পাপাচারের বিপরীতে কুরআন তিলাওয়াত, দানশীলতা ও ইবাদতে অভ্যস্ত করে তোলে। ফলে ব্যক্তি সুদৃঢ় ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হয়।

সমাজের নিরন্ন ও ক্ষুধাপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার শিক্ষা দেয় সাওম। সাওমের মূল সামাজিক শিক্ষা হল – নিঃস্ব, দুঃখী ও দরিদ্র মানুষদের প্রতি সহযোগিতা বাড়িয়ে দেয়া। কেননা, সিয়াম সাধনার মাধ্যমে প্রতিজন বিত্তশালী মুসলিম না খেয়ে থাকার দুঃসহ কষ্ট সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করে। সাওম মানুষকে সময়ানুবর্তী ও নিয়মানুবর্তী করে। তার মধ্যে শৃঙ্খলা মেনে চলার অভ্যাস গড়ে ওঠে। তবে সাওমের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হল ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা। সাওম অবস্থায় কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদে জড়িত হওয়া যায় না। বরং কেউ ঝগড়া বাধাতে উদ্যোগী হলে সাওম পালনকারী নিজের সাওমের ঘোষণা দিয়ে নিজেকে এবং বিপরীতপক্ষকে নিবৃত্ত রাখে। ধূমপান, মাদকাসক্তিসহ নানা কুঅভ্যাস ও সামাজিক অনাচার নির্মূলের শিক্ষাও রয়েছে সাওমের মধ্যে।

সুতরাং মুমিনগণ যথাযথ নিয়ম মেনে সাওম পালন করবেন এবং জীবনে এর শিক্ষা রূপায়িত করবেন। তাহলে আলাদা করে সাধনা করার জন্য সংসার ত্যাগী হতে হবে না। সংসার ত্যাগ করে লোভ প্রশমন করা অত্যন্ত সহজ একটি কাজ। কেননা যেখানে সংসার নেই সেখানে অসংখ্য পাপাচার ও প্রলোভনের উপস্থিতিই নেই। মিথ্যা, গীবত, হারাম উপার্জন, অবৈধ সম্ভোগ প্রভৃতির সুযোগই নেই। সুযোগ না থাকার কারণে কোন অন্যায় থেকে বিরত থাকার মধ্যে বাহাদুরী নেই। সাওম বরং চারপাশে অসংখ্য প্রলোভনের মধ্যে রেখেই মানুষের আত্মাকে শুদ্ধ করতে চায়। আর এ অবস্থায় যে আত্মা শুদ্ধ হয় সে আত্মাই প্রকৃত শুদ্ধ আত্মা। তার মধ্যেই প্রতিফলিত হয় আসল শুদ্ধাচার।
কাজেই মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনায় ও আত্মিক উৎকর্ষে সাওমের অবস্থান অত্যন্ত জোড়াল এবং অনিবার্য।

হাজ্জ

কুরআন মাজীদে হাজ্জ শব্দটির দুরকম ব্যবহার রয়েছে। একটি প্রচলিত হাজ্জ (حج)। এটি মাসদার যা ক্রিয়ামূল। অপর ব্যবহারিক হল হিজ্জ (حج)। এটি ইসম বা বিশেষ্য। নিহায়া গ্রন্থকার বলেছেন – শাব্দিকভাবে যে কোন বিষয়ের প্রতি ইচ্ছা পোষণ করাই হাজ্জ। ইচ্ছা বা অভিপ্রায় পোষণ, আগ্রহ ব্যক্ত করা, সুদৃঢ় প্রত্যয় বা সিদ্ধান্ত নেওয়া অর্থে শব্দটির ব্যবহার রয়েছে।
প্রাপ্তবয়স্ক এবং আর্থিক ও দৈহিকভাবে সক্ষম মুসলিমের জন্য জীবনে মাত্র একবার যিলকদ ও যিলহাজ্জ মাসে ইহরামের সাথে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ও আরাফাতে অবস্থানের মাধ্যমে একটি ফরয কাজ সম্পন্ন করাই হাজ্জ।

ইসলামের আধ্যাত্মিক সাধনায় হাজ্জের অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ হল এমন একটি ব্যবস্থা যাতে ইসলামী জীবন দর্শনের বাস্তব প্রতিকৃতি রাসূলুল্লাহ (সা) এর কর্মস্থল ও সংগ্রামের নানা জায়গা প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। ধারণ করতে পারেন ইসলামী আধ্যাত্মিকতার মূল সুর। সাথে সাথে সম্মিলিতভাবে আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজ্জ সমাপনের মধ্যে ব্যক্তি এক অনন্য প্রেরণা ও উদ্দীপনা লাভ করেন। কোন মানুষের সান্নিধ্যে থেকে বা কারো নিকট থেকে নির্দেশনা পেয়ে এ রকম উদ্দীপনা লাভ করা সম্ভব নয়। যে জন্য ইসলামী আধ্যাত্মিকতায় ইবাদত হিসেবে হাজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

হাজ্জ একটি ফরয ইবাদত। সুস্থ, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন এবং প্রয়োজনীয় অর্থসঙ্গতি আছে, এমন মুসলিমের ওপর আল্লাহ তাআলা সারা জীবনে একবার হাজ্জ পালন করা ফরয করেছেন। আল্লাহ বলেন –

Dhaka University Institutional Repository

و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

'মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে এ ঘরের হাজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।'[৬৪১]

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন – يايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا

'হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর হাজ্জ ফরয করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা হাজ্জ পালন কর।'[৬৪২]

ইসলাম যে পাঁচটি মূলভিত্তির ওপর তার অস্তিত্ব ও অবকাঠামো দাঁড় করিয়েছে তার মধ্যে হাজ্জ অন্যতম। একে বাদ দিলে তাই পরিপূর্ণ ইসলাম অকল্পনীয় বিষয় হয়ে পড়ে। কেননা আল্লাহ তাআলা মানুষ সকল দিক থেকে তাঁর প্রতিনিধিত্বের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে যে হুকুম আহকাম প্রদান করেছেন তা সুবিন্যস্ত এবং সুপরিকল্পিত। অর্থহীন কোন আদেশই আল্লাহ তাআলা মানুষকে দেন নি। এর মধ্য থেকে কোন কোন টি মেনে অপরগুলো না মানলে সে মেনে চলার কোন সার্থকতা নেই। আল্লাহ এ ব্যাপারে কঠিন হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

হাজ্জ শুধু সওয়াব অর্জনেই নয় বরং আল্লাহ তাআলার ক্ষমা লাভের মাধ্যম হিসেবেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যথাযথভাবে হাজ্জ পালন করা হলে আল্লাহ তাআলা ব্যক্তির পূর্বের গুণাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন–

'যে ব্যক্তি হাজ্জ করার জন্য বায়তুল্লাহ আগমন করে তারপর কোন রকমের যৌনক্রিয়া ও পাপাচারে লিপ্ত হয় না সে যেন সদ্য জন্ম নেওয়া নিষ্পাপ শিশুর মত প্রত্যাবর্তন করে।'[৬৪৩]

এ সম্পর্কে তিনি আরো বলেন – পানি যেমন ময়লা আবর্জনা ধুয়ে পরিচ্ছন্ন করে দেয় হাজ্জও তেমনি অপরাধসমূহ বিদূরিত করে পবিত্র করে দেয়।[৬৪৪]

হালাল জীবিকায় প্রয়োজনীয় বিধান মেনে হাজ্জ পালন করা হলে আখিরাতে সাফল্য লাভ নিশ্চিত। সঠিক নিয়মে হাজ্জ করতে রওয়ানা হওয়ার পর বা হাজ্জে গমনের বিশুদ্ধ নিয়তের পর কেউ যদি মারাও যায় তাহলেও সে পাবে হাজ্জের সওয়াব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – যে ব্যক্তি হাজ্জ বা উমরাহ কিংবা জিহাদের জন্য বের হয়ে পথে মারা যায় আল্লাহ তার জন্য গাজী, হাজী ও উমরাহকারীর সওয়াব লিখে দেবেন।[৬৪৫]

অপরদিকে হাজ্জ পালন করা না হলে বা এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পবিত্রতা বজায় না রাখলে আখিরাতে শাস্তি পেতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন – 'আল্লাহ যাকে হাজ্জ পালনের ক্ষমতা দিয়েছেন সে যদি তা পালন না করে এবং এ অবস্থাতেই মারা যায় তাহলে সে যন্ত্রণাদায়ক আগুনে পতিত হবে।'[৬৪৬]

হাজ্জের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভ করে। এ সময়ে আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানুষ মক্কা মুয়াযযামায় হাযির হয়। অগণিত মানুষের পবিত্র সমাবেশে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার প্রেরণা নিয়ে তারা ঘোষণা করতে থাকে –

لبيك اللهم لبيك لاشريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

'আমি তোমার কাছে হাযির, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপস্থিত। তোমার কোন শরীক নেই। আমি তোমার কাছে হাজির। নিশ্চয় প্রশংসা, নিআমত এবং সার্বভৌমত্ব তোমারই। তোমার কোন শরীক নেই।'

বস্তুত হাজ্জের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি আল্লাহর আতিথ্য গ্রহণের দুর্লভ সুযোগ ভোগ করে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন –

الحاج والعمار وفد الله ان دعوه اجابهم وان استغفره غفرلهم

'হাজ্জ ও উমরাহ পালনকারীরা আল্লাহর মেহমান। তারা যদি তাঁকে ডাকে, তিনি তাদের জবাব দেন। আর যদি তাঁর নিকট ক্ষমা চায় তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন।'[৬৪৭]

---

[৬৪১] আল কুরআন / ৩:৯৭

[৬৪২] মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হজ

[৬৪৩] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হজ / মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হজ

[৬৪৪] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হজ

[৬৪৫] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হজ

[৬৪৬] প্রাগুক্ত

[৬৪৭] মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ, সুনান, দার আল কুতুব, বৈরুত, ১৪১২ হিজরি, কিতাবুল হজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

হাজ্জের মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তি আত্মিক শান্তি ও স্বস্তিঃ লাভ করে। সে আল্লাহ তাআলার প্রত্যক্ষ নিদর্শনসমূহ দেখে আল্লাহর ক্ষমতা ও কুদরতের ব্যাপারে আরো আস্থাশীল হয়। তার মনে আল্লাহভীতির বিপুল সঞ্চয় গড়ে ওঠে। আল্লাহ তাআলা বলেন –

ذالك و ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب

'এটাই (হাজ্জ) আল্লাহর বিধান এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে তা তো তার হৃদয়ের তাকওয়া সঞ্জাত।[৬৪৮] আল্লাহর নির্দেশ পালন, তাঁর নির্দশনসমূহের মধ্যে অবস্থান ব্যক্তিকে আত্মিক শান্তিতে সমৃদ্ধ করে।

হাজ্জ বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করে। দীর্ঘদিন নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক চিত্তে তারা পাশাপাশি অবস্থান করে। এক অভিন্ন লক্ষ্যে পবিত্রতম পরিবেশে তারা আল্লাহর নিকট নিজেদের আত্মনিবেদন করে। লক্ষ্যগত ঐক্য, অবস্থানগত নৈকট্য, মানসিক পবিত্রতা এবং পরিবেশের দীনী চরিত্র তাদের মধ্যে সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলে। তারা আধ্যাত্মিকভাবে একীভূত হয় অভিন্ন লক্ষ্য ও একই প্রত্যাশা নিয়ে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থাকার যে আদেশ দিয়েছেন তা হাজ্জের মাধ্যমে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে।

হাজ্জ মুসলিমদের মধ্যে বিরাজমান সাম্যবাদী চিন্তা – চেতনা ও মানসিকতায় আরো উন্নতি ঘটায়। সামাজিক সাম্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ হল হাজ্জ। এখানে সকল মুসলিমকে এক পোশাক পরতে হয়, এক জায়গায় থাকতে হয়, একই খাদ্য–পানীয় গ্রহণ করতে হয়। সালাত আদায়, তাওয়াফ সম্পাপন এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতায় সকল শ্রেণী ও পর্যায়ের মানুষ এক ও অভিন্ন নীতি অনুসরণ করে। রাজা-প্রজা, সাদা-কালোর সামন্যতম ভেদাভেদ হাজ্জে থাকে না। ফলে মুসলিমদের সাম্যের চেতনা অধিকতর উন্নতি লাভ করে। তার মধ্য থেকে বড়ত্বের গৌরব ও অহমিকা দূরীভূত হয়। সে আত্মিকভাবেই ইসলামের সাম্যবাদী দর্শনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তৈরীর অহম তাকে ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত করতে পারে না।

মুসলিমরা ইসলামী আদর্শের সুমহান ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। তারা কেউ কারো পর নন। দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয় এমনকি বিস্মরণযোগ্য কোন সম্পর্কের ধারক ব্যক্তিও নন। তারা হলেন অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে গ্রন্থিত পরমাত্মীয়। সহযোগী, বন্ধু, সহমর্মী এবং সহযোদ্ধা। পৃথিবীর সকল স্বার্থ ও সম্পদের ওপর এই সম্পর্কের স্থান ও মর্যাদা। হাজ্জ মুসলিম জাতির এই আদর্শিক ভ্রাতৃত্বে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। ভাবগম্ভীর আন্তরিক পরিবেশে দীর্ঘসময় একত্রে অবস্থানের ফলে তাদের এ সম্পর্ক অধিকতর সুন্দর ও সুদৃঢ় হয়।

প্রশিক্ষণ শিবিরের মত হাজ্জ মুসলিমদের নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দেয়ার সুমহান কেন্দ্র। এ সময়ে তারা অন্য সকল কাজ থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে ধর্মীয় চেতনায় কেবল শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতারই অনুশীলন করে। তাদের জেগে ওঠা, ঘুমানো, সালাত আদায়, বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান ও নানা কাজ সম্পাদনের মধ্যে সুশৃঙ্খল ধারাবাহিকতা বিদ্যমান থাকে। এক মাসের এই নিবিড় প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন তাদেরকে সামগ্রিকভাবে শৃংখলা মেনে চলতে অভ্যস্ত করে তোলে।

আদম ও হাওয়া (আ) এর প্রথম সাক্ষাত ঘটে মুল্কা মুয়াযযামার বিখ্যাত আরাফাহ ময়দানে। ইব্রাহীম (আ) এখানে কা'বা তৈরী করেন। ইসমাঈল (আ) মক্কায় জনবসতি গড়ে তোলেন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জীবন ও কর্মক্ষেত্র এ পবিত্র নগরী। এখানে তাঁর পবিত্র স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর জিহাদ, সাধনা, ইসলাম প্রচার, হিজরতসহ সকল কিছুর বাস্তব দৃষ্টান্ত এ জনপদের প্রতিটি স্থানে বিস্তৃত হয়ে আছে। হাজ্জের সময় মুসলিম এ সকল বিষয়ের সংস্পর্শে আসে। সে রাসূলুল্লাহ (সা) ও অন্যদের স্মৃতিধন্য বিষয়গুলোর সংস্পর্শে এসে আবেগে আপ্লুত হয়। সে নতুন প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। তার মধ্যে এ সকল নবী–রাসূল ও আদর্শ মানুষদের জীবন দর্শন ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তার পক্ষে আল্লাহর জন্য আরো নিবেদিত হওয়া সহজতর হয়ে ওঠে।

হাজ্জ মূলত আন্তর্জাতিক ইবাদত। বিশ্ব মুসলিমের একীভূত হওয়ার, একই চিন্তা ও পথে পথ–পরিক্রমায় এক মহান প্লাটফরম। পৃথিবীর সকল অঞ্চলের, সব জাতি ও বর্ণের মুসলিম হাজ্জ উপলক্ষ্যে মক্কায় সমবেত হয়। প্রতি বছর

---

[৬৪৮] আল কুরআন / ২২:৩২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত স্থানে মুমিনদের এ সমাবেশ তাদের বার্ষিক কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরবর্তী বছরের কর্মসূচী প্রণয়নে ভূমিকা রাখে।

হাজ্জ কেবল ইবাদত নয় বরং মুসলিমদের জাতীয় সমস্যা সমাধান এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ধর্মীয় ফোরাম। এতে মুসলিমরা অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে একে অপরের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। সমস্যা সমাধানে নিজেদের করণীয় নির্ধারণ করতে পারে। অপর দেশ বা জাতির সমস্যা সমাধানে সাধ্য মত ভূমিকা পালন করতে পারে। এভাবে হাজ্জ আন্তর্জাতিক জীবনে পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার ধারা অব্যাহত রাখে।

হাজ্জের সময় মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক বা রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা মক্কায় সমবেত হন। এ সময় দারিদ্রপীড়িত রাষ্ট্রসমূহ ধনী ও বিত্তশালী রাষ্ট্রের কাছে আর্থিক সহযোগিতা চাইতে পারে। অসচ্ছল ও অভাবগ্রস্থ রাষ্ট্রকে বিত্তশালী রাষ্ট্র বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে নির্ধারণ করতে পারে। এমনকি যাকাতলব্ধ অর্থ পাঠিয়েও অনুন্নত রাষ্ট্রের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। আর এসব কিছু সুচারুরূপে সম্পন্ন করার ক্ষেত্র তৈরী করতে পারে হাজ্জ।

হাজ্জ মওসুমে হিজাযে বিপুল মুসলিম সমবেত হয়। এদের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্যে বিপুল জনশক্তির প্রয়োজন। যা সাময়িককালের জন্য হলেও কর্মক্ষম বেকার লোকদের জন্যে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে। তাছাড়া হাজ্জের মৌসুমে সেবার বিনিময়ে উপার্জিত অর্থে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান করা যায়।

ফরয হওয়ার পর যদি কেউ হাজ্জ অস্বীকার করে তবে সে কাফির হবে। আর স্বীকার করেও যদি হাজ্জ পালন না করে সে অত্যন্ত জঘন্য গুনাহগার হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) হাজ্জ পালন করা বা না করাকে মুসলিম থাকা বা না থাকার কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন – 'আমার ইচ্ছে হয় এইসব শহরগুলোতে লোক পাঠিয়ে খবর নিই। তারপর সে সব লোকদের ওপর জিযিয়া কর ধার্য করি যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হাজ্জ পালন করছে না। তারা মুসলিম নয়, তারা মুসলিম নয়।'[৬৪৯]
অন্যত্র তিনি বলেছেন – "যাকে কোন রোগ, কোন প্রকৃত প্রয়োজন অথবা কোন যালিম শাসক ঠেকিয়ে রাখে নি এরপরও যদি সে হাজ্জ না করে তাহলে সে ইহুদি হয়ে মরুক বা খৃষ্টান হয়ে মরুক।'[৬৫০]

হাজ্জ একটি সার্বিক ও সামগ্রিক ইবাদত। সালাত দৈহিক ও আত্মিক ইবাদত, সাওমও তাই। যাকাত হল আর্থিক ও আত্মিক ইবাদত। কিন্তু হাজ্জ একই সাথে দৈহিক, আত্মিক ও আর্থিক ইবাদত। মানুষের সামগ্রিক কর্মতৎরপতার সকল কিছুই হাজ্জে নিবেদিত হয়। এজন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) হাজ্জকে উত্তম জিহাদের সাথ তুলনা করেছেন।
তিনি বলেছেন – لكن افضل الجهاد حج مبرور – 'সর্বোত্তম জিহাদ হল কবুল হাজ্জ।'[৬৫১]

মানুষের মধ্যে আত্মগর্ব, হিংসা পরশ্রীকাতরতা, ঘৃণা, পরনিন্দা, ক্রোধ, কাম প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি রয়েছে। এ সকল পাশবপ্রবৃত্তি তার অন্তর কলুষিত করে। হাজ্জ মানুষকে এ কলুষ–কালিমা থেকে মুক্ত করে। এ সময়ে সকল হাজী মৃত্যু পোশাকে নিজেকে সাজায়। তার সন্তান, সন্ততি, পরিবার, অর্থ সম্পদ, ব্যবসায় আর পদমর্যাদার কোন সংযোগ এ সময় থাকে না। সে একান্তভাবেই উপনীত হয় আল্লাহর দরবারে। পাপাচার, মিথ্যাচার, বৈধ অবৈধ যৌনাচার, অশ্লীলতা এবং সকল মানবিক দুর্বলতার বিপরীতে এখানে সে আল্লাহর যিকরে মশগুল থাকে। ফলে তার অন্তর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। কেননা আল্লাহর যিকরেই অন্তর প্রশান্ত ও পবিত্র হয়।

হাজ্জে মুসলিমরা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে। দীর্ঘ সময়ে সে হজ্জের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দেয়। নিষ্ঠার সাথে হাজ্জের কার্যক্রম করে সে ধৈর্যের বাস্তব প্রশিক্ষন পায়। ইবাদতে এমন ধৈর্যের শিক্ষা তাকে জীবনের সকল পর্যায়ে ধৈর্য ধরতে উদ্বুদ্ধ করে।

---

[৬৪৯] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হজ
[৬৫০] প্রাগুক্ত
[৬৫১] প্রাগুক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

হাজ্জে ব্যক্তি নিজের দায়িত্বসমূহ সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে প্রাপ্ত নিজের অধিকারসমূহ বুঝে নেয়। পাশাপাশি অন্যের প্রতি নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়। তার মধ্যে হাজ্জের বিভিন্ন কার্যক্রম পালনের ক্ষেত্রে অপর ভাইকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রবণতা গড়ে ওঠে। সমাজ জীবনে এ শিক্ষা ব্যক্তিকে দায়িত্ববোধ সম্পন্ন এবং অধিকার সচেতন একজন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

হাজ্জের মাধ্যমে ব্যক্তি ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সে পশু কুরবানী করে। তার সহচর হাজীদের জন্যে নিজের সুবিধা ত্যাগ করে। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা অনুসারে সবসময় অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রবল মানসিকতা তাকে বাস্তব জীবনেও ত্যাগের আদর্শে উদ্ভাসিত করে। এভাবে ক্ষুদ্রতর ত্যাগ থেকে সে বৃহত্তর ত্যাগের প্রশিক্ষণ পায়।

হাজ্জ পৃথিবীর সকল অঞ্চল, বর্ণ, ও ভাষার মুসলিমদের সম্মিলিতভাবে কাজ করার শিক্ষা দেয়। হাজ্জের মধ্যে ইসলামী উখওয়াতের বাস্তবরূপ লক্ষ্য করা যায়। মুসলিমদের আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করার এবং ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগে সমস্যাসমূহের সমাধান করার শিক্ষা হাজ্জের মধ্যে নিহিত রয়েছে। সুতরাং শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ আন্তর্জাতিক জীবন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মুমিনগণ হাজ্জের শিক্ষা কাজে লাগাবেন।

হাজ্জ মুসলিমদের আন্তঃবাণিজ্য ও আর্থিক সহযোগিতা বৃদ্ধির শিক্ষা দেয়। হাজ্জের মাধ্যমেই উন্নত মুসলিম দেশ অনুন্নত ও দরিদ্র মুসলিম সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাদের দরিদ্রতা নিরসনে যাকাত ও অন্যান্য আর্থিক সাহায্য পাঠাতে পারে। হাজ্জের আর্থিক শিক্ষার মধ্যে এটাও অর্ন্তভুক্ত যে, কোন মুসলিম দেশে বিপুল কাজের সুযোগ অপর দেশ থেকে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে মুসলিমদেরকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

কাজেই প্রতীয়মান হয়, ইসলাম মানুষকে আনুষ্ঠানিক ইবাদতের যে নির্দেশনা দিয়েছে তা ইসলামের সম্পূর্ণ আদর্শের মতই সমন্বিত ব্যবস্থাপনার পরিচায়ক। ইবাদতগুলোর প্রতিটিতে আধ্যাত্মিকতার উপস্থিতি অত্যন্ত প্রবল। এগুলোর কবুল যোগ্য হওয়ার বিষয়টি পুরোপুরি ইবাদতকারীর আত্মিক শুদ্ধতা ও নিয়তের নিষ্ঠার উপর নির্ভর করে। তাই বলে এগুলো শুধুই আধ্যাত্মিক ইবাদত নয়। সমাজ ও অর্থনীতি বিচ্ছিন্ন কোন ধর্মাচার নয়। বরং এর প্রতিটি ইবাদত একই সাথে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, ধর্ম এবং সবার উপরে ব্যক্তির অন্তরের চাহিদা ও উপযোগ পূরণের অব্যর্থ ব্যবস্থাপনা। যে জন্যে নিষ্ঠার সাথে এ ইবাদতগুলো সম্পন্ন করার পর কাউকে আলাদা করে সাধনা করতে হবে না। সাধু-সন্ন্যাসী-সংসারত্যাগী ফকির হয়ে সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) এবং তাঁর সাহাবী (রা)দের মধ্যে কেউই তা করেন নি। তাঁদের চেয়ে অধিক আধ্যাত্মিক পবিত্রতা, চেতনা ও সাধনা সম্পন্ন মানুষ পৃথিবীতে কখনো আসেন নি। আর কখনো আসবেনও না।

বস্তুত ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহ নিছক আনুষ্ঠানিকতা মাত্র নয়। বরং এ সকল ইবাদত হচ্ছে মানুষের দৈহিক, আত্মিক, ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আর্ন্তজাতিক জীবনযাত্রার বাস্তব দিক নির্দেশনা। এর মাধ্যমে মুমিনদেরকে বৃহত্তর জীবনে যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত করা হয়। সুতরাং মুমিনদরে কর্তব্য হল – মৌলিক ইবাদতসমূহের আনুষ্ঠানিকতার পাশাপাশি জীবনে এগুলোর শিক্ষাসমূহ বাস্তবায়নের আন্তরিক উদ্যোগ নেয়া। তাহলেই জীবনে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসবে। দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনযাত্রা চিরস্থায়ী শান্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

আখলাক ও আধ্যাত্মিকতা

আখলাক বা চরিত্র একটি অদৃশ্য বিষয়। কিন্তু মানব জীবনে এর চেয়ে মূল্যবান কোন বিষয় আর নেই। একজন মানুষের গ্রহণযোগ্যতা, মর্যাদা, ভালবাসা প্রাপ্তি, সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি তার ভাল চরিত্রের উপরই নির্ভর করে। মানুষের জীবনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এ বিষয়টি ইসলামী আধ্যাত্মিকতার অন্যতম দিক। উত্তম চরিত্রবান হওয়া ছাড়া তাই কারো পক্ষে ইসলামী আধ্যাত্মিকতার যথাযথ অনুশীলন করা সম্ভব নয়। এ জন্যে একজন মানুষের মধ্যে অনিবার্যভাবে যে সকল গুণ থাকা প্রয়োজন তা হল তাকওয়া, সিদক, সবর, ইহসান, যিকর, শোকর, কর্তব্যপরায়ণতা এবং হালাল জীবিকা গ্রহণ। বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করলে এ ক্ষেত্রে ইসলামী আধ্যাত্মিকতার স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

Dhaka University Institutional Repository

তাকওয়া

تقوى (তাকওয়া) শব্দটি وقى (ওয়াকিউন) শব্দমূল থেকে নিষ্পন্ন। এর শাব্দিক অর্থ রক্ষা করা, বিরত থাকা, বাঁচিয়ে রাখা। কুরআন মাজীদে এ অর্থেই বলা হয়েছে – وقنا عذاب النار 'আমাদেরকে আগুন থেকে রক্ষা কর, বাঁচিয়ে রাখ। তাকওয়ার মূল অর্থ আত্মরক্ষা করা। শব্দটি আত্মশুদ্ধি লাভ করা, সংযত ও সতর্ক হওয়া, অমঙ্গল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা বা কোনো খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে তাকওয়া বলতে বুঝায় আল্লাহ ভীতি।

ইবন কাছীর বলেন – তাকওয়ার অর্থ হল খারাপ কাজ হতে বেঁচে থাকা। মূলত এটা ছিল الوقاية ও وقوى[৬৫২]

উমর (রা) উবাই ইবন কা'বকে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন – আপনি কি কাঁটা ভরা পথে চলেছেন? তিনি জবাবে বললেন – হ্যাঁ। উবাই প্রশ্ন করলেন – তখন আপনি কী করেন? তিনি উত্তর দিলেন – সতর্কতার সাথে কাঁটার আঁচড় থেকে শরীর ও কাপড় বাঁচিয়ে চলি। উবাই বললেন – এটাই তাকওয়া।[৬৫৩]

পরিভাষায়, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও ভালবাসা হারানো আর পরিণামে চিরস্থায়ী ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কায় সব রকমের পাপাচার ও অন্যায় থেকে বিরত থাকাকে তাকওয়া বলে।

বলা যায়, আখিরাতের জীবনে ক্ষতিকর বিবেচিত হয়, আখিরাতে শাস্তি ও দুর্দশার কারণ হতে পারে – এমন সব রকমের বস্তু ও বিষয় থেকে বিরত থাকাই তাকওয়া।

আবূ দারদা বলেন – 'মানুষের কামনা যে, তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হোক। কিন্তু আল্লাহ যা চান না, তা হয় না। মানুষ বলতে থাকে – আমার স্বার্থ, আমার সম্পদ। অথচ সকল স্বার্থ ও সম্পদের চেয়ে তাকওয়া উত্তম।[৬৫৪]

আবূ উমামা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – মানুষের সেরা উপকারী তাকওয়া এরপর নেককার স্ত্রী। স্বামী তাকে দেখলে তৃপ্ত হয়। তাকে সে হুকুম করলে তামিল করে। কোন কসম করলে তা পূর্ণ করে। স্বামীর অবর্তমানে তার সম্পদ ও নিজের সতীত্বকে হিফাযত করে।[৬৫৫]

মূলত তাকওয়া একটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক বিষয়। এর সকল কিছুর সম্পর্ক মানুষের অন্তরের সাথে। আল্লাহর ভয় বা ভালবাসা পোষণের বিষয়টি মানুষের জীবনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের কাজ সংশোধিত করা, অন্যায় থেকে বাঁচিয়ে রাখা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে তাকওয়ার আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত কার্যকর।

তাকওয়া মূলত আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং আত্মশুদ্ধি লাভ করার জন্যে একটি বিন্যস্ত পথপরিক্রমা। এর ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে। তাকওয়ার প্রথম স্তর বাদ দিয়ে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের অনুশীলন করার সুযোগ নেই। সাধারণত এর অনুশীলনের স্তর তিনটি।

তাকওয়ার প্রথম স্তরে ব্যক্তিকে শিরক, কুফরী, মুনাফিকী, নাফরমানী প্রভৃতি আল্লাহদ্রোহিতামূলক কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়। এটি মূলত ঈমান নবায়নের স্তর। এ স্তরের প্রথম কাজ ঈমান গ্রহণ করা। তারপর ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল ও আকীদা শুদ্ধ করা, আল্লাহ নির্দেশিত সকল ফরয ও ওয়াজিব কাজ সম্পাদন করা এবং নিষ্ঠার সাথে সকল হারাম কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। এক্ষেত্রে বিন্দু পরিমাণ নিষ্ঠার কমতি হলে তাকওয়ার পরবর্তী স্তরে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে না।

প্রথম স্তরের নিষ্ঠাপূর্ণ অনুশীলনের পর ব্যক্তি দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হয়। এ স্তরে এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে হয় যে কাজ গুনাহের কাজে লিপ্ত করে বা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার জন্য উৎসাহ দেয়। হয়তো সে কাজ নিষিদ্ধ নয় অথবা

---

[৬৫২] ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৭
[৬৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ.১২৮
[৬৫৪] প্রাগুক্ত
[৬৫৫] প্রাগুক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

নিষিদ্ধতায় তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় নি। তাকওয়ার দ্বিতীয় স্তরে ব্যক্তি এ সকল কাজও পরিহার করবে যদি তাতে লিপ্ত হলে কোন বড় গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

তাকওয়ার চূড়ান্ত স্তরে এমন সব হালাল কথা, কাজ ও বস্তু থেকে ব্যক্তি নিজেকে বিরত রাখবে যা না হলেও চলে বা জীবনযাপনের জন্যে যা ততটা অনিবার্য নয়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছে, "একজন মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য এটাই যে, সে সকল বাহুল্য বর্জন করবে।" তৃতীয় সোপানে আরোহণের জন্যে প্রথম ও দ্বিতীয় সোপানের নিষ্ঠাপূর্ণ অনুশীলন অনিবার্য। পূর্ববর্তী দুটি সোপানের অনুশীলন ছাড়া তৃতীয় সোপানের অনুশীলন অর্থহীন।

প্রাথমিকভাবে তাকওয়ার চারটি সোপান বা স্তর রয়েছে। এগুলো হল –

প্রথম পর্যায়ে ব্যক্তি ইসলামী শরীআতে নিষিদ্ধ সকল হারাম কথা, কাজ, বিষয় ও বস্তু থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। যেমন-মদপান, মিথ্যা বলা, ঘুষ খাওয়া, অশালীন আলোচনা, অবৈধ যৌন সম্পর্ক প্রভৃতি। তাকওয়ার এ স্তরের অনুশীলনকারী ব্যক্তিকে বলা 'মুমিন'।

তাকওয়ায় দ্বিতীয় সোপান হল এমন হালাল কথা, কাজ, বিষয় ও বস্তু বর্জনের স্তর, যে যে গুলোর হালাল হাওয়া সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। কেননা, সন্দেহযুক্ত হালাল বর্জন না করলে সন্দেহাতীতভাবে হারাম থেকে মুক্ত থাকা যায় না। বরং এতে হারামে নিপতিত হওয়ারই আশঙ্কা থাকে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন – دع ما يريبك الى مالا يريبك – 'যা সন্দেহযুক্ত তা বর্জন কর। যা সন্দেহমুক্ত তা গ্রহণ কর।'[৬৫৬] দ্বিতীয় স্তরের তাকওয়া অনুশীলনকারী ব্যক্তিকে বলা হয় 'সুলাহা'।

তাকওয়ার তৃতীয় স্তরে যে কথা, কাজ, বস্তু ও বিষয়ের হালাল হওয়া সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত, তবে জীবনের জন্যে যা অপরিহার্য নয় তা বর্জনের কথা বলা হয়। যেমন – অতিরিক্ত সুস্বাদু ও দামি খাবার বা পোশাক বর্জন করা। এ স্তরের তাকওয়া অনুশীলনকারী হল 'আতকিয়া'।

তাকওয়া অনুশীলনের চূড়ান্ত স্তরে ব্যক্তি এমন সব হালাল কথা, কাজ, বস্তু ও বিষয় বর্জন করবেন – যার হালাল হওয়া সন্দেহমুক্ত। কিন্তু তা ইবাদতে সহায়তা করে না, ইবাদতে উৎসাহ সৃষ্টি করে না। ইবাদতে অসহযোগী হালাল সমূহ যিনি বর্জন করেন তাকে বলা হয় 'সিদ্দিকীন'।

তাকওয়ার গুণে গুনান্বিত ব্যক্তি হলেন মুত্তাকী। তাঁর মধ্যে তাকওয়া বিদ্যমান থাকে। তিনি অবশ্যই মুমিন হন এবং আল্লাহ তাআলা ও রাসূলুল্লাহ (সা) এর নির্দেশের আনুগত্য করেন। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের পরিচয় দিয়ে বলেছেন– '(মুত্তাকী তারা) যারা গায়বে ঈমান আনে, সালাত কায়িম করে ও তাদেরকে যে রিযক দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে। যারা তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও তোমার আগে যা নাযিল হয়েছিল তাতে ঈমান আনে এবং আখিরাতে ইয়াকীন পোষণ করে। তারাই তাদের রবের নির্দেশিত পথে রয়েছে। তারাই সফলকাম।'[৬৫৭]

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – একজন মানুষ তখনই মুত্তাকী বলে গণ্য হবে যখন সে পাপ কাজের ভয়ে পাপ কাজের কাছাকাছি কাজসমূহও পরিহার করবে।[৬৫৮]

আবূ আফীফ সূত্রে মুআয ইবন জাবাল (রা) বলেন – যারা শিরক ও মূর্তি পূজা হতে বেঁচে থাকে এবং নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করে তারাই মুত্তাকী।[৬৫৯]

---

৬৫৬ সুলায়মান ইবন আশআছ আস সিজিস্তানী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান

৬৫৭ আল কুরআন / ২ : ২–৫

৬৫৮ ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৬

৬৫৯ প্রাগুক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

মূলত মুত্তাকী হলেন এমন ব্যক্তি যিনি আল্লাহ তাআলার সকল বিধি বিধান মেনে চলেন। যার জীবনে ইসলাম বাস্তবরূপ লাভ করে। মুত্তাকী ব্যক্তির জীবনধারায় ইসলাম ছাড়া অন্যকোন বিধান বা আইনকানুনের অনুশীলন থাকে না, অনুসরণ থাকে না।

ইসলাম যে আধ্যাত্মিকতার পরিকল্পনা পেশ করে তার প্রধান উপজীব্য বিষয় হল তাকওয়া। একে ঘিরেই ইসলামের সকল আধ্যাত্মিক কার্যক্রম আবর্তিত হয়। ইসলামী জীবনদর্শনে সকল সৎগুণের মূল হল তাকওয়া। ব্যক্তির উন্নত চরিত্র গঠন ও সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে তাকওয়া সুদৃঢ় দুর্গস্বরূপ। ব্যক্তিগত জীবনে তাকওয়ার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ব্যক্তি সমাজের ক্ষুদ্রতম কিন্তু সবচেয়ে অনিবার্য অংশ। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের ভাল বা খারাপ হওয়ার উপরে তাই সমাজের ভাল বা খারাপ হওয়া নির্ভর করে। এ জন্যে আদর্শ সমাজ বলতে আদর্শ মানুষের সমাজ বুঝায়। তাকওয়া ব্যক্তিকে আদর্শ ও সৎ মানুষে পরিণত করে। ব্যক্তিজীবনের মত সমাজজীবনেও তাই তাকওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়।

তাকওয়া ব্যক্তিকে সকল ভাল কাজ করার উৎসাহ দেয়। তাকে আল্লাহভীরু করে, আল্লাহপ্রেমিকে পরিণত করে। আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের জন্য ব্যক্তির শরীর-মন প্রস্তুত থাকে। আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন ভাল কাজে, মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলকর কাজে। তাকওয়ার কারণে ব্যক্তি তাই এ সকল কাজে আত্মনিয়োগ করে।

চরিত্র অমূল্য সম্পদ। মানুষ তখনই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে পরিণত হয় – যখন তার চরিত্র সুন্দর হয়। উন্নত নৈতিকতা ছাড়া মানুষ সৎ ও সফল মানুষ হতে পারে না। তাকওয়া মানুষের চরিত্র সুন্দর করে। তার মধ্যে আল্লাহর গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়। তার চরিত্রে আল্লাহর চরিত্র ফুটে ওঠে। সে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হয়ে আশরাফুল মাখলুকাত হয়ে ওঠে।

তাকওয়ার অনুশীলন হল আল্লাহকে ভালবাসার সবচেয়ে বড় অনুশীলন। এর মাধ্যমে ব্যক্তি সবকিছুর চেয়ে, সবার চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভালবাসার অভ্যাস গড়ে তোলার সাধনা করে। তাঁর বিধান মেনে আনুগত্যে – নিষ্ঠায় নিজেকে উজার করে দেয়ার অনুশীলন করে। আর আল্লাহকে যে ভালবাসে আল্লাহ তাআলা তাঁকে ভালবাসেন। আল্লাহ তাআলাও তাঁর ভালবাসার স্বীকৃতি দিয়ে বলেন --

ان الله يحب المتقين – 'আল্লাহ নিশ্চয়ই ভালবাসেন তাকওয়াবানদের।'[৬৬০]

তাকওয়া মানুষকে আল্লাহর সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভে ধন্য করে। তার অন্তর আল্লাহ প্রেম ও আনুগত্যে বিহ্বল থাকে। এজন্যে আল্লাহ তাআলা তাকে তাঁর সান্নিধ্য ও নৈকট্য দিয়ে ধন্য করেন। কুরআন মাজীদে এসেছে –

واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين

'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আছেন মুত্তাকীদের সাথে।'[৬৬১]

আল্লাহ তাআলা বলেন – নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে ঝর্ণাধারাবিশিষ্ট জান্নাতে। সেখানে তারা যথাযোগ্য আসনে সমাসীন হবে, থাকবে মহান আল্লাহর নিবিড় সান্নিধ্যে।[৬৬২]

তাকওয়াহীন ইবাদত মূল্যহীন এবং কবুলের অযোগ্য। আল্লাহভীতি, প্রেম ও নিষ্ঠাসহ যে ইবাদত সম্পন্ন হয় আল্লাহ তা কবুল করেন। আল্লাহর নিকট ইবাদতের বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতার কোন গুরুত্ব নেই। তিনি লক্ষ রাখেন মানুষের মনের দিকে। পর্যবেক্ষণ করেন তার নিষ্ঠা ও তাকওয়া। কবুল করেন তার তাকওয়া। সেজন্যে তাকওয়া হল ইবাদত কবুলের মাপকাঠি। আল্লাহ তাআলা বলেন –

---

[৬৬০] আল কুরআন / ৯ : ৪

[৬৬১] আল কুরআন / ২ :১৯৪

[৬৬২] আল কুরআন / ৫৪:৫৪-৫৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

لن ينال الله لحومها ولادمائها ولكن يناله التقوى منكم

'আল্লাহর নিকট কুরবানীর গোকত পৌঁছায় না। পৌঁছে না তার রক্ত। বরং তাঁর নিকট পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া।'[৬৬৩]

তাকওয়া মানুষের পাপমুক্ত জীবনযাপনের নিশ্চয়তা দেয়। কেননা, তাকওয়া তার মধ্যে আল্লাহর উপস্থিতির চেতনা সৃষ্টি করে। গোপনে, নিভৃতে এমনকি একাকী থাকলেও কোন অন্যায় সে করতে পারে না। সে জানে কেউ না দেখলেও আল্লাহ তাআলা তাকে দেখেন। আল্লাহর নিকট থেকে কোন কিছুই গোপন রাখা যায় না। মুত্তাকী আল্লাহর এ ক্ষমতায় সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখে বলেই সে পাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

তাকওয়া ছাড়া ঈমানের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। বলা যায়, তাকওয়াই ঈমান। কেননা, তাকওয়ার প্রথম স্তর হল ঈমান আনার স্তর। তাকওয়ার দ্বিতীয় স্তর বা সাধারণ সোপান হল আল্লাহর হুকুম আহকামের নিঃশর্ত আনুগত্য। বস্তুত কালিমা তায়্যিবা ও দীনী আমল সম্পাদন ছাড়া যেমন মুমিন থাকা যায় না তেমনি ঈমান পূর্ণতা পায় না তাকওয়া ছাড়া। তাই তাকওয়াহীনতা মূলত ঈমানহীনতা।

সাধারণভাবে সকল মানুষ মানবিক অধিকার ও মর্যাদায় সমান। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'কোন অনারবের ওপর আরবের বা কোন আরবের ওপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমরা সবাই আদমসন্তান আর আদম মাটি থেকে তৈরী।' তাকওয়া সাধারণভাবে মানুষের এ মর্যাদায় বিশেষত্ব আরোপ করে। তাকওয়ার বদৌলাতে মুত্তাকী আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা লাভ করে। কুরআনে এসেছে –

ان اكرمكم عند الله اتقاكم

'তোমাদের মধ্যে যে বেশি তাকওয়াবান, সুনিশ্চিতভাবেই আল্লাহর নিকট সে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি।'[৬৬৪]

তাকওয়ার অনুশীলন ব্যক্তির জান্নাত লাভ নিশ্চিত করে। আল্লাহ বলেন – 'আর যে ব্যক্তি তার রবের নিকট উপস্থিত হওয়ার ভয় পোষণ করে এবং নিজেকে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বাঁচিয়ে রাখে নিশ্চয় জান্নাতই হবে তার বাসস্থান।'[৬৬৫]

অনত্র ইরশাদ হয়েছে – ولمن خاف مقام ربه جنتان

'আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখে তার জন্যে রয়েছে দুটি জান্নাত।'[৬৬৬]

তাকওয়ার তাৎপর্য হল আল্লাহর আদেশ নিষেধ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে মেনে চলা। আর আল্লাহর নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য ছাড়া জান্নাত লাভ করা যায় না।

তাকওয়া অনুশীলনের ফলে ব্যক্তি আল্লাহর পথে চলার সঠিক নির্দেশনা পায়। সে এ পথে সুদৃঢ় থাকে এবং পরিণামে দুনিয়াতে ও আখিরাতে সাফল্য লাভ করে। আল্লাহ বলেন – ان للمتقين مفازا

'নিশ্চয় তাকওয়াবানদের জন্যে রয়েছে সফলতা।'[৬৬৭]

ইরশাদ হয়েছে – ''তারা (মুত্তাকীরা) তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং তারাই সাফল্য লাভকারী।'[৬৬৮]

আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধ মেনে ইবাদত সম্পাদন করলে ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তির কবল থেকে মুক্তি পায়। তার আত্মা শুদ্ধ ও পবিত্র হয়। আবার তাকওয়ার ফলে ব্যক্তি আল্লাহর অসীম ক্ষমতায় বিশ্বাস স্থাপন করে। ফলে সে কেবল

---

[৬৬৩] আল কুরআন / ২২ :৩৭
[৬৬৪] আল কুরআন / ৪৯ :১৩
[৬৬৫] আল কুরআন / ৭৯ :৪০-৪১
[৬৬৬] আল কুরআন / ৫৫ :৪৬
[৬৬৭] আল কুরআন / ৭৮ :৩১
[৬৬৮] আল কুরআন / ২ : ৫

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহকে ভয় পায়, অন্য কাউকে ভয় পায় না। আল্লাহর অসীম ক্ষমতায় বিশ্বাসের জন্যে তার আত্মার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সে সুদৃঢ় ও পবিত্র মনোবলের অধিকারী হয়।

তাকওয়া মানুষকে নিষ্ঠাপূর্ণভাবে দায়িত্ব পালনের প্রেরণা দেয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি হয়, দায়িত্ববোধ বেড়ে যায়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ কর্তব্য সম্পাদনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাকওয়া অনুশীলনের ফলে ব্যক্তির মনে আখিরাতে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার তীব্র চেতনা সক্রিয় হয়ে ওঠে। সে জন্যে তাকওয়াবান ব্যক্তি একনিষ্ঠ, আন্তরিক, সৎ ও দায়িত্বশীল হয়।

তাকওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার অমিয় নূর বা জ্যোতি লাভ করে। তার অন্তর পবিত্র আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। তাকওয়া অনুশীলনের জন্যে আল্লাহ তাআলা তাকওয়াবান লোকদের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। কুরআন মাজীদে আছে – 'মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি নিজ অনুগ্রহে দ্বিগুন অংশ তোমাদেরকে দেবেন। তোমাদের দেবেন জ্যোতি যার সাহায্যে তোমরা চলবে আর তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।[৬৬৯]

তাকওয়া সকল গুণাবলীর মূল এবং সকল সদাচারের প্রধান উৎস। তাকওয়ার অনুশীলন মানুষকে সৎ, সুশীল, শোভন ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলে। যার ফলে তাকওয়াবান মানুষ সমাজের সবার ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়।

যে সমাজ তাকওয়ার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, সে সমাজের ওপর আল্লাহ তাআলার বিশেষ বরকত ও কল্যাণ নাযিল হয়। তাকওয়া সমাজে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিখুঁত শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। কেননা, আল্লাহ তাআলা শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। তাকওয়াবান মানুষ আল্লাহ তাআলার এ সকল নির্দেশের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য পোষণ করে। ফলে সে শান্তি বিঘ্নিত হয় বা শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয় এমন কোন কাজ করে না।

তাকওয়া সমাজে ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করে। কেননা, তাকওয়াবান মানুষ জানে তার কাজকর্মের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা হলেন আল্লাহ তাআলা। আর তিনি নিজে ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে – اعدلوا هو اقرب للتقوى 'তোমরা ন্যায়বিচার কর। কেননা, তা তাকওয়ার অত্যন্ত নিকটবর্তী।[৬৭০]

অন্যত্র বলা হয়েছে – واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل

'আর যখন তোমরা লোকদের মধ্যে বিচার ফায়সালা করবে তখন তা করবে ন্যায়নীতির সাথে।[৬৭১]

তাকওয়া ব্যক্তির মধ্যে এ নির্দেশনা ও বোধ সবসময় সক্রিয় রাখে। ফলে সে সুবিচার করে। পরিণতিতে সামাজিকভাবে ন্যায়নীতি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা পায়।

সমাজের সদস্যদের মধ্যে তাকওয়া দায়িত্বশীলতা ও নিষ্ঠা তৈরী করে। ব্যক্তি স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের দায়িত্বটুকু বুঝে নেয় এবং আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে। সমাজের প্রতিজন লোকের এ রকম মানসিকতা ও উদ্যোগ সমাজকে কর্মমুখর ও অগ্রসর করে। এভাবে তাকওয়া সর্বজনীন ও সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়নের কারণে পরিণত হয়।

তাকওয়া ব্যক্তিকে মিথ্যাচার ও প্রতারণা থেকে দূরে রাখে। একজন অন্যজনকে ঠকানোর বা ধোঁকা দেয়ার প্রবণতা নির্মূল করে। আল্লাহ সর্বদ্রষ্টা বলে তাকওয়াবান মানুষ অন্যের ওপর গোপনে বা প্রকাশ্যে নিপীড়ন চালায় না। কারো

---

[৬৬৯] আল কুরআন / ৫৭ :২৮
[৬৭০] আল কুরআন / ৫ :৮
[৬৭১] আল কুরআন / ৪:৫৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

জীবনহানির আশঙ্কা সৃষ্টি অথবা কেউ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে এমন কাজ করে না। ফলে সমাজের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও নিরাপত্তাবোধ তৈরী হয়।

সমাজে সন্ত্রাস, মাদকাসক্তি, চুরি-ডাকাতি, ব্যভিচার, অবিচার, জুয়া, প্রতারণা, সুদ, ঘুষ, ফিৎনা, ফাসাদ, নারী নির্যাতন প্রভৃতি অনাচারে স্বাভাবিক মানবজীবন ব্যাহত হয়। তাকওয়া লোকদেরকে এ সকল অনাচার প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালানোর বাধ্যবাধকতা আরোপ করে।

তাকওয়া সমাজের লোকদের মধ্যে বিভিন্ন মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে। তাদের মধ্যে উন্নত নৈতিক গুণাবলীর অনুশীলন বৃদ্ধি পায়। তাকওয়ার ফলে মানুষের সম্প্রীতি, ঐক্য ও সহানুভূতিপূর্ণ মানসিকতা তৈরী হয়। পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার এক কাঙ্ক্ষিত মানবিক পরিবেশ গড়ে ওঠে।

সমাজের সুনাগরিক তৈরীর ক্ষেত্রেও তাকওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, তাকওয়ার চেতনা ও শিক্ষা ব্যক্তিকে দেশপ্রেমিক ও দায়িত্বশীল করে তোলে। দেশ ও জনগণের স্বার্থে সে নিজের মেধা ও যোগ্যতা নিবেদন করে।

সুষ্ঠু, সুন্দর ও কাঙ্ক্ষিত সমাজ গঠনে তাকওয়ার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাকওয়াবান মানুষ অন্যায়, অবিচার ও পাপাচারমুক্ত জীবনযাপন করে। তাকওয়ার চেতনায় তারা কেবল নিজেরাই অপরাধমুক্ত থাকে না বরং অন্যদেরকেও পাপাচারমুক্ত রাখার চেষ্টা করে। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার ও রাখার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। ফলে সুষ্ঠু ও সুন্দর মানবসমাজ গড়ে ওঠে।

তাকওয়া ব্যক্তির মধ্যে কেবল আল্লাহকে ভয় করার ও ভালবাসার চেতনা গড়ে তোলে। সে পৃথিবীর কাউকে পরোয়া করে না। তাকওয়াবান লোকদের সমাজ স্বাধীন থাকে। তারা পরাধীনতা ও অধিকারহরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়।

বস্তুত ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে তাকওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া। তাকওয়া অবলম্বন ছাড়া একজন মানুষের পক্ষে কোন ধরনের খারাপ কাজ থেকেই বিরত থাকা সম্ভব না। ব্যক্তির মধ্যে তাকওয়ার উপলব্ধি প্রবল থাকলেই কেবল তার পক্ষে সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য পাপ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয়। কাজেই আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য কেউ যদি তাকওয়া বাদ দিয়ে অন্য কোন কিছু অর্জনের সাধনায় লিপ্ত হয় তাহলে সহজেই বুঝে নিতে হবে যে, তার সাধনা সঠিক নয়। বরং সে সাধনার নামে ভণ্ডামি করে লোকদের চোখে ধোঁকা দিয়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করে নিচ্ছে। প্রকৃত সাধনা কেবল তাকওয়া অর্জনের জন্যই হতে পারে।

দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠত্ব, ভালবাসা, সম্মান ও সাফল্য লাভের জন্যে যেমন তেমনি আখিরাতেও সফলতা ও কল্যাণ পাওয়ার জন্যে তাকওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাকওয়াহীন দুনিয়ার জীবনে মানুষ লাঞ্ছনা ও ব্যর্থতার শিকার হয়। তার আখিরাতের জীবনেও নেমে আসে অন্তহীন দুর্ভাগ্য ও অসাফল্য।

তাকওয়া না থাকলে মানুষ পাপপ্রবণ হয়ে ওঠে। তার মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকে না। সে বিনাদ্বিধায় পাপকাজে লিপ্ত হয়। কেননা, সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ যে সবকিছু দেখেন সেই ভয় তার মধ্যে সক্রিয় থাকে না। এক সময় অন্যায় করাই তার অভ্যাসে পরিণত হয়। কেননা - ان النفس لامارة بالسوء - নিশ্চয় প্রত্যেক মানব মনই মন্দ কাজের আদেশদাতা।[৬৭২]

তাকওয়া হল ইবাদতের প্রাণ। তাকওয়া ছাড়া কোন ইবাদতই যথাযথ হয় না। তা অন্তঃসারশূন্য নিছক আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়। আল্লাহ তাআলার নিকট ইবাদতের আনুষ্ঠানিকতা একেবারেই মূল্যহীন। তিনি ইবাদতের বাহ্যিকরূপ কবুল করেন না। তার নিকট বিবেচ্য বিষয় হল তাকওয়া। সে জন্যে তাকওয়াহীন ইবাদত কুবল হয় না।

---

[৬৭২] আল কুরআন / ১২ :৫৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা) এজন্যেই বলেছেন – انما الاعمال بالنيات – নিশ্চয় নিয়তের উপরেই কর্মের ফলাফল নির্ভরশীল।[৬৭৩]

তাকওয়া না থাকলে আল্লাহর ভয় থাকে না। আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতায় বিশ্বাস থাকে না। ফলে ব্যক্তি সবকিছুকেই ভয় পায়। সে আল্লাহ ছাড়া আরো অসংখ্য সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। নানারকম প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক বিষয়কে নিজের উপাস্য বানিয়ে তার নিকট মাথা নত করে। অথচ মানুষ হল আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা। অংসখ্য সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস এবং অক্ষম সৃষ্টির কাছে মাথা নত করে সে তার মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে। তাকওয়াহীনতাই ব্যক্তিকে এ অমার্যাদাকর জীবনে ঠেলে দেয়।

তাকওয়াহীন দুনিয়ার জীবন অশান্তি ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হয়। তাকওয়াহীনতা ব্যক্তিকে আইন ভাংতে ও ফিৎনা ফাসাদ, ঝগড়া বিবাদ প্রভৃতি সৃষ্টিতে উৎসাহ দেয়। মানুষ পরমতসহিষ্ণুতার আদর্শ পরিত্যাগ করে। বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি যে ভয়াবহ অন্যায় এবং এর ফলে যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি লাভ অনিবার্য হয়ে পড়ে তাকওয়াহীন মানুষ তা বিবেচনা করে না। ফলে জীবন অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার বিষবাষ্পে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

তাকওয়াহীন জীবনযাপন মানুষের সকল মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে। তার মধ্যে ঐক্য, সম্প্রীতি, সহানুভূতি, সহমর্মিতা প্রভৃতি বোধ লোপ পায়। তাকওয়াহীন জীবনে তার সুকুমারবৃত্তি ও কোমল মনোভাব বিধ্বস্তঃ হয়ে পড়ে।

তাকওয়াবিহীন ব্যক্তি দায়িত্বশীল হয় না। জবাবদিহিতার ভয় না থাকায় মিথ্যাচার, প্রতারণাসহ যে কোন রকমের অপকর্ম করতে তার দ্বিধা থাকে না। যে জন্যে সমাজের লোকদের কাছে তাকওয়াহীন ব্যক্তির গ্রহণীয়তা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা বলতে কিছু থাকে না। সবাই তাকে অবিশ্বাস ও ঘৃণার চোখে দেখে।

তাকওয়াহীন দুনিয়া জীবনের সবচেয়ে খারাপ পরিণতি হল এর ফলে অন্যায় ও অবিচারের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। মানুষ আল্লাহকে ভয় পায় না। আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তির পরোয়া করে না। ন্যায়নীতি ও সুবিচারের পরিবর্তে মানুষের জীবনে অবিচার ও যুলম স্থান করে নেয়।

তাকওয়া ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয় না। কেননা, তাকওয়াই মুলত ঈমান। আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও নিআমতে দৃঢ় বিশ্বাস থেকেই তাকওয়া সৃষ্টি হয়। যে জন্যে তাকওয়াহীনতার অর্থ হল আল্লাহর ক্ষমতা ও নিয়ামতে অবিশ্বাস। সে জন্যে যার মধ্যে তাকওয়া নেই, প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে ঈমানও নেই।

তাকওয়াহীনতা মানুষের মানসিক ক্ষমতা, দৃঢ়তা ও শক্তি ধ্বংস করে। ব্যক্তির মনে আল্লাহর ভয় না থাকায় অন্য হাজারো ভয় স্থান করে নেয়। এমনকি যে সকল প্রাণী, উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক নৈসর্গিক বিষয় আল্লাহ তাআলা মানুষের ভোগের জন্যে সৃষ্টি করেছেন; তাকেও সে ভয় করতে থাকে। এ অর্থহীন অযৌক্তিক ভয় মানুষকে দুর্বল ও স্খলিত নৈতিকতাসম্পন্ন করে তোলে।

তাকওয়াহীন জীবযাপনের আখিরাতের পরিণতি হল এর ফলে ব্যক্তির জান্নাত লাভের কোন সম্ভাবনা থাকে না। কেননা, তাকওয়াহীন মানুষ হয় ঈমানহীন ও পাপাচারী। তার মধ্যে ইসলামী আখলাক থাকে না। সে ইসলামী বিধিবিধান মেনে চলে না। তাকওয়াহীন ব্যক্তির নিকট আখিরাতের জীবনের চেয়ে পৃথিবীর জীবনই বেশি কাম্য। সবসময় আখিরাতের ওপর সে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়। যে জন্যে এমন ব্যক্তির চিরস্থায়ী ঠিকানা হয় জাহান্নামে। আল্লাহ তাআলা বলেন – فاما من طغى واثر الحيوة الدنيا فان الجحيم هى الماوى 'তারপর যে ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করেছে এবং দুনিয়া জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে জাহান্নামই তার উপযুক্ত আবাস।[৬৭৪]

---

[৬৭৩] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ওহী

[৬৭৪] আল কুরআন / ৭৯ :৩৭–৩৯

Dhaka University Institutional Repository

সিদক ও কিযব

সিদক (صدق) আরবি পরিভাষা। অর্থ সত্যবাদিতা। সাধারণভাবে সত্য বলার অভ্যাস কিংবা অভ্যন্তরূপে সত্য বলাকে সত্যবাদিতা বলা হয়। তাকওয়ার সুপ্রভাবে মুত্তাকীর আচরণে যে সকল সুন্দরতম গুণ প্রতিফলিত হয়ে ওঠে সিদক তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান। বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করা হল সিদক। কোন বস্তু, বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে অবিকৃত বর্ণনা, কোন রকম অদল বদল ও পরিবর্তন-পরিবর্ধনহীন বিবরণ উপস্থাপনকেও সিদক বলে। যে ব্যক্তি সিদক বা সত্যবাদিতার গুণে গুণান্বিত তাকে বলে সাদিক বা সত্যবাদী। আর যে ব্যক্তি সত্যবাদিতার পরমসীমায় উত্তীর্ণ হয়েছে তাকে বলা হয় সিদ্দীক বা পরম সত্যবাদী। যেমন আবূ বকর (রা) কে 'সিদ্দীক' বলা হয়।

আধ্যাত্মিক সাধনায়, আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনে সিদক একটি অব্যর্থ ব্যবস্থাপনা। দুনিয়া ও আখিরাতে সিদক পরম উপকারী গুণ। একজন মানুষের প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠা এবং তার সাফল্য ও ব্যর্থতা পুরোপুরি সিদকের ওপর নির্ভর করে। সিদক অনুশীলন ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে সৎ কাজ করা বা সৎ কাজে আদেশ দেয়ার বিষয়টি নিতান্তই হাস্যকর এবং বিভ্রান্তিকর। এ জন্য আল্লাহ তাআলার প্রেরিত পুরুষ সকল নবী-রাসূল অনিবার্যভাবে ছিলেন সিদকের অনুশীলনকারী। মহানবী (সা) আইয়ামে জাহিলিয়ার প্রতিকূল সময়ে শুধু এই একটি গুণের জন্যই সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিলেন।

সিদক বা সত্যবাদিতায় মানবজীবনের প্রকৃত মুক্তি ও সাফল্য আসে। ব্যক্তি বিবেকবিরোধী ও বাস্তবতা বিবর্জিত কথা বলা ও কাজ করার গ্লানি থেকে মুক্তি লাভ করে। সত্যবাদী চিরন্তন ধ্বংস ও ক্ষতির হাত থেকে সিদকের মাধ্যমেই মুক্তি লাভ করে।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সিদক বা সত্যবাদিতার অনুশীলনের আদেশ দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন – 'মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্য কথা বল।'[৬৭৫]
সত্যবাদিতায় ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ এ ফরয কাজটিতে আঞ্জাম দেয় এবং মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন করে।

সিদক মানুষের আখিরাতের জীবন সুখময় ও সফল হওয়ার নিশ্চয়তা দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন 'সত্যবাদীদের জন্যে রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।'[৬৭৬]
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন – 'তোমাদের সত্য কথা বলা উচিত। কেননা, সত্যবাদিতা পুণ্যের পথে পরিচালিত করে। আর পুণ্য পরিচালিত করে জান্নাতের পথে।'[৬৭৭]

সত্যবাদিতায় আমল সংশোধিত হয়। ব্যক্তি যে সকল কাজ করে তাতে মানুষের সহজাত দুর্বলতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন ত্রুটি থেকে যায়। ব্যক্তি সিদকে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে এর কারণে আল্লাহ তাআলা তার আমলগত এ সকল ত্রুটিবিচ্যুতি অনুগ্রহ করে সংশোধন করে দেন। আল্লাহ বলেন – 'তোমরা সত্য কথা বল। এতে তোমাদের আমলসমূহ সংশোধিত হবে।'[৬৭৮]

সিদক মানুষকে পৃথিবীর জীবনে সাফল্য এনে দেয়। যারা সিদকের ভিত্তিতে সৎ ও সুন্দর জীবনযাপন করে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্যে চিরস্থায়ী পরম সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বলেছেন – 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।'[৬৭৯]
আল্লাহ তাআলা আরো বলেন – 'আজতো সেই দিন, যেদিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা উপকার করবে।'[৬৮০]

---

[৬৭৫] আল কুরআন / ৩৩ :৭০
[৬৭৬] আল কুরআন / ৫ :১১৯
[৬৭৭] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব
[৬৭৮] আল কুরআন / ৩৩ :৭০-৭১
[৬৭৯] আল কুরআন / ৩৩ :৭১
[৬৮০] আল কুরআন / ৫ :১১৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

সিদক বা সত্যবাদিতা আল্লাহর অন্যতম গুণ। যে জন্যে কেউ সিদকে অভ্যস্ত হলে আল্লাহ তাআলা তার ওপর সন্তুষ্ট হন। তাদেরকে বিপুল পুরস্কারে ভূষিত করেন। যে জন্যে সত্যবাদীরাও আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট থাকে। কুরআনে এসেছে, 'আল্লাহ তাআলা সত্যবাদীদের ওপর সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর ওপর সন্তুষ্ট। আর এটা হচ্ছে বিরাট সাফল্য।[৬৮১]

সাধারণভাবে মানুষ অপরাধপ্রবণ। স্বাভাবিক বিবেচনায় তারা সকলে তাই সাধারণ ক্ষতির আওতাভুক্ত। সত্যবাদিতার অনুশীলন এবং অপরকে সত্যের অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ করার পরিণতিতে ব্যক্তি এ ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন – 'সময়ের শপথ, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে। তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং একে অপরকে উপদেশ দিয়েছে সত্যের, তাগিদ দিয়েছে ধৈর্যধারণের।[৬৮২]

সিদক মানুষের পাপ মোচনে সহায়ক। আল্লাহ তাআলা সত্যবাদিতার জন্যে সত্যবাদীদের অপরাধসমূহ মোচন করে দেন। তাদের পাপসমূহ ক্ষমা করেন। কুরআনে এসেছে – 'আর আল্লাহ তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন।[৬৮৩]

সিদক মানুষকে সামাজিকভাবে সম্মানিত করে। যে সত্য কথা বলে বা সত্যের অনুশীলন করে সমাজের সকল লোক তাকে ভালবাসে ও বিশ্বাস করে। যে কোন ক্ষেত্রে তার ওপর আস্থা রাখে। রাসূলুল্লাহ (সা) বাল্যকাল থেকেই সিদকের বাস্তব প্রতিকৃতি। কেবল সত্যবাদিতার জন্যেই আইয়ামে জাহিলিয়ার বিপন্ন যুগে তিনি সবার প্রিয় ছিলেন। পেয়েছিলের আল আমীন বা বিশ্বাসী উপাধি।

সিদক বা সত্যবাদিতার অনুশীলন মূলত ইলামেরই অনুশীলন। এর মাধ্যমে ইসলামী বিধিবিধানের সর্বাধিক অনুশীলন সম্পন্ন হয়। কেননা সকল সত্যের মূল ভিত্তি হল ইসলাম। একমাত্র ইসলামই সত্য। এছাড়া আর সবকিছু মিথ্যা।

সত্যবাদীকে সবাই পছন্দ করে। আল্লাহ তাআলা এবং রাসূলুল্লাহ (সা) সত্যবাদীকে বিশেষভাবে পছন্দ করেন। তাঁদের পছন্দের কারণে পৃথিবীর সকল সৃষ্টি এবং ফেরেশতাদের নিকটেও সত্যবাদী ভালবাসা লাভ করে। হাদীসে এসেছে – 'যে ব্যক্তি চায় যে, সে আল্লাহ তাআলা ও রাসূলুল্লাহ (সা)কে ভালবাসবে এবং তাঁরাও তাকে ভালবাসবেন সে যেন সত্য কথা বলে, আমানত রক্ষা করে ও প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করে।[৬৮৪]

সিদকের বিশেষ উপকারিতা হল এর মাধ্যমে সকল সৎগুণের উৎস তাকওয়া অর্জন করা যায়। সব সময় সত্য কথা বলতে হলে, সত্য মেনে চলতে হলে, মনে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি প্রয়োজন। আবার সবসময় সত্য বলার অভ্যাস মনে তাকওয়া তৈরি করে। কেননা সত্যবাদী এ জন্য সত্য কথা বলে যে, তার মিথ্যাবাদিতা আর কেউ ধরতে না পারলেও মহান আল্লাহ তা ঠিকই ধরতে পারেন। এই বোধ ও চেতনা নিয়ে সে সত্য বলে। পরিণামে সে তাকওয়া অর্জন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন – 'যারা সত্য নিয়ে আগমন করেছে এবং সত্যের অনুশীলন করেছে প্রকৃতপক্ষে তারাই তাকওয়াবান।[৬৮৫]

কিযব (كذب) অর্থ মিথ্যাচার বা মিথ্যাবাদিতা। অভ্যাসগতভাবে মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা কাজ করা কিংবা মিথ্যা কথা ও কাজে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া হল কিযব। এটি সিদক বা সত্যবাদিতার বিপরীত। সত্য কথা না বলে বা যে ঘটনা ঘটেছে বা যে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে সে সম্পর্কে যথাযথ বিবরণ না দিয়ে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও বিকৃত তথ্য পরিবেশনই হল কিযব। প্রকৃতপক্ষে যা নয় তা প্রকাশ ও প্রমাণ করাই মিথ্যাবাদিতা। কিযব যার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাকে কাযিব বা মিথ্যাবাদী বলে। আর মিথ্যাবাদিতার চরমে যে পৌঁছে যায় তাকে বলে কাযযাব বা চরম মিথ্যাবাদী। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবদ্দশাতেই নবুওয়তের মিথ্যা দাবি করার জন্য ভণ্ডনবী মুসায়লামার নাম হয়েছিল মুসায়লামা কাযযাব।

---

[৬৮১] আল কুরআন / ৫ :১১৯
[৬৮২] আল কুরআন / ১০৩ :১–৩
[৬৮৩] আল কুরআন / ৩৩ :৭১
[৬৮৪] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব
[৬৮৫] আল কুরআন / ৩৯ :৩৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের শান্তিপূর্ণ জীবনের সবচেয়ে বড় অন্তরায় হল কিযব বা মিথ্যাচার। এর কুপ্রভাবে ঈমান থাকে না, ইবাদত কবুল হয় না। সকলের ঘৃণা লাভ হয়। বাহ্যত সাময়িক সুবিধা ভোগ করলেও পরিণামে চিরস্থায়ী ধ্বংস বরণ করতে হয়। মানবজীবনে কিযবের চেড়ে বড় অভিশাপ আর নেই। ইসলামী আধ্যাত্মিকতায় কিযব বা মিথ্যাচারের কোন অবকাশ নেই। কিযব অনুশীলন করলে একজন মানুষের মুমিন থাকাই অবাস্তব হয়ে পড়ে। কিযব আত্মাকে কলুষিত করে। মানুষকে ভয়ঙ্কর পাপের পথে ঠেলে দেয়। যে জন্যে ইসলামী আধ্যাত্মিকতার মূল কথাই হল কিযব বর্জন করা।

কিযব আর ঈমান একত্রে থাকতে পারে না। কেননা, ঈমান পোষণের অর্থ হল সিদক মেনে নেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন – 'মিথ্যা কেবল তারা রচনা করে, যারা আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাস করে না। আর তারাই মিথ্যাবাদী।'[৬৮৬] রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন – 'মুমিন ব্যক্তি অন্যান্য পাপের কাজ করলেও তার পক্ষে মিথ্যা বলা ও প্রতারণা করা সম্ভব নয়।'[৬৮৭] কেননা, সিদক ছাড়া ঈমান পোষণ অসম্ভব।

কিযব ব্যক্তিকে আকণ্ঠ পাপে নিমজ্জিত করে। একটি মিথ্যা কথা বলা বা অসত্য কাজ করার পরিণতিতে ব্যক্তি ক্রমাগত পাপ করতে থাকে। একটা মিথ্যা বললে সেই মিথ্যাটিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আরো মিথ্যা বলতে হয়। মিথ্যা বলার মানসিকতা ব্যক্তিকে নতুন নতুন পাপে নিমজ্জিত করে।
রাসূলুল্লাহ (সা) এজন্যেই বলেছেন – الكذب ام الذنوب – 'মিথ্যা সকল পাপের জননী বা মূল।'[৬৮৮]

কিযব একটি ঘৃণ্য ও অভিশপ্ত কাজ। যার মধ্যে এর অনুশীলন যত প্রবল তার জন্যে ঘৃণা ও অভিশাপের ধারাও তত প্রবল। আল্লাহ তাআলা ও রাসূলুল্লাহ (সা) মিথ্যাবাদীদের ভালবাসেন না। আল্লাহর চরম অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ নিয়ে মিথ্যাবাদীরা ধ্বংসের পথে এগুতে থাকে। অপরদিকে কোন মানুষই মিথ্যাবদীকে ভালবাসে না, পছন্দ করে না।

কিযবের অনিবার্য পরিণতি হল এটি দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে মহাবিপর্যয় ডেকে নিয়ে আসে। মিথ্যাবাদিতা ধ্বংস ও বিপর্যয়ের প্রতীক। মিথ্যার এ ভয়ঙ্কর পরিণতির জন্যে এমনকি ঠাট্টা করেও মিথ্যা বলা উচিত নয়। নবী করিম (সা) বলেছেন – 'ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্যে যে লোকদের হাসাবার জন্যে মিথ্যা বলে। তার জন্যে রয়েছে ধ্বংস, তার জন্যে রয়েছে বিপর্যয়।'[৬৮৯]

কিযব পরকালে চিরস্থায়ী দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। আল্লাহ বলেন – ويل يومئذ للمكذبين
'সেদিন মিথ্যাচারীদের জন্যে ধ্বংস ও দুর্ভোগ।'[৬৯০] মিথ্যাবাদিতার জন্যে ব্যক্তি জাহান্নাম লাভ করবে। আল্লাহ বলেন – 'যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলবে এবং তার ওপর অহঙ্কারবশত অস্বীকার করবে তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।'[৬৯১]
মিথ্যার এ পরিণতির জন্যে রাসূলুল্লাহ (সা) মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়ে বলেন– 'তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, নিশ্চয় মিথ্যা পাপের পথে পরিচালিত করে আর পাপ পরিচালিত করে জাহান্নামের দিকে।'[৬৯২]

কিযব বা মিথ্যাচার জঘন্যতম নৈতিক পাপ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – 'আমি তোমাদের তিনটি জঘন্যতম কবিরা গুনাহের কথা বলছি। আল্লাহর সাথে শরীক কর না, পিতামাতার অবাধ্য হয়ো না এবং মিথ্যা কথা বল না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। কিযব বা মিথ্যাবাদিতা হল প্রকাশ্য পাপ।'[৬৯৩]

---

[৬৮৬] আল কুরআন / ১৬ : ১০৫
[৬৮৭] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব
[৬৮৮] প্রাগুক্ত
[৬৮৯] প্রাগুক্ত
[৬৯০] আল কুরআন / ৮৩ : ১০
[৬৯১] আল কুরআন / ৭ : ৩৬
[৬৯২] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব
[৬৯৩] প্রাগুক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

কিযব এক ভয়ঙ্কর পাপ। সীমালঙ্ঘন ও মিথ্যাচার একই রকম অপরাধ। রাসূলুল্লাহ (সা) একে শিরকের চেয়েও মারাত্মক অপরাধ বলে অভিহিত করেছেন। বলেছেন – "মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া তিনবার শিরক করার মত অপরাধ।"[৬৯৪]

কিযব আর নিফাক পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিযব মূলত মুনাফিকী। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – "মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে। যখন প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তা ভঙ্গ করে। আর তার নিকট যখন আমানত রাখা হয় তা খিয়ানত করে।"[৬৯৫]

আল্লাহ তাঁর বান্দা মানুষদের খুব ভালবাসেন। এ জন্যে মানুষের হিফাযতের জন্যে তিনি রহমতের ফেরেশতা নিয়োজিত রাখেন। মানুষ যখন মিথ্যা কথা বলে রহমতের ফেরেশতা তখন আর তার সাথে থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন – "যখন বান্দা মিথ্যা বলে তখন মিথ্যার দুর্গন্ধে ফেরেশতারা তার কাছ থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়।"[৬৯৬]

কিযব বা মিথ্যাচারিতা ইবাদত কবুলের পথে অন্তরায়। যে মিথ্যা বলে আল্লাহ তার ইবাদত কবুল করেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন – "যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে এবং সে অনুসারে কাজ করা ত্যাগ করে না তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।"[৬৯৭]

মিথ্যাবাদিতা এক ভয়ঙ্কর যুলম। আল্লাহ তাআলা বলেন – "যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে এবং তার কাছে সত্য আসার পরও তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে হতে পারে? কাফিরদের বাসস্থান জাহান্নাম নয় কি?"[৬৯৮]

কিযব বা মিথ্যাচারে ব্যক্তি নিজেই গুমরাহ বা পথভ্রষ্ট হয়। তার জন্যে আল্লাহর রহমতও ভালবাসা থাকে না বলে আল্লাহ তার হিদায়াতের ব্যবস্থা করেন না। ফলে তার জীব কাটে গুমরাহির মধ্যে। আল্লাহ বলেন – 'নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদীকে পথপ্রদর্শন করেন না।'[৬৯৯]

মিথ্যাচারের ভয়ঙ্কর পরিণতির জন্যে আল্লাহ তাআলা শুধু মিথ্যাকে বর্জন করার নির্দেশই দেন নি বরং মিথ্যাবাদীকেও বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি সঙ্গী হিসেবে সত্যবাদীদের গ্রহণের তাগিদ দিয়েছেন। বলেছেন – 'মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথী হও।'[৭০০]

কাজেই মুমিনদের মূলনীতি হবে কিযব বর্জন ও সিদক গ্রহণ এবং অনুশীলন। কেউ যদি সিদকের অনুশীলন না করে কিযবের অনুশীলন করে, কিযবের উপর ভিত্তি করে কোন আদেশ দেয় বা কোন কিছু মেনে চলতে বলে তাহলে বুঝতে হবে সে আধ্যাত্মিক সাধক বা এমন কিছু নয়। বরং সে নিতান্তই একজন ভণ্ড। কেননা মিথ্যাচারের সাথে আর যাই একীভূত হোক না কেন ঈমান একীভূত হতে পারে না। আলো আর অন্ধকারের যেমন সহাবস্থান অসম্ভব তেমনি সিদক ও কিযবেরও সহাবস্থান সম্ভব নয়।

সবর

সবর (صبر) শব্দের সাধারণ অর্থ ধৈর্যধারণ করা। যার মধ্যে সবর গুণটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে 'সাবির' বা ধৈর্যশীল বলা হয়। যাঁর মধ্যে এ গুণের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে তাঁকে 'সবূর' বলে। এজন্যে মহান আল্লাহ তাআলার একটি গুণবাচক নাম 'আস-সবূর'।

---

[৬৯৪] প্রাগুক্ত
[৬৯৫] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান
[৬৯৬] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব
[৬৯৭] প্রাগুক্ত
[৬৯৮] আল কুরআন / ৩৯ : ৩২
[৬৯৯] আল কুরআন / ৪০: ২৮
[৭০০] আল কুরআন / ৯ : ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ দৃঢ়তার সাথে সহ্য করাকে সবর বলা হয়।
ইসলামী পরিভাষায়, সবর হল দুঃখ-সুখে সংযম অবলম্বন। যে কোন রকমের বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, অন্যায়-অত্যাচার প্রভৃতির মুখোমুখি হলে হতাশায় ভেঙ্গে না পড়া এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে সে অবস্থা থেকে উত্তরণ লাভের চেষ্টা করা। সীমালংঘন না করে পরবর্তী পরিস্থিতির জন্যে ধীর-সুস্থে প্রতীক্ষা করা। আবার আনন্দ-উচ্ছলতায় আত্মহারা হয়ে বাড়াবাড়ি রকমের কিছু না করা বরং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে সীমিত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা।

মোট কথা সবর হল দুঃখে বা সুখে সীমালংঘন না করে সর্বাবস্থায় সংযত ও সংযমী আচরণ করা।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন – 'মুমিন ব্যক্তির ব্যাপরটাই বিস্ময়কর। তার সকল কাজই তার জন্যে কল্যাণময়। মুমিন ব্যতীত আর কারো ব্যাপারই এমন নয়। সে যখন সুখকর অবস্থায় থাকে শুকর করে। তা তার জন্যে কল্যাণময় হয়। আবার সে যখন দুঃখকষ্টে থাকে; ধৈর্যধারণ করে তাও তার জন্যে কল্যাণকর হয়।[৭০১]
রাসূলুল্লাহ (সা) এর এ হাদীস থেকে সবরের দুটি প্রকার বা অবস্থা অনুমতি হয়। এর একটি অবস্থা হল সুখ ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে পাপ ও সীমালংঘন না করা। এজন্যে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং সংগত বা সংযমী আচরণ করা। আর অপর আচরণটি হল দুঃখকষ্টে হতাশ না হওয়া। আল্লাহর রহমত ও ক্ষমতায় ভরসা রেখে দুঃখ ও বিপদ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করা। আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ে পাপের পথে পা না বাড়ানো।

সবরে মানুষের সম্পৃক্ততা বিবেচনায় এর আরো দুটো পর্যায় উল্লেখ করা যায়। এর প্রথম পর্যায় হল হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ সম্পাদন করতে যেয়ে মানুষের শারীরিক যে কষ্ট সহ্য করতে হয় তাকে দৈহিব সবর বলে। যেমন – সালাত, সাওম, হাজ্জ ও জিহাদ সম্পাদন বা রোগীর পরিচর্যা। দ্বিতীয় পর্যায় হল মানসিক সবর। মানুষের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, ঘৃণা, হিংসা প্রভৃতি খারাপ প্রবৃত্তি রয়েছে। এগুলো মানুষকে পাপ কাজে উৎসাহ দেয়, উদ্বুদ্ধ করে। তেমন অবস্থায় প্রবৃত্তির প্রলোভনের ওপর ধৈর্যধারণ করা হল আত্মিক সবর। মানসিক নিপীড়ন সহ্য করাও আত্মিক সবরের অন্তর্ভূক্ত।

মুসলিম মনীষীগণ সাধারণভাবে সবরের তিনটি পর্যায় উল্লেখ করেছেন।
প্রথমত, হারাম কাজ না করা এবং হারাম প্রলোভন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করা।
দ্বিতীয়ত, ইসলামী শরীআতে যেসব কাজ ফরয করা হয়েছে; যেমন সালাত, সাওম, হাজ্জ, সদাচার, মানবকল্যাণ প্রভৃতি ফরয কাজ তা নিষ্ঠার সাথে পালনে ধৈর্যধারণ।
তৃতীয়ত, বিভিন্ন রকম শারীরিক ও মানসিক দুঃখ-শোকে, বালা-মুসীবতে ধৈর্যধারণ করা।

আল গাযালী (র) সবরের পাঁচটি স্তর উল্লেখ করেছেন।[৭০২]
প্রথমত : নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতার সাথে আল্লাহর ইবাদত সম্পাদন করা মুমিনের প্রথম ও প্রধান কাজ। এ কাজ করতে গেলে মুমিনকে কষ্ট সহ্য করতে হয়। বাহ্যিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। আল্লাহর ইবাদতে এমনি ধারার কষ্ট ও ক্ষতি মেনে নেওয়াই হল ইবাদতে সবর।

দ্বিতীয়ত : মানুষের প্রবৃত্তি সবসময় তাকে খারাপ কাজে নিয়োজিত হওয়ার উৎসাহ দেয়। প্রবৃত্তির উৎসাহ ও প্রলোভন উপক্ষো করে পাপ কাজে লিপ্ত না হওয়া যথেষ্ট কষ্ট ও ধৈর্যের ব্যাপার। পাপ কাজে লিপ্ত না হওয়ার ক্ষেত্রে এ কষ্ট বরণ করে নেওয়া হল পাপ কাজে সবর।

তৃতীয়ত : ইসলাম প্রচারের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রচারকদের ওপর নির্যাতনের স্টিমরোলার নেমে আসে। তাদের জীবন ও সম্পদ মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন হয়। দীন প্রচারে এ রকম অত্যাচার ও বাধা উপক্ষো করে দীন প্রচার অব্যাবত রাখাই হল নির্যাতন–নিপীড়নে সবর।

---

[৭০১] মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান
[৭০২] ইমাম গাযালী, *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৫–২৪৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থত : দুঃখ-বিপদ মানব জীবনের চিরন্তন সহচর। জীবন-সম্পদের ক্ষতি, অভাব, ভয়, অসুস্থতা, জন্ম-মৃত্যু এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে কষ্টের সীমা থাকে না। এমন নাজুক অবস্থায়ও আল্লাহর ক্ষমতায় বিশ্বাস রাখা এবং অবস্থা দূর হওয়ার প্রত্যাশায় ধৈর্য ধারণ করা হল দুঃখ-বিপদে সবর।

পঞ্চমত : সুখের সময় আনন্দে আত্মহারা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতি আনন্দে সীমালংঘনের ঘটনাও ঘটে। এ সময়ে আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় ও সংযমী হওয়া বেশ কষ্টের হয়ে পড়ে। এমন ক্ষেত্রে সংযম অবলম্বন করাই হল সুখে-আনন্দে সবর।

ইসলামী আধ্যাত্মিকতায় সবরের স্থান ও তাৎপর্য সর্বশীর্ষে। সবরের অনুশীলন ছাড়া ইসলামী আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন ও অনুসরণ অন্তঃস্বারশূন্য আনুষ্ঠানিকতা এবং অর্থহীন আচার ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্যক্তিগত সফলতা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং ব্যক্তির শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধ জীবন লাভের ক্ষেত্রে সবরের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জীবনের সকল পর্যায়ে সবরের অনুশীলন ছাড়া সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। অধ্যয়ন, ব্যবসায় বাণিজ্য, ইবাদত, সন্তান প্রতিপালন, সুস্থ থাকার জন্য যে কোন ধরনের চেষ্টা এমনকি আরাম করে খাদ্য গ্রহণের জন্যও সবর অবলম্বনের বিকল্প নেই। ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সবরের রয়েছে বিশেষ গুরুত্ব ও ভূমিকা।
সামাজিক জীবনে শান্তি, উন্নতি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে তোলা এবং তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে সবরকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও অনিবার্য বিষয় মনে করা হয়। সবরের অনুশীলন ছাড়া সম্মিলিত জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। কেননা সমাজের সকল মানুষের সব আচরণ সবার কাছে সমান গ্রহণীয় বা সকলের জন্য সমান কল্যাণকর নাও হতে পারে। সবর অবলম্বন ছাড়া এ সকল আচরণ মেনে নেওয়া অসম্ভব। সামাজিক জীবনের স্থিতি, সমৃদ্ধি, শান্তি ও নিরাপত্তা তাই সবরের উপরেই নির্ভর করে।

আল্লাহ তাআলা পরম ধৈর্যশীলতার প্রতীক। এজন্যে মুমিনদের তিনি ধৈর্যধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে – 'মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, ধৈর্যধারণে পরস্পর প্রতিযোগিতা কর, ধৈর্যের বন্ধনে নিজেদের বেঁধে রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর। যেন তোমরা সফল হতে পার।[৭০৩]

আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য কোন মুমিন যখন সবর করে তখন আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হন। সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। কুরআনে এসেছে – والله يحب الصابرين 'আর আল্লাহ ভালবাসেন ধৈর্যশীলদের।[৭০৪]
অন্যত্র আল্লাহ বলেন – ان الله مع الصابرين 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আছেন ধৈর্যশীলদের সাথে।[৭০৫]

প্রকৃত মুমিন ধৈর্যশীল হয়। কোন বিপদ ও কষ্টই তাকে বিহ্বল বা বিচলিত করে না। আল্লাহ বলেন 'মুমিন হল তারা যারা অভাব-অনটনে, দুঃখ-কষ্টে এবং যুদ্ধে দৃঢ়পদ থাকে। বস্তুত সত্যবাদী হল তারা এবং তারাই আল্লাহভীরু বা মুত্তাকী।'

সবর মানুষকে চরম দুঃখেও আল্লাহর ওপর ভরসা রাখার প্রেরণা যোগায়। ধৈর্য ধরে সে দুঃখ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে। কেননা সুখ বা দুঃখ সবই আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। কুরআনে এসেছে –
'যারা তাদের ওপর যখন বিপদ আপতিত হয় তখন বলে নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্যে আর সুনিশ্চিতভাবে আমরা তাঁ নিকটই প্রত্যাবর্তনকারী।[৭০৬]

সবর অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি অশেষ পুণ্য ও উত্তম প্রতিদান লাভ করার নিশ্চয়তা পায়। ধৈর্যশীল মুমিনের প্রতিটি সৎকাজের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ বলেন – 'নিশ্চয় যারা সবরকারী – ধৈর্যশীল, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।[৭০৭]

---

[৭০৩] আল কুরআন / ৩ : ২০০
[৭০৪] আল কুরআন / ৩ : ১৪৬
[৭০৫] আল কুরআন / ২ : ১৫৩
[৭০৬] আল কুরআন / ২ : ১৫৬
[৭০৭] আল কুরআন / ৩৯ : ১০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

সবর অনুশীলন মুমিনের জান্নাত লাভ নিশ্চিত করে। কেননা ইসলামের প্রতিটি বিধান যথাযথভাবে মেনে চলার জন্যে সবর অনিবার্য। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – الصبر ثوابه الجنة
'সবর বা ধৈর্য – তার বিনিময় হল জান্নাত।'[৭০৮]
অন্যত্র তিনি বলেন – 'জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের একটি ভাণ্ডার হল সবর।'[৭০৯]
সবর ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয় না। কেননা সবর ঈমানের অঙ্গ কিংবা সবরই ঈমান। আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ এবং ঈমানের সকল দাবি নিষ্ঠার সাথে পূরণের জন্যে সবরের বিকল্প নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) এজন্যেই বলেছেন – الصبر نصف الايمان বা সবর ঈমানের অর্ধাংশ।[৭১০]

সবর আল্লাহর বিশেষ গুণ। সেজন্যে যারা সবর অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন। কেননা এর ফলে মুমিন বিপদ ও নির্যাতনে হতাশ হয় না। আনন্দে আত্মহারা হয় না। বরং সকল অবস্থায় আল্লাহর অসীম ক্ষমতার ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখে। আর যারা এভাবে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার ক্ষমতার উপর ঈমান পোষণ করেন, তারা আল্লাহর বিশেষ সাহায্য ও পুরস্কার পেয়ে থাকেন। আল্লাহর সাহায্য লাভের ক্ষেত্রেও তাই সবরের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আল্লাহ বলেন –মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাও।[৭১১]

আল্লাহর জন্য, তাঁর নির্দেশ পালন ও তাঁর প্রতি ভালবাসা প্রমাণের জন্য কেউ যদি ইবাদতে জীবনাচারে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ সে ব্যক্তির গুনাহ মাফ করে দেন। তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে তাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন – 'কোন মুসলিম মানসিক বা শারীরিক কষ্ট পেলে বা কোন দুঃখ–শোক পেলে অথবা দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে যদি সে সবর অবলম্বন করে তা হলে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন। এমনকি সামান্য একটি কাঁটাও যদি পায়ে বিঁধে তাও তার গুনাহ মাফের কারণে পরিণত হয়।'[৭১২]

মুমিন ব্যক্তি যে সকল ইবাদত সম্পাদন করে সে সকল ক্ষেত্রেও সবর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা পরিপূর্ণ সবর অনুশীলন ছাড়া কোন ইবাদতই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন সম্ভব নয়।
যেমন সালাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ বলেছেন – انها لكبيرة الا على الخاشعين 'নিশ্চয় সালাত অত্যন্ত কঠিন ইবাদত। তবে যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্যে কঠিন নয়।'
যারা আল্লাহকে ভয় পায় সবর অবলম্বন করে তারাই। সে জন্যে সবরকারীর ইবাদত হয় যথার্থ।

পারস্পরিক লেন–দেন ও আচরণে সবর অবলম্বন করা না হলে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। সবরের অভাবে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ ও রাগ প্রশমিত করতে পারে না। ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। সবরের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখা যায়। ধৈর্য ধরে ব্যক্তি অপরের আচরণের সার্বিক মূল্যায়ণ করে পরবর্তীতে তার সংশোধনের উদ্যোগ নিলে ব্যক্তি যেমন উপকৃত হয় তেমনি সম্পর্কও সুদৃঢ় থাকে।

ব্যক্তির জীবনাচারে সবর না থাকলে সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত হয়। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। কারো মতামত ও কাজ অন্যের পছন্দ না হলেই তার বিরুদ্ধাচারণ শুরু হয়। সমাজে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। সবর শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠাই করে না বরং সামাজিক শান্তি সংরক্ষণও করে।

সমাজের সদস্যরা পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান ও দায়িত্বশীল হলে সমাজ উন্নত হয়। সমাজের সমৃদ্ধি ও সচ্ছলতা নিশ্চিত হয়। ধৈর্য ছাড়া পরিশ্রম করা যায় না। নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্যেও প্রয়োজন ধৈর্যের। তাই সমাজের অগ্রগতি ও উন্নতির জন্যেও ধৈর্য অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

---

[৭০৮] ইমাম গাযালী (র), *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৫–২৪৯
[৭০৯] প্রাগুক্ত
[৭১০] প্রাগুক্ত
[৭১১] আল কুরআন / ২ : ১৫৩
[৭১২] ইমাম গাযালী (র), *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৫–৪৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন জাতি – গোষ্ঠীর আন্তঃধর্মীয় কলহ পৃথিবীতে বারবার বিপর্যয় নিয়ে এসেছে। ধর্মান্ধতা, অন্যের ধর্মকে ছোটো ও হেয় করার মানসিকতা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ওপর অন্যায় আগ্রাসন ধৈর্যহীনতারই ফলশ্রুতি। যে জন্যে সাম্প্রাদিয়ক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্যেও সবর অনুশীলন অনিবার্য।

সবরের অভাব আর্ন্তজাতিক জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। ধৈর্য ও আন্তরিকতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করলে অনেক নাজুক ও যুদ্ধাবস্থা সামাল দেয়া যায়। আবার অধৈর্য আচরণের জন্য বিশ্বব্যবস্থায় যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। তাই আন্তর্জাতিক জীবনেও সবর অনুশীলনের বিকল্প নেই।

বস্তুত আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন রকম সাময়িক ক্ষতি ও বিপর্যয়ে নিপতিত করেন। সবল অবলম্বনকারীরা আল্লাহর এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। আল্লাহ বলেন – 'আর অবশ্যই তোমাদের আমি পরীক্ষা করব। পরীক্ষা করব ভয়ভীতি, ক্ষুধা ও সম্পদ, জীবন ও শস্যের ক্ষতি দিয়ে। আর ধৈর্যশীলদের জন্যে সুসংবাদ।[৭১৩] সুতরাং মুমিনগণ ব্যক্তিগত সাফল্য ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য সবর অবলম্বন করবে। তাহলে তাদের দুনিয়ার জীবন সফল হবে। আখিরাতেও তারা পাবে সাফল্যের নিশ্চয়তা।

ইহসান

ইহসান (احسان) শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। এটি হুসনুন (حسن) শব্দমূল থেকে নিস্পন্ন। হুসনুন অর্থ সুন্দর। কাজেই ইহসান অর্থ হবে সুন্দর করা। অভিধানে কষ্ট লাঘব করা, কোন কাজকে সুন্দর ও নির্ভেজাল করা, দয়া, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করা এবং সদাচরণ করা অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণ অর্থে দান করা, সৎ ও কল্যাণকর কাজ করা, উপকার করা ও উত্তম ব্যবহার করা হল ইহসান।
রাসূলুল্লাহ (সা) এ সম্পর্কে বলেন – 'ইহসান হল তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে নাও পাও, তা হলে অন্তত এ বিশ্বাস পোষণ করবে যে তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন।[৭১৪]
মোটকথা, ইহসান হল সকল ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সদাচরণ ও সুন্দর নীতি অবলম্বন।

আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জন্যে বিশ্বজাহান সৃষ্টি করেছেন। তাদের জীবনযাপনের সকল প্রয়োজনীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষের জন্যে তাঁর ইবাদত ফরয করেছেন।
তিনি বলেছেন – وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
'আমি জিন্ন ও মানুষকে কেবল ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।[৭১৫] সেজন্যে আল্লাহর প্রতি মানুষের ইহসান হল তাঁর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা। জীবনের সকল ক্ষেত্র ও পর্যায়ে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী, যথাযথ ও যথোপযুক্তভাবে কাজ সম্পন্ন করা।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন – 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং সে যদি হয় ইহসানকারী তা হলে সেতো এক মজবুত হাতল দৃঢ়ভাবে ধারণ করে। আর যাবতীয় কাজের পরিণাম আল্লাহর অধিকারে।[৭১৬]

আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির প্রতি যেমন আচরণ করতে বলেছেন ঠিক তেমন আচরণ করা হল সৃষ্টির প্রতি ইহসান। সৃষ্টির প্রতি ইহসান মূলত স্রষ্টার প্রতি ইহসানের বিশেষ দিক। কেননা আল্লাহ তাআলার নির্দেশেই মানুষ পরস্পরের প্রতি ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি ইহসান করে। যেমন আল্লাহ বলেন –

---

[৭১৩] আল কুরআন / ২ : ১৫৫
[৭১৪] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ঈমান
[৭১৫] আল কুরআন / ৫১ : ৫৬
[৭১৬] আল কুরআন / ৩১ : ২২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

'মাতাপিতার সাথে ইহসান কর। ইহসান কর নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম, মিসকিন, আত্মীয় প্রতিবেশি, সহচর ও পথাচারীদের সাথে। তোমাদের অধীনস্থ দাসদাসীর সাথেও ইহসান কর। নিশ্চিয় আল্লাহ দাম্ভিক ও গর্বকারীকে ভালবাসেন না।[৭১৭]

সেজন্যে সৃষ্টির প্রতি ইহসান হল তাদের সাথে সঙ্গত আচরণ করা। মাতাপিতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, দুঃস্থ, নিরন্ন ও বিপদগ্রস্থ মানুষ এবং পশু-পাখি, গাছপালা, পরিবেশ ও প্রকৃতির প্রতি দয়াদ্র মানসিকতা পোষণ এবং আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত আচরণ প্রর্দশনই সৃষ্টির প্রতি ইহসান।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন – 'পৃথিবীর অধিবাসীদের সাথে ইহসান কর, আকাশের অধিবাসীরা তোমাদের প্রতি রহম করবে।[৭১৮]

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি, তাঁর সৃষ্টি মানুষ এবং অন্যান্য প্রজাতির প্রতি ইহসান করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। যেমন- আল্লাহর প্রতি ইহসান করার উপায় হল তাঁর ইবাদত করা। তাঁর আদেশ-নিষেধসমূহ জীবনে বাস্তবায়িত করা। তাঁর জন্য ভালবাসা এবং ভালবাসা থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টিকেই সকল কাজের একমাত্র লক্ষ্য নির্ধারণ করা। সৃষ্টিকুলের প্রতি তাঁর নির্দেশানুসারে ইহসান করেও আল্লাহর সাথে ইহসান করা যায়।

মাতাপিতার সাথে ইহসান করার উপায় হল তাদের মর্যাদা ও অবস্থান অনুযায়ী তাদের অধিকার আদায় করা। তাদের সেবা করা, সম্ভাব্য সবচেয়ে সুন্দর আচরণ করা। মানুষের মধ্যে মাতাপিতাই ব্যক্তির ইহসানের প্রথম হকদার।

সন্তান-সন্ততিকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে, আদবকায়দা শিখিয়ে সচ্চরিত্রবান করে গড়ে তুলে তাদের প্রতি ইহসান করা যায়।

স্বামী-স্ত্রী ও ভাই বোন পারস্পরিক সুসম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রেখে ও প্রাপ্য অধিকার আদায় করে ইহসান করতে পারেন।

আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর সাথে ইহসানের উপায় হল তাদের দুঃখ-সুখে অংশীদার হয়ে তাদের সাথে সহানুভূতিশীল ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা।

সুন্দর আচরণ ও সাধ্য মত উপকার করে সাধারণ মানুষের সাথে ইহসান করা যায়।

ঋণগ্রস্তের সাথে ইহসান করার উপায় হল তার ঋণ পরিশোধে সাহায্য করা বা তার ঋণ মওকুফ করে দেয়া।

আর্ত-পীড়িতদের সেবা এবং অভাবীর অভাব দূর করে তাদের প্রতি ইহসান করা যায়।

বিপদগ্রস্তকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে এবং বৃদ্ধ, অন্ধ ও বিকলাঙ্গকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে তাদের প্রতি ইহসান করা যায়।

ক্ষুধার্তকে খাদ্য দিয়ে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র ও পিপাসার্তকে পানি দিয়ে এবং দুর্বলকে সবলের হাত থেকে রক্ষা করে তাদের প্রতি ইহসান করা যায়। অত্যাচারীর প্রতি ইহাসনের উপায় হল তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখা।

পশু-পাখি, গাছ-পালা, পাহাড়-নদী, ঝর্ণাধারা এবং প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক অন্যান্য সৃষ্টিসমূহ সংরক্ষণ ও পরিচর্যা করে এবং অকারণে তাদেরকে হত্যা বা নির্মূল না করে এগুলোর প্রতি ইহসান করা যায়।

ইসলাম প্রতিজন মানুষকে স্বতন্ত্রভাবে দায়িত্বশীল ঘোষণা করেছে। সাথে সাথে মানুষের সাফল্য ও ব্যর্থতাকে যুক্ত করে দিয়েছে সমাজের অন্যান্য মানুষ এবং অবশিষ্ট সৃষ্টিজগতের সাথে তার আচরণের সঙ্গে। ইহসান বা সদাচার হল এমন একটি ব্যক্তিগত আচরণ যা মানুষের আত্মিক উন্নতি, সফলতা ও কল্যাণ নিশ্চিত করে।

সাধারণভাবে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা ইহসান প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। ইহসানে তাই আল্লাহ তাআলার এ আদেশ পালন করা হয়। আর ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহর আদেশ পালনের গুরুত্ব সীমাহীন।

মানুষ যদি আল্লাহর প্রতি ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি ইহসান করে তিনি ইহসানকারীকে নিজের নৈকট্য ও ভালবাসা দিয়ে ধন্য করেন। আল্লাহ বলেন – واحسنوا ان الله يحب المحسنين

'তোমরা ইহসান কর। নিশ্চয় আল্লাহ ইহসানকারীদের ভালবাসেন।[৭১৯]

---

[৭১৭] আল কুরআন / ৪: ৩৬

[৭১৮] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদব

[৭১৯] আল কুরআন / ২ : ১৯৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

ইহসানকারীদের নৈকট্যলাভ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন – وان الله لمع المحسنين
'নিশ্চয় আল্লাহ আছেন ইহসানকারীদের সাথে।[৭২০]
এমনিভাবে আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি যারা ইহসান প্রদর্শন করে আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক সন্তুষ্টি ও ভালবাসা তাদের জন্যে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন – 'সৃষ্টিজগত আল্লাহর পরিবারস্বরূপ। তাই আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়ভাজন সে ব্যক্তি যে আল্লাহর পরিবারের সদস্যদের সাথে ইহসান করে।[৭২১]

আল্লাহর প্রতি ইহসান করলে আল্লাহ ইহসানকারীর প্রতি তাঁর ইহসানের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেন। আবার তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি ইহসান করলে একদিকে যেমন তিনি ইহসান করেন, অন্যদিকে ইহসানকৃত ব্যক্তিও ইহসান করার জন্যে এগিয়ে আসে। এভাবে অন্যকে ইহসান করার মাধ্যমে মূলত নিজেকেই ইহসান করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন – 'তোমরা যদি ইহসান কর, তা হলে তা তোমরা তোমাদের নিজেদেরকেই করবে। আর যদি তোমরা মন্দ কিছু কর, তাও করবে নিজেদের জন্যেই।[৭২২]

আল্লাহ তাআলা মানুষকে অসীম নিআমত দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ও সাধরণ সৃষ্টির প্রতি ইহসান করা হলে মূলত আল্লাহর এ বিপুল দানের কৃতজ্ঞতা পোষণ করা হয়।
কুরআন মাজীদে এসেছে – واحسن كما احسن الله اليك
' ইহসান কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি ইহসান করেছেন।[৭২৩]

ইহসান অনুশীলনের মাধ্যমে মুমিন আল্লাহর ভালবাসার পাশাপাশি মানুষেরও বিপুল ভালবাসা লাভ করে। ইহসানকারী তার উপকারী ও সহানুভূতিশীল মনোভাব তাকে সর্বজনপ্রিয় মানুষে পরিণত করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন –
هل جزاء الاحسان الا الاحسان
'ইহসানের বিনিময় ইহসান ছাড়া আর কী হতে পারে।[৭২৪]

আল্লাহ তাআলা ও তাঁর সৃষ্টিকুলের সাথে ইহসান করলে আল্লাহর অসীম রহমত লাভ সম্ভব হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) এজন্যেই বলেছেন – ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء
'পৃথিবীতে যারা আছে তাদের প্রতি রহম কর, আকাশে যিনি আছে তিনি তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।[৭২৫]

ইহসান অনুশীলন করলে ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ইহসানের ফলে মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। কুরআন মাজীদে আছে – 'যে আল্লাহর নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পণ করে এবং সে ইহসানকারী ও একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করে তার চেয়ে উত্তম দীন আর কার?[৭২৬]
ইহসন করা আল্লাহ তাআলার স্বভাবজাতগুণ। তাঁর প্রতিটি কাজেই ইহসানের পরম প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়। কুরআন মাজীদে আছে – 'যিনি (আল্লাহ) তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে সুন্দরতম বা আহসান করেছেন এবং মাটি থেকে মানুষ তৈরীর সূচনা করেছেন।[৭২৭]
সে জন্যে ব্যক্তি যদি ইহসান অনুশীলন করে সে মূলত আল্লাহ তাআলার একটি অসাধারণ গুণেরই অনুশীলন করে। আর কেউ যদি আল্লাহর কোন গুণ আয়ত্ব করতে পারে তার সফলতা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

---

[৭২০] আল কুরআন / ২৯ : ৬৯
[৭২১] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব
[৭২২] আল কুরআন / ১৭ : ৭
[৭২৩] আল কুরআন / ২৮ : ৭
[৭২৪] আল কুরআন / ৫৫ : ৬০
[৭২৫] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল আদাব
[৭২৬] আল কুরআন / ৪: ১২৫
[৭২৭] আল কুরআন / ৪১ : ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

ইহসান করে দুনিয়া ও আখিরাতের বিপর্যয় ও ধ্বংস থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়। কেননা ইহসান না করলে আল্লাহর ইহসান থেকে বঞ্চিত হতে হয়। কুরআন মাজীদে এ মর্মে বলা হয়েছে –
'আল্লাহর পথে ব্যয় কর। নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না। আর ইহসান কর। নিশ্চয় আল্লাহ ইহসানকারীদের ভালবাসেন।[৭২৮]

আল্লাহ তাআলা ও তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি ইহসান করলে আল্লাহ ইহসানকারীকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন। কোন কারণেই এ প্রতিদান বাতিল করেন না। আল্লাহ বলেন –
واصبر فان الله لايضيع اجر المحسنين
'আর ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইহসানকারীদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।[৭২৯]

ইহসান সমাজের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে। এর মাধ্যমে সমাজের প্রতিজন সদস্য একে অন্যের সাথে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাদের মধ্যে মত ও মানসিকতার ঐক্য গড়ে ওঠে।

ইহসানের ফলে সমাজের সদস্যরা একে অন্যের প্রতি অন্যায় ও অসঙ্গত আচরণের পরিবর্তে ভালবাসা পোষণ করে। এতে ঝগড়া, শত্রুতা, হিংসা, বিদ্বেষ ও মারামারির পরিবর্তে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

আন্তরিক ও ভালবাসপূর্ণ ইহসান প্রদর্শন সমাজের সকল সদস্যকে সৌহার্দ্য–সম্প্রীতি, সদ্ভাব ও ভালবাসার নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করে। তারা একে অন্যের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়। বিপদে পাশে এসে দাঁড়ায়। মমতা, সহানুভূতি ও সহযোগিতায় সমাজজীবন সুন্দর হয়ে ওঠে।

ইহসান সমাজের অগ্রগতি ও উন্নতিতেও ভূমিকা রাখে। সমাজের দুঃস্থ ও গরীব লোকদের প্রতি ইহসান পোষণের জন্যে ধনী লোকেরা তাদের সহযোগিতায় অর্থব্যয় করে। তাদের দরিদ্রতা নিরসনের চেষ্টা করে। সমন্বিত চেষ্টার ফলে সমাজ থেকে অভাব অনটন দূর হয়। মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

ইহসান অন্যায় অত্যাচার নির্মূল করে। অত্যাচারীকে অত্যাচারের ধ্বংসাত্মক পথ থেকে দূরে রাখে। নিপীড়িতকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অপরাধ নির্মূলের পথ দেখায়। ফলে সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

বস্তুত ব্যক্তির সর্বোচ্চ মানবিক উৎকর্ষসাধন এবং সামাজিক উন্নয়ন অনেকটাই নির্ভর করে ইহসানের যথাযথ অনুশীলনের ওপর। এর মাধ্যমে ব্যক্তি যেমন দুনিয়াতে উপকৃত হয় তেমনি তার আখিরাতে সাফল্য লাভও নিশ্চয়তা পায়। কাজেই প্রত্যেক মুমিনের অবশ্য কর্তব্য হল ইহাসন অনুশীলন করা।

যিকর

যিকর (ذكر) অর্থ স্মরণ করা, মনে রাখা, বর্ণনা করা বা মেনে চলা। যিকর যখন নিরবে সম্পন্ন হয় তখন তার অর্থ হয় স্মরণ করা। সরবে যিকর হলে তার অর্থ দাঁড়ায় বর্ণনা করা। যিনি যিকর করেন তাকে বলে যাকির। অভ্যাসগতভাবে যিনি যিকর করেন বা যিকরকে যিনি অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছেন তাকে 'মুযাক্কির' বলে।
যিকর হল আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম, তাঁর অসীম দান ও ক্ষমতার কথা স্মরণ করে পৃথিবীর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর বিধান মেনে চলা।

মোটকথা, মৌখিকভাবে তাসবীহ আকারে আল্লাহর নাম উচ্চারণ, অন্তরে তাঁর প্রতি ভালবাসা পোষণ এবং যে কোন কাজ করার সময় সে সম্পর্কে আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়েছেন তা জেনে নিয়ে সে নির্দেশের পরিপূর্ণ অনুশীলন করাকে যিকর বলা যায়।

---

[৭২৮] আল কুরআন / ২ : ১৯৫
[৭২৯] আল কুরআন / ১১ : ১১৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

যিকরের ধরন, পদ্ধতি ও প্রকৃতি বিবেচনায় প্রথমত যিকরকে দুইভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হল যিকরে কালবী বা অন্তরের যিকর এবং যিকরে লিসানী বা মৌখিক যিকর।

অন্তরে আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করাকে যিকরে কালবি বা অন্তরের যিকর বলে। মুমিনের কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ, লেন-দেন, চরিত্র-বিশ্বাস ও কথাবার্তায় যিকরে কালবির বাস্তব প্রকাশ ঘটে। সে জন্যে দুনিয়াতে প্রতিটা মুহূর্তে প্রত্যেক কাজে আল্লাহর নির্দেশের অনুশীলনকেও যিকরে কালবি বলা যায়। যিকরে কালবির নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন – واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة

'আর তুমি তোমার প্রভুর যিকর কর ক্রন্দনরত ও ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় মনে মনে।[৭৩০]

লিসান বা জিহ্বার মাধ্যমে আল্লাহর নাম উচ্চারণ, কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত, হাদীস অধ্যয়ন এবং আল্লাহ তাআলা ও রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করার নাম যিকরে লিসানী বা মৌখিক যিকর। যিকরে লিসানি দু'রকম হতে পারে। যেমন –

যিকরে জলি বা উচ্চকণ্ঠে যিকর। তবে এত বেশি উচ্চকণ্ঠে নয় যা চিৎকারের পর্যায়ে পৌঁছে।

আল্লাহ বলেন دون الجهر من القول 'এমন স্বরে যিকর কর যা চিৎকার করা অপেক্ষা কম।[৭৩১]

যিকরে খফি বা নিঃশব্দে যিকর। এ যিকরেও জিহ্বা ব্যবহৃত হয়। তবে কোন শব্দ করা ছাড়াই এতে আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন গুণবাচক নামোচ্চারণ করা হয় বা তিলাওয়াত, তাসবীহ, হাদীস অধ্যয়ন ইত্যাদি করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – 'তোমার জিহ্বা যেন সব সময় আল্লাহ তাআলার যিকরে সিক্ত থাকে।[৭৩২]

যিকরের উল্লিখিত প্রকার দুটো ছাড়া মুমিন সাধকগণ এর আরো তিনটি প্রকারে কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন-

শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও বর্জনের সাথে আল্লাহর যিকরের নাম যিকরে আনফাসি বা শ্বাস–প্রশ্বাসের যিকর। এ যিকরে মুমিনের অন্তরে একটা বিশেষ চেতনা কাজ করে। সে মনে করে তার জীবন অত্যন্ত অনিশ্চিত। যে শ্বাস সে গ্রহণ করেছে হয়তো তা ত্যাগ করার আগেই সে চলে যাবে। আবার যে শ্বাস সে ত্যাগ করেছে হয়তো তা গ্রহণের সুযোগও তার হবে না।

চোখ বা দৃষ্টিশক্তির সংকোচন ও প্রক্ষেপণ দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষণের উপলব্ধি হল যিকরে আয়নি বা চোখের যিকর। এ যিকরে ব্যক্তি যা কিছু দেখে তাকে আল্লাহার অস্তিত্বের প্রমাণ মনে করে সিজদায় অবনত হয়। এটি চরম ও উচ্চতর যিকর।

ব্যক্তি যখন সশব্দে বা নিঃশব্দে, মুখে মুখে বা মনে মনে, চোখের প্রতিটা প্রক্ষেপণ ও সংকোচনে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও বর্জনে আল্লাহার যিকরে লিপ্ত হয় তখন তাকে সার্বক্ষণিক যিকর বলে। আল্লাহ বলেছেন – 'যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে।[৭৩৩]

সার্বক্ষণিক যিকরের সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা হল, সবসময় আল্লাহর আদেশ নিষেধের ওপর নিজেকে বহাল রাখা। তাঁর নিআমত ও রহমতের জন্যে কৃতজ্ঞতা পোষণ। কাজ এবং তসবীহ আকারে আল্লাহকে মনে রাখার মাধ্যমে তাঁর সার্বক্ষণিক আনুগত্যের ঘোষণা প্রদান।

যিকরের যেমন বিভিন্ন প্রকার রয়েছে তেমনি এ বিভিন্ন প্রকার যিকর করারও নানা রকম পদ্ধতি রয়েছে। এ পদ্ধতিগুলো হল যিকরের পর্যায়ক্রমিক সোপান বা স্তর। এর মাধ্যমে যিকরকারীর যিকরের অবস্থা অবহিত হওয়া যায়। আল গাযালী (র) সার্বিক বিবেচনায় যিকরের চারটি সোপান[৭৩৪] নিরূপণ করেছেন। যেমন –

---

[৭৩০] আল কুরআন / ৭ : ২০৫

[৭৩১] আল কুরআন / ৭ : ২০৫

[৭৩২] ইমাম গাযালী (র) , *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন,* ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯–৮৮

[৭৩৩] আল কুরআন / ৩ : ১৯১

[৭৩৪] ইমাম গাযালী (র), *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন,* ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯–৮৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম স্তরের যিকর হল শুধু মুখে মুখে সশব্দে বা নিঃশব্দে আল্লাহর নাম বা বিশেষ বিশেষ বাণী উচ্চারণ করা। এর সাথে হৃদয়ের কোন সম্পর্ক থাকে না। তবে অপ্রয়োজনীয় ও অশালীন কথাবার্তা থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে মৌখিক যিকর কার্যকর। এর দ্বারা গীবত করা ও মিথ্যা বলার অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয় স্তরের যিকর মুখে মুখে সম্পন্ন হওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তির অন্তরও স্পর্শ করে। কিন্তু নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও আন্ত রিকতা তেমন প্রবল থাকে না। একাগ্রতা না থাকার কারণে দ্বিতীয় স্তরের যিকরকারী প্রায়ই গাফিল হয়ে পড়ে। তবুও যতটুকু সময় ব্যক্তির অন্তর যিকরে লিপ্ত থাকে ততক্ষণ তার অন্তরে অন্যায় ও অপ্রয়োজনীয় চিন্তার জায়গা হয় না। ব্যক্তি শুদ্ধতা ও সুপথের দিকে এগিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

যিকরের তৃতীয় স্তরে ব্যক্তির একাগ্রতা ও নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তি মৌখিকভাবে আল্লাহর যে নাম, গুণ ও নির্দেশের যিকর করে, সাথে সাথে তার অন্তর সে নাম, গুণ ও নির্দেশের দাবি পূরণে প্রস্তুত হয়ে যায়। ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর যিকর স্থায়ীভাবে বদ্ধমুল হয়। ফলে ব্যক্তির আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়। সে কখনোই আল্লাহর যিকর থেকে গাফিল থাকে না।

যিকরের চতুর্থ স্তর হল পরম ও চূড়ান্ত স্তর। এ স্তরে যিকরকারীর অন্তর নিষ্ঠা, একাগ্রতা, আন্তরিকতা ও নিবিড় অনুশীলন পূর্ণতা লাভ করে। তার মধ্যে আল্লাহভীতির পরিবর্তে আল্লাহপ্রেম প্রতিষ্ঠিত হয়। সে আল্লাহর শাস্তি বা ক্রোধের ভয়ে তাঁর যিকর করে না। বরং আল্লাহর প্রতি সুতীব্র ভালবাসার জন্যেই প্রগাঢ় প্রেমে তাঁর যিকরে তন্ময় হয়। সে আর নিজের আলাদা সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করে না। এভাবে আল্লাহর যিকর অব্যাহত রেখে যিকরকারী যিকরের পরম স্তরে উপনীত হতে পারে। শেষ পর্যন্ত সে নিজের মধ্যেই আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করে।

যিকরের জন্যে সাংসারিক জীবন ত্যাগ করা বা দুনিয়া কাজকর্ম বর্জন করা শর্ত নয়। রাসূলুল্লাহ (সা) সকল বৈষয়িক ও দুনিয়ার কাজ সম্পাদন করেও যিকরের পরম স্তরে উপনীত হয়েছিলেন। সেজন্যে মুমিনগণও যিকরের জন্যে সংসারত্যাগী হবেন না। বরং বৈষয়িক জীবনের মধ্যে আল্লাহর যিকর অব্যাহত রেখে ইসলাম পরিকল্পিত সমন্বিত জীবনযাপন করবেন।

আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। না চাইতেই সীমাহীন নিআমতে মানুষের জীবন যাপন সম্ভব ও সহজতর করে দিয়েছেন। মানুষ আল্লাহকে ভালবাসবে। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবে। সবসময় তাঁর কথা মনে করবে। তাঁর আদেশ অনুসারে তাঁর দেয়া বিপুল নিআমতরাশি ব্যবহার করবে। ফলে সে আত্মিক উৎকর্ষ লাভ করতে পারবে। তার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ আরো বেড়ে যাবে। কাজেই ব্যক্তিগত জীবনে যিকরের অপরিসীম গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুমিনদের তাঁর যিকর করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনে এসেছে – 'মুমিনগণ! তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর যিকর কর এবং সকাল সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা কর।[৭৩৫]

যিকরের মাধ্যমে ব্যক্তি সব সময় নিজের কাছে আল্লাহর উপস্থিতি অনুভব করে। আল্লাহর ক্ষমতা ও রহমতের ব্যাপারে তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরী হয়। কোন অবস্থাতেই সে হতাশ হয় না। জীবনধারণের জন্যে যা পায় তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন –

الا بذكر الله تطمئن القلوب 'জেনে রাখ, আল্লাহর যিকর দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।[৭৩৬]

যিকরের মাধ্যমে মানুষ যখন আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে, সাথে সাথে আল্লাহ তাআলাও তার প্রত্যুত্তর দেন। আল্লাহ বলেন – 'তোমরা আমার যিকর কর, আমি তোমাদের যিকর করব। তোমরা আমার শুকর কর এবং কুফরি কর না।[৭৩৭]

---

[৭৩৫] আল কুরআন / ৩৩ : ৪১–৪২
[৭৩৬] আল কুরআন / ১৩ : ২৮
[৭৩৭] আল কুরআন / ২ : ১৫২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা যিকরকারীর সাথে তাঁর সম্পর্কোন্নয়নের একটি সহজ চিত্র এঁকেছেন। বলেছেন– 'মানুষ যখন মনে মনে আমার যিকর করে, আমিও তার যিকর করি। সে যখন কোন দলের মধ্যে থেকে আমার যিকর করে, আমি তাকে সে দলের চেয়েও উত্তম একটি দলের মধ্যে স্মরণ করি। আমার দিকে যদি সে আধা হাত এগিয়ে আসে, তার দিকে আমি এক হাত এগিয়ে যাই। সে যদি আমার দিকে হেটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।'[৭৩৮]

শয়তানের মূল কাজই হচ্ছে মানুষকে পাপকাজের কুমন্ত্রণা দেয়া। যিকরের মাধ্যমে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন – 'শয়তান মানুষের অন্তর আঁকড়ে বসে থাকে। এরপর মানুষ যখন আল্লাহ তাআলার যিকর করে সে বিতাড়িত হয়। আর মানুষ যখন গাফিল বা উদাসীন হয়ে পড়ে তাকে কুমন্ত্রণা দেয়।'[৭৩৯]

হাদীসে এসেছে – 'একটি পাপ করলে মানুষের অন্তরে একটি করে কালো দাগ পড়ে। ব্যক্তি পাপ করতে করতে তার অন্তর কালো দাগে ভরে যায়।'[৭৪০] আল্লাহর যিকর মানুষকে এ অবস্থা থেকে রক্ষা করতে পারে। কেননা যিকরের মাধ্যমেই মানুষের অন্তরের কলুষ–কালিমা ও পাপ বিমোচিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন– 'প্রত্যেক বস্তুরই পরিষ্কারক যন্ত্র আছে। আর মানুষের অন্তর পরিষ্কারক যন্ত্র হল যিকর এবং কুরআন তিলাওয়াত।'[৭৪১]

আল্লাহর যিকর মানুষের অন্তরকে উজ্জীবিত করে। তার মধ্যে পবিত্র থাকার, পরিশুদ্ধ হওয়ার প্রবল আগ্রহ:তৈরী করে। সে সবসময় আশাবাদী এবং ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে আল্লাহর যিকরহীনতায় মানুষের অন্তর নির্জীব হয়ে পড়ে। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন –
'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালক আল্লাহর যিকর করে আর যে ব্যক্তি তাঁর যিকর করে না – তাদের দৃষ্টান্ত হল জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মত।'[৭৪২] অর্থাৎ যে যিকর করে সে জীবিত আর যে করে না মৃত মানুষ।

আল্লাহর যিকর মনুষকে আল্লাহর ভালবাসা, সন্তুষ্টি, নৈকট্য ও নিবিড় সান্নিধ্য দান করে। হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন – 'মানুষ যখন আমার প্রেমে তন্ময় হয়ে পড়ে তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলে।'[৭৪৩]

আল্লাহর যিকর মানুষকে আল্লাহর প্রিয়পাত্রে পরিণত করে। তার দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি মুক্ত হয়। ইরশাদ হয়েছে –'মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত না রাখে। যারা আল্লাহর যিকর থেকে এরূপ বিরত থাকবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত।'[৭৪৪]
অন্যত্র তিনি বলেন – 'যে ব্যক্তি আমার যিকর থেকে বিমুখ হয়ে যায় অবশ্যই তার জীবিকা সংকুচিত হবে এবং কিয়ামতের দিন তাকে আমি অন্ধ করে উঠাব।'[৭৪৫]
আল্লাহর যিকর মানুষকে জীবিকা সংকুচিত হওয়া ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করে।

আল্লাহর যিকর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইবাদত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীদের (রা) এক সমাবেশে বলেন – 'আমি কি তোমাদের এমন আমলের সন্ধান দেব যা অন্যান্য আমল থেকে উত্তম? যা আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, তোমাদের মর্যাদা সমুন্নতকারী, আল্লাহর পথে সোনা-রূপা দানের চেয়ে এবং জিহাদ থেকেও উত্তম। সে আমল হল আল্লাহর যিকর।'[৭৪৬]

---

[৭৩৮] ইমাম গাযালী (র), *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯–৮৮
[৭৩৯] প্রাগুক্ত
[৭৪০] প্রাগুক্ত
[৭৪১] প্রাগুক্ত
[৭৪২] প্রাগুক্ত
[৭৪৩] প্রাগুক্ত
[৭৪৪] আল কুরআন / ৬৩ : ৯
[৭৪৫] আল কুরআন / ২০ : ১২৪
[৭৪৬] ইমাম গাযালী (র), *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯–৮৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

যিকরের মর্যাদা ও মর্তবা এতই বেশি যে রাসূলুল্লাহ (সা) যিকরের মসলিসকে দুনিয়ার জান্নাত হিসেবে অভিহিত করেছেন। বলেছেন – 'যখন তোমরা জান্নাতের কোন উদ্যানে যাবে তখন তার ফল ভোগ করবে। সাহাবী (রা) গণ জিজ্ঞাসা করলেন – জান্নাতের উদ্যান কী? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন – জান্নাতের উদ্যান হল যিকরের মজলিস।[৭৪৭]

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন – 'আল্লাহর যিকর ছাড়া অন্যকথা বেশি বেশি বল না। কেননা আল্লাহর যিকর ছাড়া বেশি বেশি অন্য কথা অন্তর কঠিন করে দেয়। আর নিশ্চয়ই কঠিন হৃদয়ের মানুষ আল্লাহর রহমত থেকে অনেক দূরে থাকে।[৭৪৮] বেশি বেশি আল্লাহর যিকর মানুষের অন্তরকে নরম, কোমল ও সহজ করে। এমন অন্তরের মানুষের জন্যে আল্লাহ অবিরাম ধারায় রহমত নাযিল করতে থাকেন।

আল্লাহর যিকরে ব্যক্তি শুধু সওয়াবপ্রাপ্ত হয় না বরং পূর্বে করা বিভিন্ন গুনাহ থেকে ক্ষমাও লাভ করে। নিষ্ঠাপূর্ণ আল্লাহর যিকর মানুষকে উত্তম প্রতিদানের নিশ্চয়তা দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন –
'আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী; তাদের জন্যে আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।[৭৪৯]

আল্লাহর যিকর মুমিনের তাকওয়া বৃদ্ধি করে। যিকরে মানুষ আল্লাহর ক্ষমতা ও কুদরতের ওপর অধিকতর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করতে শেখে। সকল বিষয়েই চূড়ান্তভাবে সে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে। আর আল্লাহর যিকরে মানুষের ঈমান সুদৃঢ় হয়। আল্লাহ বলেন – 'নিশ্চয় মুমিন তারা, যখন তাদের সামনে আল্লাহর যিকর করা হয় তখন যাদের অন্তর কেঁপে ওঠে, যখন তাদের নিকট আল্লাহর কালাম পাঠ করা হয় তখন যাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং যারা তাদের প্রতিপালকের উপরেই ভরসা করে।[৭৫০]

যিকর ব্যক্তিগত ইবাদত হলেও সামাজিক জীবনে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কেননা 'ব্যক্তি' স্বতন্ত্র কোন সত্তা নয়। সে সমাজেরই অবিভাজ্য অংশ, অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ব্যক্তিগতভাবে যিকরের মাধ্যমে মানুষ নিজে যখন পরিশীলত, সুন্দর ও প্রশান্ত হয়ে ওঠে তখন সামাজিকভাবে শালীনতা, সৌন্দর্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে পবিত্র সমাজ, পরিচ্ছন্ন সামাজিক জীবন ও সুশৃঙ্খল সামাজিকতা প্রতিষ্ঠায় যিকর বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। কেননা যিকরে যখন ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিজন মুমিন বা অধিকাংশ সামাজিক সদস্য পরিচ্ছন্ন, পবিত্র ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হন তখন সমাজে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা, পাপাচারবৃত্তি, অন্যের ক্ষতি করার মানসিকতা, কোন ভাবে কাউকে কষ্ট দেয়ার বা স্বেচ্ছায় অন্যায় করার প্রবৃত্তি কমে যায়। আল্লাহর যিকর মানুষকে অন্যায়, পাপাচার ও অপরাধমুক্ত রাখে বলে সমাজও অপরাধমুক্ত এবং শান্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সর্বোপরি আল্লাহর নির্দেশের অনুবর্তী হয়ে যিকরের মাধ্যমে ব্যক্তি তার ওপর অর্পিত সামাজিক ও সামষ্টিক দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। ফলে পারস্পরিক সহাবস্থান, সৌহার্দ্যপূর্ণ, সহযোগিতামূলক ও সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। কাজেই সামাজিক জীবনে যিকরকে ঠিক ততটাই কার্যকর এবং গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় মনে হয় যতটা গুরুত্ব তার ব্যক্তিগত জীবনে।

বস্তুত ইসলাম যে আধ্যাত্মিক সাধনার কথা বলে, যে আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি ও শুদ্ধতার কথা বলে তার কেন্দ্র হল যিকর। আল্লাহর যিকর ছাড়া সাধনা করা যায় না। তবে মনে রাখতে হবে, আল্লাহর যিকর মানে এই নয় যে, মুখে মুখে কেবল তাঁর পবিত্র নামের তাসবীহ পাঠ করা হবে আর কাজে কর্মে তার কোন হুকুম আহকাম মানা হবে না। সালাত, যাকাত, হাজ্জ, সাওম ইত্যাদি হল আল্লাহর যিকরের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। এর সাথে সাথে আল্লাহর হুকুম মেনে তাঁর ভালবাসার অংশ হিসেবে সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা পোষণ করা, তাদের সাথে ইহসান করাও আল্লাহর যিকরের আওতাভুক্ত। কাজেই কেউ যদি আল্লাহর যিকর করার কথা বলে তাহলে তাকে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার কথাই বলতে হবে। জীবনে তাঁর সকল হুকুম নিষ্ঠার সাথে পালন করেই যিকর করা সম্ভব। আর নিষ্ঠার সাথে হুকুম পালনের জন্য যতটুকু আত্মিক সাধনা ও আন্তরিকতা প্রয়োজন ইসলাম ততটুকু আধ্যাত্মিক সাধনাকেই অনিবার্য মনে করে।

---

[৭৪৭] প্রাগুক্ত
[৭৪৮] প্রাগুক্ত
[৭৪৯] আল কুরআন / ৩৩ : ৩৫
[৭৫০] আল কুরআন / ৮ : ২

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিকতার নামে ইবাদত ও সামাজিক দায়িত্ব অস্বীকার করে লোক দেখানো যিকর করা বা সংসার ত্যাগ করাকে ইসলাম কোন ক্রমেই সমর্থন করে না।

শোকর

শোকর (شُكْر) অর্থ কৃতজ্ঞতা পোষণ করা। উপকারীর উপকার স্বীকার করা, উপকার এবং উপকারীর প্রতি বিনীত সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করা অর্থেও শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। শুকরকারীকে বলা হয় শাকির। যদি কেউ উপকার বা অনুগ্রহ করে কিংবা কোন দান করে তাহলে তার প্রতি বিনীত আচরণ করা এবং তার দান স্বীকার করাকে ব্যবহারিক অর্থে শুকর বলে।

ইসলামী শরীআতের পরিভাষায়, মহান আল্লাহ তাআলার নিআমত ও রহমতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকে শুকর বলে। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। মানুষকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। তাদের জীবন নির্বাহের জন্যে পবিত্রতম রিযক দিয়েছেন। মানুষকে দেয়া আল্লাহর এমনি ধারা নিআমতের কোন সংখ্যা নেই, সীমা নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন – 'আর যদি তোমরা আল্লাহর নিআমত গণনা কর, তাহলে তা গুণে শেষ করতে পারবে না।[৭৫১]

মূলত আল্লাহর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন মানুষের পক্ষে অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে শোকর হল নিজের অসহায় অবস্থা এবং তার বিপরীতে আল্লাহর দেয়া নিআমতের বিপুলত্বের কারণে কৃতজ্ঞতা পোষণের অক্ষমতার উপলব্ধি।

উলামাদের কেউ কেউ বলেছেন – মানুষ আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত নিআমত ভোগ করছে একথা ভালভাবে উপলব্ধি করে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মানসিক আনন্দ লাভ এবং নিআমতের যথাযথ ব্যবহারই শোকর।

মোটকথা, শোকর হল নিষ্ঠা ও বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিআমত ভোগ ও ব্যবহার করা এবং বিপুল এ নিআমতের কথা মনে রেখে আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করা।

দুঃখ ও সুখ উভয় অবস্থায় শোকর করা যায়। মানুষের দুনিয়ার সকল চেষ্টা, সাধনা, শ্রম, লেনদেন, সামাজিকতা সবকিছুরই মূল লক্ষ্য হল সুখী হওয়া। সুখ ও সমৃদ্ধি মানুষের চিরকাঙ্ক্ষিত এক বিশেষ মনঃপুত অবস্থা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ অনুগ্রহ ও নিআমত হিসেবে মানুষ সুখ লাভ করে। এমনি সুখী অবস্থায় আল্লাহর রহমত ও নিআমতের বিনিময়ে আরো বেশি আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করার মাধ্যমে শোকর বা কৃতজ্ঞতা পোষণ করার নাম সুখের অবস্থায় শোকর। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – 'তোমার শোকর করা কর্তব্য। কেননা, নিশ্চয় আমাদের জীবন, সম্পদ ও পরিজন হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সুমিষ্ট দান এবং আমাদের নিকট তাঁর গচ্ছিত আমানত।[৭৫২]

দুঃখ-বিপদ, রোগ-শোক মুমিনের জন্যে এক বিশেষ রকমের পরীক্ষা। আল্লাহ বলেন –
'আর তোমাদেরকে আমি অবশ্যই পরীক্ষা করব ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে এবং সম্পদ, জীবন ও ফল–শস্যের ক্ষতি দিয়ে।[৭৫৩]
যে জন্যে মুমিন ব্যক্তি যেমন সুখের অবস্থায় শোকর করে তেমনি দুখের অবস্থায়ও আল্লাহর শোকর অব্যাহত রাখে। কেননা, দুঃখ-বিপদ, রোগ-শোক মূলত সুখ ও আনন্দেরই পূর্বাভাস। আল্লাহ তাআলা বলেন –
'নিশ্চয় দুঃখের সাথে সুখ আছে। অবশ্যই কষ্টের পরে সুখ আসে।[৭৫৪]
কাজেই দুঃখ–শোকে হতাশায় ভেঙ্গে না পড়ে বরং ধৈর্যধারণ করাই হল দুঃখের অবস্থায় শোকর । রাসূলুল্লাহ (সা) এ প্রসঙ্গে বলেন – 'মুমিনগণ যখন সুখে থাকে তখন আল্লাহর শুক্‌রিয়া আদায় করে। আর যখন দুঃখ কষ্টে নিপতিত হয় তখন ধৈর্যধারণ করে।[৭৫৫]

আল্লাহর নিআমতের শোকর করার কতগুলো রুকন বা শর্ত বা পদ্ধতি রয়েছে। আল গাযালী (র) এ রকম তিনটি রুকনের কথা বলেছেন; যা ছাড়া সঠিকভাবে শোকর জ্ঞাপন করা সম্ভব নয়। এগুলো হল ইলম, হাল ও আমল।

---

[৭৫১] আল কুরআন / ১৪ : ৩৪
[৭৫২] ইমাম গাযালী (র), *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন,* ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫০–৯০
[৭৫৩] আল কুরআন / ২ : ১৫৫
[৭৫৪] আল কুরআন / ৯৪ : ৫
[৭৫৫] ইমাম গাযালী (র), *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন,* ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫০–৯০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

মানুষকে আল্লাহ তাআলা যে সীমাহীন নিআমত দিয়েছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জনকে ইলম বলে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, তার জন্ম, বেঁচে থাকা, বেঁচে থাকার সকল উপাদান আল্লাহর অসীম দানের অংশ। জীবনের প্রতিটি পদে, শ্বাস-প্রশ্বাসে, অণু-পরমাণুতে আল্লাহর নিআমত ভোগের পর আল্লাহর শোকর জ্ঞাপন যে তার দায়িত্ব সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ ইলমের অন্তর্ভূক্ত।

অসীম নিআমতদাতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট শোকর জ্ঞাপনের সময় যে বিনয়, নম্রতা ও আনুগত্য দেহ-মনকে আচ্ছাদিত করে ফেলে তাকে শোকরের হাল বা অবস্থা বলে। আল্লাহর শোকর জ্ঞাপনের জন্যে হাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাল ব্যতীত শোকর জ্ঞাপন নিছক নিফাকে পরিণত হয়।

শোকর জ্ঞাপনের জ্ঞান ও অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর ব্যক্তির পক্ষ থেকে শোকর জ্ঞাপনের বাহ্যিক ও আন্তরিক প্রকাশই আমল বা শোকর জ্ঞাপনের কার্যক্রম। এ পর্যায়ে ব্যক্তি আল্লাহর সকল নিআমত কেবল তাঁর নির্দেশানুসারে ব্যবহার করবে এবং তাঁর নির্দেশানুসারে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখবে। আল্লাহর নিআমত ব্যবহার হবে তাঁরই নির্দেশিত পথে। এভাবে জীবনের সকল পর্যায়ে আল্লাহর আইনের বাস্তব অনুশীলনই হল আমল বা শোকর প্রকাশক কাজ।

শুকরিয়া জ্ঞাপন বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, করতে পারা একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মানবিক গুণ। কেউ কোন উপকার করলে বা উপকার করার চেষ্টা করলে ব্যক্তি যদি সে জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহলে ব্যক্তির নিজের উদারতা ও ঔদার্যের প্রকাশ ঘটে। আর ব্যক্তিক পর্যায়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এ ধারাই ব্যক্তিকে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ে যোগ্য ও অভ্যস্ত করে তোলে। কাজেই ব্যক্তি জীবনে শোকরের বিপুল গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।
আল্লাহ তাআলা মানুষকে অসীম নিআমত দিয়েছেন এবং নিআমত ভোগের কারণে তাকে শোকর করার নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন – فاذكرونى اذكركم واشكروا لى ولاتكفرون
'কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।[৭৫৬] শোকর বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে তাই আল্লাহর নির্দেশ প্রতিপালিত হয়।

আল্লাহর বিপুল নিআমত পৃথিবীতে মানুষের জন্যে বিরাট পুরস্কার। যারা এ নিআমত ভোগের জন্যে আল্লাহর শোকর করে তাদের জন্যে আল্লাহর আরো বেশি পুরস্কারের অঙ্গীকার রয়েছে।
কুরআন মাজীদে এসেছে – وسيجزى الله الشاكرين
'আর অচিরেই আল্লাহ তাআলা শোকর বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীদের পুরস্কৃত করবেন।[৭৫৭]

আল্লাহর নিয়ামতের ভাণ্ডার অশেষ ও অসীম। কেউ যদি তাঁর নিআমত ভোগ করে শোকর করে আল্লাহ তাআলা তাকে আরো বেশি নিআমত দান করেন। আল্লাহ বলেন – لئن شكرتم لازيدنكم
'যদি তোমরা শোকর কর, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের নিআমত বাড়িয়ে দেব।[৭৫৮]

শোকরের মাধ্যমে মূলত ব্যক্তি নিজেই নিজের কল্যাণ লাভ এবং স্বার্থ সুরক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করে। আল্লাহ বলেন – 'যে ব্যক্তি শোকর করে সে তার নিজের স্বার্থেই করে। আর যে কৃতজ্ঞ হয় সে যেন জেনে রাখে যে আমার প্রতিপালন অভাবমুক্ত এবং সম্মানিত।[৭৫৯]

আল্লাহর নিআমত ভোগের বিপরীতে তাঁর শোকর করা মানুষের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। আল্লাহ বলেন –
كلوا من رزق ربكم واشكروا له
'তোমরা তোমাদের প্রভুর দেয়া রিযক ভোগ কর এবং তাঁর জন্যে শোকর কর।[৭৬০]

---

[৭৫৬] আল কুরআন / ২ : ১৫২
[৭৫৭] আল কুরআন / ৩ : ১৪৪
[৭৫৮] আল কুরআন / ১৪ : ৭
[৭৫৯] আল কুরআন / ২৭ : ৪০

Dhaka University Institutional Repository

এ জন্যে আল্লাহর শোকর না করলে কঠিন আযাবের শিকার হতে হবে। আল্লাহ বলেন – 'আর যদি তোমরা শোকর না করে অকৃতজ্ঞ হও তাহলে জেনে রাখ, নিশ্চয় আমার আযাব অত্যন্ত কঠিন।[৭৬১]

আল্লাহর নিআমতের শোকর করলে তিনি সন্তুষ্ট হন। কেননা, সাধারণভাবে কৃতজ্ঞ মানুষের সংখ্যা খুবই কম। আল্লাহ বলেন – ان الانسان لربه لكنود – 'নিশ্চয় মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।[৭৬২]
তাছাড়া শয়তানও সবসময় মানুষকে অকৃতজ্ঞ হতে প্রলুব্ধ করে। শুক্‌রিয়া না করে কুফরি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের জন্য কুমন্ত্রণা দেয়। সে জন্যে কৃতজ্ঞদের প্রতি আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন।

আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান পোষণের অনিবার্য দাবি হল আল্লাহর নিআমতের শোকর করা। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন – 'মুমিন ব্যক্তি তো সে, যদি তাকে সুখ স্পর্শ করে; সে শোকর করে। আর যদি সে দুঃখে পতিত হয় তাহলে সবর করে।[৭৬৩] দুঃখ-শোকে সবর করাই হল শোকর করা। কাজেই ঈমানের দাবি পূরণে মুমিন সুখে ও দুখে শোকর করবে।

শোকরকারীর জন্যে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে বিশেষ মযার্দাদানের ব্যবস্থা রেখেছেন। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – 'যে ব্যক্তি পানাহারের পর আল্লাহর শোকর করে তার মর্যাদা ধৈর্যশীল সাওম পালনকারীর সমান।[৭৬৪]

শোকরের মাধ্যমে ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেন – 'আল্লাহ তোমাদের যে হালাল ও পবিত্র খাবার দিয়েছেন তা খাও এবং তোমরা যদি শুধু আল্লাহরই ইবাদত কর তাহলে আল্লাহর নিয়ামতের শোকর কর।[৭৬৫]
শোকর সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার অব্যর্থ হাতিয়ার। সমাজের লোকেরা যদি আল্লাহর প্রতি এবং নিজেদের প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণের এ ধারা অব্যাহত রাখে তাহলে সমাজ শান্তি, সৌহার্দ্য, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার পবিত্র আলোয় উদ্ভাসিত না হয়ে পারে না।
রাসূলুল্লাহ (সা) এ জন্যে মানুষের পারস্পরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।
কাজেই সমাজজীবনে শোকর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। কেননা সমন্বিত শোকরের ধারা সমাজকে প্রকৃত শান্তির কাঙ্ক্ষিত সমাজে পরিণত করতে পারে। সামাজিক অনাচার ও অপরাধ হ্রাস এবং সামগ্রিক উন্নতিতে এটি অবদান রাখতে পারে। কেননা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ মানুষ যেমন আল্লাহর হুকুম লংঘন করে না তেমনি উপকারকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ মানুষও উপকারীর ক্ষতি করে না। তার উপকার করে নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করে। ফলে সমাজ উন্নত হয় এবং অপরাধ কমে আসে।

কর্তব্যপরায়ণতা

আল্লার তাআলার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। বিশ্বজাহানের অন্যসকল বস্তু ও বিষয়কে মানুষের কল্যাণ, উপকার ও ভোগের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সকল কিছুর ওপর মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। দুনিয়াতে মানুষ আল্লাহর খলীফা মনোনীত হয়েছে। যে জন্যে দুনিয়ার জীবনের সকল পর্যায় ও বিভাগে মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সীমা পরিসীমা বিস্তৃত, পরিব্যাপ্ত। এ দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান এবং তা পালনের আন্তরিক উদ্যোগই কর্তব্যপরায়ণতা।
কর্তব্য হল এমন বিষয় যা পালন করা স্বভাবতই মানুষের দায়িত্বভুক্ত। আর দায়িত্বভুক্ত বিষয়সমূহ পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা হচ্ছে কর্তব্যপরায়ণতা। কর্তব্য অর্থ করণীয়। যে সব কাজ বা বিষয় সম্পন্ন করা অপরিহার্য তাকে কর্তব্য বলা যায়। কাজেই কর্তব্যপরায়ণতার অর্থ হবে কাজ সম্পাদনে সচেতনতা, আগ্রহ ও আত্মনিয়োগ।

---

[৭৬০] আল কুরআন / ৩৪ : ১৫
[৭৬১] আল কুরআন / ১৪ : ৭
[৭৬২] আল কুরআন / ১০০ : ৬
[৭৬৩] ইমাম গাযালী (র), *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.২৫০–৯০
[৭৬৪] প্রাগুক্ত
[৭৬৫] আল কুরআন / ১৬ : ১১৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিভাষায়, মানুষের জীবনধারণ ও জীবন পরিচালনা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে শান্তি ও মুক্তি লাভের পক্ষে যা কার্যকর ও কল্যাণকর – সে সকল বিষয়ের পরিচর্যা, লালন ও অনুশীলন হল কতর্ব্য আর কল্যাণকর এ সকল কাজ সম্পাদনের জন্যে যে আত্মসচেতনতা ও একনিষ্ঠ দায়িত্ববোধ তাই কতর্ব্যপরায়ণতা।

মানুষের সবরকম কর্তব্য সাধারণভাবে দুভাগে বিভক্ত। হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ।

আল্লাহর প্রতি মানুষের কর্তব্য হল হাক্কুল্লাহ। আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে দিয়েছেন বিপুল সম্মান ও অসীম নিআমত। এ সব কিছুই তিনি করেছেন একটি বিশেষ লক্ষ্যে। আল্লাহ বলেন –

و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

'জিন্ন ও মানুষজাতিকে আমি কেবল এ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি যে, তারা শুধু আমারই ইবাদত করবে।'[৭৬৬]

বস্তুত আল্লাহর প্রতি মানুষের কর্তব্য পালনের অর্থ হবে আল্লাহর ইবাদত করা। এ জন্যে মানুষ সামগ্রিক জীবনে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে চলবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ যা করার আদেশ দিয়েছেন তা করবে আর যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকবে। আর নিজের সার্বিক সত্তা আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে সর্বাবস্থায় তাঁর অনুগ্রহ কামনা করবে।

হাক্কুল ইবাদ হল মানুষের প্রতি মানুষের এবং মানুষ ছাড়া অন্যান্য মানবেতর সৃষ্টির প্রতি মানুষের কতর্ব্য। মানুষ সামাজিক জীব। সে একা বাস করতে পারে না। তাছাড়া কোনা মানুষই সকল মানবিক প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর নয়। সমাজে মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে। মাতাপিতা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী এদের সকলের প্রতিপালন করার জন্য আল্লাহ তাআলা সুনির্দিষ্ট কর্তব্য নির্দেশ করেছেন। পরস্পর সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের কথা বলেছেন। এ সবই হাক্কুল ইবাদের অন্তর্ভুক্ত। আবার মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা। পৃথিবীর সকল সৃষ্টির ওপর আল্লাহ মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, প্রয়োজন মত ভোগ ও ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। সে জন্যে এ সকল মানবেতর সৃষ্টির প্রতিও মানুষের কতর্ব্য রয়েছে। এগুলো সংরক্ষণ এবং যথাযথ ব্যবহারও তাই হাক্কুল ইবাদের আওতাভুক্ত।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুনিয়ার খিলাফত দিয়েছেন। তাদেরকে বল্গাহীনভাবে ছেড়ে দেন নি। সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। সাথে সাথে এ ঘোষণাও দিয়েছেন যে, কারো উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন না করার জন্য অন্য কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না বা দায়ী করা হবে না। এ জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকেই দায়ী করা হবে। মানুষ হিসেবে দুনিয়াতে কেউ ই দায়িত্বহীন নয়। এ সকল দায়িত্ব পালন করা বা না করার উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির সফলতা বা ব্যর্থতা। যে জন্য ব্যক্তি জীবনে কর্তব্যপরায়ণতার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

কর্তব্য পালন করা বা না করার ওপর ব্যক্তির উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে। ব্যক্তি যদি নিজের দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করে তাহলে তার সামগ্রিক অবস্থা ও অবস্থানের উন্নতি হয়। পড়াশোনা, ব্যবসায়, চাকরি, শিক্ষকতা – সে যাই করুক তার নিশ্চিত উন্নতি ঘটে। অন্যদিকে কর্তব্যে অবহেলা বা কর্তব্য পালন না করলে বিপর্যয় ও অবনতি অনিবার্য হয়ে ওঠবে। কাজেই ব্যক্তিগত উন্নতির ক্ষেত্রে কতর্ব্যপরায়ণতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়।

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন প্রভৃতি মৌলিক মানবিক চাহিদাসমূহ পূরণের জন্যেও কর্তব্যপরায়ণ হওয়া জরুরী। কেননা, কর্তব্যপরায়ণতা ছাড়া এমন অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আশা করা যায় না যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে এ সকল চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়ে ওঠে।

জন্মগতভাবেই প্রতিটা মানুষ কিছু না কিছু প্রতিভার অধিকারী। কর্তব্যপরায়ণ হওয়া ছাড়া ব্যক্তির এ প্রতিভার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটা সম্ভব নয়। কর্তব্যে অবহেলা প্রতিভাবান ব্যক্তির সম্ভাবনা বিনষ্ট করে। বিকশিত মেধা ও প্রতিভার লালন কর্তব্যপরায়ণতা ছাড়া হয়ে ওঠে না।

---

[৭৬৬] আল কুরআন / ৫১ : ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

ঠিকমত দায়িত্বপালন না করলে মানুষকে বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়। প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য অসম্পন্ন থাকলে নানারকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। জীবন দুর্বিষহ ও অশান্তিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কর্তব্যপরায়ণতা যেমন নতুন কোন সমস্যা সৃষ্টি হতে দেয় না তেমনি সৃষ্ট সমস্যার সমাধানও দেয়।

অন্যান্য মানুষের নিকট ব্যক্তির বিশ্বস্ততা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্যেও কর্তব্যপরায়ণতা গুরুত্বপূর্ণ। কর্তব্যপরায়ণ মানুষের দায়িত্বশীলতা বিষয়ে অন্যরা আস্থাশীল থাকে। তার ওপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিত থাকে। তার ওপর নির্ভর করতে ভালবাসে। কর্তব্যপরায়ণতা সর্বস্তরে তাকে গ্রহণীয় করে তোলে।

ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষই সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করার সুবিধা পায়। সমাজ থেকে বিভিন্ন উপকার গ্রহণ করে। সামাজিকতা ব্যক্তি জীবনকে সহজ ও শান্তিময় করে। এজন্যে সমাজের প্রতিও মানুষকে কিছু কতর্ব্য পালন করতে হয়। এটা সমাজের প্রতি স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতাবোধজাত বিষয়। তাই সমাজ, সামাজিকতা এবং সমাজের সদস্য মানুষদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যেও কর্তব্যপরায়ণতা গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়।

মানুষের মধ্যে পাশবিক ও মানবিক এ দু'রকমের গুণের সমাবেশ রয়েছে। ব্যক্তির কর্তব্যপরায়ণতা তার মানবিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ করে। কেননা, কর্তব্যে অবহেলাকারী দায়িত্বহীন মানুষ পশুর মত। পশু যেমন কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানহীন; কর্তব্যে অবহেলাকারীও তেমনি। সুতরাং কর্তব্যপরায়ণতা হল মানবিক মূল্যবোধের রক্ষাকবচ।

পৃথিবীতে সকল মানুষই কোন না কোনো বিষয়ে দায়িত্বশীল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন –

الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকেই তার নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[৭৬৭]

প্রকৃতই দুনিয়ার প্রতিটি মানুষই বিভিন্ন রকমের বৈষয়িক, ধর্মীয়, নৈতিক ও সামষ্টিক দায়িত্ব নিয়ে দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছে। এ সকল দায়িত্ব পালন ছাড়া আখিরাতে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়।

ব্যক্তিজীবনের মত সামাজিক জীবনে কর্তব্যপরায়ণতার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কোন সমাজে যদি কর্তব্যপরায়ণ লোক বেশি হয় বা সব লোকই কর্তব্যপরায়ণ হয় তাহলে সে সমাজের উন্নতি,শান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি অনিবার্য হয়ে পড়ে। একইভাবে কোন সমাজের লোকেরা যদি কর্তব্যে অবহেলা করে তাহলে সে সমাজ বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। সেখানে সুস্থ বুদ্ধির কোন মানুষ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে না।

সমাজের সর্বস্তরে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্যে কর্তব্যপরায়ণতার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কর্তব্য পালনে অবহেলা সমাজে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ব্যক্তির অবস্থা ও সামাজিক পদমর্যাদাভেদে তার খামখেয়ালি এবং কর্তব্যে অবহেলা বিভিন্ন পর্যায়ে অরাজকতা সৃষ্টি করে। কর্তব্যপরায়ণতা এ অব্যবস্থা রোধ করে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে।

কর্তব্যপরায়ণতা সমাজের সদস্যদের মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণ করে। রাষ্ট্র প্রশাসনের দায়িত্বহীনতা জনগণের মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। দেশের মানুষ খাবার, পোশাক, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদনের অধিকার বঞ্চিত হয়। রাষ্ট্র-সমাজ এবং সামাজের সকল পর্যায়ের মানুষের মধ্যে কর্তব্যপরায়ণতার অনুশীলন হলে মানুষের মানবিক অধিকারসমূহ অক্ষুণ্ন থাকে

কর্তব্যপরায়ণতা বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও মূলোৎপান করে। যেমন – শরীআত চুরির জন্যে হাত কাটা, ব্যভিচারে বেত্রাঘাত, হত্যার জন্যে প্রকাশ্যে হত্যা, মদ্যপানে বেত্রাঘাত ও অন্যান্য অপরাধের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। এ সকল শাস্তি কার্যকর করা রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্বে অবহেলা সমাজে চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, মাদকাসক্তি, ব্যভিচার প্রভৃতি জঘন্য অপরাধ বৃদ্ধি করে। শাসকবর্গের প্রয়োজনীয় কর্তব্যপরায়ণতা এ সকল সামাজিক অপরাধ নির্মূল করতে পারে।

---

[৭৬৭] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইতিসাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জনে কর্তব্যপরায়ণতা একটি অপরিহার্য বিষয়। যে কোন দেশ, জাতি ও সমাজের উন্নতি, অগ্রগতি ও স্থিতিশীলতার পূর্বশর্ত হল তাদের প্রত্যেকের কর্তব্যপরায়ণতা। প্রত্যেকে কর্তব্যপরায়ণ হলে প্রতিটি পর্যায়ের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সুচারু দক্ষতার ছাপ পাওয়া যাবে। প্রশাসনে, প্রতিষ্ঠানে, ব্যবসায়, পরিবহণে কর্মকর্তা – কর্মচারীরা কর্তব্যপরায়ণ হলে জাতীয় উন্নতি সাধিত হয়। সামষ্টিক পর্যায়ে কর্তব্যপরায়ণতা না থাকলে সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব ও সমৃদ্ধির পরিবর্তে যুলুম, শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়ন, সামাজিক অধঃপতন প্রভৃতি নেমে আসে। কাজেই সামাজিক ও সামষ্টিক উন্নয়নে কর্তব্যপরায়ণতার বিকল্প নেই।

কর্তব্য পালনে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করে। সমাজের সদস্যরা নিজেদের অধিকার হারানোর চেয়ে অধিকার বুঝে পাওয়ার নিশ্চয়তা পায়। ফলে জনজীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নেমে আসে।

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা। সৃষ্টিগতভাবে মানুষ অসামান্য মর্যাদার ধারক। মানুষকে আল্লাহ বিপুল দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এ দায়িত্ব পালন করলে আল্লাহ তাআলা মানুষের মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দেবেন। তাছাড়া আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে মর্যাদা দিয়েছেন সে মর্যাদা সংরক্ষণের জন্যেও কর্তব্যপরায়ণতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কর্তব্যপরায়ণতা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। নিজের প্রতি, সন্তান, মাতাপিতা, স্বামী-স্ত্রী, ছোটোবড়, আত্মীয়-প্রতিবেশী, দুস্থ ও অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি মানুষের বিস্তারিত কর্তব্য রয়েছে। এ সকল কর্তব্য পালন করলে সমাজে সুস্থতা, স্থিতিশীলতা, গতিশীলতা ও সচ্ছলতা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সমাজ পরিণত হবে আদর্শ সমাজে।

মুসলিম জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল, মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া। এ দায়িত্ব পালন সমাজকে সৎকাজের উপযোগী করে, সমাজ থেকে অন্যায়-অশালীন ও অমঙ্গল কাজ দূর করে। সুতরাং অন্যায়-অনাচারমুক্ত এবং সৎকাজের প্রেরণাদায়ক সমাজ বিনির্মাণেও কর্তব্যপরায়ণতার আবশ্যকতা প্রতীয়মান হয়।

কর্তব্যে অবহেলার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। ব্যক্তি ও সমাজজীবনে তা অকল্পনীয় বিপর্যয় এবং অশান্তি সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রের জনগণের মৌলিক মানবাধিকার পূরণ করা রাষ্ট্রপতির কর্তব্য। তাদের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা দেয়া, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করাও রাষ্ট্রপতির কর্তব্য। রাষ্ট্রপতি যদি এ কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শন করে তাহলে দেশের স্বাধীনতা যেমন হুমকির মুখোমুখি হয় তেমনি সর্বসাধারণের জীবনও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে।

মাতাপিতার কর্তব্য সন্তানকে সুসন্তান করে গড়ে তোলা। তাঁরা এ কর্তব্যে অবহেলা করলে সন্তান বিপথগামী ও সন্ত্রাসী হয়ে সমাজের শান্তি বিনষ্টের কারণ হয়।

শিক্ষকের কর্তব্য হল শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষা দেওয়া। শিক্ষক কর্তব্যে অবহেলা করলে শিক্ষার্থী কুশিক্ষা পেয়ে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করবে।

ব্যক্তির মধ্যে এ প্রবণতা থাকলে তার পক্ষে উন্নতি লাভ সম্ভব হয় না। সে পড়াশোনা, ব্যবসায়, শিক্ষকতা, চাকরি বা অন্যকোন পেশাতে সফলতা পায় না। বরং তার কর্তব্যে অবহেরার জন্যে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন রকম সমস্যার শিকার হয়। সে ড্রাইভার হলে তার অবহেলায় যাত্রীরা আহত–নিহত হয়। চিকিৎসক হলে ভুল চিকিৎসায় বা ভুল চিকিৎসায় লোকজন প্রাণ হারায়। ভোজ্য পণ্য উৎপন্নকারী হলে তার উৎপাদিত ভেজাল ও মানহীন পণ্য জনস্বাস্থ্য ও জনস্বার্থের জন্যে বিপুল হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

অবহেলাকারী শিক্ষার্থী হলে সে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করে না, বরং পরে করার আশায় কাজ ফেলে রাখে। ফলে চূড়ান্ত মুহূর্তে তাকে আশ্রয় নিতে হয় নকলের।

কর্তব্যে অবহেলাকারী দুনিয়াতে বিভিন্ন পর্যায়ে অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হয় এবং তার সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা ও অপমানের কারণ হবে আখিরাতের ব্যর্থতা। পৃথিবীতে যারা কর্তব্যে অবহেলা করে আল্লাহ তাআলা পরকালে তাদেরকে কঠিন, লাঞ্ছনাপ্রদ চিরস্থায়ী শাস্তি দেবেন। তাদের স্থায়ী আবাস হবে জাহান্নাম। সুতরাং দুনিয়ার জীবনে যেমন তেমনি আখিরাতের জীবনেও সাফল্য লাভের জন্যে কর্তব্যপরায়ণ হওয়ার বিকল্প নেই।

Dhaka University Institutional Repository

হালাল ও হারাম উপার্জন

হালাল (حلال) অর্থ বৈধ বা সিদ্ধ। আইনানুগ বা অনুমোদিত বিষয়। পবিত্র, গ্রহণযোগ্য, যথার্থ বা সঙ্গত অর্থেও হালাল শব্দটির ব্যবহার রয়েছে।

ইসলামী শরীআতের পরিভাষায়, যে সব বিষয় বৈধ হওয়া কুরআন মাজীদ ও হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় তাকে হালাল বলে। আল্লাহ তাআলা ও রাসূলুল্লাহ (সা) যেসব কাজের অনুমতি দিয়েছেন এবং যেসব কাজ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন নিষেধাজ্ঞা দেন নি তাকে হালাল বা বৈধ বলে। হালাল যেমন কাজ হতে পারে তেমনি তা কথা বা বস্তুও হতে পারে। ব্যবসায়, চাকরি, শিক্ষকতা হল হালাল কাজ। ন্যায় ও সত্য বলা হচ্ছে হালাল কথা আর হালাল বস্তু হল গরুর গোশত, মাছ, চাল, ডাল ইত্যাদি।

হালাল উপার্জন হল বৈধ ও সিদ্ধ পথে জীবিকা অর্জনের উপায়। আইনসম্মত পদ্ধতিতে কেবল হালাল বিষয় অর্জনও হালাল উপার্জন। এর সরাসরি সম্পর্ক সম্পদ অর্জনের সাথে। কাজেই আল্লাহ তাআলা ও রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশিত ও অনুমোদিত পন্থায় কুরআন ও সুন্নাহর মূলনীতি অনুযায়ী যে উপার্জন করা হয় তাকে হালাল উপার্জন বলা যায়।

হালাল উপার্জন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। উপার্জন হালাল না হলে প্রকৃত পক্ষে কোন মানুষের পক্ষে সৎ, শান্তি পূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ ঈমানদারের জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। দুনিয়া ও আখিরাতের স্থায়ী সুখ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে উপার্জন হালাল হওয়া জরুরী। সামাজিক অনাচার নির্মূল করা এবং অর্থের লাগামহীন অপচয় – অপব্যয় নিরোধেও হালাল উপার্জন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যে জন্যে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে হালাল উপার্জনের বিপুল গুরুত্ব ও সীমাহীন উপকারিতা রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে হালাল জীবিকা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন –

'হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমি যে পবিত্র জীবিকা দিয়েছি তা থেকে খাও। আর যদি তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদতই কর তবে তাঁর শোকর কর।'[৭৬৮] হালাল খাদ্য পানীয় গ্রহণের জন্যে প্রথমে হালাল উপার্জন প্রয়োজন। কাজেই হালাল উপার্জনে আল্লাহর নির্দেশ প্রতিপালিত হয়।

আনুষ্ঠানিক সকল ফরয ইবাদত যেমন সালাত, সাওম, যাকাত ও হাজ্জ প্রভৃতির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত হল হালাল উপার্জন। কেবল ঈমান গ্রহণের বিষয়টি এর চেয়ে বেশি গুরুত্ব পেতে পারে।

হালাল উপার্জন মানুষকে কর্মপ্রেরণা দেয়। কেননা, উপার্জন হালাল রাখার জন্যে ব্যক্তিকে কাজ করতে হয়। কায়িক বা বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম দিতে হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) প্রত্যেক মুসলিমকে তাই ঘুমোতে যাবার আগে নিজের ও নিজের পরিবারের জন্যে হালাল জীবিকা নিশ্চিত করতে বলেছেন।

হালাল উপার্জনে কায়িক শ্রম ব্যয় হয়। ইসলামে শ্রমলব্ধ হালাল উপার্জনকেই সর্বোত্তম উপার্জন বিবেচনা করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – 'দুহাত দিয়ে উপার্জিত খাবারের চেয়ে উত্তম খাবার কেউ কোন দিন খায় নি।'[৭৬৯]

হালাল উপার্জনের বাধ্যবাধকতা লোকদের চাকরির পাশাপাশি ব্যবসায়– বাণিজ্য, পশু পালন, হাঁস-মুরগির খামার প্রতিষ্ঠা, মাছ চাষ, গাছ লাগানো, বিভিন্ন ধরনের নার্সারি, কুটির শিল্প প্রভৃতি উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার প্রেরণা দেয়। এর ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত হয়।

হারাম উপার্জন সবসময় মানুষকে অস্বস্তিঃ ও অরাজকতার মধ্যে রাখে। বিপুল ভয় তাকে তাড়া করে বেড়ায়। সব সময় তার অবৈধ পথ ও উপায় মানুষের সামনে প্রকাশ হওয়ার ভয়ে সে তটস্থ থাকে। তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। হালাল উপার্জনে এ রকম ভয়, দ্বিধা ও অশান্তি থাকে না। মানুষ নির্দ্বিধায় নির্বিবাদে তার উপার্জন ভোগ করে। প্রশান্তি তে তার হৃদয় মন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

মানুষ যদি হালাল উপার্জন করে, হালাল জীবিকাই গ্রহণ করে তাহলে তার ইবাদত কবুল হবে। যদি সে হারাম উপার্জন করে, হারাম জীবিকা গ্রহণ করে; তার ইবাদত কবুল হবে না। হাদীসে সুস্পষ্ট ভাষায় বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়ে

---

[৭৬৮] আল কুরআন / ২ : ১৭২

[৭৬৯] ইমাম গাযালী (র), *এহইয়াউ উলূমিদ্দীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৭–৭৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

বলা হয়েছে – 'কোন ব্যক্তি যদি দশ দিরহাম দিয়ে একটি কাপড় কিনে আর এ দশ দিরহামের একটি দিরহাম হয় হারাম উপার্জন, তাহলে যতদিন তার পরিধানে এ কাপড়টি থাকবে সে ব্যক্তির সালাত কবুল হবে না।[৭৭০]

হালাল উপার্জন পৃথিবীর লোকদের নিকট যেমন ব্যক্তির মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয় তেমনি আল্লাহ তাআলাও তাকে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন – 'যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন দিয়ে তার পরিবার প্রতিপালনের চেষ্টা করে সে যেন আল্লাহর পথের মুজাহিদ।[৭৭১]

হালাল উপার্জন কেবল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতই নয় যার মাধ্যমে শুধু সওয়াব ও মর্যাদাই লাভ করা যায়, বরং এটি এমন ইবাদত যা পূর্বেকৃত বিভিন্ন গুনাহ থেকে ক্ষমা লাভের কারণ হয়ে যায়।

হালাল উপার্জন করলে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা হয়। আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা) এর আদর্শের অনুসরণ করা হয়। আর যারা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।

মানুষ যদি হালাল উপার্জন করে সে সওয়াব পায়। এমনকি এর মাধ্যমে সে ইবাদত কবুল এবং গুনাহ মাফের নিশ্চয়তাও পায় – যার অনিবার্য পরিণাম হল আখিরাতে সাফল্য লাভ। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – 'বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে থাকবে।'[৭৭২]

প্রতারণা না করে, মিথ্যা না বলে, অপরকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে, কোন অবৈধ ও অন্যায় পথ অবলম্বন ব্যতীত যে কোন হালাল পেশা অবলম্বন করে অর্থোপার্জন করলে সে উপার্জনই হালাল উপার্জন হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন – ব্যবসায়, শিক্ষকতা, চাকরি কিংবা অন্য যে কোন হালাল পেশা। কোন ব্যবসায় যদি জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় তা হালাল হবে না। শিক্ষকতা, চাকরি বা অন্য পেশাতেও যদি অর্পিত দায়িত্ব ঠিকমত পালন করা না হয় তাহলে তাও হালাল হবে না। কাজেই হালাল উপার্জনের উপায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, যে কাজ করা হবে সেটা হালাল হতে হবে এবং যেভাবে করা হবে তথা কাজের প্রকৃতি ও পদ্ধতিও হালাল হতে হবে। তাহলেই তা হালাল উপার্জনের মাধ্যমে হতে পারে। প্রকৃতি ও পদ্ধতি হালান না হলে হালাল কাজের অর্জনও হারাম হয়ে যাবে।

হারাম (حرام) অর্থ অবৈধ, নিষিদ্ধ। এটি হালালের বিপরীতার্থক শব্দ। অসিদ্ধ, আইন বিরুদ্ধ, অসঙ্গত, অযথার্থ, অপবিত্র প্রভৃতি অর্থেও শব্দটির ব্যবহার রয়েছে।
পরিভাষায় – যে সকল বিষয় কুরআন-হাদীস দ্বারা পরিষ্কারভাবে অবৈধ প্রমাণিত তাকে হারাম বলে। হারাম কথা, কাজ, বস্তু ও বিষয় সুনির্দিষ্ট। হালাল যেমন সংখ্যাতীত, হারাম তেমন নয়। মিথ্যা বলা, গীবত করা হারাম কথার উদাহরণ। সুদ, ঘুষ, চুরি, প্রতারণা প্রভৃতি হল হারাম কাজ। হারাম বস্তু হচ্ছে শোকর, রক্ত, মদ। আর অশ্লীল-অশালীন সবকিছুই হারাম বিষয়ের অর্ন্তভুক্ত।
হারাম বা অবৈধ উপায়ে জীবিকা অর্জনকে বলা যায় হারাম উপার্জন। কুরআন মাজীদ ও হাদীসে যে পথ ও পদ্ধতিতে জীবিকা অর্জনকে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে সে সকল হারাম পদ্ধতিতে অর্জন করা জীবিকাই হারাম উপার্জন।

হালাল উপার্জন যেমন ব্যক্তির দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে সুফল ও উপকার বয়ে নিয়ে আসে বিপরীত দিকে হারাম উপার্জন তেমনি নিয়ে আসে নানাধরনের কুফল আর অপকার।
হারাম উপার্জনের প্রথম ও প্রধান কুফল হচ্ছে হারাম উপার্জনকারীর ইবাদত আল্লাহ তাআলা কবুল করেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) বিষয়টির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। বলেছেন – 'মানুষ দীর্ঘপথ অতিক্রম করে কা'বায় আসে এবং দুআ কবুলের আশায় অবিন্যস্ত চুলে ধূলি ধুসরিত অবস্থায় আকাশের দিকে দু'হাত তুলে ধরে বারবার বলতে থাকে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার রব! অথচ তার খাবার হারাম, তার পানীয় হারাম, হারাম তার পোশাক এমনকি সে লালিত পালিত হয়েছে হারাম ভাবে! এমন ব্যক্তির দুআ কীভাবে কবুল হবে?[৭৭৩]

---

[৭৭০] প্রাগুক্ত
[৭৭১] প্রাগুক্ত
[৭৭২] প্রাগুক্ত
[৭৭৩] ইমাম গাযালী (র), *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৭–৭৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

হারাম উপার্জনকারী ব্যক্তির স্থায়ী আবাস হয় জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন 'যে গোশত হারাম জীবিকা দ্বারা গঠিত তা বেহেশতে প্রবেশ করবে না। আর হারাম জীবিকায় গঠিত প্রতিটি গোশতের জন্যে উপযুক্ত আবাস হল জাহান্নাম।[৭৭৪]

আল্লাহ তাআলা হারাম উপার্জন করতে নিষেধ করেছেন। এতে একদিকে যেমন আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করা হয় অন্যদিকে তেমনি অনুসরণ করা হয় নিজের কুপ্রবৃত্তিরও। কেননা, শয়তান ও কুপ্রবৃত্তি সবসময় মানুষকে হারাম কাজেরই প্রেরণা দেয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন – 'হে মানুষ! পৃথিবীতে যা আছে তা থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও এবং শয়তানের পথ অনুসরণ কর না। নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৭৭৫]

হারাম উপার্জনে ক্ষতির কোন সীমা –পরিসীমা নেই। হারাম উপার্জন ও ভক্ষণ ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির জন্যে চরম ক্ষতিকর। এর ফলে সামাজিক শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক উন্নতি অসম্ভব হয়ে পড়ে। লোকদের পারস্পরিক আস্থা নষ্ট হয়। মানুষের কাছে অপমানিত হতে হয়। এমনকি পরকালেও অপমানিত হতে হয়।

হারাম উপার্জন অন্যায় পথে হয় বলে তা নিয়ে ব্যক্তির দুঃশ্চিন্তার সীমা থাকে না। উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা ও ভয় তার মানসিক শান্তি নষ্ট করে। হারামভাবে উপার্জিত অর্থ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হয় কম। হারাম উপার্জনকারীরা নির্দ্বিধায় অপচয় ও অপব্যয়ের নিষিদ্ধ প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই বা অন্যের অধিকার হরণ করে যে উপার্জন করা হয় তা হরাম। এ উপার্জনের সাথে জড়িত থাকে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের অভিশম্পাত। আল্লাহ তাআলা ও রাসূলুল্লাহ (সা) অভিশাপ দিয়েছেন ঘুষদাতা, গ্রহীতা ও তার সাক্ষীদের। এমনকি আকাশের ফেরেশতা পর্যন্ত প্রতারক ব্যবসায়ীদের জন্যে আল্লাহর লানত কামনা করে। পৃথিবীর কোন বিবেকবান মানুষই হারাম উপার্জনকারীকে ভালবাসে না। ভাল চোখে দেখে না। সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য লাভের জন্যেই হারাম উপার্জন বর্জন করতে হবে।

তাযকিয়া নফস, তাসাউফ ও আধ্যাত্মিকতা

ইসলামী আধ্যাত্মিকতার মূল কথা এবং একমাত্র লক্ষ্য হল তাযকিয়া ই নফস বা আত্মার পরিশোধন। কেননা আত্মা শুদ্ধ না হলে মানুষের কোন কাজ কবুলযোগ্য হয় না। সে কাজ দেখতে যত সুন্দর ও শোভন হোক, সে কাজ করে ব্যক্তি যত প্রশংসা আর সুনামই কুড়াক না কেন আল্লাহর কাছে তার কোন মূল্য নেই। অন্তর শুদ্ধ করার ব্যাপারে কুরআন মাজীদে দেয়া তাকীদ এবং ইবাদত কবুলের শর্ত হিসেবে আত্মিক শুদ্ধতাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়ায় এ বিষয়টির গুরুত্ব নিয়ে আর কোন সংশয় থাকে না। ইসলামী আধ্যাত্মিকতা আর তাযকিয়া ই নাফস তাই অনেকটাই সমার্থক বিষয়।

কিন্তু প্রচলিত ব্যবহার ও পরিচিতিতে তাযকিয়া ই নাফস অভিধাটির পরিবর্তে 'তাসাউফ' পরিভাষাটিই বেশি পরিচিত। সূফী বলতে সাধারণভাবে মানুষ আধ্যাত্মিক সাধকদের বুঝে থাকেন। অথচ কুরআন মাজীদ, হাদীস বা অন্য কোথাও এমনকি রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর সাহাবী (রা) দের জীবন দর্শনে, যাপিত জীবনে এ শব্দটির ব্যবহার দেখা যায় না। তাঁদের কাউকে কখনোই সূফী নামে ডাকা হত না। এমনি প্রেক্ষিতে তাসাউফ সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা, এর বিভিন্ন নীতি আদর্শ, কর্ম পদ্ধতি এবং তাযকিয়া ই নাফসের বিধি পদ্ধতি মূল্যায়ন করা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

তাসাউফ পরিচিতি

তাসাউফ (تصوف) শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। সাধারণত এটিকে صوف (সুফ) থেকে উদ্ভূত শব্দ তনে করা হয়। সুফ অর্থ পশম বা ডড়ড়ষ। কাজেই তাসাউফের শাব্দিক অর্থ হল অভ্যন্তরূপে পশমী পোশাক পরিধান করা। যারা পরিধান করেন তাদের বলা হয় সূফী। সূফীরা পশমি পোশাক পরতেন। এটাকে তারা গ্রহণ করেছিলেন কৃচ্ছতাপূর্ণ

---

[৭৭৪] প্রাগুক্ত

[৭৭৫] আল কুরআন / ২ : ১৬৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

অবিনাশী জীবনের প্রতীক হিসেবে। কিন্তু তাদের এ অভ্যাসই শুধু তাদেরকে সূফী হিসেবে পরিচিত করে নি। বরং তাদের উচ্চ মার্গের সাধনাই এক্ষেত্রে বেশি ভূমিকা পালন করেছ। এজন্যে কোন কোন শব্দতত্ত্ববিদ বলেছেন তাসাউফ হচ্ছে একটি শব্দ সংক্ষেপ। এর প্রতিটি বর্ণ এক একটি স্বতন্ত্র ভাব বহন করে। যেমন ت বর্ণ দ্বারা তাকওয়া (আল্লাহর প্রেমজনিত শংকা), তাওয়াক্কুল (আল্লাহ নির্ভরতা), তাওবা (কৃতপাপের জন্য অনুশোচনা), ص দ্বারা সবর (ধৈর্য), সাফা (পবিত্রতা), و দিয়ে ওয়াকফ (উৎসর্গ করা) এবং ف দিয়ে ফিকহ (দীনের গভীর জ্ঞান), ফিকির (চিন্তা গবেষণা) প্রভৃতি বিষয় বুঝানো হয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি নিরন্তর সাধনায় চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে দীনের গভীর জ্ঞান লাভ করে, আল্লাহ নির্ভরতা ও কৃতপাপের অনুশোচনা যাকে পবিত্র করে এবং ধৈর্য ধারণের শক্তি দেয়; সর্বোপরি যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাকে সূফী বলা যাবে। তার মধ্যে তাসাউফ বাস্ত বরূপ পেয়েছে। অবশ্য তাসাউফ শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কিত উল্লিখিত মতামত অধিকাংশের নিকট গৃহীত হলেও তা অবিসংবাদিত নয়। এক্ষেত্রে ভিন্নমতও লক্ষ করা যায়।

মুল্লাহ জামি[৭৭৬] বলেন – صفاء (সাফা) শব্দ থেকে তাসাউফ শব্দটি উৎপত্তি লাভ করেছে। সাফা অর্থ পবিত্রতা, আলো। তাসাউফের সাধনা মানুষকে কুপ্রবৃত্তি ও পাপ থেকে পবিত্র রাখে, তার হৃদয়ে পবিত্র আলো জ্বলে উঠে।

অথবা শব্দটি الصف الاول (আসসাফফুল আউয়াল) থেকে নিষ্পন্ন। এর অর্থ হল প্রথম সারি। তাসাউফের সাধনা মানুষকে প্রথম সারির মানুষে পরিণত করে বলে এ শব্দ থেকে তাসাউফ নামকরণের মত প্রকাশ করা হয়।

কিংবা اهل الصفة (আহলুস সুফফা) থেকে তাসাউফ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। আহলুস সুফফা রাসূলুল্লাহ (সা) এর একদল বিশিষ্ট সাহাবী। যাঁরা সংসারজীবন না করে মসজিদে জীবন কাটিয়েছেন। সব সময় নিজেদেরকে জ্ঞান ও পবিত্রতার সাধনায় লিপ্ত রেখেছেন।

আধুনিক শব্দতত্ত্ববিদগণ বলেছেন – গ্রিক শব্দ ঝড়ঢ়যরধ বা ঞযবড়ংড়ঢ়যরধ থেকে আরবিতে তাসাউফ শব্দটি গৃহীত হয়েছে। গ্রিকভাষায় শব্দগুলোর অর্থ জ্ঞান। তাসাউফ তাই জ্ঞানসাধনা। একে সূফীবাদও বলা হয়।

সূফী-সাধক ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ তাসাউফকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন –

যুননুন মিসরী (র) বলেন – 'আল্লাহ তাআলা ব্যতীত আর সব কিছু বর্জন করা হল তাসাউফ।[৭৭৭]

যুনায়দ বাগদাদী (র) বলেছেন – 'তাসাউফ হল জীবন-মৃত্যুসহ সকল বিষয়ে আল্লাহর ওপর নির্ভর করা।[৭৭৮]

আবু সাহল সালুকী (র) বলেন – 'আপত্তিকর ও নিন্দনীয় সকল বিষয় থেকে দূরে থাকাই তাসাউফ।[৭৭৯]

আল - কুশায়রীর মতে – 'দেহ ও অন্তরকে পবিত্র করার সাধনাকে তাসাউফ বলা যায়।[৭৮০]

শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আনসারী বলেন – 'মানুষের আত্মা পরিশোধনের আধ্যাত্মিক শিক্ষা হল তাসাউফ যা তাকে চিরস্থায়ী নিয়ামত লাভের জন্যে নৈতিক জীবন সমুন্নত রাখার নির্দেশনা দেয়। এর বিষয়বস্তু হল আত্মার পবিত্রতা বিধান এবং তার লক্ষ্য চিরন্তন সুখ শান্তি অর্জন করা।[৭৮১]

আবু আলী কাজিনীর মতে – 'তাসাউফ হল মনোরম-সুন্দর আচরণ।[৭৮২]

---

[৭৭৬] Saiyed Abdul Hai, ***Muslim Philosophy A Short Survey,*** Islamic Foundation Bangladesh, January 1985, p.35

[৭৭৭] ডঃ রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৯

[৭৭৮] প্রাগুক্ত

[৭৭৯] প্রাগুক্ত

[৭৮০] প্রাগুক্ত

[৭৮১] প্রাগুক্ত

[৭৮২] প্রাগুক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত মানুষের অন্তরে বিদ্যমান বিভিন্ন পাশবিক প্রবৃত্তি যেমন কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করে আত্মাকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করে তোলার সাধনাই তাসাউফ।

তাসউফের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

রাসূলুল্লাহ (সা) এর যুগে তাসাউফ নামে আত্মা সংশোধনের বা আধ্যাত্মিক সাধনার কোন পদ্ধতির অস্তিত্ব জানা যায় না। সাহাবী (রা) দের যুগেও এ নামে কোন সাধনার ধারা সম্পর্কে প্রামাণ্য কোন তথ্য নেই। তাসাউফ নামে আধ্যাত্মিক সাধনার এ ধারাটি রাসূল (সা) ও সাহাবী (রা) দের যুগের অনেক পরের একটি বিষয়। ফলশ্রুতিতে এর উৎপত্তি সম্পর্কেই মতভেদ তৈরী হয়েছে। অনেক গবেষক স্বীকারই করেন নি যে, তাসাউফ সত্যিকারার্থেই কোন শরীআ স্বীকৃত সাধন পদ্ধতি। কেননা রাসূল (সা) করেন নি, সাহাবী (রা)গণও করেন নি এমন কোন বিষয় ইসলামী বিষয় হতে পারে না। আবার যারা তাসাউফের পক্ষে কথা বলেন তারা বলেন, এটা ঠিক যে রাসূল (সা) ও সাহাবী (রা) যুগে স্বতন্ত্র নামে তাসাউফ চর্চা ছিল না। কিন্তু আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য তাঁরা যা করেছেন তা নিয়েই তাসাউফ গড়ে উঠেছে, বিস্তৃত হয়েছে। কাজেই একে শরীআ স্বীকৃত না বলার কোন কারণ নেই। উদাহরণত ফিকহ শাস্ত্রের কথা বলা যায়। রাসূল (সা) বা সাহাবী (রা)দের যুগে স্বতন্ত্রভাবে ফিকহ শাস্ত্রের কোন অস্তিত্ব ছিল না। পরবর্তীতে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে এ শাস্ত্রটির উদ্ভব ঘটে এবং সর্বজনগ্রাহ্যতা পায়। কাজেই রাসূল (সা) ও সাহাবী (রা) দের আধ্যাত্মিক সাধনার পরিপূরক হওয়ায় তাসাউফ সন্দেহাতীতভাবে ইসলাম সম্মত বিষয়।

H. Merten l Glodziher বলেন[১৮৩] – তাসাউফ বেদান্ত দর্শন ও বৌদ্ধদর্শনের শিক্ষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তারা দেখিয়েছেন, ভারতীয় জীবন ধারার সংস্পর্শে আসার পর উল্লিখিত বিবিধ দর্শানুসারী ভারতীয় যোগী, ঋষি ও ভিক্ষুদের কঠোর সংযম আর কৃচ্ছতা মুসলিমদের মাঝে দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। পর্যায়ক্রমে এ প্রভাবই পরিণত হয়ে তাসাউফ রূপ লাভ করে।

কিন্তু H. Merten l Goldziher এর মতবাদটি যতাযর্থ নয়। কেননা, ভারতীয় চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসার পূর্বেই মুসলিম জীবন ধারায় তাসাউফের সাধনা বিদ্যমান ছিল। সর্বোপরি বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শরেন সাথে মুসলিম দর্শনের নীতিগত বিরাট প্রভেদের কারণেও এটা সম্ভব ছিল না। মুসলিম দর্শন সর্বতোভাবে তাওহীদবাদী। যে কোন বিবেচনায় আল্লাহর একত্ব এ ধর্মের প্রথম এবং শেষ কথা। সেখানে বেদান্ত ও বৌদ্ধদর্শনে বহুশ্বেরবাদ ও ঈশ্বর সম্পর্কে সংশয়বাদ স্থান পেয়েছে। কাজেই বেদান্ত বা বৌদ্ধদর্শনের প্রভাবে তাওহীদবাদী মুসলিমদের প্রভাবিত হওয়ার বিষয়টি যুক্তিসিদ্ধ এবং বিবেকসম্মত নয়।

Nicholson, Voncreamar প্রমুখের মতে, নবম শতকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগে খ্রিস্টানি মরমীবাদ ও গ্রিক দর্শনের সাথে মুসলিমদের সংযোগসেতু গড়ে ওঠার প্রভাবে ইসলামে তাসাউফের উদ্ভব ঘটে।

কিন্তু ঐতিহাসিক বিবেচনায় এ মতবাদটিও অসার। কেননা, নবম শতকের পূর্বেই ইসলামে তাসাউফের উদ্ভব। সুতরং কারো চিন্তার সাথে মিল থাকলেই বলা যায় না যে, সেটা অন্য মতবাদের প্রভাবের ফসল। ইকবাল যথার্থই বলেন –

'No idea can seize people's soul unless, is some sense it is the people's own.

এটা ঠিক যে, মুসলিম দার্শনিকদের কেউ কেউ গ্রিক দর্শন দ্বারা দারুনভাবে প্রভাবিত ছিলেন। তাদের কেউ কেউ কুরআন হাদীসের পাশাপাশি গ্রিক দর্শনকেই সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সাথে সাথে এটাও মেনে নিতে হবে যে, এ সকল গ্রিকবাদী মুসলিম দার্শনিকদেরই কেউই তাসাউফ সাধনার সাথে জড়িত ছিলেন না। তারা এর সমর্থক বা পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন না। বরং তারা গ্রিক দর্শনকেই মনে প্রাণে সত্য জেনে তাসাউফকে উপেক্ষা করেছেন। কাজেই গ্রিক দর্শন বা খ্রিস্টীয় মরমীবাদ তাসাউফের উদ্ভবে কোন ভূমিকা রাখে নি।

Brown ও তার অনুসারীদের মতে, ইসলামে তাসাউফের প্রবর্তক পারিসকরা। পারস্য সাম্রাজ্যের পতনের পর পারসিক জাতি ক্ষমতা হারানো ও শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষুন্ন হওয়ার হতাশায়-নৈরাশ্যে কঠোর সংযম ও মরমীবাদের প্রতি ঝুঁকে

---

[১৮৩] ডঃ এম হুদা, *মুসলিম দর্শনের মূলতত্ত্ব*, ইউরেকা বুক হাউস, ঢাকা, মে ১৯৯৯, পৃ.৫২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

পড়ে। পরবর্তীকালে বিপুলসংখ্যক সূফীর পারস্যে জন্মগ্রহণ করার প্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয় তাসাউফ মূলত পারসিক প্রভাবজাত একটি বিষয়।

বস্তুত এমতবাদটি অযৌক্তিক। কেননা, বহু সূফী পারস্যে জন্মগ্রহণ করেছেন বলেই তাসাউফকে পারসিক প্রভাবজাত বলা যায় না। কেননা, মুসলমানদের পারস্য বিজয়ের পূর্বে রাসূল যুগেই ইসলামে তাসাউফ সাধনার সূচনা হয়। তাছাড়া ইসলাম গ্রহণের পর বা পারস্যে ইসলামের বিজয় সম্পন্ন হওয়ার পর কোন একজন পারসিকও হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন নি। বরং তারা ইসলামের বিজয়কে নিজেদের বিজয় মনে করে মুক্তির আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছেন। পারস্যে অধিকাংশ সুফীর জন্ম থেকে যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয় তা হল, তুলনামূলক বিচারে আরবের চেয়ে পারসিকরা অধিকতর ধীর-স্থির এবং সংহত চিন্তার অধিকারী ছিলেন। প্রতিভা ও যোগ্যতা বিবেচনায়ও তাদেরকেই এগিয়ে রাখতে হবে। এ কারণে পারস্যেই তাসাউফের মত একটি কষ্টসাধ্য সাধনা পরিপুষ্ট ও বিকশিত হয়। এখানেই জন্ম নেন অধিকাংশ বিখ্যাত সাধক।
কাজেই এটা বলা যায় না, তাসাউফ প্রবর্তন করেছেন পারসিকগণ। বরং তাসাউফ আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। পারসিকগণ তাদের যোগ্যতা ও মেধা দিয়ে এ সাধনা থেকে নিজেদেরকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত করে তুলেছেন।

অধিকাংশ সূফী সাধক ও গবেষকগণের মতানুসারে তাসাউফকে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষানির্ভর একটি আধ্যাত্মিক বিধি ব্যবস্থা হিসেবে মূল্যায়ন কর হয়। কেননা, কুরআন ও হাদীসে এমন অসংখ্য রহস্যময় আধ্যাত্মিক বক্তব্য পাওয়া যায় যা থেকে সহজেই প্রতিভাত হয়ে ওঠে তাসাউফ কেবল কুরআন-সুন্নাহ থেকে উদ্ভূত হতে পারে। যেমন
'আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে ঈমান আনুক যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।[৭৮৪]
'আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ; তা প্রজ্জ্বলিত করা হয় পূত পবিত্র যায়তুন গাছের তেল দিয়ে যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়। আগুন তাকে স্পর্শ না করলেও যেন তার তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে। জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করেন তাঁর জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।[৭৮৫]
'আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনীর চেয়েও অধিকতর নিকটতর।[৭৮৬]
'তিনি আদি, তিনিই অন্ত; তিনি ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত।[৭৮৭]
'তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল, তিনি তো অন্তর্যামী।[৭৮৮]

কুরআন হাদীসের এ সকল বাণী আল্লাহ তাআলার পরম রহস্যময়তার দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করে। তাছাড়া ইসলামে সকল ইবাদতের ভিত্তি ও গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে আত্মিক শুদ্ধতাকেই নির্ধারণ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন ইনসান ই কামিল বা পূর্ণাঙ্গ মানব সত্তার একমাত্র দৃষ্টান্ত। তা সত্ত্বেও আত্মশুদ্ধির জন্য তিনি রাতের পর রাত সাধনায় কাটিয়েছেন। দীর্ঘ রুকূ সাজদাহ বিশিষ্ট সালাত, অনবরত সিয়াম পালন এবং সবসময় আল্লাহর যিকর তাঁর সাধনার অনুষঙ্গ ছিল। সাহাবী (রা) এর জীবনেও এর প্রয়োগ ছিল। তাঁরা তাঁদের জীবনে রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবনকেই ধারণ করেছিলেন।

---

[৭৮৪] আল কুরআন / ২ : ১৮৬
[৭৮৫] আল কুরআন / ২৪ : ৩৫
[৭৮৬] আল কুরআন / ৫০ : ১৬
[৭৮৭] আল কুরআন / ৫৭ : ৩
[৭৮৮] আল কুরআন / ৬৭ : ১৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন মাজীদের নির্দেশনা, হাদীসের বিশ্লেষণ আর রাসূল (সা) ও সাহাবী (রা) জীবনে তার বাস্তব প্রয়োগের বিভিন্ন ধারা ও রীতি নীতিকে বিন্যস্ত রূপে সর্বসাধারণের নিকট উপস্থাপন করতে যেয়েই তাসাউফ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, তাসাউফ কুরআন-সুন্নাহ থেকে উৎসারিত আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনা।

পৃথিবীতে আদম (আ) এর আগমনকালীন সময়ে তাসাউফের উৎপত্তি ঘটে। প্রায় পোনে চার শতাব্দী অনুশোচনার আগুনে দগ্ধীভূত আদম (আ) মূলত তাসাউফের সাধনাতেই নিরত ছিলেন। বংশ পরম্পরায় হাবিল, শীষ, নূহ, ইব্রাহীম, ইসমাঈল (আ) প্রমুখ নবীদের মাধ্যমে 'তাসাউফ' বিকশিত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মুহম্মদ (সা) এর মাধ্যমে পূর্ণতা পায়। এ সময় থেকে ক্রমবিকাশের ধারায় তাসাউফে বিভিন্ন মাত্রা যুক্ত হয়।

হেরা পর্বতে ধ্যানমগ্নতার মাধ্যমে মহানবী (সা) এ ধারার সূচনা করেন। পরে কর্মময় তেইশ বছরের নবুওয়তী জিন্দিগীতে অসংখ্যবার তন্ময়তা-ধ্যান মগ্নতায় তিনি অনন্য হয়ে ওঠেন। বলা যায় তাঁর পুরো জীবনে তিনি যতটা গুরুত্ব দিয়ে বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতার মতই গুরুত্ব দিয়ে পালন করেছেন আত্মিক ও আধ্যাত্মিক সাধনার বিভিন্ন নিয়ম কানূন। এমনকি একে তিনি প্রকাশ্য জিহাদের চেয়েও বড় ইবাদত হিসেবে অভিহিত করেছেন।
বাইরের চাপে বা লোক দেখানোর জন্য হলেও আমরা অনেক সময় অনেক কাজ করতে বাধ্য হই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আত্মশুদ্ধি ছাড়া আমরা নিজেদেরকে কু চিন্তা ও কু প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পারি না। রাসূল (সা) সকল মানবিক ত্রুটি মুক্ত হওয়ার পরও নিরন্তর সাধনায় আত্মশুদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। যা থেকে প্রতীয়মান হয়, তিনি বাহ্যিক ইবাদতের সাথে সাথে আত্মিক ইবাদত ও আধ্যাত্মিক সাধনাকে কোন ভাবেই কম গুরুত্ব দেন নি।

রাসূল (সা) এর আদর্শের অনুসারী একদল সাহাবী (র) বিশেষভাবে তাঁর আধ্যাত্মিকতায় গুরুত্বারোপ করে মসজিদে নববীতে ধ্যানস্থ হতে থাকেন। এরা 'আহলি সুফফা' নামে পরিচিত। বলা হয়, এ আহলি সুফফাই তাসাউফের গোষ্ঠীবদ্ধ সাধনার জনক।
এখানে একটি ভুল ধারণা জন্ম নেওয়ার সমূহ সুযোগ থাকে। আহলি সুফফাকে সাধারণভাবে সংসার বিবাগী মনে করা হয়। আসলে ঘটনাটি তা নয়। তারা সাধারণ মানুষের মতই সংসার করতেন। আহলি সুফফার অন্যতম সদস্য আবূ হুরায়রা (রা) উমর (রা) এর খিলাফতকালে একটি প্রদেশের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরা সকলে রাসূলুল্লাহ (সা) এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইন্তিকালের পরে সংঘটিত জিহাদসমূহে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই এটা ভাববার কোন অবকাশ নেই যে, আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য ইসলাম সংসার ত্যাগের আদেশ দিয়েছে বা তাতে উৎসাহিত করেছে। ইসলাম আধ্যাত্মিকতার আদেশ দিয়েছে সংসারের মধ্যে থেকেই। শুদ্ধ হতে বলেছে অন্তরে। প্রতিটি কাজকেই আধ্যাত্মিকতার মাপকাঠিতে বিচার করতে বলেছে। কাজের গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিষয়টিকে পুরোপুরি আত্মিক শুদ্ধতাভিত্তিক বলে ঘোষণা দিয়েছে। আহলি সুফফার সদস্যগণ অন্যদের চেয়ে সাধনায় খানিকটা বেশি সময় দিয়েছেন। রাসূলের (সা) জীবদ্দশায় তাঁর সাথে সাথে থেকে তাঁর বাণী সংগ্রহ করেছেন। মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থেই তা ছিল জরুরী। কেউ যদি তাঁদের মত সাধনায় বিশেষত্ব আরোপ করতে চায় করতে পারে, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে, তার এ সাধনায় বিশেষত্ব আরোপ কোন ভাবেই যেন তাকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও প্রাসঙ্গিক দায়িত্বসমূহ পালনে কোন রকমের দূর্বলতা সৃষ্টির সুযোগ না দেয়।

আবূ বকর (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা) এর পরে মুসলিম উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সদস্য। রাসূলুল্লাহ (সা) স্বয়ং এ স্বীকৃতি দিয়েছেন। উমর (রা) সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) এ সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন যে, তাঁর পরে যদি আর কোন নবী প্রেরণের অবকাশ থাকত তাহলে উমরই হতেন সে নবী। উসমান (রা) তাঁর এত প্রিয় ছিলেন যে, নিজের দু কন্যাকে তিনি তাঁর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়া পৃথিবীতেই জান্নাতবাসী হওয়ার সুসংবাদপ্রাপ্ত ছয়জন সাহাবী (রা) ছিলেন। তাঁরা দশজন এবং তাঁর প্রতিজন সাহাবী (রা) আত্মিক শুদ্ধতা আর আধ্যাত্মিক সাধনায় এমন স্তরে উপনীত হয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা করেছিলেন – 'সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ হচ্ছে আমার যুগ। এরপর আমার সাহাবীদের। এরপর

Dhaka University Institutional Repository

তারপরের যুগ।[৭৮৯] সাহাবী (রা) দেরকে তিনি নক্ষত্রের সাথে তুলনা করেছিলেন। কাজেই ইসলামী আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত রূপটি সাহাবী (রা) দের হাতেই পরিণত হওয়ার কথা।
কিন্তু খুলাফা ই রাশিদার যুগে স্বতন্ত্রভাবে কোন সাহাবী (রা) কে প্রথাগত সাধনায় লিপ্ত হতে দেখা যায় নি। এর একটি কারণ হল, তাঁদের পুরো জীবনই ছিল ইসলামের জন্যে উৎসর্গীকৃত। তাঁরা আলাদা করে তাই কোন সাধনার প্রয়োজন বোধ করেন নি। প্রতিটি মুহূর্তই তাঁদের ভাবনায় ছিল আল্লাহ প্রেম, রাসূল (সা) এর প্রতি মহাব্বত। ফলে তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র করে তাসাউফ নাম দিয়ে সাধনা করা অপ্রয়োজনীয় ছিল।
তারপরও খুলাফাই রাশিদার যুগে তাসাউফ চর্চার পথিকৃত হিসেবে আলী ইবন আবূ তালিব ও আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। তাঁরা এর প্রথাগত বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

খুলাফা ই রাশীদার স্বর্ণযুগ শেষে মুসলিম জাহানে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু হয়। সাথে সাথে মুসলিম শাসক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে ব্যাপক ভোগী ও বিলাসী জীবন যাত্রা। এমনি পরিস্থিতিতে আত্মিক পরিশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য ভোগ-বিলাস পরিহারের নীতি অনুসৃত হয়। আবুল হাশিম কুফী, হাসান বসরী, যাবির বিন হাইয়্যান, রাবিআ বসী প্রমুখ (র) এ যুগে তাসাউফের স্বতন্ত্র ধারার সুচনা করেন। শুরু হয় কৃচ্ছতা সাধনার মাধ্যমের তাসাউফ সাধনার নতুন যুগের।

সূফী যুন্নুন মিশরী থেকে এ যুগের সূচনা। এটা তাসাউফের তত্ত্বগত উন্মেষের যুগ। আব্দুল কাদির জিলানী, যুনায়দ বাগদাদী প্রমুখ এ যুগে তাসাউফ সাধনার নীতিমালা প্রণয়ন করেন। এর আগে তাসাউফ সাধনার কোন প্রথাগত পদ্ধতি ছিল না। কোন বিন্যস্ত নীতিমালা ছিল না। আধ্যাত্মিক ও আত্মিক বিষয়টি এমনিতেই রহস্যময় হওয়ায় কেউ কেউ এই রহস্যময়তাকে ভিত্তি করে নানা রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার পায়তারা করছিল। অহেতুক রহস্যময়তা সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যে কোন ইতিবাচক বিষয় নয় তা বুঝতে পেরেই পরবর্তী কালের তাসাউফ চর্চার পথিকৃত হিসেবে স্বীকৃত আব্দুল কাদির জিলানী (র) এ সাধনার নীতিমালা তালিকাভুক্ত করেন।
ফিকহ শাস্ত্র বিন্যস্ত করে ইমাম আবূ হানীফা (র) যেমন ইমাম আযম হিসেবে খ্যাত হয়েছেন তেমনি তাসাউফের নীতিমালা বিন্যস্ত করে আব্দুল কাদির জিলানী (র) খ্যাত হয়েছেন 'বড়পীর' নামে। তাঁর সময় থেকেই সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে তাসাউফ চর্চার ধারা প্রচলিত হয়।

বায়জীদ বুস্তামী (র) এর মাধ্যমে এ যুগের উন্মেষ ঘটে এবং মনসুর হাল্লাজ (র) এর মাধ্যমে এ ধারা পূর্ণতা পায়।[৭৯০] এ যুগে তাসাউফ সাধনায় 'ফানা ফিল্লাহ' ও 'বাকাবিল্লাহ' ধারণার সংযোগ ঘটে। ফানাফিল্লাহ হল আল্লাহর মধ্যে নিজ সত্তা লয় হওয়ার উপলব্ধিতে উপনীত হওয়া। তাসাউফ সাধনার এটি একটি উচ্চতর স্তর। এ স্তরে সাধক নিজের অস্তিত্বের উপলব্ধি ভুলে যান। তিনি পরমাত্মা আল্লাহর সত্তায় নিজের অস্তিত্বের লয় উপলব্ধি করেন। 'বাকাবিল্লাহ' তাসাউফ সাধনার সর্বোচ্চ স্তর। এ স্তরে সাধক নিজের মধ্যেই আল্লাহর উপস্থিতি উপলব্ধি করেন। এটি অত্যন্ত জটিল এবং সাধারণের বোধগম্যের বাইরের একটি স্তর। মনসুর হাল্লাজ (র) এ স্তরে উপনীতি হয়েই বলেছিলেন – 'আনাল হক' বা আমিই সত্য। কেননা তিনি নিজের মধ্যে পরম স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটি সাধারণ মানুষের মধ্যে দারুন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তারা মনসুর হাল্লাজ (র) কে পথভ্রষ্ট মনে করে হত্যার ফায়সালা করে ফেলেন।
সাধারণ মানুষদের জন্য এ স্তরে আসীন হওয়া যেমন বিপদজনক তেমনি কেউ যদি এ স্তরে উপনীত হতে পারেন তাহলে তারও উচিত তা প্রকাশ না করে গোপন রাখা। তাহলে অনেক রকমের বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

স্বতন্ত্র সাধনার পথ ও পদ্ধতি হিসেবে তাসাউফের যাত্রা শুরুর পর সুন্নী মাযহাবের সাথে এর ব্যাপক মতদ্বৈততা তৈরী হয়। সুন্নী মাযহাবের অনুসারীদের কাছে এ সাধনার কোন গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। তারা বরং একে বিদআত মনে করতেন। কেননা রাসূল (সা) ও সাহাবী (রা) দের যুগে এর কোন শাস্ত্রীয় রূপ ছিল না। সুন্নী মাযহাবের সাথে তাসাউফের এ দূরত্ব দূর করার উদ্যোগ নেন আল গাযালী (র)। তিনি তাসাউফ সাধনায় ইসলাম বিরুদ্ধ প্রথা ও

---

[৭৮৯] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইতিসাম
[৭৯০] ডঃ আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৫, পৃ. ১৮৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

রীতিসমূহ সমূলে উৎপাটিত করে একে ইসলামের তাযকিয়া ই নফসের শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এর ফলে তাসাউফ ইসলামী জীবন দর্শনে মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার শরীআহ স্বীকৃতি প্রথা ও পদ্ধতি হিসেবে সর্বজনগ্রাহ্যতা পায়। আল গাযালী (র) প্রমাণ করেন – তাসাউফ শরীআত পরিপন্থী কোন বিষয় নয় বরং শরীআতের পরিপূরক একটি বিষয়। বাহ্যিক আচরণে ও অন্তরে মুমিন হওয়ার জন্য তাই শরীআতের পাশাপাশি তাসাউফেরও অনুসরণ–অনুশীলন অনিবার্য। তাঁর চেষ্টায় সুন্নী মাযহাবের সাথে তাসাউফ সমন্বিত হয়। এর ফলে সাধক শ্রেণী ছাড়াও সাধারণ মানুষের মধ্যেও তাসাউফ গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।[৭৯১]

সর্বখোদাবাদ সর্বপ্রাণবাদের সংস্কারকৃতরূপ। সর্বপ্রাণবাদে সবকিছুতে প্রাণের উপস্থিতি সংক্রান্ত মতবাদ পোষণ করা হয়। আদিম যুগে সবকিছুতে প্রাণের এই উপলব্ধি থেকেই ধর্মীয় সাধনার ধারা শুরু হয়েছিল। সর্বখোদাবাদ হল সবকিছুতে খোদার উপস্থিতির প্রমাণ প্রত্যক্ষ করা সংক্রান্ত মতবাদ। এ মতবাদ অনুসারে পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টিই প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর অস্তিত্বের ধারক। কেননা সৃষ্টির অস্তিত্ব থাকার মানেই হল একজন স্রষ্টা অস্তিত্ববান। তাসাউফ সাধনায় সকল কিছুতে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষণের এ ধারাটি নিয়ে আসেন জালালুদ্দীন রূমী, নসর আল–সরাজ, হুজাইরী, আল কুশায়রী প্রমুখ থেকে নিজামুদ্দীন আউলিয়া পর্যন্ত সূফী সাধকগণ। তারা এর একটি সর্বজনগ্রাহ্য রূপ তৈরী করার চেষ্টা করেন। তবে উচ্চমার্গীয় চিন্তা হওয়ার কারণে এ বিষয়টি সর্ব সাধারণ্যে তেমন একটি গ্রহণযোগ্যতা পায় নি।

কেবল আল্লাহ তাআলা হলেন সত্য আর সকল কিছু মিথ্যা। আল্লাহই অস্তিত্ববান। আর কারো কোন অস্তিত্ব নেই। মানুষ যা কিছু দেখে তা সবই মায়া। সবই ছায়া। আল্লাহই আদি আল্লাহই অন্ত। তিনি প্রকাশ্য, তিনিই গোপন। তিনি ছাড়া আর কেউ বা কিছু অস্তিত্ববান নয়। কেবল একটি সত্তার অস্তিত্ববান হওয়ার এ মতবাদের নাম 'ওয়াহদাতুল ওয়াজূদ'। মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী, সদরুদ্দীন কোনাবী, মুল্লাহ জামী (র) প্রমুখ তাসাউফ সাধনায় ওয়াহদাতুল ওয়াজূদ ধারণাটি যুক্ত করেন।
তবে সাধারণের নিকট ততটা সহজবোধ্য না হওয়ায় ওয়াহাতুল ওয়াজূদ তেমন সর্বজনগ্রাহ্যতা পায় নি। বরং একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্বের সত্যতার ধারণা মানুষকে নিজের ব্যাপারে হতাশ ও নৈরাশ্যবাদী করে তুলেছে। সকল ব্যাপারে নিস্পৃহ, নির্মোহ ও উদাসীন থাকার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে বলে সাধারণ মানুষ এ মতবাদকে প্রত্যাখ্যানই করেছে বেশি। সীমিত সংখ্যক সাধক শেষ পর্যন্ত তাসাউফ সাধনায় ওয়াহদাতুল ওয়াজূদ ধারণা পোষণ ও লালন করতেন।

ওয়াহদাতুশ শুহুদ সর্বখোদাবাদেরই একটু পরিশীলিত এবং সহজবোধ্য উপস্থাপনা। এতে এই ধারণা দেয়া হয় যে, পৃথিবীতে যা কিছু মজুদ আছে, অস্তিত্ববান আছে তা সবই মহান আল্লাহর অবিনশ্বর সত্তার সাক্ষী হিসেবেই মজুদ আছে। এর ফলে সকল সৃষ্টির সাথে আল্লাহ তাআলার নিঃশর্ত ও সার্বিক সম্মিলনের ধারণা যুক্ত হয়। সাধারণভাবে মনে করা হতে থাকে, আমি অস্তিত্বশীল মানে আমি এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমার স্রষ্টা আল্লাহ তাআলাও অস্তিত্বশীল। আমি আমার অস্তিত্বের নয় বরং নিজের জীবন দিয়ে, বেঁচে থাকা দিয়ে আমি মহান আল্লাহর অস্তিত্বেরই সাক্ষ্য দিচ্ছি। বাহাউদ্দীন নকশবন্দী, শেখ আহমাদ শেরহিন্দী প্রমুখ এ ধারণার বিস্তার ঘটান।
তাঁদের ব্যক্তিগত প্রভাব এবং সাধক হিসেবে খ্যাতি গোড়ার দিকে ওয়াহাদতুশ শুহুদকে জনপ্রিয় করে তুললেও শেষ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে নি। বরং জটিল দার্শনিক মতবাদের মত সাধারণ মানুষ এ ক্ষেত্রেও তেমন আগ্রহ দেখায় নি।

আধ্যাত্মিক সাধনায় খানিকটা জটিল মতাদর্শ হওয়ার পরও ওয়াহদাতুল ওয়াজূদ ও ওয়াহাদতুশ শুহুদ এর প্রবর্তক, প্রচারক আউলিয়াদের ব্যক্তি প্রভাবে তাদের অনুসারীদের মধ্যে এর চর্চা অব্যাহত ছিল। দু ধারার এ সাধনা সাধক ও তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে দূরত্ব তৈরী করেছিল যা কখনো কখনো মুসলিম উম্মাহর চিরন্তর ঐক্য ও সংহতির পথে অন্তরায় প্রতীয়মান হয়েছিল। এ অবস্থা নিরসনের জন্য শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র) ওয়াহদাতুল ওয়াজূদ ও

[৭৯১] আরো দেখুন : ডঃ রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪৭ – ৯১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

শুহুদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর সময় থেকে শুরু হয়ে আজকের বিভিন্ন পীর – মাশায়িখ ও ওলীর মাধ্যমে এ ধারার বিকাশ অব্যাহত রয়েছে।

এ চেষ্টা তাসাউফ সাধনায় মতানৈক্য নিরসনের আপাত উদ্যোগ হলেও তা পুরোপুরি সফল হয়েছে এমন বলা যায় না। কেননা এখনো অসংখ্য পীর–মাশায়িখ একজন অন্যজনকে সহ্য করতে পারেন না। একজন অন্যজনকে গুমরাহ, ফাসিক এমনকি কাফির পর্যন্ত ঘোষণা করেন। কেউ কাউকে শ্রদ্ধা করেন না বরং আত্মগর্বে দম্ভে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকায় ইসলামের মূলনীতি বিরুদ্ধ কাজ করে তাসাউফ সাধনাকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলেন। অনেকে আবার পীরগিরির উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। পিতার মৃত্যুর পর সন্তান – তা সে যত অযোগ্যই হোক না কেন গদীনশীন পীর হয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখেন। পীরদের মধ্যে ঐক্য এক বিরল বিষয় হয়ে উঠেছে। কাজেই ওয়াহদাতুল ওয়াজূদ ও শুহুদের মিলন যে অর্থবহ এবং সফল হয় নি তা বলা যায়।

অষ্টম শতকের শুরুতে উপমহাদেশে মুসলমানগণ রাজনৈতিক দিক থেকে প্রভাবশালী হয়ে উঠার সাথে সাথে এখানে তাসাউফের প্রসার ঘটে। খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী (র) উপমহাদেশে উপমহাদেশে তাসাউফ সাধনা বিস্তারে নেতৃত্ব দেন। তাছাড়া তিনি রাজনৈতিক দিক থেকে মুসলমানদের ক্ষমতাসীন হওয়ার নেপথ্যেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। খাজা মুঈন উদ্দীন (র) এর পরে নিজামুদ্দীন আউলিয়া, মুজাদ্দিদ ই আলফে সানী, বাহাউদ্দীন নকশাবন্দী প্রমুখ উপমহাদেশে তাসাউফ সাধনা বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাদের সম্মিলিত চেষ্টায় উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক সাধনার ধারাটিও অনেক পরিপুষ্ট হয়। কিন্তু পরবর্তীতে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব এর অনেক কিছুতেই বিকৃতি নিয়ে আসে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা সুস্পষ্ট শিরকে পরিণত হয়।

যেমন খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী (র) কে নিয়ে বলা হয় 'কেউ ফিরে না খালি হাতে / খাজারে তোর দরবারে।' এটি এবং এর মত আরো অসংখ্য ভয়ঙ্কর শিরক আজ আধ্যাত্মিকতার নামে উপমহাদেশের মুসলিমদের গ্রাস করেছে। হিন্দুরা যেমন অবতারে বিশ্বাস করে খাজা মুঈন উদ্দীন এবং আরো অন্যান্য সাধক পুরুষদের অনেকটা অবতারই মনে করা হয়। এ দেশে আবূ বকর (রা), উমর, উসমান বা আলী (রা) এর মত সাহাবী (রা) দের জন্মদিন মৃত্যু দিন পালন করা হয় না (অবশ্য তা পালন করার কোন প্রয়োজনও নেই। শুধু তুলনার জন্য বলা হচ্ছে) কিন্তু পীর মাশায়িখদের জন্ম মৃত্যুদিনে সওয়াবের নিয়তে উরস উদযাপন করা হয়। হিন্দুদের মন্দির আর পূজার বেদির মতই মাজারগুলো সাজান হয় ফুল দিয়ে। তাতে আগর বাতি, মোমবাতি ধূপ ধোঁয়া দেয়া হয়। মাজার প্রাঙ্গনে বসে কাওয়ালী বা এ জাতীয় ভক্তিগানের আসর – অনেকটা কীর্তন গানের মত।

অথচ ইসলামে এ বিষয়গুলো শিরকের নামান্তর। ইসলাম আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রার্থনা পুরণের ক্ষমতা আছে বিশ্বাস করে না। মানুষের ইচ্ছা পুরণের ক্ষমতা শুধু আল্লাহরই আছে। তিনি ছাড়া আর কেউ কারো ক্ষতি বা উপকার করার কোন ক্ষমতা রাখেন না। কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে তা চাইতে হবে তাঁরই নিকট। কোন মাযারে বা পীর–মাশায়িখের কাছে চেয়ে কেবল শিরকই করা হয়। সাওয়াব বা মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয়ের পর পরই সূফী – সাধকগণ এ দেশে আসেন এবং তাদের চেষ্টাতেই ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময়ের সূফীদের মধ্যে শাহজালাল, খানজাহান, শাহ পরাণ, শাহ মাখদুম, সুলতান মাহী সাওয়ার প্রমুখ (র) গণ অন্যতম। বাংলাদেশে যে সকল তাসাউফ সাধকদের নাম পরম শ্রদ্ধায় উচ্চারিত হয় তাঁদের সম্পর্কে প্রকৃত ইতিহাস নেই বললেই চলে। শাহজালাল (র) এর মত একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের জন্ম, মৃত্যু, জীবনকাল, নাম ও বংশ পরিচয় নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে নানারকম কথা আছে। তাঁদের সম্পর্কে ইতিহাসনির্ভর বক্তব্যের চেয়ে ভক্তিনির্ভর বক্তব্যই বেশি। এসকল বক্তব্যে তাঁদের মাহাত্ম, কৃতিত্ব, ক্ষমতা ও কারামাত সম্পর্কে এমন অতিরঞ্জিত বিবরণ দেয়া হয়েছে যে, তা তাঁদের প্রকৃত অবস্থা ও অবদান বুঝার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে অবস্থা ও সময় বিবেচনা করে আমাদের মনে হয়েছে, এদেশে যারা ইসলাম প্রচার করেছেন তাঁরা তাদের জীবন এ কাজে উৎসর্গ করেছিলেন।

তাঁরা ভাষাগত দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও এদেশের মানুষকে যে ইসলামের পথে নিতে পেরেছেন সে ক্ষেত্রে তাদের কোন কারামত ভূমিকা রাখে নি। বরং তাদের প্রাত্যহিক ইসলামী জীবনই সর্বসাধারণকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। সাধারণ মানুষ তাদের মানব সেবা, সত্যবাদিতা, সদাচার দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁরা সকলেই যোদ্ধা

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। শুধু দুআ করে বা কারামত দেখিয়ে মানুষকে মুগ্ধ করেন নি। বরং যারা তাঁদের জীবন ও মিশনের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে তাদের সাথে লড়াইও করেছেন।

বস্তুত তাসাউফ ইসলামী বিধি – ব্যবস্থায় কোন বাহ্য আরোপিত বিষয় নয়। বরং তাসাউফ ইসালামের অন্তর্গত ও ইসলামসম্মত আধ্যাত্মিক সাধনার স্বর্গীয় নির্দেশনা। এর ক্রমবিকাশ ধারাও ইসলামী ঐতিহ্য ও নীতিমালায় সমৃদ্ধ। সুতরাং যে কোন বিবেচনাতেই তাসাউফ এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এক নিরবিচ্ছিন্ন ইসলামী ঐতিহ্য। একে ইসলাম বিরোধী কোন আদর্শ সঞ্জাত বিষয় মনে করা নিতান্তই মূর্খতা মাত্র।

শরীআত ও তাসাউফের সম্পর্ক

ইসলাম মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। সকল বিভাগের মধ্যে ঐক্য অনিবার্য করে। সেজন্যে ইসলামের সকল বিধি–বিধানও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাসাউফ ও শরীআত ইসলামী বিধানাবলীর প্রধান দুটি দিক। তাসাউফ মানুষের আত্মা পরিশোধনের বিধান। শরীআত নিয়ন্ত্রণ করে তাদের বাহ্যিক দিক। শরীআত অর্থ বিধান, চলার পথ, জীবনব্যবস্থা। ব্যক্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালে আল্লাহ তাআলা অবশ্য পালনীয় যে বিধানাবলী দিয়েছেন তাই শরীআত। ব্যক্তিগত ও সামাজিক কর্তব্য হল শরীআতের কানুন অনুযায়ী চলা। এর কোন বিধান অমান্য করা পাপ। মানুষের জন্য ভাল ও মন্দ নির্ধারণ করে শরীআত। এটি মানবজীবনের দৃশ্যমান দিকের বিস্তারিত বিধি ব্যবস্থা। সকল কাজের ঔচিত্য–অনৌচিত্রের মাপকাঠি। মুসলিম জাতির ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, গার্হস্থ্য ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা আছে শরীআতে। ফলে তাসাউফ ও শরীআতের মধ্যে যেমন সাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক রয়েছে তেমনি রয়েছে বৈসাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক।

শরীআত ও তাসাউফ উভয়েরই উৎস এক। দুটি বিষয়ই এক অভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর মানুষকে যেমন শরীআত দিয়েছেন, তেমনি তাসাউফও দিয়েছেন।
কুরআন মাজীদে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহ তাআলা মানুষের আত্মিক শুদ্ধির কথা বলেছেন। আত্মশুদ্ধির বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছেন। ফলে প্রকাশ্যে মেনে চলার বিধান শরীআতের তিনি যেমন উৎস, তেমনি অন্তর শুদ্ধ করার বিধানেরও উৎস তিনিই।

শরীআত ও তাসাউফ একটি অপরটির ওপর নির্ভরশীল। যে জন্যে কেবল শরীআত মেনে চললে তা যেমন গ্রহণযোগ্য হবে না তেমনি শুধু তাসাউফের অনুসরণেও সাফল্য লাভ সম্ভব নয়। বরং এজন্যে একই সাথে শরীআত ও তাসাউফের অনুসরণ অনিবার্য। যেমন শরীআত সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়। কুরবানীর নির্দেশ দেয়। কিন্তু এই সালাত ও কুরবানী গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়া নির্ভর করে তাসাউফের উপর। কেননা, ইবাদত গ্রহণযোগ্য হয় তাকওয়া ও খুলুসিয়াতের মাধ্যমে। তাসাউফ ব্যক্তির আত্মা পরিশুদ্ধ করে তাকে তাকওয়া ও খুলুসিয়াতের গুণে ভূষিত করে। আবার শুধু তাসাউফে কোন ইবাদতই সম্পন্ন হবে না। আল্লাহ বলেন –
'আমি প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি; তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণ হিসেবে যে সকল চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সেগুলোর উপর যেন তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, সুতরাং তাঁর নিকটেই আত্মসমর্পণ কর এবং বিনীতগণকে সুসংবাদ দাও যাদের হৃদয় ভয়ে কেঁপে ওঠে আল্লাহর নাম স্মরণ হলে, যারা তাদের বিপদে আপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং সালাত কায়িম করে ও আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। আর আমি উটকে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম করেছি; তোমাদের জন্য তাতে মঙ্গল আছে। সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় তাদের উপর তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। যখন তারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা তা হতে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্তকে ও যাচঞাকারী অভাবীকে; এভাবে আমি তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না তাদের গোশত ও রক্ত বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া। এভাবে তিনি তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এ জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথপ্রদর্শন করেছেন; সুতরাং তুমি সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দাও।[৭৯২]

এ আয়াতে আল্লাহ কুরবানী করার আদেশ দিয়েছেন। কুরবানী করা হল শরীআত। এখানে তাসাউফ হল তাকওয়া। কেননা এ আদেশের সাথে সাথে এটাও বলে দেয়া হল, তোমাদের কুরবানী পশুর রক্ত বা গোশত আল্লাহর কাছে পৌছায় না। পৌছায় নিষ্ঠা, আন্তরিকতা। এখন কেউ যদি কুরবানী না করে তাহলে সে তাকওয়া, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখানোর কোন পথ পাবে না। শরীআতের নির্দেশ মেনে তাকে কুরবানী করতে হবে। আর কেউ যদি কুরবানী করার পর মনে প্রদর্শনেচ্ছা রাখে, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা না রাখে তাহলেও তার কুরবানী কবূল হবে না। কিন্তু কবুল না হওয়ার এ বিষয়টি মানুষের পক্ষে বুঝা সম্ভব নয়। এর বিবেচনার ভার আল্লাহ তাআলার উপর।

এতে প্রমাণিত হয়, শরীআত ছাড়া তাসাউফ অসম্ভব আর তাসাউফ ছাড়া শরীআত মূল্য ও অর্থহীন। কাজেই দেখা যাচ্ছে শরীআত ছাড়া ইবাদত অসম্ভব আবার তাসাউফ ছাড়া সেই ইবাদত গ্রহণযোগ্য করানো যায় না। সুতরাং শরীআত ও তাসাউফ পরস্পর নির্ভরশীল।

দেহের সাথে আত্মার যেমন সম্পর্ক শরীআত ও তাসাউফ তেমনি সম্পর্কে গ্রথিত। আত্মা থাকে নিভৃতে। দেহ প্রকাশ্যে। কিন্তু দেহের চঞ্চলতা ও গতি নির্ভর করে একান্তই আত্মার ওপর। আবার আত্মা গোপন। আত্মাকে দেখা যায় না। দেহের সজিবতাই প্রমাণ করে আত্মা অস্তিত্বশীল। তাসাউফও এমনি গোপন বিধান। আত্মার মাধ্যমে এ বিধানের অনুশীলন করা হয়। আল্লাহভীতি, বিশ্বাস, ধৈর্য প্রভৃতি আত্মিক ইবাদত। এগুলো সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন তাসাউফ। আর আল্লাহকে বিশ্বাস ও ভয় করার ফলে মানুষের মধ্যে ইবাদত করার মানসিকতা গড়ে ওঠে। সালাত, যাকাত, সাওম, হাজ্জ প্রভৃতি ইবাদত করা শরীআতের বিধান। তাসাউফের অনুশীলন ছাড়া শরীআতের এ সকল আনুষ্ঠানিকতাকে প্রাণহীন মনে হয়। বস্তুত ইবাদতের দেহ যদি শরীআত হয় – তাসাউফ তার আত্মা। এ দুয়ের সম্মিলন ছাড়া ইবাদত অর্থহীন, অগ্রহণযোগ্য।

ধরা যাক সালাতের কথা। সালাত আদায় করা আল্লাহর নির্দেশ। সালাত আদায় করলে আল্লাহর হুকুম আদায় করা হয়। আল্লাহ সালাত আদায়কারীর জন্য অনেক পুরস্কার ও প্রতিদানের ঘোষণা দেন। যদি সে সালাতে তাসাউফ থাকে। অর্থাৎ যদি সালাত আদায় করা হয় কেবলই আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য। কিন্তু সালাত যদি লোক দেখানোর জন্য হয় তাহলে সে সালাত পুরস্কারের পরিবর্তে শাস্তির নিশ্চয়তা বিধান করে। আল্লাহ তাআলা বলেন – 'সুতরাং দুর্ভোগ সে সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে।[৭৯৩]

ইসলামী জীবন দর্শন ও বিধানসমূহের ধারা মূলত দুটি। একটি বাহ্যিক এবং একটি আত্মিক। শরীআত বাহ্যিক ধারার বিধান আর তাসাউফ তার আত্মিক দিক। তাসাউফ ও শরীআত মূলত তাই একই বিধানের দুটি ধারা। ইসলামী বিধানের অভিন্ন লক্ষ্যের আলাদা দুটি পর্যায়। এ হিসেবে শরীআত ও তাসাউফের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। মহানবী (সা) শরীআত ও তাসাউফকে জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন দুটে ধারা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন – 'ইলম দু প্রকার। এক প্রকার হল অন্তরের ইলম। এ ইলম মহা উপকারী। আর দ্বিতীয় প্রকার ইলম হল মৌখিক। এ প্রকার ইলম মানব জাতির জন্যে আল্লাহর দলীল।[৭৯৪] এখানে রাসূলুল্লাহ (সা) এর বিবেচনায় তাসাউফ অন্তরের এবং শরীআত মৌখিকজ্ঞান হিসেবে অভিহিত হয়েছে। কাজেই তাসাউফের যাত্রা শরীআতের সাথে। এটি ইসলামের অবিভাজ্য দিক। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে কল্পনা করা যায় না।

তাসাউফ ও শরীআতের মধ্যে যেমন মিল রয়েছে, তেমনি অমিলও কম নেই। এ অমিল কার্যকারিতা ও প্রকৃতিগত দিক থেকে। এ বৈসাদৃশ্য তাসাউফ ও শরীআতকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত করায় না। একটাকে অন্যটার বিপরীতও

---

[৭৯২] আল কুরআন / ২২ : ৩৪–৩৭

[৭৯৩] আল কুরআন / ১০৭ : ৪–৬

[৭৯৪] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইলম

Dhaka University Institutional Repository

দাঁড় করিয়ে দেয় না। বরং পদ্ধতি, কার্যকারিতা, উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় একটিকে আরেকটির পরিপূরক হিসেবে উপস্থাপন করে।

কেউ শরীআতের বিধান অস্বীকার করলে তা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় এবং এ জন্যে তাকে কাফির বলা যায়। যেমন কেউ যদি সালাত অস্বীকার করে বা যাকাত অস্বীকার করে তাকে কাফির বলা যায়। কিন্তু কেউ তাসাউফের কোন বিধান পালন না করে বা অস্বীকার করে তাহলে তা বুঝা যায় না। যেমন কেউ মনের মধ্যে নিফাক বা কুফরী লালন করে মুখে ঈমানের কথা প্রকাশ করল। বাইরে থেকে কারো পক্ষে তা বুঝা সম্ভব নয়। এজন্যে ব্যক্তিকে কাফিরও বলা যায় না।

শরীআত দৈহিক বিধান আর তাসাউফ হল আত্মার বিধান। ফলে শরীআতের অনুশীলন হয় দৈহিকভাবে আর আত্মার মাধ্যমে তাসাউফ অনুশীলন করা হয়।

তাসাউফে যে হুকুম নির্দেশ দেয়া হয় তা দৃশ্যমান নয়। কিন্তু শরীআতে যে নির্দেশ দেয়া হয় তা প্রত্যক্ষ।

শরীআত ব্যক্তির বাহ্যিক মুসলমানিত্ব প্রকাশ করে। এ ছাড়া ব্যক্তির মুসলমান হওয়া না হওয়া শরীআতের ওপর নির্ভর করে। তাসাউফের ক্ষেত্রে এমন কোন ব্যাপার নেই।

শরীআত ইবাদতের বিধান ও পদ্ধতি বর্ণনা করে; কিন্তু এর গ্রহণযোগ্যতার মান নির্ধারণ করে না। তাসাউফ বিধান বর্ণনা করে না বরং ইবাদতের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করে।

বস্তুত প্রকৃতিগত দিক থেকে এ পার্থক্যগুলো থাকলেও উদ্দেশ্য ও উৎসগত দিক থেকে তাসাউফ ও শরীআত এক এবং অভিন্ন। শরীআত ও তাসাউফ – দুটোই চায় আল্লাহর সন্তুষ্টি, আখিরাতে সাফল্য এবং মানুষের যথার্থ ও প্রকৃত বিকাশ। সুতরাং সামগ্রিক বিবেচনাতেই শরীআত ও তাসাউফের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

ইসলামী জীবনব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য ও অনিবার্য দিক হল তাসাউফ। একে ছাড়া মানবিক বিকাশ পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। দুনিয়া ও আখিরাতে সামগ্রিক সাফল্য লাভের নেপথ্যে এর কার্যকারিতা প্রশ্নাতীত। সার্বিক বিবেচনাতেই ইসলামে তাসাউফ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং বিপুল গুরুত্ববহ একটি বিষয়।

মানুষের জীবনের দুটি দিক – একটি বাহ্যিক অন্যটি আত্মিক। বাহ্যিক দিকের বিধি-বিধান ইসলামে শরীআত হিসেবে বিধৃত হয়েছে। এর পরে আসে আত্মিক দিকের বিষয়টি। তাসাউফ এ স্তরের ইসলামী ব্যবস্থাপনা বলে তাসাউফকে বলা যায় ইসলাম পরিকল্পিত সমন্বিত জীবন ধারার প্রতীক। সুতরাং একে উপেক্ষা করা যায় না। কেননা তাসাউফ বাদ দিলে ইসলাম যে মানুষের জীবনের সকল দিকের পূর্ণাঙ্গ বিধান দিয়েছে তা অর্থহীন হয়ে যাবে। সর্বোপরি ইসলাম মানুষের জন্য যে সবকিছুর সমন্বয়ে একটি অনিবার্য সমন্বিত জীবনব্যবস্থা দিয়েছে তাও মিথ্যা প্রমাণিত হবে। অথচ প্রকৃতার্থেই ইসলাম সমন্বিত জীবন বিধান দিয়েছে, যাতে জীবনের কোন একটি অংশও অন্য অংশ থেকে আলাদা নয়। জীবনের কোন একটি কাজও তার মূল লক্ষ্য থেকে স্বতন্ত্র নয়।

মানুষের শুদ্ধতম অন্তর আল্লাহকে ধারণ করতে পারে। তাসাউফ ব্যক্তির আত্মাকে বিশুদ্ধ করে তাকে আল্লাহর অবস্থানের উপযোগী করে তোলে। সুতরাং তাসাউফ শিক্ষা জরুরী।

তাসাউফ মানুষকে আত্মা, পরমাত্মা ও নিজসত্তা বিষয়ে জ্ঞান দান করে। সুতরাং আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে পরমাত্মা আল্লাহকে জানার মাধ্যম হিসেবে তাসাউফ গুরুত্বপূর্ণ।

আপত্তিকর বিষয় থেকে দূরে থেকে, আল্লাহর প্রেমে নিমগ্ন হয়ে বাহ্য ও আন্তর শুদ্ধতা অর্জনের নামই তাসাউফ। সুতরাং আত্মশুদ্ধির অবিকল্প উপায় হিসেবে তাসাউফ শিক্ষা অনিবার্য।

তাসাউফের সাধনা ব্যক্তির সামগ্রিক পরিশুদ্ধতার নির্দেশক বলে একে স্থায়ী কল্যাণ লাভের মাধ্যম বিবেচনা করা যায়। আল্লাহ বলেন – 'সে কল্যাণ লাভ করেছে, যে নিজেকে পবিত্র করেছে। আর ধ্বংস হয়েছে সে, যে নিজের আত্মাকে অপবিত্র করেছে।'[১৯৫]

---

[১৯৫] আল কুরআন / ৯১, ১৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং স্থায়ী কল্যাণ লাভের জন্য তাসাউফ শিক্ষার বিকল্প নেই।

তাসাউফের সাধনা মানুষের অন্তরকে পাপ-পঙ্কিলতা ও কলুষতা থেকে মুক্ত করে। তার অন্তর পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়। আর পরিশুদ্ধ অন্তরের মানুষ পরম পবিত্র সত্তা আল্লাহ তাআলার দীদার লাভে ধন্য। হয়। তাসাউফ ছাড়া অন্তর পরিশুদ্ধ করা সম্ভব না। কেননা অন্তর পরিশুদ্ধ করার ইসলাম সম্মত যে কোন চেষ্টাই হল তাসাউফ।
মানবাত্মার সহজাত আকূতি হল আল্লাহর দীদার লাভ করা। তাসাউফই ব্যক্তিকে আত্মশুদ্ধি ও নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদতের মাধ্যমে চিরকাঙ্ক্ষিত আল্লাহ দীদারের নিশ্চয়তা বিধান করে। কাজেই আল্লাহর দীদার লাভের ক্ষেত্রে তাসাউফ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ঈমানকে সুদৃঢ় করতে এবং ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে তাসাউফের বিকল্প নেই। কেননা ঈমান হল আত্মিক বিষয়। একে আচরণ দিয়ে প্রকাশ করা যায় কিন্তু পরিমাপ করে দেখানো যায় না। কোন বাহ্যিক যুক্তি তর্কে একে প্রমাণও করা যায় না। বরং ঈমানকে উপলব্ধি করতে হয় অন্তরে। আল্লাহর ক্ষমতা, অস্তিত্ব, কুদরত, নিআমত, কিতাব, রাসূল, জান্নাত, জাহান্নাম, আখিরাত, কিয়ামাত, তাকদীর ইত্যাদি বিষয়ে ঈমান পোষণের উপলব্ধি কেবল পরিশুদ্ধ অন্তরেই সম্ভব। তাসাউফ ব্যক্তির অন্তর পরিশুদ্ধ করে তাকে ঈমানের স্বাদ আস্বাদনের যোগ্য করে তোলে। কাজেই তাসাউফ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়।

আমল কবূল হওয়ার জন্যে পূর্বশর্ত আত্মিক নিষ্ঠা ও তাকওয়া। যেমন আল্লাহর ঘোষণা – ' আল্লাহর নিকট পৌছায় না তাদের গোশত ও রক্ত বরং পৌছায় তোমাদের তাকওয়া।'[৭৯৬] আর তাসাউফ হচ্ছে তাকওয়া ও নিষ্ঠা অর্জনের অবিকল্প উপায়। তাসাউফের সাধনাই হল মানুষকে তাকওয়া ও নিষ্ঠা অর্জনে সহায়তা করার সাধনা। তাসাউফ ছাড়া তাকওয়া অর্জন সম্ভব নয়। কারণ আত্মশুদ্ধি আর তাকওয়া অর্জনের যে কোন ইসলাম সম্মত সাধনাই তাসাউফ হিসেবে স্বীকৃত। সুতরাং আমলকে কবুলিয়াতের পর্যায়ে উন্নীত করার জন্যে তাসাউফ জরুরী।

দুনিয়া থেকে আখিরাতের দৃশ্যাবলী অবলোকনের জন্যে তাসাউফের প্রয়োজন। কেননা তাসাউফের সাধনা মানুষের অন্তর চক্ষু উন্মিলিত করে। বাহ্যিক অন্তরায় ও অন্তরাল তখন অর্থহীন হয়ে পড়ে। সে আত্মিক জগতে অবাধ বিচরণ করতে পারে। ফলে আল্লাহ তাঁকে এমন সকল দৃশ্য অবলোকন করান চর্মচক্ষে যা দেখার কল্পনাও করা যায় না।

তাসাউফ সাধনায় ব্যাপৃত সাধকগণ সত্তা, পরমাত্মা, দুনিয়া, আখিরাত, সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরিণতি সম্পর্কে পরম জ্ঞান লাভে সমর্থ হন। কেননা সাধনায় তাদের দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়। তারা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, তাদের পরিণতি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান লাভে সক্ষম হন। যে কারণে মুমিন জীবনে পরম সত্তার জ্ঞান এবং পরম জ্ঞান লাভের মাধ্যম হিসেবে তাসাউফকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।

দুনিয়া ও আখিরাতের পরম জ্যোতি হলেন আল্লাহ তাআলা। তাঁর অবিনশ্বর নূরে উদ্ভাসিত বিশ্বজাহান। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে – 'আল্লাহ আকাশসমূহ ও দুনিয়ার নূর।'[৭৯৭] মানুষ আল্লাহর এ অবিনশ্বর নূরে স্নাত হতে পারে। তা লাভ করে মানব জনম স্বার্থক ও অর্থবহ করতে পারে।
তাসাউফ হচ্ছে বিশ্বজাহানে বিস্তৃত আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এ অবিনাশী আলোক ধারায় ব্যক্তিকে আলোকিত করে তোলার সাধনা। সুতরাং তাসাউফ শিক্ষা প্রয়োজন।

তাসাউফ ব্যক্তিকে সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহর যিকরে নিমগ্ন থাকার শিক্ষা দেয়। ফলে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের যোগ্য হয়ে ওঠে। আল্লাহ বলেন – 'তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের স্মরণ করব এবং তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর আর কুফরী কর না।'[৭৯৮]
তাসাউফ সার্বক্ষণিক যিকরের প্রশিক্ষণ দেয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের নিকট থেকে যেমন কৃতজ্ঞতা ও স্মরণ আশা করেন তাসাউফ তাতে পূর্ণতা প্রদান করে। সুতরাং একে উপক্ষো করা যায় না।

---

[৭৯৬] আল কুরআন / ২২ : ৩৭
[৭৯৭] আল কুরআন / ২৪ : ৩৫
[৭৯৮] আল কুরআন / ২ : ১৫২

Dhaka University Institutional Repository

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন – 'ইলম দু'প্রকার এক প্রকার ইলম হল অন্তরের ইলম আর এই ইলমই মহা উপকারী।[৭৯৯] আর অন্তরের ইলম হল তাসাউফ। একে মহাউপকারী বলার কারণ হল, এর মাধ্যমে ব্যক্তির অন্তর শুদ্ধ হয়, আমল গ্রহণযোগ্য এবং ঈমান পরিশোধিত হয়। তাসাউফ ছাড়া আমল ও ঈমান পরিশুদ্ধ করা সম্ভব নয়। কাজেই মহাউপকারী ইলম হিসেবেই সকলের তাসাউফ সাধনা অনিবার্য।

রাসূলুল্লাহ (সা) এরশাদ করেন – 'শয়তান আদম সন্তানের অন্তর নখর দ্বারা আকঁড়ে রেখেছে। যখন আল্লাহর যিকর করা হয় তখন সে দূর হয়ে যায়। আর যখন আল্লাহকে বিস্মৃত হয়, কুমন্ত্রনা দেয়।[৮০০]
তাসাউফ মুলত সার্বক্ষণিক আল্লাহর যিকরেরই সাধনা বলে – হিদায়াতের পুরোধা হিসেবে একে অবশ্যই শিক্ষা করা কর্তব্য। কেননা আল্লাহর যিকর হিদায়াতের একমাত্র নির্দেশনা দিতে পারে। হিদায়াতকে অর্থবহ এবং ব্যক্তির জন্য উপকারী করে তুলতে পারে। তাসাউফের সাধনা ছাড়া এটা সম্ভব নয়।

দৃশ্য অদৃশ্য পাপাচার ত্যাগে তাসাউফের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে – আত্মাকে শুদ্ধ করা ছাড়া বা মনের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি ছাড়া কোন ভাবেই অদৃশ্য পাপ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। যেমন হিংসা, ঘৃণা, কাম, ক্রোধ, পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা প্রভৃতি বড় ধরনের পাপ। কুফর, নিফাক, শিরক সকল পাপের শিরোমণি। কিন্তু এর কোন টিই প্রকাশ্য নয়। মানুষের চোখ ফাঁকি দিয়ে সহজেই মনের মধ্যে এ পাপ লালন করা যায়। একমাত্র তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেই কেবল এ পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। তাসাউফ ব্যক্তিকে তাকওয়া অর্জনের সাধনায় লিপ্ত করে। কাজেই পাপাচারমুক্ত জীবন গঠনে তাসাউফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ ভূমিকা পালন করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে তাসাউফ ইসলামী চিন্তাধারায় মানুষের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থার অত্যন্তরীণ দিক। বস্তুত ইসলামের সর্বজনীনতা, সর্বকালোপযোগিতা এবং সমন্বিত পূর্ণতার এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত তাসাউফ।

শরীআতে যে সকল ইবাদত সম্পাদনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে সকল ইবাদত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন করার উপযুক্ত মানসিকতা তৈরী করা তাসাউফের মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সফল হলে আনুষঙ্গিক অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহও সফলতা লাভ করবে।
মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন ভাল গুণ সৃষ্টি করার পাশাপাশি কাম, ক্রোধ, হিংসা, ঘৃণা, লোভ প্রভৃতি খারাপ গুণও সৃষ্টি করেছেন। তাসাউফের উদ্দেশ্য হল মানুষকে এ সকল খারাপ গুণ থেকে মুক্ত করা, তার অন্তরকে শুদ্ধ ও পবিত্র করা। কেননা পাশবিক এ সকল ত্রুটি মুক্ত হওয়া না গেলে প্রকৃত মানুষ হওয়া যাবে না। মুমিন মুসলিম হওয়া যাবে না। ফলশ্রুতিতে দুনিয়া ও আখিরাতে অপূরণীয় ব্যর্থতা বহন করতে হবে।

মানুষকে আল্লাহ ভালবেসে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের ভালবাসার পরম লক্ষ্য তাই তাঁর ভালবাসা অর্জন করা। আল্লাহর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি ছাড়া মানুষ কোন রকম সফলতা লাভ করতে পারে না। তাঁর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভ করাই মানুষের পরম ও চরম সফলতা। তাসাউফের একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে এ সফলতা এনে দেয়া। অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলো এই উদ্দেশ্যের আনুষঙ্গিক বিষয়।

নানারকম বাহ্যিক অপবিত্রতা মানুষের শরীর অপবিত্র রাখে। হারাম জীবিকা ব্যক্তির রক্ত মাংসকে পর্যন্ত অপবিত্র করে দেয়। বিভিন্ন রকম অসৎগুণ ও পাপপ্রবণতা মানুষের অন্তর অপবিত্র রাখে। কু প্রবৃত্তি অন্তরে খারাপ বাসনা তৈরী করে। কাজে পরিণত করা না গেলেও এ সকল খারাপ বাসনাই আত্মাকে অপবিত্র করার জন্য যথেষ্ট। তাসাউফের লক্ষ্য হল উল্লিখিত সকল রকমের অপবিত্রতা থেকে মানুষকে পবিত্র রাখা।

কুপ্রবৃত্তি, খারাপ বাসনা, অসৎ চিন্তা এবং লোভ মানুষকে পাপাচারে উদ্বুদ্ধ করে। তাকে আল্লাহ বিমুখ করে তোলে। সে ভাল কাজ, সদাচার ও ইবাদতের ব্যাপারে গাফিল হয়ে যায়। তার কাছে যে কোন মূল্যে নিজের স্বার্থ সংরক্ষণই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে প্রতীয়মান হয়। বাইরে থেকে কখনো কখনো তাকে উদার, মহৎ, সমাজসেবী,

---

[৭৯৯] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইলম
[৮০০] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মানবপ্রেমিক ইত্যাদি মনে হলেও চূড়ান্ত বিবেচনায় সে প্রদর্শনেচ্ছা, পাপাচার, গর্ব, বড়ত্ব ও অহংকার থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে না। তাসাউফের উদ্দেশ্য হল এ সকল খারাপ প্রবৃত্তি দমন করে মানুষকে আল্লাহ নির্দেশিত পথে পরিচালিত করা।

সুন্দরভাবে কথা বলা ও কাজ করার অভ্যাস গড়ে তোলা তাসাউফের অন্যতম লক্ষ্য। কেননা এছাড়া আল্লাহর ভালবাসার পাত্র হওয়া যাবে না। মানুষের সাথে ভাল আচরণ না করে, সুন্দর কথার অভ্যাস না গড়ে তুলে কেউ ভাল মানুষ হতে পারবে না। ইসলাম হল সৌজন্য প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপনা। কোন মুসলমানের সাথে কথা বলার পর অপর ব্যক্তি যদি তার সৌজন্য ও ভদ্রতায় মুগ্ধ না হয় তাহলে বুঝতে হবে সেই মুসলমান আদর্শ মুসলিম নন। তাসাউফ ব্যক্তির উত্তম অভ্যাস গড়ে তুলে তাকে আদর্শ মুসলিমে পরিণত করে।

আল্লাহ তাআলা সকল ক্ষমতা এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার একমাত্র উৎস। যেজন্যে তার ওপর যিনি নির্ভর করেন আল্লাহ তার জন্য হয়ে যান। তার কোন ভয় থাকে না, দুর্ভাবনা থাকে না। তাসাউফ সাধনা তাই সাধকগণের মধ্যে আরো বেশি আল্লাহ নির্ভরতার মানসিকতা তৈরী করে দেয়। সর্বতোভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করতে পারার দুর্লভ গুণ তৈরীর লক্ষ্যে তাসাউফ কাজ করে।

আল্লাহ তাআলা সকল শক্তি, ক্ষমতা, সৌন্দর্য, জ্ঞান ও গুণের মূল উৎস। তিনি এক, অদ্বিতীয় এবং অবিনশ্বর। তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন , তাঁকে জানা, জানার চেষ্টা করা হল সকল জ্ঞানের মূল কথা। তাসাউফের উদ্দেশ্য হল মানুষকে আল্লাহর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দেয়া। তাসাউফ মানুষের খারাপ ও অসৎ প্রবণতা নির্মূল করে। তার মধ্যে ভাল গুণের বিকাশ ঘটায়। আচরণে, অভ্যাসে, মানসিকতায় সে সৎ হয়ে ওঠে।

যে সকল পাপ দেখা যায়, যার কথা মানুষ জানতে পারে সে সকল পাপ থেকে বেঁচে থাকা সহজ। লোকলজ্জা ও সামাজিকতার ভয়েই মানুষ এ ধরনের পাপ থেকে দূরে থাকে। এ ধরনের পাপের সংখ্যাও অবশ্য বেশি নয়। অন্যদিকে যে সকল পাপ দেখা যায় না, যার কথা অন্য মানুষ জানতে পারে না এমন পাপের সংখ্যাই বেশি। এমন পাপ থেকে বেঁচে থাকা সহজ নয়। মনের মধ্যে আল্লাহর ভয় ও ভালবাসা তৈরী না হলে অদৃশ্য এ সকল পাপ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাসাউফের উদ্দেশ্য হল এ জাতীয় পাপ থেকে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা।

ইসলামের সকল সৎগুণের মূল হল তাকওয়া। মানুষের চরিত্র গঠন ও চরিত্র সুরক্ষার এ হল এক দূর্ভেদ্য দুর্গ। তাসাউফের লক্ষ্য হল মানুষকে তাকওয়া গুণে গুণান্বিত করে শ্রেষ্ঠতম চারিত্রিক গুণাবলীতে বিভূষিত হওয়ার পথ করে দেয়া। মানুষের চালিকাশক্তি ও জীবনীশক্তি হল আত্মা। আত্মা পবিত্র থাকলে মানুষ পবিত্র থাকে। আত্মা সুস্থ থাকলে মানুষও সুস্থ থাকে। শরীর সুস্থ ও পবিত্র থাকার পর যদি কেবল আত্মা অপবিত্র বা অসুস্থ থাকে তাহলে মানুষের পক্ষে সুস্থ ও পবিত্র থাকা সম্ভব হয় না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন – 'মানুষের শরীরে এমন একটি মাংসপিণ্ড আছে যা অপবিত্র ও অসুস্থ থাকলে শরীর অপবিত্র ও অসুস্থ থাকে। আর তা যদি সুস্থ ও পবিত্র থাকে তাহলে শরীরও সুস্থ ও পবিত্র থাকে। সাবধান! সেই মাংসপিণ্ডটি হল কলব বা আত্মা।[৮০১]

মানুষের আত্মা যে অসুস্থ হয় তা একটি বাস্তব সত্য কথা। পাপাচার, মিথ্যাবাদিতা, কাম, ক্রোধ, হিংসা, লোভ, প্রতারণা, মিথ্যা ধারণা, অসৎ মানসিকতা প্রভৃতি মানুষের আত্মাকে অপবিত্র ও অসুস্থ রাখে। যেমন – মুনাফিকদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেছেন – 'আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা বলে – আমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান এনেছি' – কিন্তু তারা মুমিন নয়। আল্লাহ ও মুমিনদেরকে তারা প্রতারিত করতে চায়। অথচ তারা যে নিজেদেরকে ছাড়া আর কাউকেও প্রতারিত করে না, তা তারা বুঝতেও পারে না। তাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি। এরপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী।[৮০২]

অসুস্থ ও অপবিত্র অন্তর ঈমানহীনতার পরিচায়ক। অসুস্থ ও অপবিত্র অন্তরের মানুষকে আল্লাহ তাআলা ভালবাসেন না। আখিরাতে এমন মানুষের জন্য ধ্বংস অনিবার্য। অপরদিকে পবিত্র ও সুস্থ আত্মার জন্য রয়েছে কল্যাণ ও সাফল্য

---

[৮০১] ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইলম

[৮০২] আল কুরআন / ২ : ৮–১০

Dhaka University Institutional Repository

লাভের ঘোষণা। আত্মার সুস্থতা ও পবিত্রতা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন ভাবে আত্মাকে সুস্থ ও পবিত্র রাখা যায়। যিকর মানে হল স্মরণ করা। দু ভাবে আল্লাহর যিকর করে আত্মাকে সুস্থ ও পবিত্র রাখা যায়। প্রথমত আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণ এবং কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করে। দ্বিতীয়ত, যে কোন কাজ করার সময় সেক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ মনে করা ও মেনে চলা।

বিনয়, নম্রতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে সকল ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত সালাত আদায়। পাশাপাশি গুরুত্বের সাথে তাহাজ্জুদ সালাত এবং অন্যান্য নফল সালাত আদায় করা। এর মাধ্যমে আত্মাকে অশালীন ও অশ্লীল আচরণ থেকে মুক্তি দেয়া সম্ভব। আল্লাহ তাআলা বলেন – 'নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে।'[৮০৩]

ইসলামী শরীআত যে সকল আচরণ নিষিদ্ধ করেছে তা পরিহার করা। সর্বোতভাবে কাম, ক্রোধ, ক্ষোভ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা, প্রতারণা, মিথ্যাবাদিতা, খারাপ ধারণা, পরনিন্দা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি পরিহারের চেষ্টা করা। তাহলেই আত্মা সুস্থ ও পবিত্র থাকবে।

অন্যকে ভাল কাজের উপদেশ দেয়া, অপরকে ইসলামের নীতি আদর্শের প্রতি আহ্বান জানানো আত্মাকে পবিত্র ও শুদ্ধ রাখার একটি প্রধান উপায়। কেননা অন্যকে যখন ভাল কাজের আদেশ দেয়া হবে বা অন্যকে যখন খারাপ কাজের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করা হবে তখন ব্যক্তি নিজের ক্ষেত্রে তা চিন্তা করবে। ফলে অন্যকে শুদ্ধ করতে যেয়ে সে নিজেকেই শুদ্ধ করবে। মূলত আত্মশুদ্ধি ও নিজেকে হক পথে রাখার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল দাওয়াতে দীনের কাজ অব্যাহত রাখা।

রাসূলুল্লাহ (সা) ও তার সাহাবী (রা) গণের জীবনাচারে যে সকল সৎগুণের বিকাশ ঘটেছিল তার অনুশীলন ও চর্চা ব্যক্তির আত্মাকে পবিত্র ও সুস্থ রাখতে পারে। এ জন্যে আত্মসমালোচনার অভ্যাস তৈরী করা দরকার। ব্যক্তি নিজেকে যতটা ভাল জানে ততটা ভাল আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। ব্যক্তি তাই নিজের খারাপ গুণগুলোর একটি তালিকা তৈরী করতে পারে। তারপর দীর্ঘ পরিকল্পনার আওতায় একটা একটা করে খারাপ গুণ ত্যাগ করার অভ্যাস করে তুলতে পারে। বিপরীত দিক থেকে অনুশীলন শুরু করতে পারে একটি করে ভাল গুণের। এভাবে সৎগুণের অনুশীলন তাকে আদর্শ মানুষে পরিণত করতে পারে। সব সময় আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা, ভুলক্রমে কোন পাপ কাজ করা হলে সে জন্য তীব্র অনুশোচনা প্রকাশ এবং পরবর্তীতে সে কাজ না করার সুদৃঢ় অঙ্গীকারও মানুষের আত্মাকে সুস্থ ও পবিত্র রাখে।

মুসলিম জাতি একদিন শরীআতের বাস্তব অনুসরণের সাথে সাথে তাসাউফের অনুসরণ এবং পরিপূর্ণ অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেরা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়েছিল। তাদের পবিত্রতা ও উন্নত নৈতিকতার শুদ্ধ আলোয় গোটা দুনিয়া প্লাবিত হয়েছিল। মর্যাদা ও মাহাত্ম্যে তারা ছিলেন সবার উপরে। শরীআত ও তাসাউফের সমন্বিত চর্চাই তাদের সাফল্য এনে দিয়েছিল। তারপর মুসলিমরা যখন শরীআত ও তাসাউফকে আলাদা করে ফেললো – সমন্বিত সাধনার পরিবর্তে খণ্ডিত সাধনায় আত্মনিয়োগ করে প্রকৃত সাধনার এ ধারা ছেড়ে দিলো, তখনি তাদের ওপর নেমে এল বিপর্যয়। তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লুপ্ত হল। পরাধীনতার নাগপাশ থেকে ঈমান ও আমলে তাদের আর পরিপূর্ণ মুসলিম থাকারই উপায় রইল না। দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, নির্যাতন আর সামাজিক দিক থেকে হেয় প্রতিপন্ন হওয়া তাদের ভাগ্য হয়ে উঠলো। এ অবস্থা ও দুর্ভাগ্যের অবসান করতে হলে মুসলিম জাতিকে আবারো শরীআত ও তাসাউফের সমন্বিত অনুশীলন শুরু করতে হবে। তাদের নৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধান করতে হবে। আদর্শ চরিত্রের প্রভাবেই তারা নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে পারবেন। সুতরাং জাতীয় মুক্তি ও সামগ্রিক উন্নতির জন্যে আজ বিচ্ছিন্নভাবে শরীআত বা তাসাউফ নয় বরং রাসূলুল্লাহ (সা) এর আদর্শ অনুসারে সমন্বিতভাবে শরীআত ও তাসাউফের পুরোপুরি এবং প্রকৃত অনুশীলন এক বাস্তব প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

---

[৮০৩] আল কুরআন / ২৯ : ৪৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়:

কয়েকজন বিখ্যাত সূফী–সাধক

- ভূমিকা
- আব্দুল কাদির জিলানী (র)
- খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী (র)
- শেখ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র)
- শাহজালাল (র)
- হযরত খানজাহান (র)

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং ইসলামের পরিপূর্ণ অনুশীলন করেছেন এমন একজন মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ইসলামের নীতি আদর্শ মেনে একদিকে যেমন বাহ্যিক ইবাদত করবেন অন্যদিকে তেমনি ইবাদতকে কবুলযোগ্য করে তোলার জন্য অন্তরকেও প্রস্তুত করবেন। মহানবী (সা) তাঁর আদর্শ দিয়ে আমল করা এবং আমলকে কবুলযোগ্য করে তোলার সাধনার মধ্যে কোন ব্যবধান বা স্বাতন্ত্র আরোপ করেন নি। তিনি স্বয়ং এবং তাঁর সকল সাহাবী (রা) এভাবেই বাহ্যিক আমল আর আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে সমন্বয় করেছেন। কোন ক্ষেত্রেই তাদেরকে চরমপন্থা অবলম্বন করতে দেখা যায় নি। মহানবী (সা) নিজে সংসার করেছেন। তাঁর একাধিক স্ত্রী ছিল। তিনি তাঁর প্রতিজন স্ত্রীর হক আদায় করেছেন। তাঁর কন্যা ছিলেন চারজন। তিনি পিতা হিসেবে কন্যাদের প্রাপ্য স্নেহ আদরে কখনোই কার্পণ্য করেন নি। তিনি নানা হিসেবেও পৃথিবীর সকল নানাদের আদর্শ ছিলেন। এমনিভাবে রাষ্ট্রনায়ক, বন্ধু, নেতা, সেনাপতি, সহচর, প্রতিবেশী, শিক্ষক প্রভৃতি সকল ভূমিকাতেই হযরত মুহাম্মদ (সা) মানুষের জন্য অনুসরণীয় আদর্শের বাস্তবরূপ মূর্ত করে তুলেছেন। কেউ যদি আল্লাহর নির্দেশ মানতে চায়, তার হুকুম আহকাম অনুসারে জীবন যাপন করতে চায়, মহানবী (সা) এর আদর্শকে জীবনে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় সে কোন ভাবেই সংসারভিত্তিক সাধনার এ পথ ছাড়া অন্যকোন পথ অবলম্বন করতে পারবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) যে পথ দেখিয়েছেন সে পথ আল্লাহর পথ। আল্লাহ তাআলার নির্দেশেই তিনি এ রকম জীবন যাপন করেছেন। মানুষকে নির্দেশনা দিয়েছেন। মানুষের কল্যাণ আর মঙ্গলের বার্তা প্রচার করেছেন। যেজন্যে তাঁকে বলা হয়েছে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' বা বিশ্বজাহানের জন্য রহমত। কাজেই ইসলামে স্বতন্ত্রভাবে আধ্যাত্মিক সাধনার কোন উপায় নেই। সংসার ও বাহ্যিক জীবন পরিত্যাগ করে সাধনা করার বিষয়টি অন্য যে কোন ধর্মে থাকতে পারে, যে কোন মুসলিম ব্যক্তি তা করেও থাকতে পারেন তবে তা যে কোন ইসলামী বিষয় হবে না তার সুস্পষ্ট প্রমাণ হল স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সা) এর আদর্শ।

মহানবী (সা) এর আদর্শ ধারণ করে পরবর্তীকালের অসংখ্য মানুষ নিজেদের আমল এবং নিয়্যত পরিশোধনের এ কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁদের কেউ কেউ জনগণের নিকট তাঁদের শিক্ষা প্রচারের জন্য বিশেষ সম্মান ও স্বীকৃতি পেয়েছেন। কেউ কেউ তাদের সাধনার ব্যাপ্তি ও পদ্ধতির আলোকে নতুন নতুন পথ ও তরীকা আবিষ্কার করেছেন। তবে সে পথ বা তরীকার কোন টিই কিন্তু মহানবী (সা) এর আদর্শের বাইরে নয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যে সীমা রেখা ঠিক করে দিয়েছেন – তাদের এ পথ ও তরীকা কোন ভাবেই তার বিরোধী নয়। বরং তাঁরা রাসূল (সা) এর অনুসরণে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের মধ্যে, হুকুম আহকাম ও জীবন ধারণের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এদের মধ্যে হাসান আল বসরী, রাবিআ বসরী, ইব্রাহীম ইবনে আদম, জুনায়দ আল বাগদাদী, যুননূন আল মিসরি, বায়জিদ আল বিস্তামী, আল গাযালী, আব্দুল কাদির জিলানী, খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী, নিজামউদ্দীন আউলিয়া, জালাল উদ্দীন রুমী, খাজা মুহাম্মদ বাহাউদ্দীন নকশাবন্দ আল বুখারী, শেখ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী, শাহজালাল, শাহপরান, শাহ মাখদুম, কারামত আলী যৌনপুরী, খানজাহান, আবূ বকর সিদ্দিকী, নেছারুদ্দীন প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। আমরা এ সকল মনীষীগণের মধ্য থেকে আব্দুল কাদির জিলানী, খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী, শেখ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী, শাহজালাল ইয়ামানী এবং খানজাহান (র) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁদের সাধনা পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করব।

অসংখ্য মনীষীগণের মধ্য থেকে এ ক'জনকে নির্বাচিত করার কারণ হল এদের মধ্যে প্রথম তিনজন তিনটি বিখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধনার তরীকার প্রবর্তক। তাঁরা মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার পথিকৃত হিসেবে যেমন ব্যাপক সম্মান পান পাশাপাশি তাদেরকে ঘিরে গড়ে উঠেছে অনেক অনৈতিক কাজ। এ আলোচনা তাদের প্রাপ্য সম্মান নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের ঘিরে গড়ে ওঠা এ সকল অন্যায় আচরণ ও বিশ্বাস সম্পর্কে প্রামাণ্য বিবরণ উপস্থাপন করবে। আর বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে শাহজালাল ইয়ামানী ও খানজাহান আলী (র) কে। তাঁরা যে তথাকথিত কোন পীর ছিলেন না বরং দ্বীনের খিদমতে আত্মোৎসর্গকৃত সাহসী বীর সৈনিক ছিলেন, ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনায়ও রেখেছিলেন অসাধারণ স্বাক্ষর – তা গবেষণায় প্রামাণ্য সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল কাদির জিলানী (র)

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ এক জীবনব্যবস্থা। দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য আধ্যাত্মিকতা ও বৈষয়িকতার মধ্যে এক ইনসাফপূর্ণ, ভারসাম্যমূলক, স্বভাবসুলভ এবং প্রাকৃতিক বিধান পেশ করেছে ইসলাম। এর অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্য দিয়েই কেবল সত্যিকার শান্তি, মুক্তি ও চিরকল্যাণের নিশ্চয়তা পাওয়া যেতে পারে। এ সত্য, শাশ্বত এবং চির সুন্দর ইসলামের সংস্পর্শে এসেই মরুচারী বেদুঈনদের জীবনে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধিত হয়েছিল। ইসলামের কল্যাণে তাঁরা আইয়ামে জাহিলিয়াতকে রূপান্তরিত করেছিলেন সোনালী যুগে। অর্ধ দুনিয়া জয় করে সাম্য, মৈত্রী, ন্যায়, সদাচার, ইনসাফ ও ভ্রাতৃত্বের এক মহান সমাজ গড়ে ইতিহাসের অমর অধ্যায় রচনা করেছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, নতুন নতুন বিস্ময়কর আবিষ্কারে বিশ্ববাসীকে আশা ও সুখে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিলেন। নানাকারণে সোনালী এ দিনগুলো বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। অচিরেই দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার পরিবর্তে তারা দুনিয়ার জীবনের প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়েছিলেন। বিলাসিতা, ভোগ, আদর্শহীনতা, অনৈতিকতা, ষড়যন্ত্র, ক্ষমতা ও অর্থের লোভ তাদেরকে পতনের শেষ সীমায় উপনীত করে। হিজরি পঞ্চম শতকে এসে এ অবস্থা চরম আকার ধারণ করে।

আলী (রা) এর শাহাদাতের মাধ্যমে খিলাফতের গৌরবময় অধ্যায় সমাপ্ত হওয়ার পর ইসলাম বিরোধী রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হয়। মুসলিম নামধারী এ সকল শাসকরা নিজেদেরকে খলীফা ঘোষণা করার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে। তারা নিজেদের নামে খুতবা পড়ার বিধান চালু করে। রাজতান্ত্রিক শাসন ইসলামের নামে চালানোর অপচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। তা সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির কথা চিন্তা করে আপামর মুসলিম জনতা উমাইয়া-আব্বাসীয়দের রাজতান্ত্রিক শাসনই মেনে নিয়েছিলেন। হিজরি পঞ্চম শতকে এসে তাও ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। কেন্দ্রীয় শক্তির দূর্বলতায় মুসলিম জাহানের মধ্যে গড়ে ওঠে অসংখ্য ছোটো ছোটো স্বাধীন রাষ্ট্র। এর মধ্যে একদিকে চলতে থাকে গৃহযুদ্ধ ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র অন্যদিকে বিধর্মীদের বিশেষত খৃষ্টানদের কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন।

রাজনৈতিক দিক থেকে মুসলিম জাহানে নেমে আসা এই দারুন বিপর্যয় সাংস্কৃতিক, নৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রেও বিপর্যয় নামিয়ে আনে। গ্রিক, ভারতীয় ও অন্যান্য অমুসলিম দর্শন নির্বিচারে আমদানী ও তার ব্যাপক চর্চার কারণে আপামর মুসলিম মানসে এর সর্বনাশা কুফল ছড়িয়ে পড়েছিল। সাধারণ মানুষ ভ্রান্ত দর্শনের চটকদার কথা আর মনগড়া যুক্তিতে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। তাদের চিন্তা ও বিশ্বাসে ইসলাম বিরোধী ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটে। ইসলামের নির্ভেজাল তৌহিদী দর্শন কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলাম বিরোধী দর্শনের আগ্রাসনে, শিক্ষাবিদদের স্বার্থান্ধতা এবং শাসকদের অদূরদর্শিতা ও মূর্খতার কারণে তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে। এর ফল যেমন ছিল মারাত্মক তেমনি সুদূরপ্রসারী।

মুসলিম জাতির এমন জাতীয় দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের মধ্যে আশার আলো হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন আব্দুল কাদির (র)। তিনি মুসলিম জাতির ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধঃপতন দূর করার জন্য বিরামহীন সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন। বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে ইসলামী দর্শনকে মুক্ত করার জন্য আমৃত্যু সাধনা অব্যাহত রেখেছিলেন। গ্রিক, ভারতীয় এবং পারসিক বৈরাগ্যবাদের অক্টোপাস থেকে ইসলামী আধ্যাত্মিকতাকে মুক্ত করে এর স্বকীয়তা ফিরিয়ে আনার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। সাধারণভাবে তাকে ইসলামের 'আধ্যাত্মিক সাধক পুরুষ' বলে খণ্ডিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। তাঁর প্রকৃত অবদান ও ভূমিকার কথা না বলে কতিপয় মনগড়া কারামত আর অতিশয়োক্তির মাধ্যমে তাঁকে এমন মহিমান্বিত করে তোলার চেষ্টা করা হয় যা সাধারণ মানুষকে নতুন করে বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। তাদের কেউ কেউ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য আব্দুল কাদির জিলানী (র) এর কাছে প্রার্থনা করে। তার মাযার যিয়ারতের মানত করে। তার জন্য মৃত্যু দিনে বিশেষ দুআ, উরসের আয়োজন করে এমনকি তাঁকে 'গাউসুল আযম' বা সবচেয়ে বড় ত্রাণকর্তা হিসেবে উল্লেখ করে শিরকের মত জঘন্য অনাচারের জন্ম দেয়। অথচ আব্দুল কাদির জিলানী (র) ইসলামকে খিখণ্ডিত মতবাদ হিসেবে উপস্থাপন করেন নি। তিনি বরং ইসলামের বাহ্যিক হুকুম আহকাম পালনের ধারাটি পুনরুজ্জীবিত করার পাশাপাশি এর আধ্যাত্মিক সাধনার প্রকৃত রূপটি তুলে ধরার জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন। নৈতিক, আধ্যাত্মিক, দার্শনিক সংস্কারের সাথে সাথে শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংস্কারেও

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আলোচ্য নিবন্ধে আধ্যাত্মিক সাধক আব্দুল কাদির জিলানী (র) এর জীবনের এ দিকটি তুলে ধরে ইসলামী আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। সাথে সাথে আধ্যাত্মিকতার নামে প্রচলিত অনৈসলামিক ধারণারও অপনোদন করা হবে।

কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ তীরে পর্বত ঘেরা জিলান নগরীতে ১ রমযান ৪৭১ হিজরিতে হযরত আব্দুল কাদির (র) জন্মগ্রহণ করেন। জন্মভূমির সাথে সম্পৃক্ত করেই তাঁকে 'আব্দুল কাদির জিলানী' বলা হয়।
তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আবূ সালিহ্ মূসা জঙ্গী, তাঁর মা সৈয়দা উম্মুল খায়র ফাতিমা। তাঁর নানাহ্ সৈয়দ আব্দুল্লাহ সজিময়ী ছিলেন একজন পরম ধার্মিক, সুযোগ্য আলিম ও সাধক ব্যক্তিত্ব। পিতার দিক দিয়ে তিনি হাসান বিন আলী (রা) এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। আর মাতার দিক দিয়ে তাঁর সম্পর্ক ছিল হুসায়ন বিন আলী (রা) এর সাথে। তাঁর মধ্যে তাই 'হাসানী-হুসায়নী' রক্তধারার পবিত্র সম্মিলন ঘটেছিল। তিনি মুহাম্মাদ (সা) এরও বংশধর ছিলেন।

শৈশব থেকেই আব্দুল কাদির (র) স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল রমযান মাসের ১ তারিখে। জীবনীকারগণ উল্লেখ করেছেন, সেদিন থেকেই তিনি সাওম পালন করেছেন।[৮০৪] মায়ের কোলে শুনে শুনেই তিনি ১৮ পারা পর্যন্ত কুরআন মুখস্থ করে ফেলেছিলেন।[৮০৫] সাতবছর বয়স থেকেই তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় শুরু করেছিলেন।[৮০৬]
অন্যান্য বালক-বালিকাদের মত শিশু সুলভ চাঞ্চল্য তাঁর মধ্যে ছিল না। শৈশবেই তিনি ছিলেন অনেক বেশি শান্ত, স্থির স্বভাবের এক চিন্তাশীল বালক। খেলা, দুষ্টমি, সময় বা শক্তির অর্থহীন অপচয় হয় এমন কোন কাজ তিনি করেন নি। এমনকি অনর্থক খেলায় মগ্ন থাকতেও তাকে দেখা যায় নি। বরং বেশিরভাগ সময় চুপচাপ থেকে, পড়াশোনা করে এবং মায়ের সাথে, বাবা ও অন্যদের সাথে থেকে নতুন কিছু শেখার ক্ষেত্রেই তাঁকে বেশি আগ্রহী দেখা গিয়েছে। পরবর্তীতে তিনি যে একজন বড় মাপের মানুষ হবেন – তার নিদর্শন শৈশবেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

কুরআন হিফয সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে তিনি শিক্ষা জীবন শুরু করেন। তাঁর কুরআন হিফয সম্পন্ন হওয়ার কিছু দিনের মধ্যে তিনি পিতৃ হারা হন। পরিবারে উপার্জনক্ষম আর কোন পুরুষ না থাকায় অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে তাঁর শৈশব ও বালকবেলা কাটে। তাঁর মাতা উম্মুল খায়র ফাতিমা তাঁকে অপাত্য স্নেহে বড় করে তুলেন। কোন ভাবেই যাতে তাঁর পড়ালেখা বন্ধ না হয় সে জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। মায়ের চেষ্টায় অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই আব্দুল কাদির (র) প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর তাঁর মধ্যে আরো বেশি জানার এবং উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তৈরী হয়।

আব্দুল কাদির (র) এর বালকবেলায় মুসলিম জাহানে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রভূমি ছিল বাগদাদ। এ নগরীটি কেবল আব্বাসীয় শাসকদের রাজধানীই ছিল না বরং মুসলিম সভ্যতা, সংস্কৃতিরও রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল। উচ্চশিক্ষার

---

[৮০৪] আমাদের বক্তব্য হল, জন্মদিন থেকেই তিনি সাওম পালন করেছিলেন বলে যে জনশ্রুতি রয়েছে তা একটি অপ্রামাণ্য বিষয়। তাছাড়া এটা অযৌক্তিকও বটে। কেননা দুগ্ধপোষ্য শিশু – তিনি যত বড় আল্লাহর ওলী হোন না কেন – তাঁর উপর সাওম পালন ফরয হয় না। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া ছাড়া কারো উপর আল্লাহ তাআলা শরঈ কোন বিধান পালন করা ফরয করেন নি। সুতরাং আব্দুল কাদির (র) জন্মদিন থেকেই সাওম পালন করবেন – এটি নিতান্তই অতিশায়োক্তি। ভক্তকুল তাকে বড় করে দেখানর জন্য, তার কামালিয়াত ও সাধনায় অলৌকিকত্ব ও বিশেষত্ব আরোপ করার জন্যই এ রকম বর্ণনা করেছেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

[৮০৫] এ ব্যাপারে আরো একটি বর্ণনায় এমনও বলা হয় যে, তিনি মায়ের পেটে থাকতেই আঠার পারা কুরআন মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। এটাও আগের মত বানান অযৌক্তিক প্রচারণা। তবে শৈশবে মায়ের কাছে শুনে শুনে তিনি কুরআন মুখস্থ করে থাকতে পারেন। অনেক তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন মানুষকেই এমনটা করতে দেখা যায় যে, তারা মায়ের কাছে শৈশবে শুনে শুনেই অনেক কিছু মুখস্থ করে ফেলেন।

[৮০৬] এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট। সাতবছর বয়সী কোন বালকের উপর কোন ধরনের ইবাদতই ফরয নয়। সেখানে তাহাজ্জুদ সালাতের মত একটি কষ্টসাধ্য সালাত নিয়মিত আদায় করার ব্যাপারটি বিশ্বাস যোগ্য নয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর কোন নবী-রাসূলের মধ্যেও শৈশবে এমন গুণের বিকাশ ঘটাননি যা জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত। রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন একমাত্র মানুষ যাঁকে ইনসানে কামিল বলা হয়। সত্যবাদিতার মত মানবিক গুণের বিকাশ ছাড়া তাঁর মধ্যে ইবাদতের এমন কোন চিহ্ন প্রকাশ করা হয়নি। এমনকি নবুয়ত পাওয়ার আগে কুরাইশদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পর্যন্ত তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। কাজেই অন্ধভক্তির কারণে এ ধরনের অযৌক্তিক বিশেষত্ব আরোপের চেষ্টা আব্দুল কাদির (র) এর উচ্চ ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

জন্য এ সময়ে বাগদাদে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জ্ঞানপিপাসু আব্দুল কাদির (র) উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য তাই বাগদাদ যাওয়ার পরিকল্পনা করেন।

কিন্তু জিলান থেকে বাগদাদ যাওয়া কোন সহজ বিষয় ছিল না। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থারতো প্রশ্নই আসে না, কোন প্রাচীনতম যোগাযোগও তেমন ছিল না। যাত্রা পথ ছিল দুর্গম এবং বিপদ সঙ্কুল। একাকী কেউ এ পথে চলার সাহস করত না। দল বেঁধে বড় বড় কাফিলা নিয়ে এ পথ কেউ কেউ পাড়ি দিতো। তাও মাঝেমধ্যেই অনেক কাফিলা ডাকাতের কবলে পড়ে সর্বস্ব হারাতো। পথের এ কষ্ট এবং দুর্গমতা সম্পর্কে অবহিত থাকার পরও আব্দুল কাদির (র) তাঁর পরিকল্পনায় অটল ছিলেন। কেননা তাঁর মনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য যে তীব্র ব্যাকুলতা ও অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা তৈরী হয়েছিল সে তুলনায় কোন বিপদই বিবেচনাযোগ্য ছিল না। তিনি তাঁর মায়ের কাছে বাগদাদ যাওয়ার ইচ্ছার কথা প্রকাশ করলেন।

তখন তাদের সংসারের যে অবস্থা তাতে এ প্রস্তাবে রাজি না হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু আব্দুল কাদির (র) এর মা নিজেদের দারুণ সঙ্কটেও ছেলের জ্ঞানপিপাসা নিবারণের ব্যবস্থা করলেন। অবর্ণনীয় অভাব-অনটনের চিন্তাও তাকে এ থেকে ফিরিয়ে রাখলো না। বরং স্বামীর রেখে যাওয়া সর্বশেষ সম্বল ৮০টি স্বর্ণমুদ্রা তিনি জ্ঞানপিপাসু ছেলের হাতে তুলে দিলেন। বালক বেলাতেই আব্দুল কাদির (র) এর মধ্যে যে কী অসম্ভব বিবেচনাবোধ তৈরী হয়েছিল, অন্যের অধিকার আর ন্যায়নীতির ব্যাপারে কী নিষ্ঠা জন্ম নিয়েছিল – এ সময়ে তিনি তার প্রমাণ পেশ করলেন। ৮০টি স্বর্ণমুদ্রাও তার শিক্ষা গ্রহণের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি নিলেন ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা। বাকি মুদ্রাগুলো রেখে দিলেন স্নেহের ছোটো ভাইয়ের জন্য। তারপর অপেক্ষা করতে থাকলেন বাগদাদগামী কোন কাফিলার জন্য। অবশেষে কাফিলার সন্ধানও পাওয়া গেল। পথে ডাকাতের উপদ্রবের কথা চিন্তা করে মা ক্ষুদ্র সম্বল স্বর্ণ মুদ্রাগুলো তাঁর বগলের নিচে জামার কাপড়ে সেলাই করে দিলেন। বিদায় দেয়ার আগে স্নেহময়ী মা উপদেশ দিলেন – 'কখনো মিথ্যা বলবে না। সবসময় আল্লাহর উপর ভরসা করবে।'

মায়ের কাছে উপদেশ পালনের ওয়াদা করে আব্দুল কাদির (র) বাগদাদের পথে, জ্ঞান অর্জনের নতুন সম্ভাবনার পথে, নিজেকে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ শিক্ষিত করে তোলার আলোকিত পথে যাত্রা করলেন। আব্দুল কাদির (র) এর বাগদাদ যাত্রা পথে মায়ের উপদেশ পালন, ওয়াদা পালন আর সত্যবাদিতার এক অনুপম ঘটনা জন্ম নেয়। সাথে সাথে পথহারা নীতিহারা মুসলিমদেরকে সুপথে ফিরিয়ে আনার কাজে তাঁর সফল অভিষেক ঘটে।

বাগদাদমুখী কাফিলাটি দুর্গম পথ অতিক্রম করতে যেয়ে ডাকাত কবলিত হয়। ডাকাতরা কাফিলার প্রতিজন সদস্যের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায়। সবাইকে আলাদা আলাদা ভাবে সার্চ করে। তন্ন তন্ন করে প্রত্যেকের গোপন জায়গা তল্লাশি লুকোন সম্পদও লুট করে নেয়। এমনকি বালক বলে আব্দুল কাদির (র) পর্যন্তও রেহাই পান না। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে – তাঁর কাছে কিছু আছে কি না।

আব্দুল কাদির (র) এর মা উপদেশ দিয়েছিলেন, তিনি যেন মিথ্যা না বলেন এবং তিনি মায়ের উপদেশ পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন। কাজেই একমাত্র সম্বল ৪০টি স্বর্ণ মুদ্রার চেয়েও নিজের ওয়াদাই বেশি দামি বিবেচিত হল। তিনি ডাকাতদের জিজ্ঞাসার জবাবে জানালেন – তার কাছে ৪০টি স্বর্ণ মুদ্রা আছে।

ডাকাতদলের সদস্যরা বিষয়টা বিশ্বাস করল না। তারা তাঁকে তাদের সরদারের কাছে নিয়ে গেলো। সরদারের জিজ্ঞাসার জবাবেও আব্দুল কাদির (র) জানালেন, তাঁর কাছে সত্যিই স্বর্ণমুদ্রা আছে। ডাকাতরা অনেক খুঁজেও স্বর্ণমুদ্রা বের করতে না পেরে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল। তাঁকে প্রতারণাকারী বলল। তখন তিনি জানালেন সত্যিই তিনি কোন মিথ্যাচার করেন নি। বরং প্রকৃতার্থেই তার নিকট ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা আছে এবং সেগুলো তাঁর বগলের নিচে কাপড়ের সাথে সিলাই করা অবস্থায় আছে।

বালকের সরলতা আর সত্য বলা হয়তো ডাকাত সরদারকে বিস্মিত করল। অথবা সে বালকের বোকামি দেখে বিরক্ত হল। তারপরও সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, সে কেন লুকোন স্বর্ণমুদ্রার কথা জানালো। তখন আব্দুল কাদির (র) জানালেন, মায়ের কাছে করা ওয়াদা পালন এবং সত্য বলার জন্যই তিনি এমনটা করেছেন।

তাঁর কথায় ডাকাত দলের সরদার এবং সকল সদস্যদের মধ্যে এক অপূর্ব ভাবাবেগ তৈরী হল। তাদের মধ্যে এই চেতনা তীব্র হয়ে উঠলো যে, এই ছোট্ট একটি ছেলে তার মায়ের সাথের ওয়াদা পালনের জন্য কীভাবে নিশ্চিত ক্ষতি

Dhaka University Institutional Repository

যেনও সত্য বলে ফেললো। ক্ষতির কথা না ভেবে মায়ের উপদেশ পালনকেই কর্তব্য জ্ঞান করল। আর তারা কত খারাপ! মানুষের সম্পদ কেড়ে নেওয়া, সত্য না বলা ইত্যাদি কাজ করেই তাদের জীবন কেটে যাচ্ছে! এই ভাবনা ডাকাতদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরী করল। তখনই তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, এই অভিশপ্ত পাপের জীবন আর না। তারা কাফিলার লোকদের সম্পদ ফেরত দিয়ে নিজেরা আত্মশুদ্ধির সাধনায় নিমগ্ন হলেন।

আব্দুল কাদির (র) যখন বাগদাদে এলেন তখন বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি দুনিয়া জোড়া। বিশ্ববিখ্যাত অনেক মুসলিম মনীষী তৈরী হয়েছেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনিও এখানে এসে ভর্তি হলেন। আত্মনিয়োগ করলেন জ্ঞান অর্জনের পবিত্র সাধনায়। এখানে তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, আরবি সাহিত্য, কালাম শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত অধ্যয়ন করেন। তীক্ষ্ণ মেধা, গভীর প্রত্যয়, নিষ্ঠাপূর্ণ সাধনায় খুব সহসাই আব্দুল কাদির (র) নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতে পরিণত হন।

এ সময়ে নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসভুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার বাইরে ব্যক্তিগত পর্যায়েও পড়াশোনার পদ্ধতি ছিল। অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিই নিজ নিজ বিষয়ে লোকদের ইসলামী জীবন দর্শনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞানদানের কাজ করতেন। নিজে যে বিষয়ে অভিজ্ঞ – কোন সম্মানী ছাড়াই সে বিষয়টি মানুষকে জানিয়ে দিতেন। আব্দুল কাদির (র) এমন ওস্তাদদের কাছেও তালিম গ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষকগণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন – আবূ সানী মুহাম্মদ ইবন হাসান আল বাকিল্লানী, আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ইবন আব্দুল করীম হায়বশ, আবূ গানায়িম মুহাম্মদ ইবন আলী মামুন আল কায়সী, আবূ বকর আহমদ ইবন আল মুজাফফর, আবূ জাফর ইবন আহমদ ইবন আল হুসায়নী, আবূ তাহির আব্দুর রহমান ইবন আহমদ, হিবতুল্লাহ ইবন আল মুবারক, আবূ নসর মুহাম্মদ আবূ ইমাম ইসমাঈল ইবন আল মুহাম্মদ ইসপাহানী, আবুল কাসিম আল ফারুকী, আবদুর রহমান আল কাজ্জাজ, তালহা আল আকুনী ইয়াহইয়া আওলাদ আল বান্না, কাজী আবূ সাঈদ মুবারক মাখরানী, আবদুল ওয়াকী হাম্বলী আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবন কাজী এবং আবুল খাত্তাব মাহফুয হাম্বলী প্রমুখ।

সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে শাস্ত্রীয় পণ্ডিত হিসেবে আব্দুল কাদির (র) এর এ সকল শিক্ষকগণ ছিলেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব। তাঁদের কাছে দীর্ঘদিন বিস্তারিত অধ্যয়ন শেষে তিনি নিজেও শাস্ত্রীয় জ্ঞানে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। অচিরেই তাঁর এ দক্ষতার কথা দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথাগত শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জন শেষে আব্দুল কাদির (র) আত্মশুদ্ধি অর্জন ও আত্মিক উন্নয়নের আধ্যাত্মিক শিক্ষাগ্রহণে আত্মনিয়োগ করেন।

আধ্যাত্মিক ইলম অর্জনের প্রথম পর্যায়ে তিনি সমকালীন শ্রেষ্ঠ সাধক ও আলিম আবূ সাঈদ মুবারক ইবন আলী ইবন হুসায়নী মাখযুমী (র) এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। নযীরবিহীন আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, একাগ্রতা আর আগ্রহে আব্দুল কাদির (র) বায়আত গ্রহণের অল্প দিনের মধ্যে তরিকতের জ্ঞান অর্জন করেন। ক্রমান্বয়ে মারিফাতের জ্ঞানেও তাঁর সফল অধিষ্ঠান ঘটে এবং তিনি এ ক্ষেত্রে মাখযুমী (র) এর সকল শিষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। তাঁর সাধনা ও সফলতাই তাঁকে শায়খ হুসায়নী মাখযুমীর খিরকা লাভে সহযোগিতা করে।

তবে ইলম মারিফাতের উচ্চ শিখরে আরোহণের ব্যাপারটি সহজতর কোন বিষয় ছিল না। এ জন্য মাখজুমী (র) এর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দও তেমন মূল্য পেত না যদি না আব্দুল কাদির (র) নিজে অভাবনীয় দক্ষতায় নিজের সাধনার অংশটি সম্পন্ন না করতেন। ইলমে মারিফাতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌছার জন্য তিনি কঠোর ইবাদত ও রিয়াযতে নিমগ্ন হয়েছিলেন। এ জন্যে তিনি ইরাকের গহীন জঙ্গলে একাদিক্রমে ২৫ বছর মুরাকাবা-মুশাহাদা ও কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনায় কাটিয়েছেন। এ সময় তিনি খাবার-পানীয় প্রায় গ্রহণই করতেন না। দিনের পর দিন কাটাতেন অনাহারে। বেশিরভাগ সময় খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতেন গাছের ফল, পাতা প্রভৃতি।

রিয়াযতকালে তাঁর অবস্থা এমন হত যে, বাহ্য জ্ঞান থাকত না। কখনো আল্লাহর ইশকে চিৎকার করতেন, কখনো জঙ্গলময় ছুটাছুটি করতেন, কখনো বা অজ্ঞান হয়ে ছটফট করতেন। তাঁর ইবাদতের নযীর পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। দীর্ঘ ৪০ বছর তিনি ইশার ওযূ দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেছেন! এ দীর্ঘ সময়ে ইশার পর কোন একটি দিনও তিনি ঘুমোন নি। সারারাত জেগে ইবাদত করেছেন। দীর্ঘ পনেরো বছর তিনি ইশার সালাতের পর প্রতিরাতে একবার করে

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন খতম করেছেন। নিষিদ্ধ দিনগুলো বাদে প্রতিদিন সাওম পালন করেছেন। এ থেকেই ইবাদতে তাঁর নিষ্ঠা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়।[৮০৭]

আব্দুল কাদির (র) ইবাদত সম্পর্কে বলতে যেয়ে বলেছেন – 'সূফীদের ইবাদাত আল্লাহর আযাবের ভয়ে নয়, তাঁর থেকে পুরস্কার লাভের আশায়ও নয়। বরং আল্লাহ প্রেমই তাকে ইবাদতে বাধ্য করে ও মশগুল রাখে।'

এভাবে তিনি নিজ ইচ্ছা–শক্তি, কর্মশক্তি ও চিন্তা শক্তিকে আল্লাহতে সমর্পণ করে তাঁরই ইচ্ছা সিদ্ধিতে নিজেকে বিলীন করে দিয়েছিলেন।

আব্দুল কাদির (র) তাঁর রিয়াযতকালীন সময়ে যখন জঙ্গলে একাকী সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, তখন একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে। জঙ্গল এমনিতেই নিরব, তারউপর নিশুতি অন্ধকার রাত। ভীষণ অন্ধকার, নিরবিচ্ছিন্ন নৈঃশব্দ। তারমধ্যে হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখা গেল। উপর থেকে আলোর বন্যায় আলোকিত হয়ে উঠলো পুরো বনভূমি। আব্দুল কাদির (র) ধ্যানমগ্ন ছিলেন। অবস্থার হঠাৎ অস্বাভাবিক পরিবর্তনে তাঁর ধ্যান ভেঙ্গে গেল। আলোর মধ্য থেকে ভেসে এল একটি গুরু–গম্ভীর কণ্ঠ। কণ্ঠ বলল : 'হে আব্দুল কাদির! আমি আল্লাহ, তোমার কঠোর সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে তোমাকে দীদার দিয়ে ধন্য করার জন্য আরশ থেকে নেমে এসেছি। আমি আজ তোমাকে পরম পুরস্কার দিচ্ছি যে, আজ থেকে তুমি সকল বিধি নিষেধ মুক্ত। আজ হতে আমি তোমার জন্য সব হারামকে হালাল করে দিলাম।'

নিরব–নিস্তব্ধ বন এবং উর্ধ্বাকাশের আলোর বন্যা থেকে ভেসে আসা এই গম্ভীর কণ্ঠ এবং তার বাণী শুনে আব্দুল কাদির (র) বিভ্রান্ত হলেন না। কেননা তিনি জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। তিনি জানতেন, ইসলামকে আল্লাহ তাআলা পূর্ণ করেছেন হযরত মুহাম্মদ (সা) এর মাধ্যমে। এরপরে ইসলামে আর কোন সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধনের প্রয়োজন নেই। হযরত মুহাম্মদ (সা) শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, রাসূল ও নবীই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন সর্বশেষ রাসূলও। তাঁর পরে আর কোন নবী–রাসূল আসবেন না। কাজেই তাঁর মাধ্যমে যা হারাম ঘোষিত হয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত তা বহাল থাকবে। যা হালাল ঘোষিত হয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত তাতে কোন পরিবর্তন আনা যাবে না। নতুন করে তাঁকে এই বনভূমিতে দীদার দিয়ে হারাম–হালাল তুলে নেওয়ার যে কথা বলা হল তা কোন ভাবেই আল্লাহ তাআলার কথা হতে পারে না। এ নিশ্চয় শয়তানের ধোঁকা। শয়তানই তাঁর ঈমান লুট করার জন্য আল্লাহর নামে ধোঁকা দেয়ার এই প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ তৈরী করেছে। কাজেই তিনি পরম করুণাময় আল্লাহর সাহায্য চেয়ে ও তাঁর সর্বময় ক্ষমতা ও অসীম শক্তির কথা বর্ণনা করে তিলাওয়াত করলেন – 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।'

সাথে সাথে বনভূমি উজ্জ্বল করে রাখা আলো বিলীন হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মানুষের আকৃতি ধরে আব্দুল কাদির (র) এর কাছে উপস্থিত হল শয়তান। সে বলল – ' আব্দুল কাদির! আমি এভাবে ধোঁকা দিয়ে অনেক সাধক–দরবেশকে গুমরাহ করেছি। কিন্তু তুমি আলিম। তোমার ইলমই আজ তোমাকে রক্ষা করল।'

আব্দুল কাদির (র) কিন্তু শয়তানের এই স্তুতি বাক্যে ভুললেন না। তিনি আবারো পাঠ করলেন – 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।' আর বললেন – দূর হ' অভিশপ্ত শয়তান। এটা হল তোর আরো মারাত্মক একটি ধোঁকা। আমার জ্ঞানের কোন সাধ্য নেই যে আমাকে তোর ধোঁকা থেকে রক্ষা করে। আমাকে রক্ষা করেছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ।'

অতীতে দেখা গিয়েছে, বর্তমানে দেখা যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও যে দেখা যাবে তা প্রায় নিশ্চিত করে বলা যায় যে, একধরনের লোক নিজেদেরকে নিজেরাই, কামিল মুর্শিদ ঘোষণা করে। নিজেরা নিজেদেরকে আউলিআকুল শিরোমনি বা সূফী সম্রাট ইত্যকার নানা উপাধিতে ভূষিত করে। তাদের অন্ধ ভক্তরা অথবা স্বার্থান্বেষী ভক্তরা নিজেদের

---

[৮০৭] আব্দুল কাদির জিলানী (র) যে একজন অত্যন্ত ইবাদত গুজার লোক ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে তাঁর নফল ইবাদতের কথা যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে সন্দেহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে এমন নিখুঁত বিবরণ কীভাবে দেওয়া সম্ভব হল! কেননা নফল ইবাদত সম্পন্ন করে আব্দুল কাদির জিলানী (র) নিজে তা মানুষকে বলে বেড়াবেন তা হতে পারে না। কেননা নফল ইবাদত গোপনে করার কথা এবং তা গোপন রাখারই নির্দেশ। কেননা এতে করে 'রিয়া' বা প্রদর্শনেচ্ছার বিকাশ ঘটে। আব্দুল কাদির জিলানী (র) এ কাজটি করবেন এমন মনে হয় না। কাজেই যারা তার ইবাদতের বিবরণ দিয়েছেন তারা খানিকটা বাড়াবাড়ি করেই দিয়েছেন মনে হয়। বরং বলা যায়, নিজেদের বানান এ সকল বিবরণ দিয়ে তাঁরা আব্দুল কাদির জিলানী (র) কেই অসম্মান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অপকর্মকে হালাল করা অথবা সত্যিকারার্থেই না বুঝার জন্য তাদের তথাকথিত কামিল মুর্শিদের উপর নানা অলৌকিকতা আরোপ করে। শয়তানের ধোঁকায় আত্মবিস্মৃত হয়ে ধর্মব্যবসায়ী এবং চরম ভণ্ড পীরের কাছে নিজেদের ঈমান-আমল বিকিয়ে দেয়। কেননা এ ধরনের মুর্শিদরা ঘোষণা করে কামালিয়াত হাসিলের পর আর শরীআত মেনে চলার দরকার নেই। সালাত, সাওম, হজ, যাকাত সহ ইসলামের সকল বাহ্যিক ইবাদাত ও অন্যান্য সদাচার, সামাজিক, পারিবারিক ও নৈতিক বিধি-বিধান মেনে চলা তখন ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত হয়। হালাল, হারাম মেনে চলার কোন বাধ্য বাধকতা থাকে না। আসলে এরা আল্লাহর ওলী নয়। তারা নিঃসন্দেহে আল্লাহর অভিশাপপ্রাপ্ত শয়তানের প্রিয়ভাজন অনুসারী।

যে কোন মানুষ সে যত বড় সাধকই হোক না কেন – সে সত্যিকারের সাধক কি-না তার মাপকাঠি হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা)। কোন মানুষের পক্ষে তাঁর চেয়ে বেশি ইবাদত করা সম্ভব না। তাঁর চেয়ে বেশি আধ্যাত্মিক সাধনা ও কামালিয়াত হাসিল করাও সম্ভব নয়। সম্ভব নয় তাঁরচেয়ে বেশি আল্লাহ তাআলার প্রিয়ভাজন হওয়া। আজন্ম নিষ্পাপ হওয়ার পরও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) শরীআতের একটি আমলও তরক করেন নি। বরং এমন অনেক কাজ বেশি বেশি করেছেন, অনুসারীদের জন্য করা কঠিন হবে বিবেচনা করে তা তাদেরকে করতে আদেশ করেন নি। বিশ্বনবী, সর্বশেষ নবী ও রাসূল, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়ভাজন এবং শরীআতের ভাষ্যকার ও ইসলামের পূর্ণতা বিধানকারী হয়েও যে কাজ মহানবী (সা) করেছেন – কেউ যদি দাবি করে তাকে বা তাদেরকে সে কাজ করা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে – তাহলে বুঝতে সে আসলে আল্লাহ ও রাসূলের দল থেকে বের হয়ে গিয়েছে। কেননা হযরত মুহাম্মদ (সা) এর চেয়ে বেশি কামালিয়াতের দাবিদার ভণ্ড এবং অবশ্যই পথভ্রষ্ট না হয়ে পারে না।

বিষয়টির ব্যাখ্যা এভাবেও করা যায় যে, ইলম মারিফাত বা ইসলামী আধ্যাত্মিকতার জ্ঞান ইসলামী শরীঅত বহির্ভূত কোন বিষয় নয়। তা এমন বিষয়ও নয় যা শরীঅতকে অবজ্ঞা করে বা উপেক্ষা করে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে তিন রকম বিধান দিয়েছেন পালন করার জন্য।

প্রথমত : আকাঈদ তথা বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ, রাসূল, ফেরেশতা, কিতাব, আখিরাত, তাকদীর, কিয়ামাত প্রভৃতির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন হল আকীদাগত ইবাদত। এ ইবাদত ছাড়া কোন মানুষ মুসলিম বলে গণ্য হয়ে না। এবং সে যত ভাল কাজই করুক না কেন তা আল্লাহ তাআলার নিকট ভাল কাজ বলে গণ্য হবে না। আল্লাহর নিকট আমল কবূলযোগ্য হওয়ার জন্য অবশ্যই আকাঈদগত ইবাদত আগে সম্পন্ন করতে হবে। ইলমে আকাঈদ বা ইলম আল কালাম শাস্ত্রে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত : যাহিরী আমল তথা আনুষ্ঠানিক ইবাদত। ইসলাম মানুষকে এমন কিছু আমলের নির্দেশ দিয়েছে যা করার জন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার করতে হয়। যা গোপন করা যায় না এবং গোপন করা জরুরীও নয়। বরং প্রকাশ্যে সবাইকে নিয়ে পালন করতে হয়। যেমন সালাত, সাওম, যাকাত, হজ, সুবিচার, সদাচার, ইহসান, তাবলীগ, পরোপকার, দুঃস্থের সেবা, মানবকল্যাণের জন্য নানা কর্মসূচী প্রভৃতি। এ সকল কাজ ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়ে সম্পন্ন করতে হয়। মানুষের পার্থিব শান্তি ও কল্যাণ এবং আখিরাতের মুক্তির জন্য এ কাজের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

তৃতীয়ত : বাতিনী আমল তথা অনানুষ্ঠানিক গোপন ইবাদত। শরীআতের এমন কতগুলো আমল আছে যা করার জন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লাগে না, বরং তা করতে হয় অন্তর দিয়ে। এগুলো বাতিনী আমল। নিয়ত শুদ্ধ করা, তওবা, শোকর, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল বাতিনী আমলের উদাহরণ। যাহিরী বা আনুষ্ঠানিক ইবাদত কবূলযোগ্য হওয়ার জন্য এ ইবাদতটি জরুরী। যাহিরী আমলকে বাদ দিলে এটি কোন ইবাদত না। যেমন যাহিরী ইবাদত হল সালাত আদায় করা। এর মধ্যে বাতিনী ইবাদত হল শুধু আল্লাহর হুকুম পালনের নিয়তে সালাত আদায় নিশ্চিত করার জন্য অন্তরকে যাবতীয় রিয়া থেকে মুক্ত রাখার সাধনা করা। অন্তরকে যদি এ থেকে মুক্ত করা না যায় তাহলে সালাত কবূল যোগ্য হবে না। আবার সালাত আদায় না করে শুধু অন্তর পবিত্র করার এ কাজ অর্থহীন এবং অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হবে। আবার ধরা যাক তওবা, শোকর, তাকওয়া, ইখলাস প্রভৃতি মানসিক কাজগুলো। যাহিরী আমলে ভুল না হলে বা যাহিরী ও মানসিক দিক থেকে আল্লাহর নিকট ভুল করার পর তীব্র অনুশোচনা ও অনুতাপ তৈরী না হলে তওবা অর্থবহ

Dhaka University Institutional Repository

হবে না। যাহিরী ইবাদত না থাকলে বা না করলে নিষ্ঠা দেখানোর কোন সুযোগও থাকবে না। কাজেই শুধু বাতিনী ইবাদাত কেবল অর্থহীনই নয় বরং বিভ্রান্তিকরও বটে।

এ ইবাদাতগুলো কোন একটি এককভাবে শরীআত নয়, বরং শরীআত হল এ তিনের সমন্বয়। আরো সহজভাবে বললে, এ তিনটির সমষ্টিই মূলত ইসলাম। এর কোন একটিকেও অস্বীকার করে, অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করে মুমিন হওয়া যাবে না। কাজেই আকাঈদ বাদ দিয়ে কেউ যদি যাহিরী আমল করে সে মুনাফিক। আকাঈদ অনুশীলন করে যদি কেউ যাহিরী আমল তরক করে সে ফাসিক। আর আকাঈদ ও যাহিরী আমল বাদ দিয়ে কেউ যদি বাতিনী আমলের কথা বলে সে মূর্খ এবং ভণ্ড। সুতরাং কালাম ও ফিকহ বাদ দিয়ে যারা তাসাউফ ও তরীকতের দাবিদার তারা ভণ্ড। আব্দুল কাদির (র) তাসাউফের দাবিদার পীর-ফকিরদের ১২টি দলের কথা উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে কেবল একটি দল যারা শরীআতের বিধি-বিধান মেনে চলে তাদেরকেই কেবল হক বলে আখ্যায়িত করে বাকী ১১টি দলকে ভণ্ড ও বাতিল বলে ঘোষণা দিয়েছেন।
এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক (র) এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যায়। তিনি বলেছেন – 'যে ব্যক্তি কোন ইলম যাহির অর্জন করে নি, সে ফাসিক। যে বাতিন বা তাসাউফ শিখেছে, ফিকহ শিখে নি, সে যিন্দিক বা কাফির। আর যে উভয় বিদ্যা শিক্ষা করেছে, সে মুহাক্কিক।

আব্দুল কাদির (র) আকাঈদ, ফিকহ ও তাসাউফের ইলমের মধ্যে রাসূলের (সা) দেখানো আদর্শ অনুসরণ করেছেন। কোন টিকে আলাদা অতিরিক্ত গুরুত্ব দেন নি। আবার কোন টিকে উপেক্ষাও করেন নি। বরং মহানবী (সা) যেভাবে এ তিনটি বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে উপস্থাপন করেছেন তিনিও তাই করেছেন। ফলে তিনি শরীঅত ও তরীকত – উভয় দিকের ইমাম হিসেবেই বরিত হয়েছিলেন। আর এ জন্যেই তিনি গ্রিক ও ভারতীয় দর্শনের নাস্তিক্যবাদী অথবা বহুশ্বরবাদী প্রভাব থেকে তরীকতকে মুক্ত করে এর প্রকৃতরূপ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শরীআত ও মারিফাতে পূর্ণতা অর্জন করার পর আব্দুল কাদির জিলানী (র) ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমে তিনি জনসভার আয়োজন করে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন। এ সকল জনসভায় তিনি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায়, আবেগপূর্ণভাবে ইসলামের জীবনদর্শন ও মূলনীতি ব্যাখ্যা করেন। প্রথমদিকে সাধারণ মুসলমানরাই এ সকল সভার শ্রোতা ছিলেন। পরে আস্তে আস্তে অমুসলিমরা আসতে শুরু করেন। তাঁর বক্তব্য সাধারণ মুসলমানের উপর অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। তারা নিজেদেরকে পাপ পথ থেকে বিরত রাখার জন্য শপথ গ্রহণ করেন। অনেকেই তওবা করে নতুনভাবে ইসলামী জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর এ সকল সভার বক্তৃতা শুনে প্রায় পাঁচ হাজার অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেন। শেষের দিকে সাধারণ মুসলমানদের সাথে সাথে আলিম, দার্শনিক, গবেষক, আবিষ্কারক, বিজ্ঞানী, আমির-উমরাহরাও তার জনসভায় আসা শুরু করে এবং তার বক্তৃতা শুনে নতুনভাবে জীবন গড়ার শপথ নিয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে ফিরে যায়। আব্দুল কাদির জিলানী (র) তার বক্তৃতা শুনতে আসা বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না। বরং ইসলামের নীতি অনুসারে সবার সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতেন। কাউকে বেশি গুরুত্ব দিতেন না আবার কাউকে গুরুত্বহীন মনে করে দূরে সরিয়ে দিতেন না। বরং গুরুত্ব দিতেন আগ্রহ ও আন্তরিকতাকে। যে যত বেশি আগ্রহ ও আন্তরিকতা নিয়ে তাঁর কাছে আসতো তিনি তাকে তত বেশি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করতেন।

আব্দুল কাদির জিলানী (র) ইসলাম প্রচারের কাজ শুধু জনসভায় বক্তৃতা দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। বরং নতুন করে জীবন যাপন করার শপথ নেওয়া বিভিন্ন পর্যায়ের আলিম – যারা তার শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন – তাদেরকে নিয়ে একটি মুবাল্লিগ দল গঠন করেছিলেন। এ দলটিকে বিশেষ যত্নে শরীআত ও মারিফাতের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। সকল দিক থেকে তাদেরকে ইসলাম প্রচারের জন্য যোগ্য করে তুলেছেন। তারপর তাদেরকে পাঠিয়েছেন দেশ-দেশান্তরে। তাঁর মুবাল্লিগ দলের একটি উপদল সুদূর আফ্রিকার গহীন অরণ্য, মরু ও পর্বতময় এলাকায় গিয়েছিলেন। সেখানে তারা ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে আদিবাসীদের সাথে মিশে গিয়েছিলেন। তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। নিজেদের জীবন দিয়ে তুলে ধরেছিলেন ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য। চারিত্রিক মাধুর্যে

Dhaka University Institutional Repository

প্রমাণ করেছিলেন, ইসলামের চেয়ে মানবতার বন্ধু আর কোন জীবনব্যবস্থা হতে পারে না। তাঁদের জীবনযাপন ও চারিত্রিক মাধুর্য আদিবাসী আফ্রিকানদের মনে গভীর ভাবান্তর তৈরী করেছিল। তারা ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে জীবন ধন্য করেছিলেন। মুবাল্লিগদল গহন অরণ্যের এই আদিবাসীদের শিক্ষা দেয়ার জন্য অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের চেষ্টায় আফ্রিকায় ইসলাম বিস্তৃত হয় বলেই সুদান, নাইজেরিয়া, চাঁদ, ক্যামেরুনের মত দুর্গম দেশে আজো মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লক্ষ্য করা যায়।

আব্দুল কাদির জিলানী (র) এরপর আবূ সাঈদ খরমী (র) এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি প্রয়োজনীয় বৈষয়িক শিক্ষা, ইসলামের বাহ্যিক হুকুম আহকাম বা শরীআত শিক্ষা দেয়ার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক শিক্ষা দানেরও ব্যবস্থা রাখেন। তার চেষ্টায় শিক্ষার্থীরা আমল শুদ্ধ করার সাথে সাথে নিয়ত শুদ্ধ করারও প্রশিক্ষণ পেতে থাকে। তাঁর শিক্ষার্থীরা তথাকথিত মারিফাতের ইলম গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ ইসলাম শেখে। আব্দুল কাদির জিলানী (র)ও নিজের আদর্শ বলে কোন আদর্শ প্রচার না করে বরং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর আদর্শই প্রচার করেন। কেননা তিনি জানেন, ইসলামে হযরত মুহাম্মদ (সা)ই হলেন প্রথম এবং শেষ কথা। তাঁর বিন্দুমাত্র অবাধ্যতা বা তাঁর চেয়ে কাউকে অগ্রাধিকার দেয়া একজন মানুষের কাফির হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কাজেই তিনি নিজস্ব কোন আদর্শ প্রচার করেছেন এটা যারা ভাবেন তারা অত্যন্ত গুমরাহীর মধ্যে বাস করেন। অথবা যারা বলেন, আমরা আব্দুল কাদির জিলানী (র) এর আদর্শ অনুসরণ করব তারাও ভয়ানক গুমরাহীর মধ্যে বাস করেন।

আব্দুল কাদির জিলানী (র) খরমী (র) এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রতিষ্ঠানটির খ্যাতি দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমেই এর ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। একটি সামান্য কুটির থেকে বাগদাদের লোকদের সহযোগিতা ও আগ্রহে প্রতিষ্ঠানটি একটি সুরম্য প্রাসাদে পরিণত হয়। এখানে তিনি পরম আন্তরিকতা ও নিষ্ঠায় একদল আত্মনিবেদিত আলিম গড়ে তোলেন – যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হন। যাদের মধ্যে দুনিয়াকে উপেক্ষা করা বা অবজ্ঞা করার পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা যেমন গুরুত্ব দিতে বলেছেন তেমন গুরুত্ব দেয়ার মানসিকতা তৈরী হয় আবার আধ্যাত্মিক দিক থেকে তাযকিয়ায়ে নফস অর্জনের সাধনা অব্যাহত রাখে। তাঁর কাছে শিক্ষা নেওয়া এ সকল আলিমও ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করে মুসলিম উম্মাহকে ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তির কবল থেকে রক্ষা করেন।

আব্দুল কাদির জিলানী (র) এর খ্যাতি, জ্ঞান গভীরতা ও আন্তরিকতার জন্য দেশ দেশান্তর হতে সাধারণ মানুষ তাদের বিভিন্ন রকম সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর কাছে আসতে থাকে। তিনি কোন রকম বিরক্তি ছাড়াই সাধ্যমত সকলের কথা শোনার এবং কুরআন সুন্নাহর আলোকে তার ফায়সালা দেওয়ার চেষ্টা করেন। ফলে সর্বস্তরে তার একটি বিশেষ ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। সাধারণ ও শিক্ষিত মানুষ সকলেই তাঁকে তাদের অত্যন্ত আপনজন এবং অভিভাবক হিসেবে মেনে চলতে থাকে।

নিজে সভা করে লোকদের ইসলাম সম্পর্কে জানানো, মুবাল্লিগ তৈরী করে তাদেরকে দিয়ে ইসলাম প্রচার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করার সাথে সাথে আব্দুল কাদির জিলানী (র) বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে ফতুহুল গায়ব, গুনিয়াতুত তালিবীন, ফতহুর রব্বানী, কাসিদা প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ। তার এ সকল গ্রন্থ কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে।

আব্দুল কাদির জিলানী (র) এর চারিত্রিক মাধুর্য ইসলাম যেমন মানবীয় চরিত্রের আদেশ দেয় ঠিক তেমনই ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) এর পূর্ণ অনুসারী ছিলেন তিনি। ইসলামের আদর্শ অনুসারে তাই মানুষে মানুষে পার্থক্য করতেন না। দুঃখী মানুষের সেবা করতেন। সবসময় আগে সালাম দেয়ার চেষ্টা করতেন। তবে ক্ষমতাসীনদের তিনি খুব এড়িয়ে চলতেন। তাদের দেয়া কোন উপহার গ্রহণ করতেন না। সাধারণ মানুষের উপহার গ্রহণ করতেন হাসি মুখে। আর যা পেতেন সবই গরীব–দুঃখী মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন।

আব্দুল কাদির জিলানী (র) এর অনেক কারামতের কথা জানা যায়। অনেকক্ষেত্রে তা ভক্তের বর্ণনায় অতিশায়োক্তি হতে পারে, তবে ওলীগণের কারামত যেহেতু সত্য সুতরাং তার সুনির্দিষ্ট কোন কারামত নিয়ে কথা না বলে এটা বলা যায় যে, তিনি কারামতের অধিকারী ছিলেন। পাশাপাশি এ কথাটি মনে রাখতে হবে যে, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)

Dhaka University Institutional Repository

মু'জিযার উপর নির্ভর করে ইসলাম প্রচার করেন নি। বিশ্বনবীর ঘোষণা অনুসারে তাঁর পরে শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে স্বীকৃত যথাক্রমে আবূ বকর (রা), উমর (রা), উসমান (রা) ও আলী (রা)ও ইসলাম প্রচারের জন্য সর্বজনগ্রাহ্য বোধগম্য উপায়ই ব্যবহার করেছেন। কারামতের আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুসারী হিসেবে আব্দুল কাদির জিলানী (র)ও যে ইসলাম প্রচারে স্বাভাবিক পথ অবলম্বন করেছেন, তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তাঁর নিকট থেকে যে সকল কারামত প্রকাশ পেয়েছে তা নিশ্চয় কোন বিশেষ অবস্থা মুকাবিলার জন্য। কাউকে মোহিত বা মুগ্ধ করা বা নিজের বড়ত্ব প্রমাণ করার জন্য না।

আব্দুল কাদির জিলানী (র) বলতেন – 'মুমিনের কাজ তিনটি। আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং তাঁর ইচ্ছার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেওয়া।'

তিনি আরো বলতেন – 'প্রথমে ফরয, পরে সুন্নাত ও তারপর নফল। ফরয ছেড়ে দিয়ে সুন্নত ও নফল নিয়ে মশগুল থাকা আহাম্মকী। সুন্নাত আদায় বাকী রেখে নফল আদায়ের চেষ্টারও কোন মূল্য নেই। ফরয ছেড়ে দিয়ে সুন্নত নফল নিয়ে থাকা বাদশাহকে পরিত্যাগ করে গোলামের খিদমতে আত্মনিয়োগ করার শামিল। শুধু প্রতিমা পূজার নামই শিরক নয়, প্রবৃত্তির দাসত্ব করাও শিরকের শামিল।

সকল ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত ইবাদত সম্পাদনের পর তিনি তার অনুসারী সাধকদের আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য কিছু বিশেষ রীতি নির্ধারণ করে দেন। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতায় তিনি এ বিষয়গুলোকে সাধনায় সহযোগী হিসেবে প্রমাণ করেন। এগুলো হল –

উচ্চস্বরে 'আল্লাহ' যিকর করা।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর ১২ বর্ণের মধ্যে বিশ্বজাহানের সকল রহস্য লুকিয়ে রয়েছে তাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুর' বিশেষ তালিম নেওয়া, একে নিয়ে চিন্তা গবেষণা করা এবং বেশি বেশি যিকর করা।

তাহাজ্জুদের সালাত নিয়মিত আদায় করা এবং এরপরে কুরআন তিলাওয়াত ও দরুদ পাঠ করা।

ফজরের সালাতের পর নিয়িমিত কুরআন তিলাওয়াত ও দরুদ পাঠ করা।

তরিকার সাধক আশিকানদের মারিফাতি গযল শোনা। সাধারণদের জন্য এ গযল শোনা বিদআত।

রবিউস সানী ১১, ৬৬২ হিজরিতে আব্দুল কাদির জিলানী (র) ইন্তিকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১। তাঁর চার স্ত্রী ছিলেন, তাদের ঔরষে জন্ম নিয়েছিল ২৭ পুত্র ও ২২ কন্যা।

রবিউস সানীর ১১ তারিখটি অনেক সংস্থা ও সংগঠন অত্যন্ত গুরুত্ব, মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদযাপন করে। দিবসটি উদযাপিত হয় অনেক মসজিদে। উদযাপনকারীরা এর নাম দিয়েছে 'ফাতিহা ই ইয়াজদাহম।' ফাতিহা ই ইয়াজদাহম' উদযাপন করা হয় আব্দুল কাদির জিলানী (র) এর মৃত্যু উপলক্ষ্যে।

কারো জন্ম বা মৃত্যু উপলক্ষ্যে দিবস উদযাপন করার পক্ষে কুরআন সুন্নাহর কোন সমর্থনতো নে–ই এমনকি কোন ফিকহের কিতাবেও এর পক্ষে কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। এ ধরনের অনুষ্ঠান যেহেতু সওয়াবের নিয়তে করা হয় অথচ কুরআন সুন্নাতে এর সমর্থন নেই, তাই এসব অনুষ্ঠান সুস্পষ্ট বিদআত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন –

من أحدث في أمرنا هذا مالیس منه فهو رد

'যে আমাদের এ দীনে এমন কিছু উদ্ভাবন করে, যা তাতে নেই তা প্রত্যাখ্যান যোগ্য।[৮০৮]

আর জন্মদিন ধর্মীয় ভাবাবেগে পালন করা এবং তাতে সওয়াবের নিয়ত রাখার মত কোন কিছু রাসূলুল্লাহ (সা) আদেশ করেন নি। এ ধরনের নতুন কিছু উদ্ভাবন করার নামই বিদআত। আর সকল ধরনের বিদআতই গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতা। রাসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেছেন –

واياكم ومحدثات الامور فان كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة

'তোমরা নতুন উদ্ভাবিত সকল বিষয় থেকে সতর্ক থাকো। কেননা নতুন উদ্ভাবিত সকল বিষয়ই বিদআত। আর সকল বিদআতই গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতা।[৮০৯]

---

[৮০৮] মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, প্রাগুক্ত, কিতাবুল ইতিসাম

[৮০৯] প্রাগুক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুল কাদির জিলানী (র) এর মৃত্যু উপলক্ষ্যে 'ফাতিহা ইয়াজদাহম' উদযাপনের চেয়েও আরো ভয়াবহ হচ্ছে তাঁকে ঘিরে যেসব আকীদা পোষণ করা হয় সেগুলো। তাঁকে 'গাউছুল আযম বা গাউছ পাক' বলা হয়। তিনি বা অন্য কারো ক্ষেত্রে শব্দগুলো প্রয়োগ করা যায় কি না এ বিষয়টি আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

গাউছুল আযম শব্দ দুটি আরবি। غوث (গাউছ) শব্দটির অর্থ সাহায্য করা, বিপদ থেকে উদ্ধার করা, দুর্দশা থেকে রক্ষা করা। 'গাউছ' এর সাথে আরো কিছু বর্ণ যোগে আরেকটি শব্দ হল استغاثة (ইসতিগাছা) যার অর্থ হল সাহায্য প্রার্থনা করা, দুর্দশা ও সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য কারো সাহায্য কামনা করা।

গাউছ শব্দটি সাহায্যকারী, উদ্ধারকারী, ত্রাণকর্তা হিসেবেও ব্যবহার হয়। যেমন عبد (আবদ) শব্দটির অর্থ দাসত্ব ও গোলামী করা হলেও দাস ও গোলাম অর্থেও এ শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। অর্থের আধিক্য বুঝানোর জন্য ক্রিয়ামূলকে কর্তা অর্থে ব্যবহার আরবি ব্যকরণের একটি সাধারণ রীতি। ব্যকরণের এ রীতি অনুযায়ী গাউছ মানে অধিক সাহায্যকারী, বিপদ থেকে বেশি বেশি উদ্ধারকারী।

উপাধিটির অপর অংশ اعظم (আযম) অর্থ সর্বোচ্চ, সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে মহান। গাউছ ও আযম শব্দ দুটো মিলিয়ে গাউছুল আযম করা হলে এর অর্থ হয় সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী, বিপদাপদ থেকে সবচেয়ে বড় উদ্ধারকারী, সর্বোচ্চ সাহায্যকারী, সবচেয়ে বড় ত্রাণকর্তা। আরবি ভাষার নির্ভরযোগ্য অভিধান ও ব্যাকরণ রীতি অনুসারে 'গাউছুল আযম' শব্দের যে অর্থ আমরা জানলাম তাতে কোন ব্যক্তিকে কি এ অভিধায় অভিহিত করা যায়? কাউকে যদি এ রকম একটি অভিধায় অভিহিত করা হয় তাহলে যারা অভিহিত করছে ইসলামী আকীদা অনুসারে তাদেরকে কী বলা হবে?

ইসলামী ঈমান ও আকীদার অন্যতম মূল কথা হল, আল্লাহই বিপদে আমাদের উদ্ধারকারী, সাহায্যকারী। তিনিই আমাদেরকে সঙ্কট-সমস্যা ও দুর্দশা থেকে উদ্ধার করেন। কঠিন ও সঙ্কটময় মুহূর্তে তিনিই আমাদের পরিত্রাণ কর্তা। তাই বিপদে দুর্দশায়, কঠিন সঙ্কটকালে আমরা শুধু তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করব। আর কারো কাছে নয়। প্রতি সালাতের প্রতি রাকাআতে আমরা এ ঘোষণাই দিচ্ছি যে –

اياك نعبد واياك نستعين

'আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।[৮১০]

আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে বিপদে সাহায্যকারী, বিপদ থেকে উদ্ধারকারী, সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় ত্রাণকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করা তো দূরের কথা ধারণা পোষণ করাও সুস্পষ্ট শিরক। আল্লাহ কুরআন মাজীদে অনেক জায়গায় বলেছেন, যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানানো হয় তাদের উপকার করার ও ক্ষতি থেকে বাঁচানোর কোন ক্ষমতা নেই। যেমন তিনি ইরশাদ করেন – قل اتعبدون من دون الله مالايملك لكم ضرا ولانفعا ط والله هو السميع العليم

'বল, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত কর যার তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করার কোন ক্ষমতা নেই? আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[৮১১]

والذين تدعون من دونه لايستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون

'আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাকে আহ্বান কর তারা তো তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না এবং তাদের নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারে না।[৮১২]

আব্দুল কাদির জিলানী (র) একজন অতন্ত বড়মাপের আল্লাহর ওলী ছিলেন। তাঁকে আল্লাহর ওলী হিসেবে সম্মান করা, ভালবাসা এবং আল্লাহর হুকুম মেনে, রাসূলুল্লাহ (সা) এর আদর্শ অনুসরণ করে তিনি যেভাবে জীবন যাপন করেছেন তেমনি জীবন যাপনেরও চেষ্টা করব। কিন্তু কোন অবস্থাতেই এমন কিছু বলবো না বা করব না যাতে তাঁকে মহান আল্লাহর কোন গুণের সাথে শরীক করতে হয়। কাজেই গাউসুল আযম বলে তাঁকে আমরা আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতায় শরীক করব না। তিনি বিপদে আমাদের সাহায্যকারী নন, হতে পারেন না। তিনি দুর্দশা থেকে আমাদের

---

[৮১০] আল কুরআন / ১ : ৪

[৮১১] আল কুরআন / ৫ : ৭৬

[৮১২] আল কুরআন / ৭ : ১৯৭

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধার করতে পারেন না। সে ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয় নি। স্বয়ং মহানবী (সা)ও কোথাও নিজেকে বিপদ উদ্ধারকারী বলে দাবি করেন নি। কাজেই হযরত মুহাম্মদ (সা) যেখানে তা নন সেখানে তাঁর কোন মুহসিন উম্মতকে তা বলা নিতান্তই মূর্খতা এবং ভয়ঙ্কর শিরক ছাড়া আর কি?

বস্তুত আল্লাহ তাআলাই আমাদের একমাত্র সাহায্যকারী। আমরা শুধু তাঁর কাছেই সাহায্য চাইবো। তিনিই আমাদের সবচেয়ে বড় ত্রাণকর্তা। আর এ অর্থে আল্লাহই 'গাউছুল আযম। আব্দুল কাদির জিলানী (র) বা অন্যকোন ফেরেশতা, জিন্ন, নবী-রাসূল, ওলী, দরবেশ, শাসক, নেতা বা সাধারণ কোন মানুষ কিংবা আব্দুল কাদির জিলানী (র) নয়। এ বিষয়ে আমরা সাবধান হব এবং জানা-অজানা এ রকম শিরক থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করব।

খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র)

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কা এবং তদসংলগ্ন আফগানিস্তান ও আরাকানে ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সকল আল্লাহর ওলী বিশেষ অবদান রেখেছেন – তাঁদের মধ্যে খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) প্রথম ও প্রধান ব্যক্তিত্ব। প্রথাগত রাজনীতিবিদ এবং শাসক বা শাসকদের আনুকূল্য ছাড়া তাঁর মত আর কেউ এত বিশাল ভূ-ভাগে ইসলাম প্রচারে অবদান রাখতে পারেন নি। তিনি সেনাপতি ছিলেন না, রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশ পরিচালনা করেন নি – কিন্তু ইসলামের জন্য তাঁর অবদান তাঁকে এ এলাকায় ইসলামের সকল খাদিমের শীর্ষে স্থান দিয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য ইসলামের এ নিষ্ঠাবান খাদিম যিনি শিরকের মূলোৎপাটন করে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন – তাঁকে ঘিরেই এ উপমহাদেশে এখন ভয়ঙ্কর শিরক মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সাধারণ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মানুষ নির্বিশেষে এখন তাঁর মাযারে যেয়ে আরোগ্য কামনা করে, সম্পদ ও সন্তান এবং সামাজিক সম্মান কামনা করে। তাঁর জন্ম মৃত্যুদিন পালন করা হয় সাড়ম্বরে। লালসালুতে কাপড় বেঁধে তার নামে হাদিয়া-তোহফা তোলা হয়। তাঁকে ঘিরে ইসলামের মৌলিক বিধান পর্দা লংঘন করে এক শ্রেণীর ভক্তনামধারী নর-নারী অশালীন নাচে গানে মেতে ওঠে। এক শ্রেণীর ভণ্ড ভক্ত ও খাদিম তাঁর নাম করে নিজেদেরকে ইসলামের বাহ্যিক আনুষ্ঠানিক ইবাদতের দায়হীন ঘোষণা করে সালাত, সাওম, হাজ্জ, যাকাত, সদাচার, মানবসেবার মত আমল ই সালিহ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখে। অথচ খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) ছিলেন শিরকের বিরুদ্ধে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত সিপাহসালার। আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন শিরকের ভয়ানক থাবা থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য। পৌত্তলিকতা আর বহুদেববাদের লীলাভূমি উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে তাঁর মূল লক্ষ্যই ছিল, শিরকের অসম্মান থেকে আশরাফুল মাখলুকাত মানুষকে মুক্ত করা।

এ নিবন্ধে আমরা দীনের জন্য নিবেদিত প্রাণ, আত্মোৎসর্গীত মহান সাধকের জীবন ও কর্ম বিশ্লেষণ করব। তিনি যে আধ্যাত্মিক সাধনা করেছেন তা যে রাসূলুল্লাহ (সা) এর আদর্শ থেকে অতিরিক্ত কিছু ছিল না এবং জীবনের কোন একটি পর্যায়েও তিনি যে বিশ্বনবী (সা) এর আদর্শচ্যুত হন নি – তা প্রমাণের প্রয়াস পাব। পাশাপাশি তাঁকে ঘিরে গড়ে ওঠা কুসংস্কার ও শিরকের পরিধি ও প্রকৃতি সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় আলোচনা উপস্থাপন করব।

৯ জমাদিউছ ছানী ৫৩০ হিজরি ইস্পাহানের অন্তর্গত সিস্তান জনপদের সাঞ্জার নামক গ্রামে খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খাজা গিয়াসউদ্দীন হাসান এবং তাঁর মাতা উম্মুল ওয়ারাহ। তাঁর মাতাপিতা দুজনই রাসূলুল্লাহ (সা) এর দৌহিত্র হাসান (রা) এর বংশধর ছিলেন। এ জন্য তাঁর ও তাঁর পূর্ব পুরুষগণের নামের সাথে 'হাসান' শব্দটি যুক্ত করা হয়। শৈশবে তাঁকে তার মা বাবা আদর করে শুধু 'হাসান' নামেই ডাকতেন।

খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) এর পিতা গিয়াসউদ্দীন হাসান সিস্তানের একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। একজন সাধক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। দিনে ব্যবসায় করতেন আর রাতে আল্লাহর যিকরে নিয়ত থাকতেন। তাঁর মাও একজন মুত্তাকী মানুষ ছিলেন। সারাদিন সাংসারিক কাজ শেষে স্বামীর সাথে তিনি আল্লাহর ইবাদতে রাত কাটাতেন। এমন ইবাদত গুজার পরিবারের সন্তান হিসেবে তিনিও শৈশবেই ইবাদতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেন।

খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন মুসলিম জাতি একটি সঙ্কটময় অবস্থা অতিক্রম করছিল। মুসলিম জাহানের সর্বত্র তখন স্বার্থান্বেষী মানুষেরা এক অসম্ভব অরাজক অবস্থা তৈরী করে রেখেছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

লুটতরাজ, খুনখারাবি, রাহাজানি আর ক্ষমতাসীনদের ভোগী জীবন জনসাধারণের মধ্যে নাভিশ্বাস তৈরী করেছিল। বিভিন্ন ফিরকা ও দলের বিরোধ, মতদ্বৈততা, পারস্পারিক হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে শহরগুলোকে বিশৃংখলা ও অরাজকতার কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। সেলজুক বংশের শাসক তখন সিস্তান শাসন করছিলেন। স্বজনপ্রীতি ও স্বার্থন্ধতা তাকে জনবিচ্ছিন্ন শাসকে পরিণত করেছিল। দেশের মানুষের স্বার্থের চেয়ে তিনি নিজ গোত্র, বংশ আর পরিবারের লোকদের স্বার্থ রক্ষাকেই তার প্রধান দায়িত্ব মনে করতেন। যে কোন ভাবে শাসনতন্ত্র কুক্ষিগত করে রাখতে পারাটাই তার কাছে সেরা সফলতা ছিল। এ সময় সেলজুক দুঃশাসনের বিরুদ্ধে একটি দুর্ধর্ষ জাতি মাথা তুলে দাঁড়ায়। ইতিহাসে এরা তাতার নামে পরিচিত। তারা ছিল সাহসী যোদ্ধা এবং ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর। সিস্তানে অরাজক পরিস্থিতির সুযোগে তারা নগরীতে তাদের লুটতরাজের রাজত্ব কায়িম করল। সেলজুক শাসক তাদেরকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেও সফল হল না। তার বাহিনী পরাস্ত হল। তিনি নিজে তাতারদের হাতে বন্দি হলেন। এরপর শুরু হল অত্যাচারের নতুন অধ্যায়। তাতাররা যাকে যেখানে পেল হত্যা করতে লাগল। নির্বিবাদে পরিচালনা করল ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাযজ্ঞ ও লুণ্ঠন। কয়েকদিনের মধ্যেই সিস্তান পরিণত হল মৃত নগরীতে। এমনি প্রেক্ষিতে ৫৩৬ হিজরিতে খাজা গিয়াসউদ্দীন সিস্তান ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। স্ত্রী–পুত্র নিয়ে তিনি খোরাসানে হিজরত করলেন। এ সময়ে খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) নিতান্তই বালকমাত্র।

সমকালীন মুসলিম পরিবারের প্রথা ও ঐতিহ্য অনুসারে কুরআন শিক্ষার মাধ্যমেই খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) এর শিক্ষা জীবন শুরু হয়। মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি কুরআন মাজীদ হিফয শেষ করেন। এরপর খোরাসানের আলিমদের নিকট তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, ইলম ও মারিফাত শাস্ত্রের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। তাঁর ১৫ বছর বয়সে ৫৪৪ হিজরিতে তিনি পিতৃহারা হন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর মাও পরলোকে পাড়ি জমান। ভিনদেশে অপরিচিত পরিবেশে কিশোর খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েন। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া একটি ফলের বাগান ও গম পিষার একটি যাঁতা দিয়ে তিনি জীবন চালানোর পরিকল্পনা করেন। নিজে নিজেই বাগানের গাছপালা পরিচর্যা করেন, মাটি খনন করেন, আটা পিষে রুটি তৈরী করেন। সাথে সাথে চলতে থাকে জ্ঞান অর্জনের সাধনা।

মাতাপিতার ইন্তিকালের পর ৫৪৪ হিজরির শেষের দিকে খোরাসানের মায়া ছেড়ে তিনি বুখারা গমন করেন। সেখানে তিনি মওলানা শরফুদ্দীন ও মওলানা হাসান উদ্দীনের মত আলিমগণের সংসর্গে পাঁচ বছর অবস্থান করেন এবং কুরআন, হাদীসের সাথে সাথে শরীআত ও মারিফাতের জ্ঞান অর্জন করেন।
২২ বছর বয়সে তিনি বুখারা ত্যাগ করে বাগদাদ যান এবং সেখানে আব্দুল কাদির জিলানী (র) এর সান্নিধ্য লাভ করেন। আব্দুল কাদির জিলানী (র) তাঁকে শরীআত, মারিফাত, তরীকত ও হাকীকতের বাতিনী ফয়য দান করেন। তাঁর সান্নিধ্যে কাটানো ৫৭টি দিন খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র)কে আমূল বদলে দেয়। এসময় থেকেই তিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান, বাতিনী ইলম, তাযকিয়ায়ে নফস ও কুরআন, হাদীস, ফিকহ, কালাম প্রভৃতি শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান অন্বেষণে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। শুধু তাই নয়, এরপর থেকে তিনি কামিল ওলীর সন্ধানে সিরিয়া, কিরমান, হামাদান, তাবরীয, আস্তারাবাদ, বুখারা, সমরকন্দ, হিরাত, বলখ প্রভৃতি স্থানে ব্যাপক ভ্রমণ করেন। এভাবে অনুসন্ধান করতে করতে দশ বছর কেটে যায়। ৩২ বছর বয়সে তিনি উসমান হারুনী (র) এর সাক্ষাত লাভ করেন। এখানে তিনি আরো দু দশক আধ্যাত্মিক গুরু উসমান হারুনীর সংসর্গে সময় অতিবাহিত করে চিশতিয়া তরীকায় দীক্ষা গ্রহণ করেন। গুরুর খিদমতে থেকে ক্রমান্বয়ে আধ্যাত্মিক ও বাতিনী ইলম হাসিল করেন।

৫৮২ হিজরিতে খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষক উসমান হারুনী (র) এর সাথে মক্কা–মদীনা গমন করেন। এখানে তাঁর সাথে আল্লাহর ধ্যানরত অসংখ্য ওলীর সাক্ষাত ঘটে। এ ছাড়াও তিনি গুরুর সাথে আরো অগুণতি ওলীর কবর যিয়ারত করে তাঁদের রুহানী ফয়য হাসিল করেন। তারপর বায়তুল্লাহ তওয়াফ করেন। বায়তুল্লাহ তওয়াফের পর তাঁরা মদীনা গমন করেন। সেখানে বিশ্বনবীর (সা) রওযা মুবারক যিয়ারত করেন। এরপরেও তাঁরা শত শত মাইল পায়ে হেঁটে বিভিন্ন ওলীর সান্নিধ্যে গমন করেন। এভাবে হাজ্জ সম্পাদন শেষে উসমান হারুনী (র) তাঁর শিষ্যের আধ্যাত্মিক শিক্ষার পূর্ণতার স্বীকৃতি দিয়ে তাঁকে বিদায় জানান। পরবর্তীতে এখান থেকেই খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং পৌত্তলিকতার লীলাভূমি ভারতবর্ষে

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম প্রচারে আত্মোৎসর্গ করেন। আজমীর নামক স্থানে তিনি ইসলাম প্রচার ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখানেই একটি সফল দীর্ঘ জীবন শেষে ৬ রজব ৬৩২ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে এককভাবে তাঁরচেয়ে বেশি অবদান আর কেউ রাখেন নি।

সপ্তদশী তরুণ সিপাহসালার মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধু জয়ের মাধ্যমে ৭১৩ খৃষ্টাব্দে[৮১৩] মুসলিমরা প্রথম রাজনৈতিকভাবে ভারত উপমহাদেশে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রবেশ করে। তিনি সিন্ধু থেকে মুলতান পর্যন্ত অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু একটি নৃশংস ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তরুণ সেনানায়ক মুহাম্মদ মর্মান্তিকভাবে নিহত[৮১৪] হলে উপমহাদেশে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা স্তব্ধ হয়ে যায়।
মুহাম্মদ বিন কাসিমের পর গজনীবংশের সবুক্তগীন (৯৭৭-৯৭ খৃ) ভারতে অভিযান পরিচালনা করেন।[৮১৫] তার পুত্র কনিষ্ঠ পুত্র মাহমুদ নিজেকে সুলতান ঘোষণা করেন (৯৯৭-১০৩০ খৃ) ভারতে অভিযান পরিচালনায় গতি বৃদ্ধি করেন। তার সতেরোবার[৮১৬] ভারত আক্রমণ ও বিজয়ীর বেশে ফিরে যাওয়া উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমণের দ্বার উন্মুক্ত করে। আর এ উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের বিকাশ পর্ব শুরু হয় সুলতান শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘুরীর (১১৭০-১২০৬ খৃ) সুযোগ্য নেতৃত্বে।[৮১৭]

সুলতান শিহাবুদ্দীন মাহমুদ ঘুরীর যে সেনাবাহিনী রাজপূত বীর পৃথ্বিরাজকে পরাজিত ও বন্দী করেছিল, খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র)ও সে বাহিনীর সাথে ছিলেন। তাঁর দুআ ও আধ্যাত্মিক প্রভাব পৃথ্বিরাজের তিন লাখ ঘোড় সওয়ার এবং তিন হাজারের বেশি হাতির বিরাট বাহিনীকে পদানত ও স্বয়ং পৃথ্বিরাজকে বন্দী করার মত অবিশ্বাস্য সাফল্য সহজতর করেছিল।

পৃথ্বিরাজ ছিলেন দিল্লীর সর্বশেষ রাজপূত সম্রাট আনন্দ পালের দৌহিত্র এবং আজমীরের চৌহাস রাজপূত বংশের শেষ নৃপতি। দিল্লী অধিপতি আনন্দ পালের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় দৌহিত্রকেই তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। পৃথিরাজের পৈতৃক সিংহাসন ছিল আজমীরে। দিল্লী ও আজমীরের মত দুটি এলাকার শাসক হওয়ায় সমকালীন ভারতে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে শক্তিমান নৃপতি। তার প্রধান রাজপাট ছিল পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত, তিনি রাজধানী স্থাপন করেছিলেন আজমীরে।
শিহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘুরী প্রথমে দিল্লী আক্রমণ করেন ১১৯১ খৃষ্টাব্দে। থানেশ্বরের নিকটবর্তী তালওয়ান্ডিতে সংঘটিত এ যুদ্ধে ঘুরী পরাজিত হন। পরের বছর তিনি আজমীর আক্রমণ করেন। এ আক্রমণের পরিকল্পনাকারী ছিলেন খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র)। তিনি ঘুরীকে এ আক্রমণের জন্য উৎসাহ দেন এবং নিজে সাথে থেকে যুদ্ধ পরিচালনায় সহযোগিতা করেন। এ যুদ্ধ ছিল রাজপূতদের জন্য একটি মর্যাদার যুদ্ধ। সে কারণে যুদ্ধে পৃথ্বিরাজ একা ছিলেন না। তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল দেড় শতাধিক রাজপূত তাদের নিজেদের পূর্ণ সামরিক শক্তিসহ। কিন্তু যুদ্ধের ফল ঘুরীর পক্ষে যায়। পৃথ্বিরাজসহ রাজপূত যোদ্ধারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। এ যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে আজমীর ও দিল্লীর সিংহাসন চিরদিনের জন্য রাজপূত শক্তির হস্তচ্যুত হয়ে যায়।

খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সা) কর্তৃক আদেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। স্বপ্নে তাঁকে বিশ্বনবী (সা) এ আদেশ দিয়েছিলেন। মুহাম্মদ ঘুরীর অভিযান শুরু হওয়ার অনেক আগেই তিনি একদল সাধক সাথে নিয়ে লাহোর হয়ে দিল্লীতে উপনীত হয়েছিলেন। প্রধান খলীফা খাজা বখতিয়ার কুতুবুদ্দীন কাকী (র) কে দিল্লীতে রেখে তিনি নিজে চলে গিয়েছিলেন তদানীন্তন ভারতের প্রধান শক্তিকেন্দ্র ও হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান পাদপীঠ আজমীরে।

---

[৮১৩] প্রফেসর এ কে এম আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ৪র্থ মুদ্রণ, জুন ১৯৯০, পৃ.১৩-১৪
[৮১৪] Dr. E. P. Roy, ***A Short History of Muslim Rule in India,*** Delhi, 1978, p.36
[৮১৫] S M Jafar, ***Medieval India under Muslim Kings***. London, 1968, p.16
[৮১৬] Dr. E. P. Roy, ibid, p.80
[৮১৭] D. A B M Habibullah, ***The Foundation of Muslim Rules in India,*** Oxford University Press, 1967, p.78

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

এ সময়ে ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা যেমন কম ছিল তেমনি তারা বসবাসও করতেন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গায়। যে জন্যে জনসংখ্যার হিসেবে সে সময়ের মুসলমানদের পক্ষে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনার কথা কল্পনাও করা যেত না। খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) অকল্পনীয় এ কাজটি সম্ভবপর করে তোলার জন্যই তার মিশন শুরু করেন।

'সিয়ারুল আউলিয়া' শীর্ষক প্রামাণ্য গ্রন্থে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে – 'ভারত ভূমির শেষ সীমানা পর্যন্ত ছিল কুফরী ও শেরেকীতে পরিপূর্ণ। এখানে শক্তিমানেরা প্রত্যেকেই সাধারণ মানুষের উপর প্রচণ্ড ধরনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল। তারা এক আল্লাহর কর্তৃত্বের সাথে আরো অনেক কিছুর অংশীদারিত্বের কথা প্রচার করত। ইট, পাথর, বৃক্ষ, জীবজন্তু এমনকি গোময়কে পর্যন্ত পবিত্র বস্তু জ্ঞানে পূজা করত। কুফরীর কালিমায় ওদের হৃদয়-মন ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অর্গলবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সবাই ছিল দীন ও শরীআতের অনুশাসন সম্পর্কে অনবহিত এবং আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূল সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। এদের কেউ কোন দিন 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি যেমন শোনেনি, তেমনি কোন দিকে ফিরে মহান আল্লাহকে সিজদা করতে হয়, সে তথ্যও অবগত হয় নি। খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) এ দেশে এসে অজ্ঞানতা ও ঈমানহীনতার এ অন্ধকার দূর করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর চেষ্টা-সাধনায় আল্লাহর ইচ্ছায় যে পরিবেশ ছিল শিরকের কলরবে মুখরিত সে সব স্থানে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিত – প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক এ অঞ্চলে ইসলাম গ্রহণ করবে, যত নতুন নতুন এলাকায় ইসলাম প্রসারিত হবে তার সওয়াব খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) এর রূহে পৌঁছাতে থাকবে।

খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) ছিলেন হিন্দুস্তানে[৮১৮] রাসূলুল্লাহ (সা) এর নায়িব। সুলতান মাহমুদ গযনবী উপর্যুপরি অভিযানের মাধ্যমে ভারত উপমহাদেশে ইসলামের বীজ বপন করেছিলেন। খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) সে বীজ থেকে শুধু যে বৃক্ষ জন্ম দিয়েছেন তাই নয় বরং তাকে ফুলে ফলে সুশোভিত করে করেছেন। এ কারণেই মুসলিম হিন্দের রূপকার হিসেবে তাঁকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। তাঁকে বলা হয় হিন্দুস্তানের মুকুটহীন সম্রাট বা সুলতানুল হিন্দ। শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র) বলেন – 'সে সময় আজমীর ছিল রাজপূত হিন্দুদের সর্বপ্রধান কেন্দ্র। এতদসঙ্গে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যময় এলাকা হিসেবেও এর একটি বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা ও ভাবমূর্তি পুরো ভারতে গড়ে উঠেছিল। খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) এর অনন্য সাহস, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতাই তাঁকে আজমীরে এসে আস্তানা স্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।'[৮১৯]

প্রকৃত প্রস্তাবে সুলতান মাহমুদ পৌত্তলিকতার প্রধান কেন্দ্রবিন্দুগুলো প্রচণ্ড আঘাত হেনে তাওহীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য পথ তৈরী করে দিয়েছিলেন। সে পথে অগ্রসর হয়ে খাজা আবূ মুহাম্মদ চিশতী (র) ও দাতাগঞ্জ বখশ আলী হাজারী (র) ইসলামের মহান বাণী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিভিন্ন স্থানে জানা-অজানা অগণিত সাধক – দরবেশের বিরামহীন চেষ্টায় যে শক্তিটুকু সঞ্চয় হয়েছিল খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) এর সাধনা ও যত্নে সেটুকু সুসংহত হয়ে ইসলামী হিন্দের অভ্যুদয় ঘটায়। এ জন্যই তিনি উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী ব্যক্তিত্ব ও ইসলামী সমাজের স্বার্থক রূপকার হিসেবে সর্বজন শ্রদ্ধেয় হয়ে আছেন।

খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) এর আগেও ভারত ভূমির বিভিন্ন স্থানে মসজিদ, মাদরাসা ও খানকাহ প্রভৃতি ইসলামী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সীমাহীন প্রতিকূলতার মধ্যে সে সব প্রতিষ্ঠানকে কাজ করতে হত। অনেক ক্ষেত্রে শুধু অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই অকাতরে জীবনের কুরবানী পেশ করতে হত এসকল প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের। এমন প্রেক্ষিতে আজমীরের মত জায়গাকে কেন্দ্র নির্ধারণ করা তাঁর জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় ছিল।

---

[৮১৮] হিন্দুস্তান নামের সাথে হিন্দুধর্মাবলম্বী লোকদের বা হিন্দু ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। এটা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই যে, হিন্দুদের বসতি হিসেবে একে হিন্দুস্তান বলা হয়েছে। প্রকৃতকথা হল, পারসিকরা যখন সিন্ধু আক্রমণ করে তখন থেকেই তারা সিন্ধকে উচ্চারণ বিভ্রাট ঘটিয়ে হিন্দ বলতে থাকে। আর সেখান থেকেই 'হিন্দুস্তান' নামটি গৃহীত হয়। পর্তুগীজরা এ নামকেই উচ্চারণ বিভ্রাটের মাধ্যমে 'ইন্ডজ' এবং চূড়ান্তভাবে 'ইন্ডিয়া' নামকরণ করে। হিন্দুস্তানের এ নামকরণের সাথে এর অধিবাসীদের ধর্ম কোন প্রভাব ফেলে নি।

[৮১৯] আব্দুল হক দেহলবী, *আখবারুল আখইয়ার*, দেওবন্দ, ১৩৮৭ হিজরি, পৃ.১২৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথ্বিরাজ আর তার পৌত্তলিক দোসররা আজমীরে তাঁর উপস্থিতি কখনোই সহজভাবে নেয় নি। নানাভাবে তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদের উত্যক্ত করেছে। নির্যাতন করে আজমীর ত্যাগ করার জন্য বাধ্য করতে চেয়েছে। কিন্তু আল্লাহর উপর অসীম নির্ভরতা, তাঁর ক্ষমতায় নিঃশর্ত আস্থা স্থাপনকারী খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র)কে কোন নির্যাতন ও বাঁধাই তাঁর মিশন থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি।

খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) এর বাণী সঙ্কলন এবং ইসলামী হিন্দের প্রাথমিক যুগের নির্ভরযোগ্য সামাজিক ইতিহাস সূত্র 'ফাওয়ায়িদুল ফুয়াদ' গ্রন্থের বর্ণনা মতে বিখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা রিযাউদ্দীন হাসান সাগামী (র) সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযান শুরু হওয়ার দশ বছর আগে বাদায়ুনে জন্মগ্রহণ করেন। 'মাসরিকুল আরওয়ার' শীর্ষক বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থের সংকলক আল্লামা সাগামী (র) তদানীন্তন মুসলিম বিশ্বের প্রধান জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র বাগদাদ সফরে গেলে সেখানের জ্ঞানী-গুণীগণ পর্যন্ত সাগামীর পাণ্ডিত্যে অভিভূত হয়ে পড়েন। এতে প্রমাণিত হয় যে, হিন্দুস্তানে খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) এর আগমনের আগে থেকেই প্রচুর মুসলিম জনতা ছিলেন এবং ইসলামী জ্ঞানের চর্চাও ছিল। তবে ছিল না ইসলামের বিপ্লবী রূপ। মদীনার পরিপূর্ণ ইসলাম তখন উপস্থিত ছিল না। হিজরতপূর্ব শঙ্কিত-সন্ত্রস্ত মুসলিম সমাজের প্রতিভূ হয়ে উপমহাদেশে মুসলিম সমাজের জীবনযাত্রা অব্যাহত ছিল। খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) এসে তাতে ইসলামী বিপ্লবের প্রকৃত ধারাটি সংযোজন করেন। তাঁর চেষ্টায় মুসলিমগণ শঙ্কিত জীবন যাপনের পরিবর্তে সম্মানিত জীবনযাপন করার উপযুক্ত পরিবেশ পায়। এ থেকে আরো একটি বিষয় প্রমাণিত হয়। তা হল, খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) তথাকথিত মারিফাতের চর্চার নামে সমাজ সংসার ত্যাগ করেন নি। নিজের সামাজিক দায়িত্ব বিস্মৃত হন নি। বরং সমাজে থেকে সমাজ বদলাবার জন্য শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়ায় শক্তি প্রয়োগ করেছেন। নিজে মুহাম্মদ ঘুরীর সাথে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। কাজেই সাধক পুরুষ বা সাধু পুরুষ বলে খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) কে ইসলামী জিহাদের প্রকৃত চেতনা রহিত সাধক হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা যে শুধু অসত্য তাই নয়, বরং যে কোন বিবেচনাতেই তা বিভ্রান্তিকর এবং প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য বিরোধী একটি কাজ। মূল কথা হল তিনি সাধক ছিলেন, শাসক ছিলেন এবং যোদ্ধাও ছিলেন। প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) তো আমাদের সামনে এমন আদর্শই পেশ করেছিলেন। সুতরাং ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হলে মহানবী (সা) এর আদর্শ অনুরসণ ছাড়া আর কোন পথ তো থাকতে পারে না।

বিশ্বনবী (সা) মদীনায় মসজিদে নববী নির্মাণের পর এর সাথে আরো একটি সংলগ্ন কুটির নির্মাণ করেছিলেন। এতে সংসারের বাঁধনমুক্ত একদল সাহাবী (রা) বসবাস করতেন। তাঁরা ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তাঁরা ইসলামের জন্য তাঁদের সংসার জীবনের সুখ, স্বপ্ন, পরিকল্পনা ও আশা বিসর্জন দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এর সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে থেকে তাঁর বাণী সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং প্রতিটি আচরণ,কার্যকলাপ রেকর্ড করাই তাঁদের প্রধান কাজ ছিল। নিজেদেরকে তাঁরা নিবেদন করেছিলেন মূলত জ্ঞান সাধনায়। মসজিদ ই নববী সংলগ্ন এ জায়গাটার নাম ছিল 'সুফফা' আর এর অধিবাসী সাহাবী (রা)গণকে বলা হত আহলি সুফফা। মহানবী (সা) এর এ আদর্শ অনুসরণ করে পরবর্তীকালের ইসলাম প্রচারকগণও তাঁদের প্রধান প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ছোটো আকারে 'খানকাহ' গড়ে তুলতে থাকেন। খানকায় সাধারণভাবে সকলের প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ হয় না। এখানে কেবল আত্মোৎসর্গী মুসলিম মুজাহিদদেরকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলা হয়। বাহ্যিক শিক্ষার সাথে সাথে তাদেরকে আধ্যাত্মিক শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে তোলা হয়। এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দুর্গম এলাকা এবং ইসলামের নাম-গন্ধহীন দেশে ইসলামের আলোকশিখা দেদীপ্যমান করে জ্বালানোর ক্ষেত্রে এ সকল খানকাহে শিক্ষাপ্রাপ্ত সাধকগণই প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বিপ্লবধর্মী ইসলামী আন্দোলনগুলোও প্রধানত এসব খানকাহ থেকেই জন্ম লাভ করেছে।

রাসূলুল্লাহ এর (সা) একনিষ্ঠ আশিক ও অনুসারী খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) প্রিয় হাবীবের অনুসরণে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী পৌত্তলিক শাসক পৃথ্বিরাজের শাসনামলেই খোদ আজমীরে ও আজমীরের বাইরে বাদায়ুন, বেনারস, কনৌজ, নাগুর এবং বিহারেও খানকাহ নির্মাণ করেছিলেন। কনৌজে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই খানকাহর মাধ্যমে ইসলাম আপামর জনসাধারণের মনে আসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম করতে হয়েছিল। ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বিহার বিজয় এবং পরবর্তী দু'বছরের মধ্যে বাংলায় অভিযান পরিচালনা করার অনেক আগে

Dhaka University Institutional Repository

থেকেই এ দুটি এলাকাতে বিপুল সংখ্যক মুসলমান বাস করতেন। আর এ সকল মুসলিম যে খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) প্রতিষ্ঠিত খানকাহ'র আত্মোৎসর্গকৃত মুজাহিদদের মাধ্যমে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন তা তো সহজেই অনুমান করা যায়। বস্তুত মুহাম্মদ ঘুরীর মাধ্যমে রাজনৈতিক বিজয় অর্জনের আগেই এভাবে খানকাহ'র মাধ্যমে খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) ইসলামী বিপ্লবের উপযুক্ত প্রেক্ষাপট তৈরী করে রেখেছিলেন।

ভারত উপমহাদেশের সমাজ জীবন ছিল জাতপাতের বেড়াজালে বিচ্ছিন্ন। এক জাত হতে অন্য জাতের স্পর্শ পর্যন্ত বাঁচিয়ে চলতে অভ্যস্ত। এখানে আভিজাত্য ও সামাজিক মর্যাদা নির্ণীত হয় জন্মের অধিকারে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সুকৃতির ভিত্তিতে কারো পক্ষে মর্যাদার শিখরে আরোহণ করার কোন উপায় নেই। সীমিত সংখ্যক মানুষই উচ্চ বর্ণের দাবিদার। ভোগ – উপভোগের সকল সুযোগ সুবিধা এদেরই করায়ত্ত। আর নিম্ন বর্ণরূপে পরিচিত সাধারণ মানুষ এদের হৃদয়হীন শোষণ–নির্যাতনে একেবারে পিষ্ট হয়ে রয়েছে। মানুষের পরিচয়ে বেঁচে থাকার মত কোন পথও তাদের সামনে খোলা নেই।[৮২০]

খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) বর্ণ প্রথার অমানবিকতা থেকে ভারতের বিশেষত নির্যাতিত নিম্নবর্ণের মানুষদের রক্ষা করার জন্য ভারতের পৌত্তলিক সমাজের মর্মমূলে তাওহীদের অমোঘ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। কুরআনের নির্দেশ অনুসারে সমগ্র মানুষই যে এক আদমের সন্তান, প্রত্যেকটি মানুষের ধমনীতেই যে একই মাতাপিতার রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, এ অনুভূতিকে বাস্তবায়িত করে দেখালেন। ফলে বর্ণবাদ আর সাম্প্রদায়িকতার আভিজাত্যাভিমানী পৌত্তলিক সমাজে নিদারুণ কাঁপন তৈরী হল। নিপীড়িতরা মুক্তির আশায় দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন। খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) ইসলামগ্রহণকারী তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকদের যেভাবে বুকে তুলে নিলেন তা যেন ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন হাবশী বিলাল (রা) এর জীবন চিত্রই পতিত মানুষের চোখে নতুনভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সমাকালীন ভারতীয় সমাজে ইসলামের সাম্যভিত্তিক এ সমাজচিত্র যে কতটুকু আবেগ সৃষ্টি করেছিল, অগণিত মানুষ দলে দলে এসে খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) এর হাতে ইসলামের দীক্ষা গ্রহণের ঘটনা থেকেই তা প্রতীয়মান হয়।

এর একটি কারণ ছিল তাঁর সহজ সরল জীবন যাত্রা। শাসক, সাধক এবং নেতা হয়েও তাঁর জীবন প্রণালীতে কোন অসাধারণত্বের ছাপ ছিল না। 'খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) জীবন ছিল নিতান্ত সহজ–সরল। উপমহাদেশের সর্বাপেক্ষা বড় সমাজ বিপ্লবের এ মহানায়ক একটি পর্ণ কুটিরে বাস করতেন, শতছিন্ন জীর্ণ বসন ছিল তাঁর অঙ্গভূষণ। সমকালীন যুগের রাজা–মহারাজাগণ পর্যন্ত তাঁর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ত। কিন্তু তিনি সারাদিন সাওম পালন করে পাঁচ মিসকাল পরিমাণের বেশি খাদ্য ইফতারের সময়ও গ্রহণ করতেন না।[৮২১]

মুহাম্মদ ঘুরী কর্তৃক দিল্লী ও আজমীর দখল করার পর খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) প্রভূত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হন। স্বয়ং সুলতান তাঁর শিষ্য হওয়ার কারণে সুলতানকে প্রভাবিত করা তাঁর জন্য সহজতর বিষয় বলেই মনে হয়। তা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে এর কোন প্রভাব পড়ে নি। তাঁর জীবন যাত্রায়ও এর কোন ছাপ দেখা যায় নি। তিনি আগে যেমন ছিলেন পরেও ঠিক তেমনি অত্যন্ত সাধারণ মানুষের জীবন যাপন অব্যাহত রাখেন।

খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) এর প্রধান দুই খলীফার মধ্যে খাজা বখতিয়ার কাকী দিল্লীতে এবং শায়খ হামিদুদ্দীন নাগুরী রাজপুতনার নাগুরে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। দিল্লীর সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ এবং কুতুবউদ্দীন আইবেক খাজা বখতিয়ার কাকীর শিষ্য ছিলেন। দিল্লী সিংহাসনের পর পর দু সম্রাটের গুরু হওয়ার পরও বখতিয়ার কাকী আগের মতই সাধারণ জীবন যাপনই করতেন। নিজ শায়খের মত সকল ক্ষমতার প্রলোভন, ভোগের ইচ্ছা তিনিও প্রশমিত করে রেখেছিলেন।

অপর খলীফা নাগুরী (র) নিজ হাতে চাষাবাদের কাজ করতেন। ভক্তরা তাঁর জন্য যা নিয়ে আসতো তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর আদর্শের অনুসরণে তা অভাবীদের মধ্যে বিলি করে দিতেন। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) এর দু প্রধান খলীফার একজনও তাঁর কাছে কোন হাদিয়া তোহফা পাঠাতেন না। বা তাঁর নামে মুরীদদের

---

[৮২০] আবূ রায়হান আল বিরুনী, *কিতাবুল হিন্দ,* বৈরুত, ১৪১২ হিজরি, পৃ.১২৬

[৮২১] খালীক আহমদ নিজামী, *তারীখ মাশায়িখ ই চিশত,* দিল্লী, ১৯৭৬, পৃ.২৫৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

নিকট থেকে কোন হাদিয়া গ্রহণ করতেন না। অথচ আজ অর্বাচীন ভণ্ডের দল তাঁর নামে উরস করে, উরস করার নামে মানুষের কাছ থেকে চাঁদা তোলে, গান-বাজনার আয়োজন করে, তাঁর কবরগাহে যেয়ে ইচ্ছা পূরণের প্রার্থনা করে ভয়ানক শিরকে লিপ্ত হয়।

সকল ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাহ, নফল, মুস্তাহাব ইবাদাত সম্পাদনের পর আধ্যাত্মিক সাধনায় অধিকতর সফলতা এবং সহজতর পথপরিক্রমার জন্য চিশতিয়া তরীকায় কিছু বিশেষ পথ ও পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়। খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) দীর্ঘ সাধনার মাধ্যমে এ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এগুলো হল –
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যিকর করা এবং 'ইল্লাল্লাহ' অংশটুকু উচ্চকণ্ঠে পড়া।
পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর গুরুত্বের সাথে ওযীফা পাঠ করা।
আল্লাহর ধ্যান ও ভালবাসার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।
আল্লাহর গুণাবলী, রাসূলুল্লাহ (সা) এর নীতি, তাদের প্রেম-ভালবাসা প্রভৃতি বিষয়ক বিশেষ গযল গাওয়া।

খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) এবং তাঁর অনুসারী খলীফাগণের প্রধান কাজ ছিল ইলম দীনের চর্চা ও প্রচার-প্রসার। এ জন্য তাঁরা নিজেদের জীবন, সুখ-সুবিধা, চাহিদা ও ভোগাকাঙ্ক্ষাকে কুরবানী দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত খানকাহগুলো তাই উচ্চতর জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সাধারণত জ্ঞানপিপাসুরাই এখানে থাকতেন। 'সুরুরুস সুদূর' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – 'খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) এবং তাঁর খলীফাগণ হাদীস, তফসীর এবং ফিকহর প্রামাণ্য কিতাবসমূহ পড়াতেন। তফসীরে কাশশাফের মত কিতাবও খানকাহর পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল। শায়খ হামিদুদ্দীন নাগুরী (র) ইলম ফারাইয আয়ত্ত করার জন্য তাকিদ দিতেন। একখানা হাদীস উদ্বৃত করে তিনি বলতেন – 'ফারাইয ইলমের অর্ধাংশ।'

খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) এবং তাঁর অনুসারীরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর মত শিক্ষা বিস্তারের আদর্শকে মূল আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, প্রকৃত মুসলিম হওয়ার জন্য শিক্ষা গ্রহণের বিকল্প নেই। তাই খানকাহ'র জন্য তারা বিশেষ পাঠক্রম নির্বাচন করেছিলেন। তাদের নির্বাচিত পাঠক্রমে ইমাম গাযালী (র) এর 'কিমিআয়ে সাদত' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক ছিল। এ ছাড়া ফিকহর কিতাব 'কুদূরী, কিতাবুল ফায়িক, তফসীরের মধ্যে মাদারিক, কাশশাফ, মুকাতিল, যাহিদী ও তফসীর ইমাম নাসিরুদ্দীন এবং হাদীসের মধ্যে মাশারিকুল আনওয়ার, নাহজুল বালাগা ও আগবারুল আছার নিয়মিত পড়ানো হত। এ ছাড়াও শীর্ষস্থানীয় আলিমগণের মাকতুবাত ও মালফুযাত আলোচনাও বাধ্যতামূলক ছিল।[৮২২]

খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) এর উপদেশাবলী বা মালফুযাত লিপিবদ্ধ করেন খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র)। পরে এটিই 'সুরুরুস সুদূর' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এ সময়ের সাধকগণের আরো একটি অমূল্য অবদান হল 'ফাওয়ায়িদুল ফুয়াদ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি। এ সকল কিতাব, পাঠক্রম এবং জ্ঞান চর্চার ধারাই প্রমাণ করে খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) এ দেশে যে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লবের ধারার প্রবর্তন করেন তার প্রধান ভিত্তিই ছিল কুরআন হাদীস ভিত্তিক দীনী ইলমের নিয়মিত চর্চা।

মোটকথা, খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) এবং তাঁর অনুসারী চিশতিয়া তরীকার অনুসারী বুযুর্গগণ ছিলেন সাহাবীগণের অনুকরণে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারে নিবেদিত প্রাণ। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনও ছিল সুন্নত তরীকার এক একটি বাস্তব নমুনা। রাসূলুল্লাহ (সা) এর এক একটি সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা যে ব্যাকুলতা দেখিয়েছেন তা নযীরবিহীন। যাঁরা মনে করেন এমনকি প্রচারের দুঃসাহসও দেখান যে, চিশতিয়া তরীকা শরীআতের অনুশাসন উপেক্ষা করে তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা চর্চার প্রশ্রয় দিয়েছে তারা খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) ও তাঁর অনুসারী অসংখ্য তরীকতপন্থী সাধকদের প্রতি নির্লজ্জ মিথ্যাচারই করেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, যে ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণবাদী সমাজের নিগড় ভাঙ্গার জন্য আল্লাহর রাসূল (সা) কাজ করেছেন, তাঁর অসংখ্য অনুসারী সাহাবীগণ কাজ করেছেন, অসংখ্য মানুষ শাহাদাতের পিয়ালা পান করেছেন, দুনিয়ার সকল সুখ এর খিদমাতে

[৮২২] খালীক আহমদ নিজামী, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

কুরবানী করেছেন – আজ আবার তাঁদের খিদমাতকেই আমরা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে গুনরাহীর কাছে বিকিয়ে দিচ্ছি। যে শিরকের শিকড় মূলোৎপাটনের জন্য বিশ্বনবী এবং তাঁর অনুসারিগণ প্রাণপাত করেছেন, আজ তাওহীদের নিষ্ঠাবান প্রচারক খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) কে কেন্দ্র করে সে শিরকই দানা বেঁধে উঠেছে। এটা যে পৌত্তলিকতাপন্থী ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র তা আজ বুঝার সময় এসেছে। ওরা ওদের মূর্তি পূজার সাথে আমাদের মাযার পূজাকে মিলিয়ে দিচ্ছে। ওদের অবতার আর দেবতার সাথে গুলিয়ে দিচ্ছে ইসলামের মহান সেনানী আল্লাহর দাসানুদাস ওলিগণকে। খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) সম্ভবত এ ক্ষেত্রে ওদের সবচেয়ে বড় আক্রোশের নাম। কেননা তাঁর হাতেই ব্রাহ্মন্যবাদীদের নৈতিক পরাজয় সাধিত হয়েছিল। আজ সময় এসেছে ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ভেঙ্গে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করার। সময় এসেছে আধ্যাত্মিকতার নামে শরীআত উপেক্ষার ধ্বংসাত্মক পথ পরিহার করে ইসলামী শিক্ষার আলোকে আত্মশুদ্ধির প্রকৃত চেতনায় উদ্ভাসিত হওয়ার। তাহলেই যে স্বপ্ন ও সাধ নিয়ে এ দেশে খাজা মুঈন উদ্দীন হাসান চিশতী (র) ও তাঁর অনুসারীরা ইসলামের ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছিলেন সে স্বপ্ন সফল হবে।

শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র)

যুগে যুগে যে সকল সাধক মানুষ নিজেদের নেতৃত্ব, জীবন, সাধনা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধর্মীয়, সামাজিক ও নৈতিক নানাবিধ কুসংস্কার দূর করে মানবগোষ্ঠীর অবিস্মরণীয় কল্যাণ সাধন করেছেন, সংস্কারক, ধর্ম প্রচারক ও আদর্শ মানুষ হিসেবে ইতিহাসে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) তাঁদের অন্যতম। তিনি আমৃত্যু সমাজের নানাবিধ কুসংস্কার দূর করার জন্য সংগ্রাম করেছেন, সকল সামষ্টিক অকল্যাণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, শিরক ও বিদআত মূলোৎপাটনের জন্য জীবনের সকল সুখ ও ভোগ কুরবানী দিয়ে সাধনায় লিপ্ত হয়েছেন, শাসক শ্রেণীর যুলুমের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে নির্যাতিত হয়েছেন – তা সত্ত্বেও আপোষ করেন নি। বরং প্রতিবারই পূর্ণ সফলতার সাথে প্রতিটি পর্যায় অতিক্রম করেছেন।

শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) একজন সফল সাধক, সাহসী সমাজ সংস্কারক। তাঁর সফলতা ও সাধনা সর্বজনবিদিত বিষয়। আল্লাহর অসীম ক্ষমতায় নির্ভরতা তাঁকে অদম্য মনোবল ও বিপুল সাহসে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। একনিষ্ঠ সাধনা, সুগভীর অধ্যবসায়, অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও দৃঢ় মনোবল থাকলে কীভাবে একজন মানুষ সকল ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করতে পারে শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) ছিলেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ও প্রজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

কথিত আছে,[৮২৩] আব্দুল কাদির জিলানী (র) একদিন মুরাকাবায় নিমগ্ন থাকা অবস্থায় একটি নূর প্রকাশিত হয়ে তা দ্বারা সমস্ত বিশ্বকে আলোকিত হতে দেখেন এবং জানতে পারেন যে, তাঁর সময় থেকে পাঁচ শত বছর পরে আল্লাহর এক ওলী পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন। তিনি শিরক ও বিদআত নিশ্চিহ্ন করে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। এ কথা জানার পর জিলানী (র) তাঁর নিজের খিরকা কামালতে পূর্ণ করে পুত্র তাজুদ্দীন আব্দুর রাজ্জাকের কাছে রেখে যান। সে সময় থেকে হস্তান্তরিত হতে হতে সৈয়দ সিকান্দার কর্তৃক শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) সেই খিরকা প্রাপ্ত হন। এভাবে আব্দুল কাদির জিলানী (র) এর খিরকা লাভের বিষয়টি ইসলামের পূনর্জাগরণ এবং শিরক ও বিদআত দূরীকরণে তার সফলতার স্মারক হয়ে আছে। এ প্রেক্ষিতেই যথার্থই বলা যায় –

'Played a prominent part in re-establishing Muslim orthodoxy after the pantheist influence of Hindu teaching on Indian and Pakistani orthodox Muslims and Sufis'.[৮২৪]

---

[৮২৩] কোন নির্ভরযোগ্য কিতাবে এ ঘটনার উল্লেখ নেই। তবে শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফ ই সানী (র) যে সৈয়দ সিকান্দার সূত্রে একটি খিরকা লাভ করেছিলেন তা সত্য বলেই মনে হয়। কিন্তু তা পাঁচশত বছর পূর্বে আবদুল কাদির জিলানী (র) এর দেওয়া খিরকা এমন কথা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণের যেমন কোন উপায় নেই, আবার একে অস্বীকার করারও উপায় নেই। কেননা পক্ষে বা বিপক্ষে সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। এ জন্য আমরা একে সাধারণভাবে উল্লেখ করেছি। এটা দিয়ে আলাদা করে তাঁর কামালিয়াত ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের কোন ইচ্ছা আমাদের নেই।

[৮২৪] Muslim mystics, *The New Encyclopaedia Britannica,* 15th ed, vol.i, London 1987, p.154

Dhaka University Institutional Repository

শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) যে একজন সফল ব্যক্তি হবেন তা তাঁর জন্মের আগেই জানা গিয়েছিল। তাঁর জন্মের আগেই তাঁর পিতা মাকদুম আবদুল আহাদ (র) একবার স্বপ্নে দেখতে পান যে, সমস্ত দুনিয়া অন্ধকারে পরিপূর্ণ এবং বাঘ, বানর, ভালুক ইত্যাদি হিংস্র জন্তু মানুষকে ধ্বংস করে চলছে। ঠিক সে মুহূর্তে মাকদুম আব্দুল আহাদের বক্ষ মতান্তরে পৃষ্ঠদেশ থেকে একটি অত্যুজ্জ্বল আলো বের হয়ে সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করে তুললো। উক্ত আলো থেকে একটি বিদ্যুত চমকে সমস্ত বানর, ভালুক ইত্যাদি জ্বালিয়ে দিলো। এ আলোর মধ্য থেকে একটি সিংহাসন বের হল যাতে একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ বালিশে ঠেস দিয়ে বসে আছেন এবং তার সামনে হাজার হাজার নূরানী লোক ও আসমানের ফেরেশতা আদবের সাথে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি আরো দেখেন যে, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মভ্রষ্ট ও আল্লাহদ্রোহী লোকদেরকে তার সামনে বকরীর মত যবেহ করা হচ্ছে এবং একটি মানুষ উচ্চস্বরে ঘোষণা করছে, সত্য সমাগত, মিথ্যা দূরীভূত, নিশ্চয়ই মিথ্যা দূর হবার। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় তৎকালীন বিখ্যাত সূফী শাহ কামাল (র) মাকদুম আব্দুল আহাদের এমন একটি পুত্র সন্তান জন্মের কথা বলেছিলেন যার দ্বারা সমস্ত বিদাআত ও শিরকের অন্ধকার দূর হয়ে সুন্নতে নববী কায়িম হবে।[৮২৫]

শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) ৪ শাওয়াল ৯৭১ হিজরি মুতাবিক ২৬ জুন ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার আগ্রহে শৈশবেই তিনি কুরআন, হাদীস বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সবার আগে তিনি কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। এরপর পিতার কাছে ইসলামী শরীআতের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের পর আরো উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য শিয়ালকোট গমন করেন। এখানে তিনি সমকালীন বিখ্যাত আলিম মওলানা কামালুদ্দীন কাশ্মীরীর কাছে তাফসীর, আকাঈদ, কালাম, হাদীস, ফিকহ, আদব, মানতিক শাস্ত্রের বিস্তারিত শিক্ষা লাভ করেন। কাশ্মীরীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ শেষে তিনি মুহাদ্দিস শেখ ইয়াকুব কাশ্মীরীর নিকট হাদীসের বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত অধ্যয়ন শেষে সনদ লাভ করেন। দুজন বিখ্যাত আলিমের কাছে শিক্ষা গ্রহণের পরও শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) এর শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহ শেষ হয় না। তিনি কাযী বদখশানীর কাছে তাফসীর, ফিকহ, হাদীস, আদব প্রভৃতি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। এভাবে শিক্ষা গ্রহণ শেষে তিনি তাঁর উস্তাদদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা এবং ফতওয়া প্রদানের ইজাযত লাভ করেন।[৮২৬]

শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) এর পিতা মাকদুম আব্দুল আহাদ (র) একজন প্রথম শ্রেণীর আল্লাহর ওলী ছিলেন। ইসলামী শরীআতের পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের পর তিনি তাই নিজের পিতার কাছেই প্রথম মারিফাতের দীক্ষা গ্রহণ করেন। পিতা তাঁকে কাদিরীয়া, চিশতিয়া, সুহরাওয়ার্দীয়া প্রভৃতি তরীকার তালিম প্রদান করেন। খুব কম সময়ের মধ্যে তিনি এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সফলতা লাভ করেন। সহসাই আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবে তাঁর

---

[৮২৫] আরো দেখুন : মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, *মুজাদ্দিদ ই আলফে সানী (র) এর কামিয়াবী ও কর্মপদ্ধতি*, হেযবুল্লাহ লাইব্রেরী, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ / এ এফ এম আবদুল আযীয ও এস এ সিদ্দীক খান, *মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র)*, ইস্টার্ন বুক সিন্ডিকেট, প্রথম মুদ্রণ – নভেম্বর, ১৯৬১, ১ম খণ্ড/ মাওলানা মোঃ তরিকুল ইসলাম, *মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র)*, বিউটি বুক হাউস, প্রথম প্রকাশ – আগস্ট ১৯৯০ / মাওলানা নূরুর রহমান, *তাযকিয়াতুল আউলিয়া*, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, দ্বিতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ১৯৮৭। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে কোন রকম সূত্র উল্লেখ না করে এমনি ধরনের আরো অসংখ্য ঘটনার আলোকপাত করা হয়েছে। অপ্রামাণ্য এ সকল বর্ণনাকে অনেক ক্ষেত্রেই অতিশোয়োক্তি মনে হয়। কেননা শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফ ই সানী (র) একজন অত্যন্ত বড়মাপের সাধক হলেও তাঁর কর্ম এলাকা ভারত উপমহাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর তিনি সমাজ ও ধর্মীয় কুসংস্কার প্রতিরোধে চেষ্টা করেছিলেন এবং সে জন্যে নির্যাতনও সহ্য করেছিলেন কিন্তু পুরোপুরি সফল হয়েছিলেন একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য প্রমাণিত হয় না। যেমন ইসলামে রাজতন্ত্র নেই। কিন্তু তিনি তা নিরসনে কোন ভূমিকা পালন করেন নি। বরং সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে কারাগার থেকে ছাড়িয়ে এনে তাঁর প্রতি সম্মান দেখালে তিনি তাকে সমর্থন করেন। এমনিভাবে জাহাঙ্গীরের পর সম্রাট শাহজাহান ও সম্রাট আওরঙ্গজেব ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দী ভাইদের হত্যা করে ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করেন। পুরো সাম্রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামের প্রকৃত রূপ ছিল অনুপস্থিত। তবে এমন প্রবল পরাক্রান্ত রাজ শক্তির বিরুদ্ধে সংস্কারের কথা বলে শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফ ই সানী (র) যে অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন এবং তাঁর দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছেন, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সুতরাং অতিশোয়োক্তি আর আরোপিত অলৌকিকতা দিয়ে তাঁকে মাহাত্ম দানের এ সকল অপ্রামাণ্য চেষ্টা ছাড়াই বলা যায়, তিনি একজন প্রকৃতই বুযর্গ লোক এবং সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কারক ছিলেন।

[৮২৬] *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ১৯৮৭, পৃ.২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এতে তাঁর পিতা অত্যন্ত প্রীত হন এবং ইন্তিকালের আগে তাঁকে খিলাফত ও খিরকা প্রদান করে নিজের কারিন মুকাম করেন।

পিতার ইন্তিকালের পর শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) ১০০৮ হিজরিতে বায়তুল্লাহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন। যাত্রা পথে তিনি দিল্লীতে ভ্রমণ বিরতি দেন এবং এখানে নকশবন্দীয়া তরীকার সুপ্রসিদ্ধ পীর খাজা বাকী বিল্লাহ (র) এর কাছে উপস্থিত হয়ে নকশাবন্দীয়া তরীকা গ্রহণ করেন। খাজা বাকী বিল্লাহ সাধারণত কাউকে মুরীদ করার আগে ইস্তিখারা করেন এবং ইস্তিখারায় ইতিবাচক প্রতীয়মান হলেই লোকদের মুরীদ করতেন। কিন্তু শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) এর ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করেন। তিনি মুরীদ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করার সাথে সাথে বিনাদ্বিধায় বিনা ইস্তিখারায় তাঁকে মুরীদ হিসেবে বরণ করে নেন। এরপর তিনি হাজ্জ সম্পাদন করেন এবং মক্কা, মদীনা ও রাসূলুল্লাহ (সা) এর স্মৃতিবাহী বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে আবারো দিল্লী ফিরে আসেন। দিল্লীতে তিনি তিন মাসের কিছু কম সময় অবস্থান করেন। এ অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নকশাবন্দীয়া তরীকায় অসাধারণ উন্নতি লাভে সমর্থ হন। অত্যন্ত সফলতার সাথে তরীকার মাকামসমূহ অতিক্রম করে নিসবত লাভ করেন এবং খাজা বাকীবিল্লাহ (র) এর নিকট থেকে রুখসত লাভ করেন। তরীকায় শিক্ষায় তাঁর অসাধারণ দখল দেখে খাজা বাকীবিল্লাহ তাঁকে তরীকার খিলাফত ও খিরকা দান করেন। এ ব্যাপারে মাঝে মাঝে তিনি অন্যান্য শিষ্যের কাছে গর্ব করে বলতেন যে – ' শায়খ আহমদ সিরহিন্দীর হাতে তরীকা নকশাবন্দীয়া খিলাফতরূপ আমানত সোপর্দ করতে পেরে আমি দায়মুক্ত হয়েছি।'[৮২৭]

নকশাবন্দীয়া তরীকার শিক্ষা পূর্ণ হওয়া এবং তরীকার খিলাফত ও খিরকা লাভের পর শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) তাঁর গুরুর অনুমতি নিয়ে দিল্লী ত্যাগ করে সরহিন্দে ফিরে আসেন। এখানে তিনি তরীকার তালিম, তরবিয়াত ও হিদায়াতে তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর ফয়য ও কামালিয়াতের খ্যাতি সরহিন্দসহ এর আশেপাশের অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন পর্যায়ের আগ্রহী লোক এসে তাঁর কাছে শরীআত, তরীকত, মারিফাত ও হাকীকাতের শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করে। বহু বিশিষ্ট আলিম তাঁর কাছে বায়আত গ্রহণ করেন এবং বহু বিখ্যাত শায়খ তাঁর কাছ থেকে ফয়য লাভ করেন।
লাহোরে অবস্থান কালে মওলানা জামালুদ্দীন তিলভী ও মওলানা আব্দুল হাকিম শিয়ালকোটী তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেন এবং তাঁর কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে 'মুজাদ্দিদ আলফে সানী' উপাধিতে ভূষিত করেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর এ উপাধি মুসলিম জাহানের স্বীকৃতি লাভ করে। এ ভাবে তিনি তাঁর এ উপাধিতেই বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।[৮২৮]

প্রথমে পিতার কাছে তিনি চিশতিয়া, কাদিরীয়া ও সুহরাওয়ার্দীয়া তরীকার জ্ঞান লাভ করেন। খাজা বাকী বিল্লাহর মাধ্যমে নকশাবন্দীয়া তরীকার ব্যাপারেও তিনি বিপুল পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। ফলে তরীকাসমূহ সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত ধারণা ছিল। তরীকাগুলোর কোন কোন বিষয় তাঁর মনোপূত ছিল না। তাছাড়া এগুলোর অনেক কিছুই তাঁর বিবেচনায় সাধারণ মানুষের জন্য ছিল খানিকটা জটিল এবং কঠিন। যে জন্যে এ পর্যায়ে শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) সবার নিকট সহজবোধ্য ও সহজসাধ্য একটি তরীকা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এটিই বিখ্যাত 'মুজাদ্দিদীয়া' তরীকা হিসেবে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। উপমহাদেশে প্রচলিত সকল তরীকার প্রবর্তকগণ বাইরে থেকে এ দেশে তাঁদের তরীকা প্রবর্তন করেছেন। অথবা তাঁরা নিজেরা এ দেশে এলেও তাঁরা ভিন্ন দেশের অধিবাসী ছিলেন এবং তাদের তরীকার উদ্ভবও এদেশে হয় নি। এ ক্ষেত্রে মুজাদ্দিদীয়া তরীকাই একমাত্র ব্যতিক্রম। এ তরীকাটি উপমহাদেশেই জন্ম নিয়েছে এবং এখান থেকে অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করেছে। তাছাড়া অন্যান্য তরীকাসমূহের নির্যাস নিয়ে গড়ে ওঠার কারণে এ ছিল তরীকাসমূহের এক সমন্বিত প্রকাশ, সম্মিলিত রূপ। দীনের আবশ্যকীয় ইবাদত সম্পাদনের পর আত্মিক সাধনায় সফলতা অর্জনের জন্য এ তরীকায় কিছু বিশেষ রীতি অনুসৃত হত। যেমন –
'উচ্চকণ্ঠে যিকর করা।

---

[৮২৭] মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫২
[৮২৮] এ এফ এম আব্দুল আযীয, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫ / মওলানা তরিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

বাদ্যযন্ত্র ছাড়া হামদ ও নাত শোনা
তাসাউফ সাধনার বিভিন্ন স্তরবিন্যাস এবং প্রতিটি স্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মুরাকাবা বা ধ্যান।
রাসূলুল্লাহ (সা) এর শানে বেশি বেশি দরুদ পাঠ।'

তরীকা প্রবর্তন ও আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবে উচ্চ স্তরে আরোহণের পর শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) রাষ্ট্রীয় অনাচার প্রতিরোধে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হন। মুল্লা মুবারক নাগোরী ও তার দু পুত্র আবুল ফজল ও ফয়েজী প্রমুখ স্বার্থান্বেষী আলিম নামের কুলাঙ্গার ব্যক্তিদের প্ররোচনা ও সহযোগিতায়, হিন্দুধর্মাবলম্বী রাজপুত স্ত্রীদের প্রভাবে এবং রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে মুঘল সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)[৮২৯] হিন্দু, পারসিক, বৌদ্ধ, খৃষ্ট, জৈন, শিখ প্রভৃতি ধর্ম এবং শীআ, সুন্নী নির্বিশেষে সকল মতবাদের সমন্বয়ে একটি নবতর ধর্ম মত প্রবর্তন করেন। এ ধর্মের নাম দেয়া হয় 'দীনে ইলাহী'। সাম্রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের জন্য এ ধর্মের বিধি-বিধান পালন অনিবার্য করা হয়। এর কালিমা নির্ধারণ করা হয় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আকবারু খলীফাতুল্লাহ। নবতর এ ধর্ম অন্যান্য ধর্মপন্থীদের মধ্যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরী না করলে তা ইসলামের জন্য ভয়ঙ্কর হুমকি হয়ে দেখা দেয়। কেননা আকবর এমন কিছু বিষয় তার ধর্মে অন্তর্ভূক্ত করেন যা ইসলাম বিরোধী। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য তাদের ধর্মের আংশিক বিধান পালনে কোন ক্ষতি না হলেও ইসলামে এমন চিন্তাও করা যায় না। কেননা ইসলাম আল্লাহর মনোনীত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানুষের সাধ্য নেই এতে কোন কিছু সংযোজন করে বা বিয়োজন করে। অথচ আকবর ভয়ঙ্কর ধৃষ্টতায় এ কাজটিই করেছিলেন। তার নবপ্রবর্তিত ধর্মে যে সকল বিধান প্রচলন করা হয় সেগুলো হল –

১. সূর্য, নক্ষত্র, আগুন, পানি, গাছপালা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বিষয়াবলী এবং গরু পূজার ব্যবস্থা রাখা হয়।
২. সাধারণভাবে দাঁড়ি রাখা এবং গরু যবেহ নিষেধ করা হয়।
৩. আখিরাতের জীবনের পরিবর্তে পূনর্জন্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলা হয়।
৪. সুদ ও জুয়াকে বৈধ ঘোষণা করা হয়।
৫. একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়।
৬. জানাবাতের গোসল রহিত করা হয়।
৭. নিকাহ মুতআর বৈধতা দেয়া হয়।
৮. উট, গরু, মেষ, ছাগল ইত্যাদির গোশত হারাম ঘোষণা করা হয়।
৯. বাঘ, ভালুকের গোশত হালাল ঘোষণা করা হয়।
১০. বারো বছরের আগে খাতনা করা নিষিদ্ধ এবং এরপরে খাতনা করাকে ঐচ্ছিক ঘোষণা করা হয়।
১১. মৃতদেহ কবরস্থ করা বা শ্মশানে পোড়ানোর পরিবর্তে ইট বা পাথর বেঁধে ডুবিয়ে দেয়ার বিধান দেয়া হয়। পানি না পাওয়া গেলে জ্বালিয়ে দেয়া অথবা পূর্ব দিকে মাথা দিয়ে দাফন করার বিধান রাখা হয়।
১২. দেখা হলে আসসালামু আলাইকুম এর পরিবর্তে 'আল্লাহ আকবর' এবং জবাবে ওয়ালাইকুম আসসালাম এর পরিবর্তে 'জাল্লাজালালুহু' বলার বিধান রাখা হয়।
১৩. নির্দিষ্ট দিনে জীবহত্যা নিষিদ্ধ করা হয়।
১৪. রবিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিধান চালু করা হয়।[৮৩০]

এভাবে দীনেলাহী প্রবর্তন করে সম্রাট আকবর ইসলামী শরীআতের প্রতি সরাসরি আঘাত করেন এবং মুসলিম জাতির বিশ্বাসগত চেতনাকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ জানান। আকবরের রাষ্ট্রীয় প্রভাব এবং একরোখা মানসিকতার জন্য সাধারণ মানুষের পক্ষে এর প্রতিবাদ করা সম্ভব ছিল না। সে সাহসও তাদের ছিল না। শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) সাহস করে তাদের পাশে দাঁড়ালেন। নিজে থেকে সম্রাটের বাতিল মতবাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য

---

[৮২৯] এ কে এম আব্দুল আলীম, প্রাগুক্ত, পৃ.২২১-৭৪

[৮৩০] আরো দেখুন : মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, মুজাদ্দিদ ই আলফে সানী (র) এর কামিয়াবী ও কর্মপদ্ধতি / এ এফ এম আবদুল আযীয ও এস এ সিদ্দীক খান, মুজাদ্দিদ আলফ ই সানী (র) / মাওলানা মোঃ তরিকুল ইসলাম, মুজাদ্দিদ আলফ ই সানী (র) / মাওলানা নূরুর রহমান, তাযকিরাতুল আউলিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। সম্রাটের মূর্খতাসুলভ মতবাদের বিধি-বিধানসমূহ খণ্ডন করে আহলি হকের সর্বজনস্বীকৃত মতবাদ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করলেন।

এ কাজে তিনি ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করলেন এবং পুরো সাম্রাজ্য জুড়ে এ পরিকল্পনার আলোকে কর্মসূচী বাস্তবায়ন শুরু করলেন। নিজে সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে সফর করে সভার মাধ্যমে লোকদেরকে আকবরের মতবাদের ব্যাপারে সতর্ক করে তুললেন। এ ছাড়া প্রতিটি এলাকায় একজন করে খলীফা নিয়োগ করলেন। মুআল্লিম ও মুবাল্লিগ নিয়োগ করলেন। কেন্দ্র থেকে শুরু করে প্রাদেশিক পর্যায়ের সকল শাসকের কাছে উপদেশপূর্ণ চিঠি পাঠালেন। শুধু শাসকই নয় বরং গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কাছেও তিনি চিঠি পাঠালেন। নিয়োগকৃত খলীফা, মুআল্লিম ও মুবাল্লিগগণ শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) এর নির্দেশনা অনুসারে লোকদের মধ্যে দীনে ইলাহীর বিরুদ্ধে সচতেনতা তৈরী করেন। সবশেষে তিনি নিজে সম্রাটকে এ বিষয়ে আবেগপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ চিঠি লেখেন। এতে করে সম্রাটের চেতনার মধ্যে কোন পরিবর্তন না এলেও তিনি দীনে ইলাহী পালনের বাধ্যকতা থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দেন এবং দীনে ইলাহীকে ঐচ্ছিক করে দেন। ফলে সকল ধর্মের লোক হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। একমাত্র আবুল ফজল ও তার সহোদর ফয়েজী ছাড়া সকল পর্যায়ের মানুষ দীনে ইলাহী গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। ফলে সাধারণ মুসলিম জনতা সহ সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) অত্যন্ত গ্রহণীয় এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন।

সম্রাট আকবরের পর দিল্লীর সম্রাট হন তার ছেলে জাহাঙ্গীর (১৬০৫ - ১৬২৭ খৃ)।[৪৩১] সম্রাট জাহাঙ্গীর ক্ষমতাসীন হয়ে সম্মানসূচক সিজদার প্রচলন করেন। এ ছাড়া স্ত্রী নূরজাহানের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্ররোচনায় শীআ মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। সুন্নীদেরকে নানাভাবে হেনস্থা করা হতে থাকে। সাধারণ মুসলিমদের পক্ষে এ অবস্থায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও নেতৃত্ব দেয়ার মত কাজ করা সম্ভব ছিল না। এ জন্যে যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র)। তিনি শীআ মতবাদের বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করেন এবং শীআ আলিমদের প্রকাশ্যে বিতর্কে আহ্বান করেন। সম্রাজ্ঞীর পৃষ্ঠপোষকতা ধন্য শীআ আলিমরা বিতর্কে অংশ নিলেও বাহাসে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। এতে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তার সকল ক্রোধের পাত্র হন শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র)। সম্রাজ্ঞীর সাথে বিদআতপন্থী আরো কিছু গোষ্ঠী একত্রিত হয়। তারা সম্মিলিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে সম্রাটকে নানাভাবে ক্ষেপিয়ে তোলে। তাদের অব্যাহত মন্ত্রণা ও প্ররোচনায় শেষ পর্যন্ত সম্রাট তাকে তাযিমী সিজদা করে সম্রাটকে সম্মান প্রদর্শন না করার জন্য শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) কে গ্রেফতার করে গোয়ালিয়র দূর্গে বন্দী করে রাখেন। তার ঘর-বাড়ি এবং স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়।[৪৩২]

শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তাঁকে গ্রেফতার করায় মুঘল সাম্রাজ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। কাবুলের গভর্নর মহব্বত খানের নেতৃত্বে আপামর জনগোষ্ঠী সম্রাটের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তারা খুতবা থেকে সম্রাটের নাম বাদ দেন। এরপর বিরাট বাহিনী নিয়ে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। বিদ্রোহ দমনের জন্য সম্রাট স্বয়ং অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। ঝিলাম নদীর তীরে উভয় বাহিনীর সাক্ষাত হয়। যুদ্ধে সম্রাট মহব্বত খানের হাতে বন্দী হন। এরপর শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) কে মুক্তিদানের প্রতিজ্ঞাপত্র প্রদানের বিনিময়ে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তিলাভের পর সম্রাট জাহাঙ্গীর তার প্রতিজ্ঞা অনুসারে শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) কে মুক্তি দিয়ে নিজের কাছে আহ্বান করেন। মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ আরোপ করেন -

১. সিজাদায়ে তাযিমী বন্ধ করতে হবে।
২. বন্ধ করে দেয়া মসজিদসমূহ চালু করতে হবে।
৩. গরু কুরবানী নিষিদ্ধ করার সরকারি আদেশ বাতিল করতে হবে।

---

[৪৩১] দেখুন : এ কে এম আব্দুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, পৃ.২৭৫-২৯২

[৪৩২] প্রাগুক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

৪. কাযী, মুফতী, মুহতাসিব প্রভৃতি শরঈ পদসমূহ পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে।
৫. জিযিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে।
৬. বিদআতী তরীকা বন্ধ করে সুন্নতী তরীকা চালু করতে হবে।
৭. রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।

সম্রাট তার শর্তাবলী মেনে নিলেন। সাথে সাথে গোটা সাম্রাজ্যে শাহী ফরমান জারী করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হল। শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) রাজদরবারে এসে পরিষদ সদস্যদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান ভাষণ দিলেন। এতে সম্রাটসহ সভাষদ সকলের মধ্যে ভাবান্তর হল। তারা অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করে তওবা করলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরও তার কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হলেন।

এভাবে আমৃত্যু সফল সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা শেষে সফর ২৮/২৯, ১০৩৪ হিজরিতে শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) ইন্তিকাল। বস্তুত তাঁর জীবন ছিল হযরত মুহাম্মদ (সা) এর প্রকৃত আদর্শের বাস্তব উদহারণ। কোন অন্যায়কেই বিনাচ্যালেঞ্জে ছেড়ে না দেয়ার অদম্য মানসিকতা তঁকে শতাব্দীর সংস্কারকে পরিণত করেছিল। কেবল নিস্কাম আধ্যাত্মিক সাধনা ত্যাগ করে তিনি জীবনকে প্রকৃতই আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী পরিচালনা করতে পেরেছিলেন। যা থেকে আমরা বুঝতে পারি, ইসলামী আধ্যাত্মিকতা মানে সমাজ সংসার ত্যাগ নয়। বরং সমাজে থেকে সমাজের সমস্যাসমূহ সমাধানের যথাযথ উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সাথে সাথে আত্মশুদ্ধির সাধনই ইসলামী আধ্যাত্মিকতা। শায়খ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র) এর পূর্ণ জীবন ও কর্ম এ বক্তব্যেরই জীবন্ত সাক্ষী।

হযরত শাহ জালাল (র)

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষে ও চতুর্দশ শতকের শুরুর দিকে যে সকল মুসলিম মুজাহিদ – আধ্যাত্মিক সাধক ব্যক্তিত্ব সমকালীন ভারত উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশ ও আসামে ইসলাম প্রচার করে এ দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও তাহযীব তমুদ্দুনে নব জাগরণ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন শাহ জালাল (র) তাঁদের অন্যতম। মানুষের চিন্তা–চেতনায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ মর্দে–মুমিন আধ্যাত্মিক সাধনা ও বৈষয়িক জীবন যাপনে, সমাজ সংস্কার ও জনকল্যাণে যে অবদান রেখে গেছেন তার তুলনা উপমহাদেশে বিরল। উত্তরকালে মুসলিম মুক্তি আন্দোলনে এ মুজাহিদ মহান সাধকের যে ভূমিকা স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল একমাত্র খাজা মুঈন উদ্দীন চিশতী (র) ছাড়া সমগ্র ভারত উপমহাদেশে আর কারো প্রচেষ্টা ও সাধনায় তা হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বিশ্বখ্যাত মুসলিম পর্যটক ইবন বতুতা তার সফরনামায় উল্লেখ করেছেন – 'তার হাতে এ দেশের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল।'[৮৩৩]

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বর্তমান সিলেট, নোয়াখালী, মোমেনশাহী, কুমিল্লা ও আসামের দক্ষিণ – পশ্চিম অংশের বিভিন্ন জেলার অধিকাংশ লোক তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে জীবনের সত্যিকার মুক্তির সন্ধান পেয়েছেন। এসব এলাকার অধিবাসীদের উপর আজো তাঁর অপ্রতিহত প্রভাব লক্ষ করা যায়। কেবল তাই নয় ঐতিহাসিকদের ধারণা, তিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গেও ইসলাম প্রচার করেন এবং সে সব অঞ্চলেও তাঁর স্থায়ী প্রভাব রেখে যেতে সমর্থ হন।[৮৩৪] বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারকারী সাধক–মুজাহিদ ব্যক্তিগণের মধ্যে শাহ জালাল (র) তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব।

শাহ জালাল (র) চিরকুমার ছিলেন বলে তাঁকে 'মুজাররাদ' বলা হয়। মুজাররাদ মানে অবিবাহিত। তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন তা নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। কারো কারো মতে, তিনি ইয়ামানে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁকে 'ইয়ামানী' বলা হয়।[৮৩৫] কেউ কেউ বলেন, তিনি কুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।[৮৩৬] ' শাহ জালাল (র)' শীর্ষক প্রামাণ্য

---

[৮৩৩] ইবন বতুতা, *আযায়িবুল আসকার*, ২য় খণ্ড, উর্দু অনুবাদ, লক্ষ্ণৌ, ১৪০২ হি, পৃ.৩৮৩
[৮৩৪] আরো দেখুন : *ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ*, অগ্রপথিক, ২/২/৮৯–৯০
[৮৩৫] দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *শাহ জালাল (র)*, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ.২-১২
[৮৩৬] প্রাগুক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থে দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী বহু প্রমাণ উদ্বৃত করে বিস্তারিত বিশ্লেষণ শেষে দেখিয়েছেন যে, শাহ জালাল (র) এর জন্মস্থান ইয়ামানে।[৮৩৭]
গবেষক আরো প্রমাণ করেছেন যে, যাঁরা এশিয়া মাইনরের কুনিয়াকে শাহ জালাল (র) এর জন্মস্থান বলে মত দিয়েছেন তাদের মত অভ্রান্ত নয়। তাঁর মতে, কর্নিয়া বা করন নামক জনপদে তার জন্ম হতে পারে। ইয়ামানে এ নামে জনপদ আছে। তবে তা কোনভাবেই তুরস্কের কুনিয়া হতে পারে না। কুনিয়া আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী (র) এর সাধনার ক্ষেত্র। এটি সে সময়ের তুর্কিস্তানে অবস্থিত ছিল। অনেকে ভুল করে শাহ জালাল (র) এর সাথে জালালুদ্দীন রুমী (র) কে অভিন্ন মনে করে জন্মস্থানগত এ জটিলতা তৈরী করেছেন।

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের পথিকৃত ব্যক্তিত্ব হলেন শাহ জালাল (র)। বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম পরিব্রাজক ইবন বতুতা ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে সিলেটে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। এ সাক্ষাতটি এখন একটি প্রামাণ্য সত্য বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য ইবন বতুতা শাহ জালাল (র) কে 'শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরীযী (র) বলে উল্লেখ করেছেন। এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একজন বিখ্যাত দরবেশের কথা বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ থাকতে দেখা যায়। কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র) এর 'দলীলুল আরিফীন, ফরীদউদ্দীন গঞ্জেশকর (র) এর 'ফওয়ায়িদুস সালিকীন, বদরউদ্দীন ইসহাস (র) এর 'আসরারুল আউলিয়া' এবং আমীর হাসান সিজ্জির 'ফাওয়ায়িদুল ফওয়াদ' শীর্ষক মালফুযাত গ্রন্থগুলোতে জালালউদ্দীন তাবরীযী (র) বলে একজন সাধকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সকল মালফুযাত গ্রন্থে উল্লিখিত শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরীযী ও ইবন বতুতা বর্ণিত শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরীযী এবং আমাদের আলোচ্য শাহ জালাল (র) একই ব্যক্তি কি না – সে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হতে পারে।

ইবন বতুতার বিবরণ অনুসারে শায়খ জালাল বা শাহ জালাল (র) ১৫০ বছর জীবিত ছিলেন। প্রামাণ্য অভিমত হল শাহ জালাল (র) ১৯ যিলকদ ৭৪৬ হিজরি মুতাবিক ১৪ মার্চ ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। এ হিসেবে তাঁর জন্ম ৫৯৬ হিজরি মুতাবিক ১১৯৬ খৃষ্টাব্দ ধরা যেতে পারে।
'ফওয়ায়িদুল ফওয়াদ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, শাহ জালাল (র) আবূ সাঈদ তাবরীযী (র) এর মুরীদ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি শিহাবউদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (র) এর মুরীদ হন। আখতার দেহলবী ও ডঃ এম এ রহীম বলেন যে, শাহ জালাল (র) সাত বছর শিহাবউদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (র) এর শিষ্যত্বে ছিলেন। তিনি ইন্তিকাল করেন ৬৩২হিজরি/১২৩৪–৩৫ খৃষ্টাব্দে। এর সাত বছর আগে অর্থাৎ ৬২৫ হিজরি / ১২২৭–২৮ খৃষ্টাব্দে শাহ জালাল (র) তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন। এ হিসেবে তখন তাঁর বয়স ৩০ ছিল বলেই প্রতীয়মান হয়।[৮৩৮]

'সুহায়লে ইয়ামন' গ্রন্থ অবলম্বনে ডঃ জে ওয়াইজ বলেন, 'For thirty years Shah Jalal is said to have lived in a cave without crossing the threshold.[৮৩৯]
১২২৭–২৮ খৃষ্টাব্দে শিহাবউদ্দীন সুহরাওয়ার্দীর শিষ্যত্ব গ্রহণের আগে শাহজালাল (র) আবূ সাঈদ তাবরীযী (র) এর শিষ্যত্ব বরণ করেন তবে তা ছিল অত্যন্ত কম সময়ের ব্যাপর। কেননা শাহ জালাল (র) তাঁর প্রথম ৩০ বছর অর্থাৎ ১২২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মামা সৈয়দ আহমদ কবীর সুহরাওয়ার্দীর (র) তত্ত্বাবধায়নে ছিলেন এবং তাঁর কাছেই শরীআত, মারিফাত, তরীকত ও হাকীকতের শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ হিসেবে তিনি আবূ সাঈদ তাবরীযী (র) এর কাছে অল্পকালই আধ্যাত্মিক সাধনার সুযোগ পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। এ সময়টি হতে পারে ১২২৬ –২৭ থেকে ১২২৭–২৮ খৃষ্টাব্দের অন্তর্বর্তীকাল।

শাহ জালাল (র) ২৫ বছর শিহাবউদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (র) এর পুত্র এবং খলীফা বাহাউদ্দীন সুহরাওয়ার্দী (র) এর সান্নিধ্যে আধ্যাত্মিক সাধনায় সময় অতিবাহিত করেন। শাহ জালাল (র) এর সমসাময়িক খ্যাতিমান সূফী সাধক ফরীদউদ্দীন গঞ্জেশকরের সাক্ষ্যে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৮৪০]

---

[৮৩৭] প্রাগুক্ত। গ্রন্থটিতে ৩৪ জন গবেষকের গবেষণা ও বিশ্লেষণ ব্যবহার করে প্রমাণ করা হয়েছে, শাহ জালাল (র) এর জন্মস্থান তুর্কিস্তান, এশিয়া মাইনর বা কনিয়া নয়। বরং তিনি ইয়ামানে জন্মগ্রহণ করেন।
[৮৩৮] প্রাগুক্ত
[৮৩৯] প্রাগুক্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

মলফুযাত গ্রন্থের বর্ণনা মতে, শায়খ জালালউদ্দীন তাবরীযী (র) ১২৫৯ খৃষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন বলে সমসাময়িক লোকদের সাক্ষ্য ও প্রত্যক্ষ দলীল থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। ইবন বতুতা তাঁর সফর নামায় উল্লেখ করেছেন যে, শায়খ জালাল তাঁকে বলেছেন যে, হালাকু খাঁ কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের সময় তিনি সেখানে ছিলেন। এটি ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

পূর্বোক্ত মলফুযাত ও ইবন বতুতার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যে প্রমাণিত হচ্ছে যে, শায়খ জালাল ১২৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দেও বাগদাদে জীবিত ছিলেন। সমসাময়িক প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যে ইউনিফরমিটি থাকায় নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, ইবন বতুতা বর্ণিত শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরীযী ও পূর্বোক্ত মলফুযাত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরীযী এক ও অভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। শাহ জালাল (র) এর নাম ও মৃত্যু তারিখ প্রসঙ্গে স্থানীয় লোকদের সাক্ষ্য প্রমাণ ও শিলালিপির সাক্ষ্যের বিষয়টি আলোচনা হতে পারে।

তাঁর পিতার নাম প্রসঙ্গে ডঃ জে ওয়াইজ 'সুহায়ল ই ইয়ামন' অবলম্বনে লিখেছেন – Shah Jalal Mujarrad Yamani was the son of a distinguished saint, whose title of Shaikus Shuyuke is still preserved. He belonged to Quraish tribe. Shah Jalal's father was named Muhammad.[৮৪১]

সিলেটে প্রাপ্ত ও জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত ৯১৮ হিজরির একাধিক শিলালিপিতের শাহজালাল (র) এর পিতার নাম 'মুহাম্মদ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। শিলালিপির ভাষায় তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে 'বআজমতি শায়খুল মাশায়খ মখদুম শায়খ জালাল মুজাররাদ বিন মুহাম্মদ।'

শায়খ জালাল বা শাহ জালাল (র) এর পিতা মুহাম্মদ (র) একজন প্রখ্যাত সাধক ছিলেন। তিনি আবূ সাঈদ তাবরীযী (র) এর একজন খলীফা ছিলেন। মুঈন উদ্দীন চিশতী (র) ও আবূ সাঈদ তাবরীযী (র) এর ফয়য হাসিল করেন। যা থেকে বুঝা যায়, আবূ সাঈদ তাবরীযী (র) এর খিলাফত লাভ করা যে কোন লোকের পক্ষে কোন সহজ কাজ ছিল না। কাজেই তাঁর খলীফা হিসেবে শায়খ জালালের (র) পিতা মুহাম্মদ (র) একজন বিখ্যাত সাধক ও দরবেশ হওয়ায়ই যথার্থ বলে মনে হয়। সমকালীন সময়ের বিখ্যাত সাধক মুহাম্মদ খিলাফত লাভের পর তাঁর গুরু আবূ সাঈদ তাবরীযী (র) এর পদবী ধারণ করেছিলেন এবং এভাবে তিনি মুহাম্মদ তাবরীযী (র) নামেই বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। শায়খ জালালের (র) দেওতলাস্থ চিল্লাখানায় ৯৩৪ হিজরিতে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ শিলালিপিটির ভাষ্য হল – 'ফিল বিলাদিশ শায়খ জালাল মুহাম্মদ তাবরীযী।' বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে এভাবে উল্লেখ করা যায় – 'ফিল বিলাদিশ শায়খ জালাল বিন মুহাম্মদ তাবরীযী (র)।' কেননা এদেশে সমকালীন আরো কয়েকজন সাধকের পিতার নাম 'ইবন' উল্লেখ না করে সরাসরি তাদের নামের অংশ হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন শরফুদ্দীন বিন ইয়াহইয়া মানেরীর (র) নামটিও শায়খ জালাল মুহাম্মদ তাবরীযীর (র) মত 'ইবন' শব্দ বাদ দিয়েই মকতুবাতে সদীতে 'শরফুদ্দীন ইয়াহইয়া মানেরী' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শায়খ জালাল (র) বা শাহ জালাল (র) এর কর্মক্ষেত্র পাণ্ডুয়া, দেওতলা ও সিলেটে তাঁর নাম প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বহু শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে। দুটি শিলালিপির কথা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। দেওতলার ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ আরেকটি শিলালিপিতে বলা হয়েছে – 'বিকসবাতি তাবরিযাত ওরফ ই দেওতলা।' এতে দেওতলার তাবরিযবাদ নামকরণের প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাবরিযবাদ বা বিলাদিশ শায়খ জালাল বিন মুহাম্মদ বা শায়খ জালাল বিন মুহাম্মদ (র) এর শহর। তাছাড়া এর সাথে জড়িত ছিল তাঁর পিতা মুহাম্মদ তাবরীযী এবং তাঁর গুরু আবূ সাঈদ তাবরীযীর (র) স্মৃতি। নিজের আবেগ আর তাঁদের পূণ্য স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই দেওতলার নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয় তাবরিযবাদ। ১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রাপ্ত অপর একটি শিলালিপিতেও 'বিকসবাতি তাবরিযাবাদ' উল্লিখিত হতে দেখা যায়।

---

[৮৪০] প্রাগুক্ত

[৮৪১] ডঃ জে ওয়াইজ, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

১৪৬৪, ১৫২৭ এবং ১৫৭১ খৃষ্টাব্দের শিলালিপিগুলো শাহ জালাল (র) এর সম্মানেই যে উৎকীর্ণ করা হয়েছে তা একটি সহজ অনুমানলব্ধ বিষয়। তাছাড়া দেওতলার শিলালিপিসমূহে উল্লিখিত শায়খ জালাল বিন মুহাম্মদ তাবরীযী এবং পাণ্ডুয়ার ১০৭৫, ১০৮৪ ও ১৩৩৪ হিজরিতে প্রাপ্ত শিলালিপিসমূহে উল্লিখিত শাহ জালাল তাবরীযী (র) একই ব্যক্তি। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হল, পাণ্ডুয়ার শিলালিপিসমূহে তাঁর নাম শাহ জালাল উদ্দীন তাবরীযী (র) বা শাহ জালাল তাবরীযী (র) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেবল তাই নয়, পাণ্ডুয়ার বড় দরগাহের গেটের লিন্টলের গায়েও তাঁর নাম শাহ জালাল লিখিত হয়েছে।

এতসব প্রমাণ পাওয়ার পরও আর সন্দেহ থাকে না যে, পাণ্ডুয়া, দেওতলা ও সিলেটের শিলালিপিতে বর্ণিত শায়খ জালাল বা শাহ জালাল বা শাহ জালাল উদ্দীন তাবরীযী (র) এবং ইবন বতুতা ও সুহায়ল ই ইয়ামনে উল্লিখিত শাহ জালাল (র) বা শায়খ জালাল (র) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

শাহ জালাল (র) এর মৃত্যু তারিখ নিয়েও নানা মত এবং বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়। ইবন বতুতার সফরনামা ও আসরারুল আউলিয়ার সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, শাহ জালাল (র) (যিনি শাহ জালাল ইয়ামনী, শায়খ জালাল তাবরীযী বা শাহ জালাল তাবরীযী (র) নামেও অভিহিত হয়ে থাকেন) ১২৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দেও জীবিত ছিলেন। কাজেই এ সময়ের আগে তাঁর মৃত্যু তারিখ নির্ধারিত হতে পারে না। যদি কেউ তা নির্ধারণের চেষ্টা করে তাহলে তা নির্ভুল হবে না। তাঁর মৃত্যু সন হিসেবে ৬২২, ৬২৩ ও ৬৪২ হিজরির কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কাজেই এ বিষয়টি বিস্তারিত বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

শাহ জালাল (র) এর মৃত্যু সন হিসেবে ৬২২ হিজরির কথা উল্লেখ করেছেন আখতার দেহলবী তার 'তাযকিরাতুল আউলিয়া হিন্দ ওয়া পাকিস্তান' গ্রন্থে। ডঃ আব্দুল করিম তার 'সোশ্যাল হিস্ট্রি অব মুসলিমস্ ইন বেঙ্গল' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে 'তাযকিরাতুল আউলিয়া হিন্দ ওয়া পাকিস্তান' গ্রন্থের বরাতে শাহ জালাল (র) এর মৃত্যু সন হিসেবে ৬২২ হিজরিকে গ্রহণ করলেও পরবর্তী সংস্করণে তাতে পরিবর্তন আনেন। এ ক্ষেত্রে তিনি 'আখবারুল আখইয়ার' গ্রন্থের বরাত দিয়ে তাঁর মৃত্যু সন ৬২৩ হিজরি বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু তাযকিরাতুল আউলিয়া হিন্দ ওয়া পাকিস্তান ও আখবারুল আখইয়ার গ্রন্থ দুটি কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ নয়। তথ্য বর্ণনার ক্ষেত্রে গ্রন্থ দুটোতে কোন সূত্র উল্লেখ করা হয় নি। যে জন্যে ডঃ আব্দুল করিম শাহ জালাল (র) এর মৃত্যু সন হিসেবে উল্লিখিত ৬২২ বা ৬২৩ হিজরির ব্যাপারে কোন আস্থা পোষণ করতে পারেন নি। তিনি এরপরে 'খাযীনাতুল আসফিয়া' গ্রন্থের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন যে, শাহ জালাল (র) এর মৃত্যুর সম্ভাব্য আরেকটি সন রয়েছে এবং তা ৬৪২ হিজরি হতে পারে।[৮৪২]

ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ[৮৪৩] ও ডঃ মেহদী হোসেন যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে শাহ জালাল (র) এর মৃত্যু সন হিসেবে উল্লেখ করা ডঃ আব্দুল করিমের তিনটি সনই (৬২২, ৬২৩ ও ৬২৪ হিজরি) প্রত্যাখ্যান করেছেন। 'খাযীনাতুল আসফিয়া'য় বর্ণিত শাহ জালাল (র) এর মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে এইচ বেভারিজ আই সি এস বলেন –

'Ghulam Sarwar is quite a modern author ad the chronogram of his book title shows (1254/1839 AD) and he gives no authority for his statement. He is the same man who gives the wrong date for Qutb's death.'

এ সকল যুক্তির মাধ্যমে তিনি নিশ্চিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, ৬৪২ হিজরি সনে নির্ধারিত শাহ জালাল (র) এর মৃত্যু তারিখটি ভুল। এইচ বেভারিজের যুক্তি খণ্ডন করার মত তথ্য আমাদের হাতে নেই। 'খাযীনাতুল আসফিয়া'য় বর্ণিত ৬৪২ হিজরিকে সমর্থন দেয়ার জন্য 'রাহাতুল কুলুব' নামের একটি বইয়ের দোহাই দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এ বইটিও নির্ভরযোগ্য নয় যে জন্যে গবেষকগণ এর উপর কোন ভাবেই আস্থা রাখেন নি বা এর উপর নির্ভর করেন নি। 'রাহাতুল কুলুব' যে একটি অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থ তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, এ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে শাহ জালাল (র) এর ইন্তিকালের সময় ফরিদউদ্দীন গঞ্জেশকর (র) উপস্থিত ছিলেন। এ কথা সর্বজন বিদিত এবং স্বয়ং রাহাতুল কুলুব গ্রন্থের লেখকও মেনে নিয়েছেন যে, শাহ জালাল (র) এর কবর বাংলাদেশে অবস্থিত। এই বাংলাদেশেই তিনি

---

[৮৪২] Dr. Abdul Karim, *Social History of Muslims in Bengal,* Chittagong, 1965, p.63

[৮৪৩] মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *ইসলাম প্রসঙ্গ,* ঢাকা ১৯৭০, পৃ.১৫০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 'আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (র) তাঁর আখবারুল আখইয়ার' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, ফরীদউদ্দীন গঞ্জেশকর কখনো বাংলাদেশে আসেন নি। কাজেই শাহ জালাল (র) এর সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন বলে যে বক্তব্য রাখা হচ্ছে তা এই মর্মে মুজাহিদের উপর অলৌকিকত্ব আরোপেরই চেষ্টা বিশেষ যার কোন ভিত্তি নেই। তাছাড়া রাহাতুল কুলুব গ্রন্থখানি কোন ভাবেই মুহাদ্দিস দেহলবীর 'আসরারুল আউলিয়ার মত নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ নয়। কাজেই শাহ জালাল (র) এর মৃত্যু সন হিসেবে অভিহিত সন গুলো ভুল এবং অপ্রামাণ্য বলে মনে হয়।

ডঃ আব্দুল করিম ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'আখবারুল আখইয়ার' গ্রন্থটিকে রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এতে শাহ জালাল (র) এর মৃত্যু সন ৬২৩ হিজরি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তারিখটি প্রক্ষিপ্ত। মূল 'আখবারুল আখইয়ার' গ্রন্থ প্রণয়নের তারিখ ৯৯৯ হিজরি। অথচ গ্রন্থটিতে এ সময়ের পরের অনেক আউলিয়ার জন্ম-মৃত্যুর তারিখ দেখতে পাওয়া যায়। অথচ ১২৮৩ হিজরিতে প্রকাশিত সংস্করণে শাহ জালাল (র) এর মৃত্যু তারিখটিই উল্লেখ করা হয় নি। গ্রন্থটির অনির্ভরযোগ্যতা এবং প্রক্ষিপ্ততা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় এই একই রকম ভুল গ্রন্থকার গ্রন্থের সর্বত্র করেছেন। তাই ৬২২/৬২৩/৬৪২ হিজরিতে শাহ জালাল (র) এর মৃত্যুর বিষয়টি বাতিল হয়ে যায়। ফলে আসরারুল আউলিয়া গ্রন্থের বর্ণনা এবং ইবন বতুতার সফরনামার বর্ণনায় বিবৃত মৃত্যু সনটি অধিকতর নিশ্চয়তা লাভ করে।

ইবন বতুতা বর্ণিত শায়খ জালালউদ্দীন তাবরীযী (র) আমাদের আলোচ্য শাহ জালাল (র) ছাড়া অন্য কোন প্রখ্যাত সাধক বা ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকলে কমপক্ষে তাঁর মৃত্যুর তারিখটি কোন প্রামাণ্য উৎসে অবশ্যই থাকত। অথবা এমন কোন ইঙ্গিত, সূত্র বা তথ্য পাওয়া যেত যা থেকে তাঁর মৃত্যুর সময়টি নির্ধারণ করা সম্ভব হত।[৮৪৪] এমতবস্থায় ইবন বতুতার সফরনামার ভিত্তিতে ও পূর্বাপর আলোচনার প্রেক্ষিতে শায়খ জালাল উদ্দীন বা শাহ জালাল (র) এর একটি মাত্র মৃত্যু সনই নির্ধারিত হতে পারে। আর তা অবশ্যই ৭৪৬ হিজরি। কেননা তিনি যখন ইন্তিকাল করেন তখন তিনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, তাঁর অসংখ্য ভক্ত, অনুসারী দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। অনেকেই তাঁর সঙ্গ গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসেবে, খাদিম হিসেবে তাঁর সাথেই অবস্থান করেছেন। তাছাড়া প্রতিদিনই তিনি দীনী নসীহত করেছেন। ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করার জন্য দীনী তরবিয়াত তালিম অব্যাহত রেখেছেন। কাজেই তিনি যখন ইন্তিকাল করেছেন তখন সবাই তা লক্ষ্য রাখবে এটাই স্বাভাবিক। তাদের প্রত্যক্ষ দর্শন এবং স্বীকৃতিও শাহ জালাল (র) এর মৃত্যু ৭৪৬ হিজরিতে হওয়ার পক্ষেই রায় দেয়। আমরা তাই এ সনটি গ্রহণ করেছি এবং বেশিরভাগ গবেষক এর পক্ষেই নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

শাহ জালাল (র) এর কবর সিলেটে অবস্থিত – এ কথা সর্বজন স্বীকৃত। পাণ্ডুয়ায় তাঁর চিল্লাখানা বা জওয়াব সমাধি রয়েছে।[৮৪৫] পাণ্ডুয়ার চিল্লাখানার খাদিমগণও এটা স্বীকার করেছেন।

রিয়াজুস সালাতীনের বরাতে বর্ণিত আছে যে, সুলতান আলাউদ্দীন আলী শাহ এটি নির্মাণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। ব্লকম্যান, ইউল, টমাস প্রমুখ গবেষকের মতে আলাউদ্দীন আলী শাহের রাজত্বকাল ৭৪৬ হিজরি পর্যন্ত বহাল ছিল। টমাস নিজে তার ৭৪৬ হিজরির মুদ্রা দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। ব্লকম্যান ও ইউল এটা মেনে নিয়েছেন। এটা ঠিক হলে ৭৪৬ হিজরি বা ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ মার্চ তারিখে শাহ জালাল (র) এর ইন্তিকালের পর পাণ্ডুয়ায় তাঁর চিল্লাখানায় জওয়াব সমাধি নির্মাণের প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হয়।

কিন্তু আধুনিক গবেষকদের কেউ কেউ টমাসের দেখা সুলতান আলী শাহের ৭৪৬ হিজরির মুদ্রার সাক্ষ্যটি কোন রকম ব্যাখ্যা না করে প্রত্যাখ্যান করে সুলতানের রাজত্বকাল ৭৪২ হিজরি পর্যন্ত বলবত থাকার সময় নির্ধারণ করে নেওয়ায় এ সময়টিকেই ইমারত নির্মাণের সময় হিসেবে ধার্য করেন। এর ফলে ৭৪২ হিজরি বা এর আগে পাণ্ডুয়ার চিল্লাখানায় শাহ জালাল (র) এর জওয়াব সমাধি নির্মাণ অসম্ভব এবং অবাস্তব হয়ে পড়ে। কেননা তখনো তিনি বেঁচে আছেন আর

---

[৮৪৪] তুলনীয় : লিইয়ুমিনাল আউলিয়া, কিবারুল আউলিয়া, হোসেন শাহী শিলালিপির শায়খুল মশায়খ।

[৮৪৫] ডঃ আব্দুল করিম ও ডঃ এম এ রহিম প্রমুখ পণ্ডিত এ মত প্রকাশ করেছেন। তাদের এ মত জনশ্রুতি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। কেননা পাণ্ডুয়ায় শাহ জালাল (র) এর কবর থাকা সম্ভব নয়। সিলেটে তাঁর কবর থাকার বিষয়টি সন্দেহাতীত সত্য। কাজেই পাণ্ডুয়ায় যা আছে তা হল শাহ জালাল (র) এর চিল্লাখানা। সে সময়ে খ্যাতিমান সাধকের ইন্তিকালের পর তাঁর রুহানী ফায়য হাসিল করার জন্য ভক্তগণ মূল কবরের আদলে এ রকম চিল্লাখানা বা জওয়াব কবর তৈরী করতেন। সবসময় মূল কবরে এসে যিয়ারত করা সম্ভব হতো না বলে তারা এ জওয়াবী কবর 'চিল্লাখানা' যিয়ারত করে রুহানী ফায়য হাসিলের চেষ্টা করতেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

কোন জীবিত মানুষের জন্য জওয়াব কবর তৈরীর কোন ধারা বা সম্ভাবনা একেবারেই অবাস্তব। কাজেই এটিকে তাহলে তাঁর জওয়াব সমাধির পরিবর্তে চিল্লাখানায় নির্মিত স্মৃতি সৌধ হিসেবে গণ্য করতে হবে। টমাস, ব্লকম্যান, ইউল প্রমুখের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এবং পূর্বোক্ত সমসাময়িক মলফুযাত, সফরনামা ও পরবর্তীকালের প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থের বিবরণ, শিলালিপি, মুদ্রা ও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে পূর্বাপর আলোচনার প্রেক্ষিতে ৭৪২ হিজরিতে চিল্লাখানার স্মৃতিসৌধ নির্মাণের চেয়ে ৭৪৬ হিজরিতে শাহ জালাল (র) এর ইন্তিকালের পর তাঁর জওয়াব সমাধি নির্মাণের কথাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়।

এভাবে শায়খ জালাল উদ্দীন তাবরীযী আল ইয়ামনী বা শায়খ জালাল তাবরীযী আল ইয়ামনী তথা শাহ জালাল (র) এর সঠিক নাম, জন্মস্থান, মুর্শিদ পরিচিতি, তাঁর প্রভাব, মৃত্যুর তারিখ, সমাধির স্থান ও জওয়াব সমাধি প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় এবং এভাবেই প্রচলিত বিভ্রান্তিসমূহেরও অবসান হতে পারে।

বাগদাদে হালাকু খাঁনের নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর সময় শাহ জালাল (র) জীবিত ছিলেন এবং তখন তিনি বাগদাদেই অবস্থান করছিলেন এ কথা আমরা ইতোপূর্বে ইবন বতুতার সফরনামার আলোকে বর্ণনা করেছি। এর কিছুকাল পরে উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে আদেশ পান। এ সময় তিনি মক্কায় অবস্থান করছিলেন। স্বপ্নাদেশ পালনের জন্য তিনি মক্কা থেকে ইয়ামন আসেন। এখান থেকেই তাঁর উপমহাদেশ যাত্রা শুরু হয়।
কথিত আছে, উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের জন্য তাঁর আগমণের আগে তাঁর মুর্শিদ তাঁকে এক মুঠো মাটি প্রদান করেন এবং এ মাটির অনুরূপ মাটি যেখানে পাওয়া যাবে, যেখানকার মাটি বর্ণে, গন্ধে ও স্বাদে এর সমান হবে সেখানে বসতি স্থাপনের আদেশ প্রদান করেন। সফর শুরুর প্রাক্কালে এ মাটি শাহ জালাল (র) তাঁর এক অনুসারীর নিকট মজুদ রাখেন, যার কাজ ছিল সফরের পথে পথে মাটি পরীক্ষা করে দেখা। সফর সঙ্গী এ ব্যক্তি তাঁর দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। তিনি যাত্রা পথের প্রতিটি নতুন স্থানের মাটির স্বাদ জিহ্বা দিয়ে গ্রহণ করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতেন। এ জন্য পরবর্তী কালে তিনি 'চাশনী পীর' নামে খ্যাত হন।

শাহ জালাল (র) উপমহাদেশ যাত্রা করার প্রাক্কালে শাহ পরান, হাজী ইউসুফ, বুরহানুদ্দীন কাত্তাল, তাজুদ্দীন কুরায়শী প্রমুখ তাঁর অনুসঙ্গী হয়েছিলেন। যাত্রা পথে শাহ জালাল (র) ইয়ামন রাজের অতিথি হয়েছিলেন। রাজা শাহ জালাল (র) এর কামালিয়াত ও বিলায়াত পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে বিষ মেশানো শরবত পান করতে দেন। তিনি বিসমিল্লাহ বলে এ শরবত পান করেন। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় বিষে তাঁর কোন ক্ষতি হয় না বা তাঁর মধ্যে বিষ কোন ক্রিয়া করে না। এর কিছু সময়ের মধ্যে শাহ জালাল (র) ইয়ামন রাজদরবারে অবস্থান করা অবস্থাতেই রাজার মৃত্যু হয়। অনেকে এ মৃত্যুকে শাহ জালাল (র) এর কারামত হিসেবে উল্লেখ করলেও আমরা এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে চাই না। কেননা এ বিষয়টি কোন প্রামাণ্য সূত্রে প্রমাণিত নয়। ভক্তদের বর্ণনা মাত্র। ভক্তরা তাঁর ইয়ামন অবস্থান এবং রাজা কর্তৃক তাঁকে পরীক্ষা করার বিষয়টির মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করে এবং তাঁকে কারামতগত দিক থেকে অতুচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করার জন্য এ রকম গল্প তৈরী করতে পারেন। কেননা আমাদের মনে রাখতে হবে, মানুষের মৃত্যু আল্লাহ নির্ধারিত সময়ের আগে হয় না এবং এ ক্ষেত্রে মানুষের করার কিছুই নেই। তাছাড়া ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষকে সত্য গ্রহণের সুযোগ না দিয়ে হত্যা করার রীতি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক সমর্থিত নয়। কাজেই রাজার মৃত্যুর সাথে শাহ জালাল (র) এর বিষ খাওয়ার কোন যোগসাজশ না থাকাই স্বাভাবিক মনে হয়।

রাজার মৃত্যুর কিছুকাল পর শাহ জালাল (র) ইয়ামন ত্যাগের উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। ইয়ামানের নতুন রাজা এবং মৃত রাজার ছেলে তাঁর সফরসঙ্গী হতে চাইলেন। শাহ জালাল (র) তাঁকে সাথে নিলেন না। কেননা ন্যায়নীতির সাথে রাজ্য পরিচালনা করা দেশ দেশান্তরে মুর্শিদের সফরসঙ্গী হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য তিনি তাঁর শিষ্য এই শাহজাদাকে ইসলামের শাসননীতি অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনার আদেশ ও উপদেশ দিয়ে ইয়ামন ত্যাগ করেন। কিন্তু রাজ্য শাসন যুবরাজের পছন্দ হল না। তিনি রাজকীয় সুখ, সম্ভোগ, ক্ষমতা আর ঐশ্বর্যের মধ্যে কোন আকর্ষণ টের পেলেন না। বরং অচিরেই শাসন ক্ষমতা অন্যের নিকট হস্তান্তর করে শাহ জালাল (র) এর সফরসঙ্গী হলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

শুধু ইয়ামন যুবরাজই নয় বরং যাত্রা পথের প্রায় প্রতিটি স্থান থেকেই কেউ না কেউ শাহ জালাল (র) এর সফরসঙ্গী হলেন। ইয়ামন, গযনী, মুলতান, বাগদাদ প্রভৃতি স্থানের অনেক দরবেশই তাঁর সাথে উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারের কাজে আসার আগ্রহ প্রকাশ করে তাঁর সফরসঙ্গী হলেন।
শাহ জালাল (র) এর আগমণের খবর আধ্যাত্মিকভাবে পূর্বাহ্নেই উপমহাদেশের সুফী–সাধকগণ অবহিত হয়েছিলেন। তাঁরা তাই তাঁকে অভিনন্দন জানানোর ব্যবস্থা করেন। দিল্লিতে নিজামুদ্দীন আউলিয়া তাঁকে সম্বর্ধনা প্রদান করেন এবং উপহার হিসেবে একজোড়া কবুতর প্রদান করেন। এ কবুতর 'জালালী কবুতর' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

বিখ্যাত মুসলিম সাধক ফরীদুদ্দীন গাঞ্জেশাকরের জীবদ্দশায় শাহ জালাল (র) বদায়ূন হয়ে লাখনৌ আগমন করেন এবং কিছুদিন পাণ্ডুয়ায় অবস্থান করেন। এখানে তিনি জমি খরিদ করে তা ওয়াকফ করে দেন। এ সম্পত্তির আয় ছিল বাইশ হাজার মুদ্রা যে জন্য এটি বাইশহাজারী এস্টেট নামে বিখ্যাত হয়। শাহ জালাল (র) এখানে খানকাহ স্থাপন করেন এবং লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। বাইশহাজারী এস্টেটের আয় থেকে এর সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করা হত। এ লঙ্গরখানায় আগন্তুক, মুসাফির, নও মুসলিম, ফকীর মিসকিন সকলেই বিনা পয়সায় খাবার পেত। খানকাহ ও মসজিদ ছিল শরীআত, মারিফাত, তারীকত ও হাকীকাত শিক্ষা দেয়ার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।
পাণ্ডুয়ার দেওতলায় শাহ জালাল (র) এর চিল্লাখানাহ ছিল। এ এলাকার নামকরণ হয় কসবা তাবরীযাবাদ বা বিলাদে শায়খ জালাল বা শায়খ জালালের শহর। পান্ডুয়ার কয়েকটি শিলালিপিতে শাহ জালাল উদ্দীন তাবরীযী এবং দেওতলা বা তাবরীযবাদের কতিপয় শিলালিপিতে শায়খ জালাল বা শায়খ জালাল ইবন মুহাম্মদ তাবরীযী'র নাম উল্লেখ পাওয়ার কথা ইতোপূর্বে আমরা বলেছি। দেওতলা বাইশহাজারী এস্টেটের অন্তর্ভূক্ত ছিল। পাণ্ডুয়া ও দেওতলাকে কেন্দ্র করে শাহ জালাল (র) দীর্ঘকাল ইসলাম প্রচার করেন। অতঃপর সদলবলে তিনি পূর্ব বাংলায় আগমন করেন এবং সোনার গাঁকে কেন্দ্র করে ইসলাম প্রচার করতে থাকেন। ৭০৩ হিজরিতে তাঁর নেতৃত্বে সিলেট বিজিত হয়।[৮৪৬]

শাহ জালাল (র) এর সিলেট বিজয় বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম বিস্ময়কর অধ্যায়। সিলেটে তখন হিন্দু রাজা গৌর গোবিন্দের রাজত্ব ছিল। রাজা ছিল দারুন বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ এবং চরম নিপীড়ক। প্রচলিত কাহিনী অনুসারে তখনো সিলেট এলাকায় কিছু মুসলিম বসতি ছিল। তবে তাঁরা অত্যন্ত ভয়ের গোপন জীবন যাপন করতেন। স্বাধীনভাবে ধর্ম কর্ম করার স্বাধীনতা তাদের ছিল না। বুরহানুদ্দীন ছিলেন এমনি একজন মুসলমান। তিনি তাঁর সন্তানের আকীকায় গরু যবেহ করেছিলেন। এ কারণে রাজা সন্তানটিকে হত্যা করেন এবং তার ডান হাত কেটে দেন। পুত্রহারা বুরহানুদ্দীন এই অন্যায়ের প্রতিকারের আশায় বাংলার শাসক ফিরুয শাহের দ্বারস্থ হন। ফিরুয শাহ দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খালজীর (১২৮৬–১৩১৬ খৃষ্টাব্দ) অধীনস্থ বাংলার শাসক ছিলেন।
বুরহানুদ্দীনের কাছে ঘটনার বিবরণ শুনে এবং আরো অন্যান্য সূত্র থেকে গৌর গোবিন্দের অত্যাচারী শাসন সম্পর্কে অবহিত হয়ে ফিরুয শাহ সিকান্দার খান নামক তার একজন সেনাপতিকে সিলেটে রাজা গৌর গোবিন্দের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু সিকান্দার খানের এ অভিযানটি ব্যর্থ হয়। তিনি গৌর গোবিন্দের যুদ্ধ কৌশল এবং যাদুর কাছে পরাজিত হন। এরপরে রাজা গৌর গোবিন্দের অত্যাচার আরো বৃদ্ধি পায়। বিশেষত স্বল্প সংখ্যক মুসলিম প্রজার জন্য সে মূর্তমান বিভীষিকা হয়ে ওঠে। বেশিরভাগ মুসলমানই এ সময় সিলেট ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। আর যারা যেতে পারেন না তাঁরা মানবেতর জীবন যাবন করতে থাকেন।

এ সময় শাহ জালাল (র) সোনার গাঁকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। গৌর গোবিন্দের কাছে মুসলিম বাহিনীর পরাজয় তাঁকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছিল। তিনি নতুন করে অভিযান চালানোর জন্য সিকান্দার খানকে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর উৎসাহে সিকান্দার খান বাংলার সুলতান ফিরুয শাহের কাছে সিলেটে নতুন অভিযান প্রেরণের অনুরোধ করেন। সুলতান তার অনুরোধ মঞ্জুর করে তাকে আরেকটি বাহিনী প্রদান করেন। সুলতান নিজে এবং অভিযানের সেনাপতি সিকান্দার খান বিশেষভাবে শাহ জালাল (র) এর দুআ ও সাহায্য কামনা করেন। তাঁদেরকে আশ্বস্তঃ করে এবং ইসলাম প্রচারের বিপুল সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে শাহ জালাল (র) তাঁর ৩৬০জন

---

[৮৪৬] দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *শাহ জালাল (র),* সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ জুন ১৯৯৫, পৃ.৩৭৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

সাধক সঙ্গী এবং অনেক ভক্ত মর্দে মুজাহিদ নিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। শাহ জালাল (র) ও তাঁর সাধক সঙ্গী এবং মুজাহিদ ভক্তদের উপস্থিতি সিকান্দার খানের বাহিনীর মধ্যে দারুন জজবা তৈরী করে। তাঁরা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে গৌর গোবিন্দকে পরাস্ত করেন। এবার শাহ জালাল (র) এর উপস্থিতিতে রাজার যাদু কোন প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়। বরং তার যাদুর অগ্নিগোলক উল্টো তার বাহিনীকেই আঘাত করে। ফলে রাজার বাহিনীর মধ্যে দ্রুত ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। আর এ ঘটনা মুসলিম বাহিনীকে আরো বেশি উৎসাহী করে তোলে। তারা বুঝতে পারে আল্লাহর ওলী শাহ জালাল (র) এর উপস্থিতির জন্যই এমন ঘটনা ঘটছে। কাজেই তারা বিজয়ের ব্যাপারে তীব্র আশাবাদী হয়ে ওঠে এবং সে জন্যে সাধ্যের শেষ বিন্দু দিয়ে চূড়ান্ত হামলা চালায়। এরই ফলশ্রুতিতে সিলেটে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়।

বর্ণনার সামান্য ব্যতিক্রমসহ এ ঘটনা আরো বিস্তারিতভাবে গুলজার ই আবরার ও সুহায়ল ই ইয়ামান[৮৪৭] গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। গ্রন্থ দুটির বর্ণনা অনুসারে শাহ জালাল (র) এর সিলেট আগমণের ঘটনা নিম্নরূপ।

শায়খ বুরহানুদ্দীন নামে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম সিলেটে বসবাস করতেন। তাঁর এক পুত্র সন্তানের আকীকা উপলক্ষে তিনি একটি গরু যবেহ করেন। এ কথা জানতে পেরে দুর্ধর্ষ রাজা গৌর গোবিন্দ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং বুরহানুদ্দীনকে শাস্তি দেন। রাজার নির্দেশে বুরহানুদ্দীনের ডান হাত কেটে ফেলা হয় এবং তার শিশু পুত্রকে হত্যা করা হয়। রাজার আদেশ কার্যকরী হওয়ার পর সাজা প্রাপ্ত মখদুম বুরহানুদ্দীন গৌড়ে চলে আসেন। তিনি সুলতান শামসুদ্দীন ফিরুয শাহকে সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বলেন এবং এ অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য যালিমের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানান। সুলতান অত্যাচারী রাজাকে সমূচিত শাস্তি বিধানের জন্য তাঁর ভাগিনা সিকান্দার খানকে সিলেট আক্রমণ করে গৌর গোবিন্দকে দমন করার নির্দেশ দেন। সিকান্দার খান তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে সিলেট অভিযানে আসেন। কিন্তু যুদ্ধে তিনি গৌর গোবিন্দের বিরাট বাহিনীর কাছে পরাজিত হন। সুলতান শামসুদ্দীন ফিরুয শাহ সিকান্দার খানের পরাজয়ের খবর পেয়ে দুঃখিত হন। তারপর তিনি নাসির উদ্দীনকে সিকান্দার খানের সাহায্যে পাঠান।

শাহ জালাল (র) সে সময় সোনার গাঁ অঞ্চলেই তাঁর সহচরদের নিয়ে মুশরিক ও ধর্মহীনদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সিলেটে মুসলিম নির্যাতনের ও সিকান্দার খানের পরাজয়ের কাহিনী শুনে এ মর্দে মুমিন স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তাঁর ৩৬০ জন মুরীদ অনুসারী নিয়ে সিকান্দার খানের সাথে যোগ দেন।

শাহ জালাল (র) এর শৈশবে তাঁর পিতা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর রক্তে তাই সবসময়ই জিহাদী জজবা ছিল। ইয়ামান থেকে বাংলায় আসার পথে পথেও তিনি অনেক সংগ্রাম করেছেন। সে অভিজ্ঞতা আর মামা সায়্যিদ আহমদ কবীরের কাছে থেকে প্রাপ্ত দীক্ষার সাথে যুদ্ধ বিদ্যার প্রকৃত প্রয়োগের সুযোগ পেয়ে তিনি এ সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাইলেন না।

সিলেটে রাজা গৌর গোবিন্দের সাথে তুমুল যুদ্ধ হয়। এবারের যুদ্ধে অহংকারী রাজা গৌর গোবিন্দ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। সিলেট ছেড়ে সে উত্তর-পূর্ব আসামের পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যায়। মুসলিম বাহিনী সিলেট জয় করে বিজিত রাজ্য গৌড়ের অন্তর্ভূক্ত করেন। এ বিজয় বার্তা ১৫১২ খৃষ্টাব্দ / ৯১৮ হিজরিতে উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে এভাবে পাওয়া যায়,

'শায়খুল মাশায়িখ মখদুম শায়খ জালাল মুজাররাদ ইবন মুহাম্মদ এর অনুগ্রহে শ্রীহট্ট শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ইসলামের প্রথম বিজয় সম্পন্ন হয় সিকান্দার খান গাজীর হাতে এবং সুলতান ফিরুয শাহ দেহলভীর শাসন আমলে ৭০৩ হিজরি মুতাবিক ১৩০৩ ঈসায়ী সালে।'

শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, সিকান্দার শাহ শাহ জালাল (র) এর সহযোগিতায় ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে সিলেট জয় করেন। তখন ফিরুয শাহ দেহলভীর রাজত্ব ছিল। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে দেখা যায়, সুলতান শামসুদ্দীন ফিরুয শাহ গৌড়ের শাসক এবং তিনিই সিকান্দার খান ও নাসীরুদ্দীনকে শাহ জালাল (র) সহ সিলেট জিহাদে প্রেরণ করেন। 'সুহায়ল ই ইয়ামানী' গ্রন্থের মতে, সিকান্দার খানকে তার মামা গৌড়ের শাসক শামসুদ্দীন ফিরুয শাহ ই যুদ্ধে পাঠান। এতে বুঝা যায়, শিলালিপিতে উল্লিখিত ফিরুয শাহ পাহলভী এবং পাণ্ডুয়ার শাসক সুলতান শামসুদ্দীন ফিরুয শাহ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। তিনি ১৩০১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৩২২ পর্যন্ত গৌড়ের শাসক ছিলেন। দিল্লী সম্রাট গিয়াসউদ্দীন বুলবনের তিনি

---

[৮৪৭] ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ উদ্ধৃত, *আমাদের স্বাধীনতার এক বিস্মৃত অধ্যায় শাহজালাল (র)*, অগ্রপথিক, ডিসেম্বর ১৪, ১৯৮৯

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন পৌত্র। গিয়াসউদ্দীন বুলবন ১২৬৫ থেকে ১২৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তাঁর পৌত্র এবং দিল্লীর শাহী বংশের অন্তর্ভূক্ত বলে শিলালিপিতে তাঁর নামের সাথে দেহলভী যুক্ত করা হয়েছে।

সিলেট জয়ের পর শাহজালাল (র) সেখানেই নিজের খানকাহ স্থাপন করেন। কারণ মুর্শিদের দেয়া আরবীয় মাটির সাথে এখানকার মাটির আশ্চর্যজনক মিল দেখা যায়। কথিত চাশনী পীর মাটি পরীক্ষা করে এতদুভয়ের মধ্যে মিল নির্ণয় করেন। চাশনী পীরের কবরও সিলেটেই অবস্থিত।

শাহজালাল (র) এর শিষ্যদের একাংশ সিকান্দার খানের সেনাদলের সাথে গৌড় ফিরে যান এবং তাঁরা ইসলাম প্রচারের সুমহান ব্রত নিয়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। অবশিষ্ট সহচরগণ তার সাথে সিলেটেই থেকে যান। তাঁদের সহায়তায় শাহজালাল (র) সিলেট ও তার আশেপাশের অঞ্চল এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রামসহ পূর্ববাংলা ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কাজে ব্রতী হন। ফলে বাংলা ও আসামের বহু এলাকায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। এ সকল অঞ্চলের অনেক লোক তাঁর ও তাঁর শিষ্যদের কাছে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হন। শাহজালাল (র) বাকী জীবন এখানেই কাটিয়ে দেন।[৮৪৮]

শাহজালাল (র) এর প্রভাবে সিলেট বিজিত হওয়ায় এ শহরটির অন্য নাম হয় জালালাবাদ। সিলেট বিজয়ে ৩৬০ আউলিয়ার প্রভাব থাকায় সিলেট '৩৬০ আউলিয়ার মুলক' হিসেবেও বিখ্যাত হয়। শাহজালাল (র) সিলেটকে কেন্দ্র করে বাংলা ও আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এখানেও তিনি লঙ্গর খানা চালু করেন। সিকান্দার খান সিলেটের প্রথম মুসলিম শাসক। শাহজালাল (র) এর নির্দেশে তিনি ইসলামী শাসন কায়িম করেন। আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নতি লাভ করে সিকান্দার খান 'সিকান্দার শাহ' নামে বিখ্যাত হয়ে উঠেন।

শাহজালাল (র) তাঁর অনুসঙ্গী ৩৬০ আউলিয়ার অনেককেই বাংলা ও আসামের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁর ধর্ম নিষ্ঠা ও সেবাপরায়নতা অতুলনীয় ছিল। তিনি 'সাইমুদ দাহর' বা নিষিদ্ধ দিনগুলি বাদ দিয়ে সারা বছর সাওম পালনকারী ছিলেন। সারা রাত তিনি সালাতে নিমগ্ন থাকতেন। গরীব-দুঃখী, সুফী-দরবেশ, মুসাফির, নও মুসলিম সকলেই তাঁর খানকাহতে নিরাপদ আশ্রয় লাভ করত। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর কারামত সম্বন্ধে বহু ঘটনার কথা শোনা যায়। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বাংলা ও আসামে ইসলামের বাণী দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

ইবন বতুতা শাহ জালাল (র) সম্বন্ধে লিখেছেন : ' শাহজালাল (র) ছিলেন লম্বা ও পাতলা গড়নের। তাঁর দু পাশের গাল বসা ছিল। তাঁর বয়স এক শ পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলে তিনি ইন্তিকাল করেন। তিনি বলতেন যে, তিনি বাগদাদে খলীফা মুহতাসিম বিল্লাহকে দেখেছেন এবং খলীফাকে হত্যা করার সময় সেখানে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি একাদিক্রমে চল্লিশ বছর সিয়াম পালন করেন। এ সময় তিনি দশদিন অন্তর ইফতার করতেন।

শাহজালাল (র) লোকালয় থেকে দূরে একটি গুহার মধ্যে অবস্থান করতেন। এ গুহার বাইরে ছিল তাঁর খানকাহ। দেশের হিন্দু মুসলিম সবাই তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে আসতো। তারা তাঁর জন্য তুহফা ও নযরানা নিয়ে আসতো। তিনি নিজে তা ভোগ না করে ফকির মিসকিনদের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। তাঁর নিজের একটি গাভী ছিল। তিনি সে গাভীর দুধ পান করেই নিজের ক্ষুধা নিবারণ করতেন।

শাহজালাল (র) বাংলাদেশের ইতিহাসে ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার সেই সৈনিকগণের অন্যতম যাঁরা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ইসলামের খিদমাতে। যাঁদের জীবনে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছু চাওয়ার ছিল না। রাব্বুল আলামীনের ভালবাসায় যাঁরা নিজেদের সবকিছু কুরবানী করে দিয়েছিলেন। নিষ্কাম সাধনা যাঁদের লক্ষ্য ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) এর পূর্ণ অনুশীলনের মাধ্যমে যাঁরা জীবনের সকল বিভাগের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তাঁদের মানবসেবা, সুবিচার আর সদাচার এতটাই সর্বব্যাপী ছিল যে, সমকালীন ও তার পরের অমুসলিম

---

[৮৪৮] কেউ কেউ মনে করেন, তিনি শেষ জীবনে মালদ্বীপে কিছুদিন কাটিয়েছেন এবং সেখানেই তাঁর মাযার আছে। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদগণ এবং সকল প্রত্নতাত্ত্বিব পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে এ মতটি ঠিক নয়। এবং শাহজালাল (র) মালদ্বীপে যান নি, সমাহিত হওয়া তো প্রশ্নই তো আসে না। আরো দেখুন : ডঃ এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতি ইতিহাস,* অনুবাদ. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ঢাকা, ১৯৮২।

Dhaka University Institutional Repository

লেখকদের লেখায়ও এই মহত্ত্ব আর বিশেষত্ব উপেক্ষিত হতে পারে নি। এ প্রসঙ্গে 'সেক শুভোদয়া'[৮৪৯] গ্রন্থটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। এ গ্রন্থে বলা হয়েছে –

'সেকাখ্যানং স্মরেদ্‌য়স্তু শ্রাবয়েদ্‌বা শুভোদয়ম
বিস্মনা শৌভবেত্রস্য শুভস্তস্য বিবর্ধতে।'

(যে ব্যক্তি শেখের গল্প কোন অথবা অপরকে তাঁর শুভাগমনের কথা শোনায় তার কোন ক্ষতি হয় না, বা তার বৈষয়িক উন্নত হয় ও সমৃদ্ধি ঘটে।)

'সেকস্য চরিতং সম্যক শ্রুয়তে জনসংসদি
বিঘ্নাস্তত্র না গচ্ছন্তি নাপি চৌর ভয়ানি চ।'

(যে জনসামজ শেখ চরিত্রের ব্যাখ্যা শোনে, তাদের বিঘ্ন ও চৌর্যভীতি থাকে না।)

গ্রন্থটিতে শাহজালাল (র) সম্পর্কে আরো যে বিবরণ রয়েছে তা থেকে গ্রন্থের লেখক মোটামুটি যা বলেছেন তা হল,

'শেখ কালো পোশাক ও পাগড়ি পরিহিত একজন বলিষ্ঠ পুরুষ। সিলেটের শাহজালাল (র) এর উপখ্যানে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক চপেটাঘাতে একটি বাঘ তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনি একজন বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন এতে এ কথাই প্রমাণিত হয়। তাছাড়া তিনি যেমন সফর করেছেন, যে সাধনা করেছেন – তাতে স্বভাবতই তাকে একজন বলিষ্ঠ পুরুষ মনে করা যায়। ইবন বতুতাও তাকে দীর্ঘ আকৃতির শক্ত সমর্থ পুরুষ বলে বিবৃত করেছেন।

'শেখ পানির উপর দিয়ে হেটে রাজধানীতে আসেন। এ বর্ণনাও সিলেটের শাহজালাল (র) এর উপখ্যানে বর্ণিত আছে। কথিত আছে যে, হরিণের চামড়া দিয়ে তৈরী জায়নামায বিছিয়ে শাহজালাল (র) অনেক নদ–নদী অতিক্রম করেছেন অবশেষে সুরমা নদী পাড় হয়ে সিলেট শহরে উপনীত হন। তাঁর আগমণে গৌর গোবিন্দের পৌত্তলিক প্রাসাদে তাওহীদের বিজয় নিশান উড্ডীন হয়।

'বিষ মেশানো খাবার খেয়েও শেখের কোন ক্ষতি হয় নি। এমন একটি ঘটনাও শাহজালাল (র) এর উপখ্যানে রয়েছে। কথিত আছে ইয়ামন রাজ তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য বিষ মেশানো শরবত খেতে দেন। তিনি বিসমিল্লাহ বলে বিষ মেশানো শরবত পান করেন। আল্লাহর রহমতে তাঁর কোনে ক্ষতি হয় না। ডঃ জে ওয়াইজ এ প্রসঙ্গে বলেন –

'He passed by a city of Yaman, the king of which was informed that a great Darwish was near. He accordingly sent cup of deadly poison instead of Sharbat, to test his power. Shahjalal at once divined its nature and informed the king's massagers that the instant draught was swallowed, the king would die. The poison was quaffed without injury to the Saints, but as foretold the king died.[850]

'সঙ্গী সাথীদের অলক্ষ্যে দূরদেশ গমন করার আধ্যাত্মিক শক্তি শেখের ছিল। ইবন বতুতাও তাঁর সফরনামায় সিলেটের শাহ জালাল (র) এমন ক্ষমতা সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন।[৮৫১]

---

[৮৪৯] 'সেক শুভোদয়া' বাংলাদেশের কোন দরবেশ বা মুসলিম সাধককে নিয়ে লেখা সংস্কৃত অথবা বাংলা গ্রন্থ রচনার প্রথম নিদর্শন। কোন কোন পণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্র রচিত 'সেক শুভোদয়া' রাজা লক্ষণ সেনের আমলে রচিত এবং লেখক হলায়ুধ মিশ্রকে রাজা লক্ষণ সেনের সভাপণ্ডিত বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থখানি ২৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ফারসী ও উর্দূ বিভিন্ন গ্রন্থের বর্ণনা সূত্র বিচার করলে এ গ্রন্থটির অনেক বর্ণনাই অসমর্থিত এবং অপ্রামাণ্য হিসেবে প্রতীয়মান হয়। সবকিছু বিচার করে ভাষাবিদরা মনে করেন, সেক শুভোদয়া হলায়ুধ মিশ্রের নামে আরোপিত হলেও ঐ হলায়ুধ মিশ্র লক্ষণ সেনের সভাপণ্ডিত হতে পারেন না এবং দু জন এক ও অভিন্ন লোকও হতে পারে না। কেননা রাজা লক্ষণ সেনের সময় বাংলা ভাষার যতোটুকু উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল তার তুলনায় সেক শুভোদয়ার ভাষা অনেক নিম্নমানের এবং ত্রুটিপূর্ণ। তাই পণ্ডিতদের ধারণা বইখানি জাল এবং তা ষোড়শ শতাব্দিতে রচিত হয়েছে। তা সত্ত্বে একজন অমুসলিম লেখকের রচনায় শাহজালাল (র) এর এ রূপ বর্ণনার একটি ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যই আছে। আরো দেখুন: দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *শাহজালাল (র),* ইফাবা,১৯৮৭ / *History of Bangal,* V.1, p.225

[৮৫০] Dr. J. Wise, ***Notes on Shahjalal, the Patron Saint of Shihat*** / quoted by H. Blochman, Contribution to the Geography, History of Bengal, 1873, p.73

[৮৫১] ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, পৃ.২৫২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি পুকুর খনন করেন।
প্রথমত কোন একটি জঙ্গলে আস্তানা তৈরী করেন।
শেখ পাওয়ায় বাইশ হাজারী মসজিদ নির্মাণ করেন।
দেবতলা বা দেওতলা নামক স্থানে দেও–দৈত্যকে জব্দ করে উৎপীড়িত মানুষকে তাদের পীড়ন থেকে মুক্তি দেন।
দেওতলার নাম রাখা হয় তাবরিযাবাদ।
শেখ গোয়ালপাড়ায় গমন করেন এবং সেখানেও একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

বস্তুত জাল এবং অপ্রামাণ্য এই গ্রন্থটির সকল তথ্য প্রচলিত উপখ্যান ঘিরে গড়ে উঠেছিল। আর যেহেতু এর লেখক ছিলেন একজন দেববাদী অমুসলিম সে জন্যে গ্রন্থের সর্বত্র শাহ জালাল (র) এর সমাজ সংস্কার, শাসন, জনসেবা প্রভৃতি বিষয় উপেক্ষা করে কেবল তার অলৌকিক ঘটনা গুলোর উল্লেখ করে তার উপর দেবত্ব আরোপেরই চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রকৃত পক্ষে আলোচ্য হলায়ুধ মিশ্র বা সেক শুভোদয়া গ্রন্থই শুধুই নয় বরং শাহ জালাল (র) কেন্দ্রিক যত গবেষণা, লেখা, প্রচার এবং আলোচনা তা সবই তার কারামত কেন্দ্রিক – যে সকল কারামত মূলত কোন প্রামাণ্য উৎস থেকে গৃহীত নয়। বরং জনশ্রুতি ও ভক্তদের বর্ণনাই হল এর উৎস। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা) নিজে এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যে কেউই মুজিযা বা কারামাতের ভিত্তিতে ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টা করেন নি। বরং মানবিক জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামকে উপস্থাপন করেছেন। তার মানবিক দাবি সমূহ তাদের সামনে ব্যাখ্যা করেছেন। সুবিচার, সদাচার, ইহসান, আদল আর মানবসেবার ইসলামী আদর্শের কথা বলেই তাঁরা তাদের দায়িত্ব শেষ করেন নি। বরং বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ করেও দেখিয়েছেন। ফলে ভাষাগত দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও এ দেশের মানুষের পক্ষে ইসলামের সুমহান আদর্শ গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। শাহ জালাল (র) এর প্রচার কাজেও এ থেকে ভিন্ন কোন ধারা অনুসৃত হতে পারে না। প্রয়োজনে তিনি যে কারামত প্রকাশ করেন নি বা তাঁর নামে প্রচলিত ও প্রচারিত সকল কারামতের ঘটনাই যে মিথ্যা ছিল আমরা তা বলছি না। আমাদের বক্তব্য হল, ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কারামতের উপর নির্ভর করেন নি। মানুষ তাঁর এবং তাঁর অনুসারীদের জীবনাদর্শ, নৈতিকতা এবং মানবসেবার আদর্শ দেখেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন।
সুতরাং কেবল আধ্যাত্মিক সাধক হিসেবে শাহ জালাল (র) কে চিহ্নিত করা হলে তা তাঁর উপর বড় রকমের অবিচারই হয়। মূলত বিশ্বনবী (সা) এর এই মহান প্রেমিক ও অনুসারী তাঁর আদর্শেই জীবন পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর সাধনা বা সমাজ সংস্কারের কোথাও এর ব্যাতয় ঘটে নি। তিনি এমন কিছুই করেন নি যা রাসূলুল্লাহ (সা) করেন নি।

হযরত খান জাহান আলী (র)

সাধক ও ধর্ম প্রচারক হিসেবে বিখ্যাত খান জাহান (র) কেবল সাধক ও ধর্ম প্রচারক ছিলেন না। ধর্ম প্রচার ও সাধনার পাশাপাশি তিনি ব্যাপকভাবে জড়িত ছিলেন সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে। নিজের অধিকারভুক্ত এলাকায় ব্যাপক সংস্কার কাজের পাশাপাশি তিনি একটি স্বাধীন বা প্রায় স্বাধীন শাসন ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 'খলিফাতাবাদ' নামক শহর কেন্দ্রিক তাঁর শাসনাধীন এ এলাকায় ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মর্যাদা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন এর শাসক, সেনাপতি, নীতি নির্ধারক ও সেবক। কিন্তু বাংলাদেশের গণমানসে এই মহান শাসক ও সমাজ সংস্কারকের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই। একজন সাধক ও ধর্ম প্রচারক হিসেবে যতটা তিনি পরিচিতি ঠিক ততটাই অপরিচিত একজন শাসক ও সংস্কারক হিসেবে। আলোচ্য নিবন্ধে খান জাহান (র) এর অনুদঘাটিত এই পরিচয় এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সংস্কার কাজের উপর আলোকপাত করা হবে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে খান জাহান (র) সাধারণত খান জাহান আলী এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জনগণের মধ্যে পীর খাজালী নামে সমধিক পরিচিত। তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে (হিজরি নবম শতক) যশোর, খুলনা ও

Dhaka University Institutional Repository

সুন্দরবন অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক, সমাজ সংগঠক ও স্থপতি।[৮৫২] তাঁর প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে কোন কিছুই জানা যায় না। কেউ কেউ তাঁকে জৌনপুরের শারকী সুলতান বংশের প্রতিষ্ঠাতা খাওয়াজা জাহানের সাথে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। খাওয়াজা জাহান ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে জৌনপুরে শারকী সুলতান বংশ প্রতিষ্ঠা করার চার বছর রাজত্ব করেন। এরপর নিজের পালিত ছেলে মুবারক শাহের হাতে ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যভার অর্পণ করেন। সুতরাং খান জাহান (র) ও শারকী সুলতান খাওয়াজা জাহান একই ব্যক্তি হতে পারেন না।[৮৫৩]

কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, খান জাহান আলী (র) এর মূল নাম ছিল শের খান বা কেশর খান। মায়ের নাম আমিনা, বাবা শের খান বা আজর খান। ভাগ্যান্বেষণে আজর খান বাগদাদ থেকে সপরিবারে দিল্লী আসেন এবং সেখানে কিছু কাল অবস্থানের পর গৌড়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন ও মৃত্যু মুখে পতিত হন। দরবেশ কুতুব উল আলমের অনুরোধে জৌনপুরের স্বাধীন সুলতান ইব্রাহীম শর্কি কেশর খানকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করেন। নিজ যোগ্যতায় অল্প দিনেই কেশর খান শর্কির সেনাপতি নিযুক্ত হন। রাজা গণেশকে পরাজিত করার কারণে তার উপাধি হয় 'খান ই জাহান।' এরপর সুলতান ইব্রাহীম শর্কি ও গৌড়ের সুলতান জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের ইচ্ছায় এবং আধ্যাত্মিক নেতা নূর কুতুব উল আলমের নির্দেশে খান জাহান দক্ষিণ বঙ্গে আসেন।[৮৫৪]

স্থানীয় লোকগাঁথা, পুঁথিপত্র ও প্রবাদ থেকে তাঁর সম্পর্কে দুটি তথ্য জানা যায়। একটি হল খান জাহান পারস্য দেশীয় মুসলমান। তিনি দিল্লীর সম্রাট মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সময় পাক ভারতে আগমণ করেন। প্রথমে তিনি সম্রাটের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে তার দক্ষতা ও প্রতিভার জন্য সম্রাট তাকে মন্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। সম্রাটের ইন্তিকালের পর এক অরাজক অবস্থায় এগারোজন আউলিয়া ও ষাট হাজার সৈন্যসহ তিনি দিল্লী হতে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন।[৮৫৫]

দ্বিতীয় তথ্যটি হল, খান জাহান ইয়ামন দেশীয় সওদাগর। ব্যবসায়ের জন্য আত্মীয় পরিজনসহ দিল্লীতে আসেন। পরে তিনি দিল্লীর রাজ সরকারে চাকুরি পান এবং নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভার গুণে সম্রাট মুহাম্মদ বিন তুঘলকের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। এ সময়ে তিনি বেশকিছু বিদ্রোহ দমন করেন। রাজদরবারের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র, অত্যাচার, ধ্বংসাত্মক কাজ, শাসক শ্রেণীর দাম্ভিকতা, নরহত্যা ও যুদ্ধ তাঁর মনের অবস্থা বদলে দেয়। তিনি জৌনপুরে এসে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করেন এবং সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। নিয়মিত সাধনা শেষে মিরাজের রাতে তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। অসংখ্য লোক তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এরপর তিনি মানব সেবা, তাদের আত্মিক ও জাগতিক কল্যাণ সাধন, ইসলাম প্রচার, রাজ দরবারের সঙ্গ বর্জন ও আধ্যাত্মিক সাধনাকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই তিনি কতিপয় শিষ্যসহ বাংলাদেশে আগমন করেন।[৮৫৬]

বাস্তব কথা হল, মুহাম্মদ বিন তুঘলকের মন্ত্রী খাজাজাহান ও খান জাহান (র) এক ব্যক্তি নন। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের পূর্ব নাম উলুঘ খান। বিভিন্ন সফল সামরিক অভিযান শেষে পিতা গিয়াসউদ্দীন তুঘলক রাজধানী প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে তিনি তুঘলকবাদে শাহী মঞ্চ নির্মাণ করেন। কিন্তু গিয়াসউদ্দীন সে মঞ্চে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর উলুঘ খান মুহাম্মদ বিন তুঘলক নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আহম্মদ বিন আয়াজকে 'খাজাজাহান' উপাধি দিয়ে মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত করেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলক ১৩২৫–৫১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সিংহাসনে আসীন থাকেন। এ সময়ের মধ্যে খাজাজাহান ছাড়া তার আর কোন মন্ত্রীর নাম খান জাহান ছিল না। খান জাহান (র) এর আয়ুষ্কাল প্রায় ১০০বছর ছিল। তাঁর সমাধির শিলালিপিতে মৃত্যুসন উল্লেখ করা হয়েছে ১৪৫৯খৃষ্টাব্দ। তাঁর বয়স ১০০ বছর ধরলেও জন্ম সন হয় ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দ। কাজেই তাঁর পক্ষে ১৩২৫-৫১ খৃষ্টাব্দে কারো মন্ত্রী হওয়া সম্পূর্ণ অবাস্তব।[৮৫৭]

---

[৮৫২] ডঃ এ কে এম আইয়ুব আলী, *খান জাহান,* ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃ.৫০৩

[৮৫৩] *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ,* ১ম খণ্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা – ১৯৮৬, পৃ.৩৮১

[৮৫৪] নাসির হেলাল, *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার,* সীমান্ত প্রকাশনী, ১৯৯১, পৃ.৬৭

[৮৫৫] এ এফ এম আব্দুল জলিল, *সুন্দরবনের ইতিহাস,* ঢাকা – মার্চ ১৯৬৯, পৃ.৮৯

[৮৫৬] মোঃ আবদুর রহিম, হজরত খান জাহান আলী (র), কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরী, বরিশাল, আষাঢ় ১৩৮০, পৃ.২

[৮৫৭] এ এফ এম আব্দুল জলিল, *সুন্দরবনের ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ.৯০-৯১

Dhaka University Institutional Repository

খান জাহান (র) সম্পর্কে এমনও বলা হয় যে, তিনি দিল্লীর সুলতান বা বঙ্গের রাজার নিকট হতে জায়গীর প্রাপ্ত হয়ে যশোর অঞ্চলে আগমন করেছিলেন। তিনি সম্রাট আকবরের অন্যতম সভাষদ ছিলেন। জনৈক সন্যাসী সম্রাটকে একটি মূল্যবান উপহার দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। অঙ্গীকার পুরণের জন্য তিনি গভীর রাতে সম্রাটের নিকটে আসেন। তিনি তখন ঘুমচ্ছিলেন আর তাকে বাতাস দিচ্ছিলেন খাঞ্জা আলী। সন্যাসী সম্রাটকে বিরক্ত না করে তার উপহার খাঞ্জা আলীকে দিয়ে গেলেন। তিনি তা সম্রাটকে প্রদান করলে সম্রাট অত্যন্ত খুশি হন। সম্রাট তাকে প্রচুর অর্থ সম্পদ ও জমি দান করেন। পরে খাঞ্জা আলী অসংখ্য অনুচরসহ শাহী দরবার ত্যাগ করে সুন্দরবন অঞ্চলে আসেন এবং জঙ্গল কেটে ভূমি আবাদ করেন।[৮৫৮]

এ মতটিও পুরোপুরি অবাস্তব। কেননা সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল হল ১৫৫৬-১৬০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। খান জাহান (র) ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেছেন। কাজেই তাঁকে সম্রাট আকবরের অমাত্য উল্লেখ করা নিতান্তই কল্পনা বিলাস মাত্র।[৮৫৯]

কারো কারো মত হল, শাহ পীর খান জাহান আলী ওরফে খাজা আলী কামেল দরবেশ ছিলেন। দিল্লী থেকে জাঁকজমকের সাথে সৈন্যসামন্ত নিয়ে তিনি ফতেহাবাদ পরগনায় শাহ আলী বাগদাদী (র)[৮৬০] এর খিদমতে উপস্থিত হন। এখানে কিছুকাল থেকে সুন্দরবনের দিকে চলে যান এবং হাবেলী কড়াপুরে বসবাসের বন্দোবস্ত করেন।[৮৬১]

এ মতটিকেও বাস্তব সম্মত মনে হয় না। কেননা খান জাহান (র) দিল্লী হতে সরাসরি ফাতেহাবাদ পরগণায় শাহ আলী বাগদাদী (র) এর খিদমতে উপস্থিত হয়েছেন এমন কোন ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাছাড়া এটা সর্বজন গ্রাহ্য মত যে, যশোরে খান জাহান (র) প্রথম বারোবাজারেই অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি যদি এখান থেকে ফতেহাবাদ যেতেন তাহলে চলার পথে নিশ্চয় তিনি মসজিদ বা দীঘি জাতীয় কোন চিহ্ন অবশ্যই রাখতেন। কিন্তু ফতেহাবাদ থেকে বারোবাজার পর্যন্ত খান জাহান (র) এর কোন কীর্তি নেই। তাছাড়া পাণ্ডুলিপিটিতে ব্যাপক অসঙ্গতিও রয়েছে। এতে শাহ আলী বোগদাদী (র) এর মৃত্যু সন লেখা হয়েছে ৯২৩ হিজরি আর খান জাহান (র) ইন্তিকাল করেন ৮৬৩হিজরিতে অর্থাৎ ৬০ বছর আগে। কাজেই তাঁর পক্ষে শাহ আলী বোগদাদীর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার বিষয়টিকে নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত মনে হয়।[৮৬২]

এ ব্যাপারে একটি ভিন্নমত লক্ষ্য করা যায়। যেমন বলা হয়, খাজা জাহান খোজা বা নপুংসক ছিলেন। তার কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি নিজের পালিত পুত্র ইব্রাহীমের উপর জৌনপুরের শাসনভার দিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও পূণ্য কাজে শেষ জীবন অতিবাহিত করার জন্য পূর্বাঞ্চলে আসেন। ইব্রাহীমের শাসন শুরু হওয়ার আগে তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হন। যশোর-খুলনার খাঞ্জালী পীর বা খাঁ জাহান আলী এবং জৌনপুর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা খাজা জাহান অভিন্ন লোক।[৮৬৩]

এ মতটি ঐতিহাসিকভাবে অসত্য এবং বিভ্রান্তিপূর্ণ। দ্বিতীয় মাহমুদ তুঘলকের সময় মালিক সারোয়ার নামে যে অমাত্য ছিলেন তিনি ছিলেন নপুংসক এবং তার উপাধি ছিল খাজাজাহান। নিজ যোগ্যতায় তিনি মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন এবং নাসিরুদ্দীন মাহমুদকে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। এরপর তিনি পূর্ব প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং মালিক উস শর্ক উপাধিতে ভূষিত হন। ১৩৩৪ সালে তিনি পূর্ব প্রদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং জৌনপুরে শর্কী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৯৯ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কাজেই ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করা খান জাহান (র) এর সাথে একে অভিন্ন মনে করা সঙ্গত ও যৌক্তিক হতে পারে না।[৮৬৪]

---

[৮৫৮] ওমালী, খুলনা গেজেটিয়ার, ১৯৪৫

[৮৫৯] এ এফ এম আব্দুল জলিল, *সুন্দরবনের ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ.৯২

[৮৬০] ঢাকার মিরপুরে যে শাহ আলী বাগদাদীর কবর, তিনি এবং আলোচ্য শাহ আলী বাগদাদী (র) অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন বলেই মনে হয়।

[৮৬১] এ এফ এম আব্দুল জলিল, *সুন্দরবনের ইতিহাস,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

[৮৬২] প্রাগুক্ত, পৃ.৯৪

[৮৬৩] প্রাগুক্ত

[৮৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ.৯৬-৯৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার একটি মসজিদের দ্বার দেশে একখানি শিলালিপি হতে জানা যায়, মসজিদটির নির্মাতা একজন খান। মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে তাঁর উপাধি হয়েছিল খাজা জাহান। এ মসজিদের নির্মাণ তারিখ জুন ১৩, ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ। এ তথ্য থেকেই কেউ কেউ এই অনুমান করার চেষ্টা করেছেন যে, ঢাকার এই খাজা জাহান এবং বাগের হাটের খান জাহান অভিন্ন ব্যক্তি।[৮৬৫] খাজা জাহান যে মাহমুদ শাহের নিকট থেকে উপাধি পেয়েছিলেন তিনি বাংলাদেশের শাসক নাসিরুদ্দীন মাহমুদ নন। তিনি হলেন দিল্লীর সুলতান মাহমুদ শাহ (১৩৯৫-১৪১৪খ্রি.)।[৮৬৬]

এ মতটিও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ঢাকার খাজাজাহানের মৃত্যু তারিখ খোদিত হয়েছে শাবান ৮৬০ হিজরি আর খান জাহান (র) এর সমাধি সৌধের শিলালিপিতে এ তারিখ জিলহজ ৮৬০ হিজরি। মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে ঢাকা থেকে যশোর-খুলনা যেয়ে সেখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও উল্লেখযোগ্য নানা স্থাপনা নির্মাণ যে কোন বিবেচনাতেই অসম্ভব। বরং ঢাকার খাজাজাহান গৌড় সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের কোন অধীনস্থ কোন শাসক হতে পারেন।[৮৬৭]

খান জাহান (র) সম্পর্কে এ রকম বিভ্রান্তির কারণ হল তাঁর সমসাময়িক কালে এমনকি তাঁর আগে পরেও বেশ ক'জন খাজাজাহান, খান জাহান উপাধিধারী কয়েকজন ব্যক্তির অস্তিত্ব। যেমন তুর্ক-আফগান আমলে কয়েকজন খান জাহান সম্পর্কে জানা যায়। প্রথম খান জাহান হলেন হোসেন খান, পিতা খান জাহান । ইনি সুলতান বাহলুল লোদীর অমাত্য ছিলেন। তিনি খান ই জাহান লোদী নামে পরিচিত ছিলেন। দ্বিতীয় খান জাহান হলেন সেকান্দর লোদীর পুত্র। তৃতীয় জন রাপরীর শাসক খান জাহান লোহানী। চতুর্থজন খান জাহান মালিক সরোয়ার উল মুলক ছিলেন সৈয়দ বংশের খ্যাতনামা অমাত্য। বেরার ও বিদরে খান জাহান নামে আরো দুজন শাসকের কথাও জানা যায়।

তুঘলক আমলে কয়েকজন খান জাহান সম্পর্কে জানা যায়। প্রথম খান জাহান ছিলেন ফিরোজ শাহ তুঘলকের মন্ত্রী খান জাহান মকবুল। ১৩৭০ সালে খান জাহান মকবুলের মৃত্যুর পর তার পুত্র জোনা শাহ খান জাহান উপাধি পান। শাহজাদা মুহাম্মদ একে হত্যা করেন। তৃতীয় খান জাহান হলেন মালিক ফিরোজ আলী ইবন মালিক তাজউদ্দীন এবং তিনিও মন্ত্রী ছিলেন। খান জাহান (র) সম্ভবত দ্বিতীয় খানজাহানের বংশধর ছিলেন। কেননা তিনি নিহত হওয়ার পর পুত্র বা পৌত্র কিংবা রক্তসম্পর্কের অন্য কেউ 'খান জাহান ' উপাধি গ্রহণ করতে পারেন। দ্বিতীয় খান জাহান নিহত হন ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে।[৮৬৮] এ সময় রাজ দরবারের ষড়যন্ত্র ও ভীষণ গোলযোগের মধ্যে দ্বিতীয় খানজাহানের কোন পুত্র যদি বংশানুক্রমে সঞ্চিত বিপুল ধনসম্পদ নিয়ে রাজধানী ত্যাগ করেন তা কারো জানার কথা নয়। বাস্তবে এটা ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। কেননা সমাধি সৌধের শিলালিপিতে নিজের জন্ম, বংশ, প্রাথমিক জীবন ও প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করা থেকেও এ বিষয়টিই প্রমাণিত হয়। খান জাহান তার গোপন দিল্লী ত্যাগ এবং ঐশ্বর্য ও ক্ষমতাপূর্ণ জীবন সম্পর্কে কোন তথ্য দিতে চাননি। এবং তথ্যের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্যই তিনি সুন্দরবনের মত এমন দুর্গম একটি এলাকাকে নিজের কর্মস্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।

খান জাহান (র) এর সময়কাল, তাঁর কার্য এলাকা এবং পূর্বাপর ঘটনা পরম্পরা বিশ্লেষণ করে আমরা এমতটিকেই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করি। তবে এমনটি বলতে পারি না যে, এমতটিই চূড়ান্ত মত।

জন্ম ও বংশ পরিচয় নিয়ে সংশয়, বিভ্রান্তি ও মতবিরোধ থাকলেও খান জাহান (র) এর কর্মক্ষেত্র, মূল নাম এবং মৃত্যু তারিখ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি নিজেই এর তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে গেছেন। বাগেরহাট শহরের অদূরে অবস্থিত তাঁর মাযারের শিলালিপি থেকে তাঁর প্রকৃত নাম, সময়কাল ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য অবগত হওয়া যায়। আরবি ভাষায় এ শিলালিপিতে উৎকীর্ণ আছে – 'আল্লাহর নগণ্য দাস, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের করুণাপ্রত্যাশী প্রেরিত পুরুষ প্রবরের বংশধরগণের অনুরক্ত, সৎপথে পরিচালিত আলিমগণের একাধিক বন্ধু, কাফির ও মুশরিকদের শত্রু, ইসলাম ও মুসলিমগণের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা – খান ই জাহান – তাঁর প্রতি আল্লাহর করুণা ও ক্ষমা বর্ষিত হোক – ৮৬৩ হিজরির ২৬ যুলহজ বুধবার রাতে এ নশ্বর দুনিয়া হতে চিরস্থায়ী বাসস্থানে প্রস্থান করেন এবং

---

[৮৬৫] প্রাগুক্ত, পৃ.৯৫
[৮৬৬] প্রাগুক্ত
[৮৬৭] প্রাগুক্ত, পৃ.৯৭
[৮৬৮] প্রাগুক্ত, পৃ.১০০

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত মাসের ২৭ তারিখ বৃহস্পতিবার সমাহিত হন (অক্টোবর ২৫, ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ)।[৮৬৯] শিলালিপির 'কাফির ও মুশরিকদের শত্রু এবং ইসলাম ও মুসলিমগণের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা ' উপাধি দুটোর প্রতি লক্ষ্য করলেই অনুভব করা যায় – কী গভীর নিষ্ঠা ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে এ মহান সাধক নিম্নবঙ্গ এলাকায় ইসলাম বিস্তৃতির অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।[৮৭০]

মাযারের অন্য একটি শিলালিপিতে উৎকীর্ণ রয়েছে – 'এ কল্যাণময় উদ্যানটি (মাযারটি) জান্নাতের উদ্যানসমূহের একটি, মহান খান (আল খানুল আযম) খান ই জাহানের (আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি তার উপর বর্ষিত হোক)। এটা লিখিত হয় হিজরি ৮৬৩ সালের ২৬ যুলহজ (অক্টোবর ২৫, ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ)।[৮৭১]

উল্লিখিত শিলালিপির দুটি পাঠ থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। যেমন – তাঁর প্রকৃত নাম হল খান ই জাহান। তাঁর পদমর্যাদাজ্ঞাপক সম্মানসূচক উপাধি হল উলুগ ও আল খানুল আযম। তুর্কী উলুগ শব্দ নেতা ও সরদার অর্থে দলপতি ও আঞ্চলিক শাসনকর্তাদের জন্য ব্যবহৃত হয়। খান ই আযম – তুর্কি ও ফার্সি ভাষায় উলুগ শব্দের সমার্থবোধক। তাঁকে 'উলুগ' উপাধিতে ভূষিত করা থেকে এটা অনুমিত হয় যে, তিনি হয়তো তুর্কী বংশোদ্ভূত কোন লোক ছিলেন। আর তাঁর 'আল খানুল আযম' উপাধি প্রমাণ করে তিনি যশোর–খুলনা অঞ্চলের স্বাধীন অথবা প্রায় স্বাধীন শাসনকর্তা ছিলেন।[৮৭২] কাজেই তার নাম 'খান জাহান আলী খান' নয়। প্রকৃত নাম উলুগ খান জাহান । নামের পরে কোন সময়ে হয়তো 'আলাইহিস সালাম'[৮৭৩] যুক্ত করা হত। এই আলাইহিকেই ভুল করে আলী বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। এর সাথে খান যুক্ত করে ভুলের মাত্রা আরো বাড়ানো হয়েছে মাত্র। তার কর্মক্ষেত্র ছিল খুলনা ও যশোর। ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ নয়। শেষ দুটি জেলায় তিনি কখনো পদার্পণ করেছেন বলে কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।[৮৭৪]

কোন কোন বিবরণে রয়েছে, খান জাহান (র) 'আলী বা খাজা আলী বা চলিত কথায় খানজালী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন শাসক, স্থপতি, ইনজিনিয়ার, বুজর্গপীর, সূফী ও সাধক। তার পূর্ব পরিচয় অজ্ঞাত। সম্ভবত তাইমুরের ধ্বংসলীলার পর তিনি দিল্লী হতে বাংলাদেশে আসেন এবং দিল্লীতে সৈয়দ বংশের ও বাংলাদেশে ১ম নাসিরুদ্দীন মাহমুদের শাসনামলে খুলনার বাগেরহাটে খ্যাতি লাভ করেন।[৮৭৫] এ বিষয়ে আরো সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়, ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে তৈমুর লং এর আক্রমণের ফলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে অসংখ্য আমীর উমরাহ ও অভিজাতবর্গ দিল্লী, জৈনপুর প্রভৃতি অঞ্চল হতে পলায়ন করেন। সম্ভবতঃ এ সময় জৈনপুর থেকে সেনাপতি খান ই জাহান কিছু সংখ্যক সৈন্য–সামন্ত ও বারোজন সূফী দরবেশ সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করতে আসেন।[৮৭৬] সহচরদের সংখ্যা অবশ্য কেউই নির্দিষ্ট করে বলেন নি, বলা সম্ভবও ছিল না। সে জন্যে এমনও বলা হয়েছে যে, 'Khan Jahan Ali, with his hundreds of followers, traversed thousands of miles through pathless and backward areas of central and southern Bengal.[৮৭৭] কেউ কেউ যশোহর ও খুলনা জেলায় ব্যাপক প্রচলিত জনশ্রুতি এবং বাগেরহাটে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে এ অনুমানও করেছেন যে, তিনি সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ

---

[৮৬৯] Shamsud – Din Ahmed, *Inscriptions of Bengal,* vol. iv, Rajshahi – 1966, p. 65-66

[৮৭০] চৌধুরী শামসুর রহমান, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের আলো,* পাকিস্তান পাবলিকেশান্স, ১৯৬৮, পৃ.২৮

[৮৭১] Shamsud – Din Ahmed, ibid, p. 66

[৮৭২] ডঃ এ কে এম আইয়ুব আলী, প্রাগুক্ত পৃ.৫০৪

[৮৭৩] ইসলামী আকীদা অনুসারে 'আলাইহিস সালাম' নবী–রাসূলগণের নামের শেষে ব্যবহার করা হয়। কাজেই খান জাহানের নামের শেষে আলাইহিস সালাম ব্যবহার করা হত এবং এর অপভ্রংশ হিসেবে তার নামের শেষে আলী যুক্ত হয়েছে এটা যৌক্তিক মনে হয় না। বরং এটাই যৌক্তিক যে, আলী তার নামেরই অংশ ছিল।

[৮৭৪] এ এফ এম আবদুল জলীল, *খান জাহান আলী,* হাবেলীবাগ পাবলিকেশান্স, খুলনা – এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ.৩০

[৮৭৫] বাংলা বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ঢাকা–১৯৭৫ পৃ.২৫০

[৮৭৬] হাসান আব্দুল কাইয়ুম, *যশোরে ইসলাম প্রচার,* (আসাদুজ্জামান আসাদ সম্পাদিত 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট জার্নাল, ঢাকা – ১৯৮৯, পৃ.১৮০

[৮৭৭] Anwar Husain, *Khan Jehan Ali Khan,* (Pakistan Observer, October 10, 1956), p.5

Dhaka University Institutional Repository

শাহেরই একজন সেনাপতি ছিলেন এবং তিনিই এ এলাকায় মুসলিম শাসনের গোড়া পত্তন করেন।[৮৭৮] চূড়ান্ত বিবেচনায় এ মত গ্রহণযোগ্যতা পায় নি। বরং তিনি যে অন্যদেশ থেকে এদেশে এসেছেন তা অধিকাংশ গবেষকই গ্রহণ করেছেন।

অবশ্য খান জাহান (র) বাংলাদেশেই ছিলেন না কি বাংলাদেশের বাইরের দেশ থেকে এ দেশে এসেছিলেন সে বিষয়ে গবেষক-ইতিহাসবদগণের দুটি মত রয়েছে। একটি মত হল, তিনি বাংলাদেশেই ছিলেন। দিল্লী থেকে এ দেশে আসেন নি।[৮৭৯] এর বিপরীতে বলা হয়, তিনি দিল্লী হতেই বাংলাদেশে আগমণ করেন। তিনি দিল্লীর সুলতানের কর্মচারী ছিলেন এবং সেখানে অরাজকতার সময় দিল্লী ত্যাগ করে এ দেশে আসেন। তাঁর নির্মিত মসজিদ ও স্থাপনাসমূহের নির্মাণ রীতির সাথে তুঘলক নির্মাণ রীতির মিল থেকেও মতটির সমর্থন পাওয়া যায়।[৮৮০]

খান জাহান আলী (র) যশোর ও খুলনা এলাকায় ৪০ বছর ইসলাম প্রচার ও জনকল্যাণমূলক কাজ করেন। বাংলাদেশে আগমণের আগে তিনি দিল্লী সুলতানের সামরিক বাহিনীতে সেনাপতির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে সামরিক জীবনের কাজে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এ চাকুরিতে ইস্তফা দেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এরপরই তিনি ইসলাম প্রচার ও জনসেবার কাজে বাংলাদেশে আগমণ করেন। এ বিবরণ অবিসংবাদিত – তা নয়। এ নিয়ে অনেক মতবিরোধ রয়েছে। তবে বিরোধপূর্ণ মতবাদসমূহের মধ্যে এ বিবরণটিকে নানাকারণে অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য এবং গ্রহণীয় মনে হয়। সে হিসেবে এর ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, বাংলাদেশে আগমণকালীন সময়ে তাঁর বয়স ছিল ৪০ বা এর কাছাকাছি বছর। এরসাথে ইসলাম প্রচারের ৪০ বছর যোগ করলে তাঁর মোট বয়স দাঁড়ায় ৮০ বছর। কাজেই বলা যায়, খান জাহান (র) সম্ভবত ১৩৭৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এর ৪০ বছর পর ১৩১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বাংলা আগমণ করেন এবং তাঁর মৃত্যু হয় ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে।[৮৮১] অনেকের ধারণা তিনি ১০০ বছর বা তার সামান্য বেশি সময় জীবিত ছিলেন। এ থেকে অনুমিত হয় যে, তিনি চতুর্দশ শতকের প্রথমার্থের শেষপাদে অর্থাৎ চল্লিশের দশকে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।[৮৮২] তিনি যখন বাংলায় আসেন তখন দিল্লীর সুলতান ছিলেন সায়্যিদ বংশীয় খিদির খান (১৪১৪-২১ খ্রি.) এবং বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন ছিলেন রাজা গণেশের নও মুসলিম ছেলে জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ (১৪১৮-৩১ খ্রি.)। তাঁর বাংলায় অবস্থানকালীন সময়ে (১৪১৯-১৪৫৯ খ্রি.) বিভিন্ন মেয়াদে বাংলা শাসন করেছেন জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ (১৪১৮-৩১ খ্রি.), শামসুদ্দীন আহমদ শাহ (১৪৩১-৪২ খ্রি.) এবং ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতান আবুল মুজাফফর নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৪২-৫৯ খ্রি.)। সুলতান জালালুদ্দীন মুহাম্মদ শাহ ইসলাম গ্রহণের পর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ইসলাম প্রচারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। যে কারণে খান জাহান (র) যখন বাংলাদেশে আসেন তখন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নানারকম গোলযোগ থাকা সত্ত্বেও ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ তৈরী হয়েছিল। তিনি এই অনুকূল পরিবেশের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।[৮৮৩] কেউ কেউ অবশ্য এমন দাবি করেছেন যে, দকযধহ ঔধযধহ ধিং ঃযব ভরৎংঃ গংষরস ঝধরহঃ যিড় নৎড়ঁমযঃ ঝঁষঃধহধঃব ধৎবধ হফবৎ ঃযব নধহহবৎ ড়ভ ওংষধস রহ ঃযব বধৎষু ঢ়ধৎঃ ড়ভ ঃযব ১৫ᵗʰ পবহঃ.[৮৮৪]

তবে প্রকৃত কথা হল, গৌড়ে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার আগে যশোর-খুলনা এলাকায় কোন ইসলাম প্রচারকের আগমন হয়েছিল কি না সে সম্পর্কে কোন সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবে স্থানীয় লোককাহিনী ও প্রাচীন বাংলা পুঁথি সাহিত্য হতে জানা যায় যে, কয়েকজন সূফী সাধক ও মুজাহিদ ইসলাম প্রচারের জন্য এ এলাকায় আগমন করেছিলেন। এদের মধ্যে যিনি যশোর-খুলনা ও ভাটি অঞ্চলের জনগণের অশেষ ভক্তি ও সম্মান অর্জন করেছিলেন তিনি হলেন গাযী পীর নামে খ্যাত বারখান গাযী। ত্রিবেণী বিজয়ী জাফর খান গাযীর মৃত্যুর পর তার ছোটো ছেলে

---

[৮৭৮] আব্দুল মান্নান তালিব, ***বাংলাদেশে ইসলাম,*** আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা – ১৯৮০, পৃ.১৫৩

[৮৭৯] এ এফ এম আবদুল জলীল, *খান জাহান আলী,* প্রাগুক্ত, পৃ.৩০

[৮৮০] প্রাগুক্ত

[৮৮১] ডঃ এ কে এম আইয়ুব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫০৪

[৮৮২] নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৩

[৮৮৩] ডঃ এ কে এম আইয়ুব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫০৪

[৮৮৪] Syed Murtaza Ali, ***Khan Jahan : The Saint of Bagerhat,*** Morning News Paper, November 14, 1963, p.5

Dhaka University Institutional Repository

বারখান গাযী খৃষ্টীয় ১৪শ শতকের শেষভাগে যশোর-খুলনা অঞ্চলের ইসলাম বিদ্বেষী সামন্ত রাজা মুকুট রায় ও ভাটির দেশের রাজা দক্ষিণা রায়কে যুদ্ধে পরাজিত করে এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের পথের সকল প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিরোধ শক্তি বিধ্বস্ত করেন। গাযী পীর বারখান গাযী যশোরের বারবাজার নামক স্থানকে কেন্দ্র করে যশোর-খুলনাসহ দক্ষিণ বাংলার বিভিন্ন এলাকায় ১৩১৩ থেকে ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দের পরও ইসলাম প্রচারে সক্রিয়ভাবে ব্যাপৃত ছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়।[৮৮৫] এ কারণেই খৃষ্টীয় ১৫শ শতকের প্রথম ভাগে খান জাহান (র) বাংলায় আগমন করে যশোরের বারবাজারে[৮৮৬] যখন আস্তানা স্থাপন করেন তখন দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁকে কোন অমুসলিম শক্তির সাথে সংঘাত-সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয় নি। যশোর-খুলনা অঞ্চলে তিনি কোন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছিলেন, ইতিহাস বা স্থানীয় লোক-কাহিনীতে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৮৮৭]

খান জাহানের আগমন ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে। তবে তাঁর 'খলিফাতাবাদ' (খিলাফত ই আবাদ) সাম্রাজ্যের নামকরণ থেকে অনুমান করা যায় যে, সমকালীন খলিফাতুল্লাহ উপাধিধারী বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ এর তিনি কোন প্রতিনিধি বা অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি ছিলেন।[৮৮৮] অবশ্য তিনি স্বাধীন সুলতান হোন আর নাই হোন, কোন রাজ প্রতিনিধি হোন আর নাই হোন, তিনি যে গৌড় সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের সমকালীন ব্যক্তি ছিলেন এবং একজন অতি উচ্চস্তরের সূফীসাধক ছিলেন এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আর তিনি যে সমকালীন নিম্ন বাংলা তথা যশোর, খুলনার অধিপতি এবং একজন শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন এ কথাও অনস্বীকার্য।[৮৮৯]

যশোরের প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, খান জাহান আলী (র) প্রথমে এখানকার অতি প্রাচীন নগরী বারোবাজারে আগমন করেন। এখানে তিনি বহু জনহিতকর কাজ করেন এবং ইসলামী ইবাদতের সুষ্ঠ অনুষ্ঠানের জন্য গড়ে তোলেন একটি সুরম্য মসজিদ। এ মসজিদটি এখনো বিদ্যমান আছে।[৮৯০] এ ধরনের মসজিদ বারোবাজার থেকে বাগেরহাটের পথে তিনি বেশ কয়েকটি নির্মাণ করেছেন বলে জানা যায়। বারোবাজার মূলত উত্তর বঙ্গের পৌণ্ডবর্ধনের মত নিম্নবঙ্গের বৌদ্ধ ও হিন্দু সভ্যতার পীঠস্থান ছিল। খান জাহান (র) যখন এখানে অবস্থান করেন তখন তাঁর প্রচেষ্টা ও প্রচার মাহাত্মে বহু বৌদ্ধ ও হিন্দুর মনে ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। মুসলমানদের নামানুসারে এখানে গড়ে ওঠে কয়েকটি গ্রাম। মুরাদগড়, সাদিকপুর, হাসিলবাগ, এনায়েতপুর ও রহমতপুর প্রভৃতি গ্রাম তার সাক্ষ্য বহন করে।

বারোবাজার থেকে তিনি যশোরের কয়েকটি স্থানে ইসলাম প্রচারের জন্য নিজের শাগরিদদের প্রেরণ করেন। এঁদের মধ্যে বাহরাম শাহ ও গরীব শাহ অন্যতম। তাঁর অন্যান্য শাগরিদদের মধ্যে বুড়া খাঁ, ফতেহ খাঁ, মোহাম্মদ তাহির ওরফে পীর আলী, মীর খাঁ, চাঁদ খাঁ, এখতিয়ার খাঁ, মেহের উদ্দীন, বখতিয়ার খাঁ, পীর জয়ন্তী ও আলম খাঁর নাম জানা যায়। এঁদের মধ্যে বুড়া খাঁ ও ফতেহ খাঁ খানপুর ও বিদ্যানন্দকাঠি অঞ্চলে বহু অমুসলিমকে ইসলামে দীক্ষিত করেন। আমাদি গ্রামে তাঁরা একটি গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদটি আজো বিদ্যমান আছে।[৮৯১]

---

[৮৮৫] ডঃ এ কে এম আইয়ুব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫০৪

[৮৮৬] যশোহর জেলার 'বারবাজার' নামক স্থান এ জেলায় ইসলাম প্রচারের প্রাচীন কেন্দ্রস্থল। প্রবাদ আছে, বারোজন পীরের দ্বারা এ অঞ্চলে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল হয়েছিল। বারবাজারের ভাঙ্গাচোরা মসজিদ ও দীঘি এখনো ইসলাম প্রচারের সাক্ষ্য দান করছে। প্রকৃতপক্ষে, খুলনা ও যশোহর অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী আদর্শ সম্প্রসারণের বেলায় যাঁর কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় তাঁর নাম উলুঘ খান ই জাহান। (গোলাম সাকলায়েন, *পূর্ব পাকিস্তানে সূফী-সাধক,* পৃ. ৮৪, বাংলা একাডেমী, ঢাকা – পৌষ, ১৩৬৮ এবং সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস,* ১ম খণ্ড, কলিকাতা – ১৩২১ বঙ্গাব্দ)।

[৮৮৭] ডঃ এ কে এম আইয়ুব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫০৪

[৮৮৮] মুহাম্মদ আবু তালিব, *যশোর জেলায় ইসলাম,* ঢাকা – ১৯৯১, পৃ.১১

[৮৮৯] মুহাম্মদ আবু তালিব, পৃ.৫৭

[৮৯০] প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৪

[৮৯১] আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

খান জাহান (র) তাঁর নিম্নবঙ্গে ইসলাম প্রচারের শুরুতে বারোবাজারে আস্তানা স্থাপন করেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ আমলে এটা এ এলাকার শাসনকেন্দ্র ছিল বলে ধারণা করা হয়। কেউ কেউ এমনও বলেছেন, গ্রিক ইতিহাস পেরিপ্লাসে গঙ্গারিডি নামে যে রাজ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, বারোবাজার ছিল তার রাজধানী। আধুনিক গবেষণায় অবশ্য কাটালিপাড়ার নিকটবর্তী কাম্বেরীখানকে গঙ্গারিডির রাজধানী হিসেবে সনাক্ত করা হয়। তবে গঙ্গারিডির রাজধানী হোক বা না হোক বারোবাজার যে বিখ্যাত প্রাচীন জনপদ ছিল তা সন্দেহাতীত সত্য। খান জাহান (র) শহরটির গুরুত্ব উপলব্ধি করেই এখানে অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি এখানে অনেকগুলো দীঘি খনন করেন এবং মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর এখানে অবস্থানের কারণে সহসাই এলাকাটি মুসলিম প্রধান হয়ে ওঠে।[৮৯২] তবে প্রথম আগমণের স্থান এবং অবস্থানগত গুরুত্ব অত্যধিক হওয়া সত্ত্বেও বারোবাজারে তাঁর কীর্তি খুব বেশি দেখা যায় না।[৮৯৩]

বারোবাজারে কিছুদিন অবস্থানের পর খান জাহান (র) সদলবলে ভৈরব তীর ধরে মুরলী উপস্থিত হন। নিম্ন বঙ্গের শহরগুলোর মধ্যে মুরলী প্রাচীনতম। এখানে বৌদ্ধ সংঘারাম ছিল, ছিল শিবমন্দির এবং কালিবাড়ি। মাটির নিচে কেল্লাও ছিল। এ জন্য এখানকার নাম হয় কেল্লাবাটি। খান জাহান এ স্থানের নাম দেন 'মুরলী কসবা। কসবা ফার্সি শব্দ যার অর্থ শহর, এটি বর্তমান যশোরের একটি উপশহর। হাজি মহসীন প্রতিষ্ঠিত ইমামবাড়া এখানেই অবস্থিত। মুরলী কসবাতেও খান জাহান (র) বেশিদিন থাকেন নি। এখানে তিনি তাঁর প্রধান দু শিষ্য বাহরাম শাহ বা বুরহানুদ্দীন ও গরীব শাহকে ইসলাম প্রচারের জন্য রেখে নিজে আরো এগিয়ে যান।[৮৯৪] বাংলার দক্ষিণাঞ্চল ছিল সুন্দরবন ঘেরা। জলপথ ছাড়া যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা ছিল না। এ কারণেই খান জাহান (র) এর সাথীরা যেদিকেই এগিয়েছেন, পথ তৈরী করে এগিয়েছেন। কাজটা কষ্টসাধ্য ছিল, কিন্তু এটা করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় ছিল না। এজন্যে তাঁর ষাট হাজার সৈন্য এবং প্রতিটি জনপদ থেকে সঙ্গী হওয়া ভক্তরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।[৮৯৫]

মুরলি কসবা হতে খান জাহান (র) তাঁর শিষ্যদেরকে দুটি ভাগে ভাগ করেন।[৮৯৬] একদল কপোতাক্ষ নদীর তীর ধরে এগিয়ে গিয়ে সুদূর সুন্দরবন অঞ্চলের বেতকাশি পর্যন্ত গিয়ে ইসলাম প্রচার করেন। অন্যদলটি ভৈরবকূল দিয়ে পায়গ্রাম কসবায় পৌছেন। প্রথম দলটির নেতা ছিলেন বোরহান খাঁ বা বুড়ো খাঁ। তাঁর সুযোগ্য পুত্রের নাম ফতেহ খাঁ। তাঁরা দুজনেই ধর্মপ্রাণ মুসলিম এবং কর্মনিষ্ঠ সৈনিক ছিলেন। মুরলি কসবা থেকে বেতকাশি পর্যন্ত এলাকায় তারা ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে জঙ্গল কেটে সাফ করেন, জলাশয় খনন ও মসজিদ নির্মাণ করেন।[৮৯৭] খান জাহান (র) তাঁর বিশাল সেনাবাহিনীর জন্যে মাটির নিচে কেল্লা তৈরী করেছিলেন। সে স্মৃতি বিজড়িত স্থানের নাম আজও কেল্লাবাটি রয়ে গেছে।[৮৯৮]

দ্বিতীয় দলটি পরিচালনা করেন খান জাহান (র) নিজে। যাত্রাপথের স্থানে স্থানে তিনি বিশ্রাম ও খাবার গ্রহণ করার জন্য যাত্রা বিরতি দিতেন। প্রায় প্রতিটি যাত্রা বিরতির স্থানে তাঁর সাথীরা দীঘি খনন করত। এ ক্ষেত্রে দীঘি খনন করার জন্য খান জাহান (র) জিন্ন-পরির সাহায্য গ্রহণ করতেন বলে যে প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে তা ঠিক নয়। সাধারণ মানুষের কায়িক শ্রমের মাধ্যমেই এ দীঘিগুলো খনন করা হয়েছিল।[৮৯৯] বারো বাজার থেকে মুরলি কসবা পর্যন্ত রাস্তাটিকে গাযীর জাঙ্গাল বলা হত। আর মুরলি হতে দক্ষিণ পূর্ব অর্থাৎ সুন্দরবন ও বাগেরহাট পর্যন্ত খান জাহান আলীর

---

[৮৯২] এ এফ এম আব্দুল জলীল, *খান জাহান আলী,* প্রাগুক্ত, পৃ.৩৪-৩৫

[৮৯৩] নূরুল্লাহ মাসুম, *দক্ষিণের বাদশাহ খান জাহান আলী (র),* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা – এপ্রিল ১৯৯৬, পৃ.৫

[৮৯৪] এ এফ এম আবদুল জলীল, *খান জাহান আলী,* প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬

[৮৯৫] নূরুল্লাহ মাসুম, প্রাগুক্ত, পৃ.৫

[৮৯৬] নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ.৭১

[৮৯৭] এ এফ এম আবদুল জলীল, *খান জাহান আলী,* প্রাগুক্ত, পৃ.৩৭-৩৮

[৮৯৮] নূরুল্লাহ মাসুম, প্রাগুক্ত, পৃ.৫-৬

[৮৯৯] এ এফ এম আবদুল জলীল, *খান জাহান আলী,* প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪

Dhaka University Institutional Repository

শিষ্যদের তৈরী রাস্তাকে বলা হত খাঞ্জালীর বা খান জাহানের জাঙ্গাল বা রাস্তা। বলা বাহুল্য, গার্যা–খাঞ্জালীর রাস্তা এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রাচীনতম স্মারক।[৯০০]
মুরলি কসবা থেকে খান জাহান (র) এর চলার সুদীর্ঘ রাস্তা এঁকে বেকে ভৈরব তীর দিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়েছে। ভৈরব তীরেই তিনি পত্তন করেছিলেন চারটি নগরীর। প্রথমটি বারোবাজার, দ্বিতীয়টি মুরলি কসবা, তৃতীয়টি পায়গ্রাম কসবা এবং সর্বশেষটি খলিফাতাবাদ।[৯০১]

পায়গাঁও বা পায়গ্রাম ফার্সি শব্দ। এর অর্থ সুসংবাদ। পায়গ্রাম কসবা হল সুসংবাদের শহর। বর্তমানের ফুলতলা হতে প্রায় চার মাইল উত্তরে এ নগরি অবস্থিত। যশোর হতে চার মাইল পূর্ব দক্ষিণ কোণে রামনগর গ্রামে খান জাহান একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করেন। বর্তমানের যশোর–খুলনা মহাসড়ক থেকেই দীঘিটি দেখা যায়। শাহবাটির দীঘি নামে পরিচিত এ দীঘিটি অত্যন্ত গভীর ছিল এবং বারোমাসই এখানে সুপেয় পানি থাকে। এ দীঘির কাজ শেষ করে খান জাহান (র) পায়গ্রাম কসবায় আসেন। এখানে তিনি প্রথম যে স্থানে আস্তানা স্থাপন করেন তার নাম হয় খাঞ্জেপুর – এখনো এ নাম অপরিবর্তিত আছে। এখানে তিনি একটি শহর গড়ে তোলেন এবং নদী তীরে তাঁর বাসস্থান, দরবারগৃহ ও মসজিদ নির্মাণ করেন।[৯০২]

পায়গ্রাম কসবায় বিখ্যাত পীর আলী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। যশোর অঞ্চলের একজন ব্রাহ্মণ খান জাহান (র) এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নাম মোহাম্মদ তাহের। তাঁর পূর্ণ নাম ছিল পীর আলী মোহাম্মদ তাহের। তাঁর পূর্ব নাম শ্রী গোবিন্দ লাল রায়। গোবিন্দ ঠাকুর নামে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। পায়গ্রাম কসবায় তিনি খান জাহান (র) এর বিশেষ প্রিয়পাত্র ও প্রধান অমাত্য ছিলেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, প্রশাসনিক দক্ষতা ও ধর্মনিষ্ঠার কথা বিবেচনা করে খান জাহান (র) তাকে নিজের বিশিষ্ট খলীফা ও উযীর মনোনীত করেন।[৯০৩] পীর আলী মোহাম্মদ তাহেরের চেষ্টায় পায়গ্রাম কসবায় অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর চেষ্টায় ইসলাম গ্রহণ করত বলে এ সকল মুসলমানদেরকে পীর আলী বা পীরালী মুসলমান বলা হত। আর যে বংশের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করত তাদের আত্মীয় স্বজনদেরকেও সমাজচ্যুত করা হত। সমাজচ্যুত এ সকল হিন্দুরা পীরালী ব্রাহ্মণ, পীরালী কায়স্থ প্রভৃতি আখ্যা দেয়া হত। এভাবে পীরালী হিন্দু–মুসলিম ধারাটি বেশ ছড়িয়ে পড়ে।[৯০৪]

খান জাহান (র) কিছুকাল পয়গ্রাম কসবা অবস্থান করে এ স্থানের শাসনভার মোহাম্মদ তাহেরের উপর অর্পণ করে সদলবলে আরো পূর্ব দিকে এগিয়ে যান।[৯০৫] অভ্যাসমত পথে পথে খনন করেন পুকুর, নির্মাণ করেন চলাচলের রাস্তা। এভাবে তিনি ভৈরব নদী পার হয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হন। তখন এ নদী খরস্রোতা ছিল। নদী পার হয়ে সম্ভবত তার নড়াইল যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। তবে তার এ নড়াইল যাত্রা সম্পর্কে কোন কিছু জানা যায় না। মনে হয়, মাঝখানে চাঁদের বিলে বাঁধা পেয়ে বাসুড়ি থেকে ফিরে শুভরাড়া, রানাগাতি, গোপীনাথপুর, নাওলী হয়ে ধূলগ্রামে আসেন।[৯০৬] যে কোন কারণেই হোক তিনি স্থানীয় বাসুড়ী গ্রামে যাত্রা বিরতি করেন। এখানে তিনি তীরভূমিসহ ৭০ বিঘা জমি জুড়ে বিস্তৃত একটি বিশাল দীঘি খনন করেন। বাসুড়ি গ্রামে কিছুদিন অবস্থানের পর খান জাহান (র) আবারো ভৈরবের তীর ধরে দক্ষিণে অগ্রসর হতে থাকেন। যাত্রাপথে শুভরাড়া গ্রামে তিনি এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। শুভরাড়া গ্রাম থেকে খান জাহান (র) রানাগাতি, গোপীনাথপুর ও নাওলী হয়ে ধূলগ্রামে আগমন করেন। এখান থেকে তিনি বরাকপুর থেকে দিঘলিয়া পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণ করেন। ধূলগ্রাম হতে ভৈরব নদীর তীর দিয়ে তিনি

---

[৯০০] নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ.৭২
[৯০১] এ এফ এম আবদুল জলীল, *খান জাহান আলী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৪
[৯০২] প্রাগুক্ত
[৯০৩] ডঃ এ কে এম আইয়ুব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৫
[৯০৪] এ এফ এম আবদুল জলীল, *খান জাহান আলী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৪৬-৪৮
[৯০৫] ডঃ এ কে এম আইয়ুব আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৫০৫
[৯০৬] মুহাম্মদ আবু তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ.২০

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধিপাশা হয়ে বারাকপুর এসে পৌঁছেন। তখন মুজতখালির নদী ছিল না। এ স্থানের হয়তো অন্য কোন নাম ছিল। খান জাহান (র) এর সেনারা ছাউনি ফেলায় হয়তো এর নাম বারাকপুর হয়ে থাকবে।[৯০৭]
বারাকপুর থেকে খান জাহান (র) ঘোষগাতি ও দিঘলিয়ার মধ্য দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করতে করতে বর্তমান দৌলতপুর কলেজের সন্নিকটে নদীর উত্তর তীরে উপস্থিত হন। এখানে ব্রহ্মগাতি গ্রামে তিনি দুটি বিশাল দীঘি খনন করেন। ব্রহ্মগাতি থেকে তিনি সেনহাটি ও চন্দনীমহল দিয়ে আতাই নদী পার হয়ে সোলেপুরের পথে সেনের বাজারে উপনীত হন। সেনের বাজার খুলনা শহরের উত্তরে অবস্থিত। খুলনার খালিশপুর হয়ে তিনি এখানে এসেছিলেন। এখান থেকেই তিনি বাগেরহাট যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।[৯০৮]

ইসলাম প্রচারের জন্য খান জাহান আলী গৌরনদী অঞ্চলে আগমণ করেন বলে কথিত আছে। গৌরনদী থানার খাঞ্জাপুর গ্রামের নাম তার স্মরণে হয়েছে বলে মনে হয়। গৌরনদী থানার কসবা মসজিদের নির্মাণ কৌশল খুলনার মসজিদ কুড়ের মত।[৯০৯] কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন, এ মসজিদ পনর শতকে নির্মিত হয়েছে, বাকলা–চন্দ্রদ্বীপ বাগেরহাট সংলগ্ন ভূ–ভাগ। সুতরাং মনে হয়, খান জাহানের জীবিতকালে এবং তার মৃত্যুর পর তার কয়েকজন সঙ্গী বরিশালে ইসলাম প্রচার করেছেন। সাতুরিয়া মিয়াদের পূর্ব পুরুষ শাহ সাজেন্দ খান জাহান আলীর সঙ্গী ছিলেন। শাহ সাজেন্দ ও আরো অনেকে বাকলায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে আসেন।[৯১০] বাকলা চন্দ্রদ্বীপে কখন কোথায় মুসলিম বসতি গড়ে ওঠে তার কিছু তথ্য অবশ্য পাওয়া গেছে। সতীশচন্দ্র মিত্র বলেছেন, চন্দ্রদ্বীপের রাজা দুনজমর্দনের ভয়ে খান জাহান বলেশ্বর নদী অতিক্রম করেন নি।[৯১১] কিন্তু সতীশ চন্দ্রের এ মতকল্পনাপ্রসূত। কেননা খান জাহান (র) ও রাজা দুনজমর্দন সমসাময়িক নয়।[৯১২]

খান জাহান (র) সেনের বাজার হতে ভৈরব নদী পার হয়ে তালিমপুর, শ্রীরামপুর, নেহাটী, সামন্তসেনা প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়ে সোজা সাতসিকা ও আট টাকার পার্শ্ব দিয়ে রাংদিয়ায় পৌঁছেন। রাংদিয়া নামটির একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। যে ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে ইসলামের পরমত সহিষ্ণুতার সুন্দর দৃষ্টান্ত। ঘটনাটা অনেকটা এরকম, 'সামন্তসেনাদের সাথে সংঘর্ষে যখন খান জাহান (র) এর সেনারা যখন ক্রমাগত জয়ী হচ্ছিলো, বিধর্মীগণ পরাজিত হচ্ছিলো, সামন্ত রাজন্যবর্গ তখন ব্রাহ্মণ সমাজের বিলুপ্তির ভয়ে খান জাহান (র) এর কাছে ব্রাহ্মণদের রক্ষার আবেদন জানান। সাচ্চা মুসলিম খান জাহান (র) ইসলামের মহামানবতার চেতনায় উজ্জীবিত। ইসলামের আদর্শ অনুসারে তিনি হিংসা বিদ্বেষের পরিবর্তে সৌহার্দের নীতি প্রবর্তন করেন। তিনি বলেন – 'ব্রাহ্মণ রায় দিয়া' বা ব্রাহ্মণদের রক্ষা কর।' এ থেকেই গ্রামের নাম হয় রাখদিয়া। পরে তার নাম হয় রাংদিয়া।[৯১৩] এখানে কিছুদিন থেকে তিনি মধুদিয়া, আফরা প্রভৃতি গ্রামের মধ্যদিয়ে বাদখালীর বিল হয়ে বাগেরহাটের সন্নিকটে প্রাচীন ভৈরব নদী তীরে সুন্দরঘোনা উপস্থিত হন। এখানে যে স্থানে তিনি শিবির স্থাপন করেন তার নাম হয় বারাকপুর। এখানে তিনি একটি বিশাল দীঘি খনন করেন। খুলনার পূর্ব পারে অবস্থিত সামন্তসেনা হতে বাদখালী পর্যন্ত তিনি বিশ মাইল পাকা রাস্তা নির্মাণ করেন।[৯১৪]
বাদখালীর উত্তর পার্শ্ব দিয়ে খান জাহান বারাকপুর প্রবেশ করেন। ভৈরব নদী সে সময়ে সুন্দরঘোনার উপর পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল। এ নদীর দক্ষিণ তীরে মনোরম স্থানে খান জাহান তাঁর নতুন শহর গড়ে তোলেন। তাঁর এ শহর পশ্চিমে সায়রা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ শহরে তিনি বিশালাকার এক দীঘি খনন করেন। এর নাম ঘোড়াদীঘি। এর দৈর্ঘ

---

[৯০৭] এ এফ এম আবদুল জলীল, *খান জাহান আলী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪-৫৫
[৯০৮] প্রাগুক্ত, পৃ.৫৫-৫৬
[৯০৯] সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *বরিশালের ইতিহাস*,ঢাকা – ১৯৮২ পৃ.১৫৯
[৯১০] প্রাগুক্ত
[৯১১] *Bangal District Gazetteer,* Bakerganj, J. C. Jack – 1918, London & Hi Beveridge, *The District of Bakerganj – Its history and Statistics,* p.42
[৯১২] সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, প্রাগুক্ত,পৃ.১৬০
[৯১৩] নূরুল্লাহ মাসুম, প্রাগুক্ত, পৃ.১২
[৯১৪] এ এফ এম আবদুল জলীল, *খান জাহান আলী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৭

Dhaka University Institutional Repository

সহস্র হাত আর প্রস্থে ছয়শত হাত। খান জাহান (র) এর এ এক অক্ষয় কীর্তি। স্থানীয় জনগণের জন্য সুপেয় পানির সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্যই তিনি এ দীঘি খনন করেন।[৯১৫]

'দীঘির পূর্ব পাড়েই খান জাহান (র) নির্মাণ করেন তাঁর দরবার হল। অবশ্য সবাই এটাকে বলে ষাট গম্বুজ মসজিদ। এটা শুধু মসজিদ ছিল না। তবে এর নাম এমনটি হল কেন? আরো মজার ব্যাপার এর গম্বুজও ষাটটি নয়, তাহলে একে ষাট গম্বুজ বলা হয় কেন? ষাটটি খাম্বা বা খুটির উপর ভিত্তি করে এ দরবার হল নির্মিত। এর গম্বুজের সংখ্যা ৭৭টি। এগুলোর অবস্থানও বেশ মজার। আড়াআড়িভাবে গম্বুজের সারি ৭টি। আর লম্বালম্বি দিকে ১১টি। এই ১১টির মধ্যে দুই পাশের ৫টি করে মোট ১০টি গম্বুজের আকৃতি গোলাকার অর্থাৎ ডিম্বাকৃতির আর বাকি ১টি দেখতে চারচালা ঘরের চালে মত। যা হোক গম্বুজ মোট ৭৭টি। আর চার কোণায় চারটি মিনারের উপর ৪টি গম্বুজ। তাহলে সব মিলিয়ে গম্বুজ সংখ্যা ৮১টি। সুতরাং ষাট গম্বুজ নামের হেতু কি? ঐতিহাসিকগণ বলেন, ষাট খাম্বাজ নামটি বিকৃত হয়ে ষাট গম্বুজ হয়েছে। খাম্বাজ অর্থ খাম্বা বা খুঁটি। এমনটি হতেও পারে। এটা মসজিদ ছিল না। খান জাহান (র) এর দরবার হল হিসেবেই এটা নির্মিত হয়েছিল। শাসক হিসেবে খান জাহান (র) এখানে শাসন কাজ চালাতেন। অনেকে অবশ্য বলেছেন, এটা মসজিদই ছিল। তবে দরবার হল হিসাবেও ব্যবহৃত হত। আবার কেউ কেউ বলেন, দরবার হল হিসাবেই নির্মিত হয়েছিল, তবে শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ দিনে সালাতের জন্য ব্যবহৃত হত। আমরা শেষোক্ত মতকে সমর্থন করতে পারি। কেননা সাধারণত অন্য কোন অসুবিধা না থাকলে মসজিদ পূর্ব দুয়ারী হয়ে থাকে। অর্থাৎ সব মসজিদের দরোজা পূর্ব দিকে থাকে, পশ্চিম দিকে দরজা থাকে না। এমনকি উত্তর বা দক্ষিণ দিকেও দরজা রাখার তেমন একটা প্রচলন দেখা যায় না। ষাট গম্বুজ মসজিদে কিন্তু তিন দিকে অনেকগুলো দরোজা আছে এমনকি পশ্চিম দিকেও ছোটো একটা দরোজা আছে। পশ্চিম দিকের দরোজাই প্রমাণ করে এটা মসজিদ হিসেবে নির্মিত হয় নি। মূলত তিনি এখানে দরবার বসাতেন। নিয়মিত দরবার ছাড়াও ধারণা করা হয়, শুক্রবারে জুমআর নামায আদায় করা হত এবং সেদিন খান জাহান (র) এর সহচরদের সকলেই এ জামাতে শরীক হতেন। হয়তো বা দুই ঈদের জামাতও এখানে অনুষ্ঠিত হত। পশ্চিম দিকের ছোটো দরজার ব্যবহার সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ বলেন, প্রতিদিনকার দরবারে অমাত্যবর্গ ও দর্শনার্থীদের অত্যধিক ভীড় থাকার কারণে খান জাহান (র) পশ্চিম দিকের ছোটো দরজা ব্যবহার করতেন। যাই হোক পরবর্তীকালে এটি ষাট গম্বুজ মসজিদ নামেই পরিচিতি লাভ করে। মসজিদ হোক বা দরবার হল হোক যাই হোক, এর থেকে অনতিদূরে উত্তর পার্শ্বে খান জাহান (র) এর বাসস্থান ছিল। বাড়িটি সাত দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল বলে জানা যায়। সেখানে বাসভবন ছাড়াও ছোটো একটা পুকুর ও একটা মসজিদ ছিল। ষাট গম্বুজ মসজিদের এত কাছে একটি মসজিদের অবস্থান প্রমাণ করে যে, ষাট গম্বুজ মসজিদ আসলে মসজিদ ছিল না। বাড়ির ভেতরকার ছোটো পুকুরটির নাম বিষপুকুর এবং মসজিদটির নাম সোনা মসজিদ। এগুলোর এমন নামকরণের কারণ কী তা নিয়ে নানা মতবিরোধ আছে।[৯১৬]

শহরে খান জাহান (র) কয়েকটি পাকা রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। ষাটগম্বুজ হতে একটি খাঞ্জালী রাস্তা উত্তরমুখী হয়ে ভৈরব পর্যন্ত এবং অন্য রাস্তা পূর্বদিকে বর্তমান বাগেরহাট শহর পর্যন্ত গিয়েছিল। তৃতীয় রাস্তা দ্বিতীয় রাস্তা হতে উত্তরমুখী হয়ে নদীতীর দিয়ে প্রথম রাস্তার সাথে মিশেছিল। এই শেষোক্ত রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে ভৈরব তীরে খানজাহানের গড়বেষ্টিত বাড়ি ছিল। বাড়ির সদর ছিল পূর্বদিকে এবং নদীতীরে পাকা ঘাট ও খানজাহানের আবাসবাটির তোরণ ছিল। এর নিকটে কোতয়ালী চৌতারা এবং পশ্চিমদিকে একটি ছিলেখানা বা অস্ত্রাগার ছিল। কোতয়াল পুলিশ ও সৈন্যদের সাহায্যে শহরের শান্তি রক্ষা হত। রাজ্যের রক্ষিবাহিনীর প্রধান কেন্দ্রস্থল এখানেই অবস্থিত ছিল।[৯১৭]

এ সময় পুরো এলাকাটি একটি সুন্দর নগরী হিসেবে গড়ে ওঠে। খান জাহান (র) তাঁর প্রতিষ্ঠিত নগরীর নাম দেন 'খলিফাতাবাদ। খলিফাত ও আবাদ শব্দ মিলে খলিফাতাবাদ। খলীফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি এবং আবাদ অর্থ আবাসস্থল। পুরো শব্দের অর্থ প্রতিনিধির বাসস্থল। খান জাহান (র) তাহলে কারো প্রতিনিধি ছিলেন নিশ্চয়। ইতিহাস

---

[৯১৫] প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮-৫৯

[৯১৬] নূরুল্লাহ মাসুম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩-১৫

[৯১৭] এ এফ এম আবদুল জলীল, *খান জাহান আলী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৪

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষ্য দেয়, তিনি গৌড় সুলতান নাসিরুদ্দীন আবুল মুজাফফর মাহমুদ শাহ্ এর প্রতিনিধি ছিলেন। অনেকে অবশ্য দাবি করেন, খান জাহান (র) স্বাধীন শাসক ছিলেন এবং খলীফাতাবাদ শব্দের দ্বারা তিনি নিজেকে আল্লাহর খলীফা বুঝিয়েছেন। তবে এটি ধারণা করা ঠিক হবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। সে হিসেবে মানুষ মাত্রই আল্লাহর প্রতিনিধি। সেখানে একজন আলিম মানুষ কীকরে এককভাবে নিজেকে আল্লাহর প্রতিনিধি ভাবতে পারেন?[৯১৮]

খান জাহান (র) ঘোড়াদীঘি খনন, ষাটগম্বুজ ও নিজের বাসভবন নির্মাণের পর খলিফাতাবাদেই স্থায়ী হওয়ার মনস্থ কারণ। তাঁর বয়সও হয়েছিল এবং জীবনে তিনি হয়তো স্থিরতাও চেয়েছিলেন। এজন্যই এখানে তিনি সুন্দরবনের জনবসতিহীন স্থান আবাদ করে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গড়ে তোলেন। এ কাজ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল কেননা তাঁর অর্থের অভাব ছিল না, উদ্যম ও উদ্যোগের কমতি ছিল না সর্বোপরি ছিল নিবেদিত প্রাণ একদল শিষ্য। কাজেই এখানে তিনি হর্মরাজি নির্মাণের সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। এজন্য স্থাপন করেন নির্মাণ কাজে সহযোগী একটি কারখানা। এ কারখানায় সুরকি ভাঙার জন্য ৬০ থেকে ১০০টি ঢেকি সবসময় প্রস্তুত থাকত। এ কাজের জন্য তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যেমন তেমনি দিল্লী থেকেও কারিগর সংগ্রহ করেছিলেন। এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই তিনি মূলত এ শহরের নাম রাখেন খলিফাতাবাদ বা খলিফাতে আবাদ বা প্রতিনিধির কর্মস্থল। এর অন্য নাম হাবেলী কসবা অর্থাৎ বাসস্থানের শহর।[৯১৯]

বাংলার একমাত্র সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহকে ঢাকায় প্রাপ্ত ৮৬৩হিজরি /১৪৫৭ খৃষ্টাব্দের একটি শিলালিপিতে এবং তাঁর কয়েকটি মুদ্রাতে 'খলীফা' উপাধিতে ভূষিত হতে দেখা যায়। সম্ভবত সুলতানের এ উপাধির প্রতি সম্মানার্থে খান জাহান তার নবনির্মিত শহরের নাম রাখেন খলিফাতাবাদ।[৯২০]

খান জাহান (র) তাঁর রাজধানী শহরের নাম খলিফাতাবাদ বা খলিফাতে আবাদ রাখায় প্রতীয়মান হয়, তিনি স্বাধীন শাসক ছিলেন না। তিনি ছিলেন কোন শাসকের প্রতিনিধি। এখন প্রতিনিধি অর্থে তিনি দিল্লীর সুলতানের নাকি বঙ্গের স্বাধীন সুলতানের প্রতিনিধি - সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ সিদ্ধান্তের ব্যাপার। দিল্লীর সুলতানের সাথে তার কোন সম্পর্ক বা যোগাযোগ থাকলে তা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকত। ঐতিহাসিক কাশিম ফেরেশতা, জিয়া বারানী, আব্দুল কাদির বদাউনী প্রমুখ সমসাময়িক বিখ্যাত ইতিহাসবিদগণের লেখায় এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই। বাগেরহাট থেকে দিল্লী পর্যন্ত সংবাদ আদান প্রদান বা চলাচলেরও কোন ব্যবস্থা তিনি রাখেন নি। তনি মূলত দিল্লীর শাসক ও তাদের ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখার ইচ্ছা থেকেই এই দুর্গম স্থানে নিজের বসতি নির্মাণ করেছিলেন। কাজেই এটা বলা যায় যে, তিনি স্বাধীন শাসক হোন বা না হোন তিনি কখনোই দিল্লীর কোন শাসকের প্রতিনিধিত্ব করেন নি।[৯২১]

খান জাহান (র) তাঁর মুর্শিদ এবং বাল্যশিক্ষক নূর কুতুব উল আলমের নির্দেশে দক্ষিণ বঙ্গে ইসলাম প্রচার করতে আসেন বলে কোন শাসকের সরাসরি প্রতিনিধিত্ব করেন নি। তবে সে সময়ে বাংলা অবশ্যই গৌড় রাজ্যের অধীন ছিল। সম্ভবত নূর কুতুব উল আলমের প্রতি জৌনপুর ও গৌড়ের সুলতানদের প্রবল শ্রদ্ধাবোধ থাকার কারণে তাঁর আধ্যাত্মিক শিষ্য খান জাহান (র) এর সাথে অন্যান্য রাজ প্রতিনিধিদের মত আচরণ করা হয় নি। বরং তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চোখে দেখা হত অর্থাৎ সম্মানের চোখে দেখা হত। যে কারণে তিনি স্বাধীন শাসক না হয়েও খলিফাতাবাদ শাসন করতেন মোটামুটি স্বাধীনভাবেই।[৯২২]

তবে তাঁর ইসলাম প্রচার, বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নিজের ইচ্ছা ও বিবেচনায় শহর প্রতিষ্ঠা ও শাসনকেন্দ্র স্থাপন এবং প্রাসঙ্গিক আরো বিষয় প্রমাণ করে প্রথম দিকে তিনি স্বাধীনভাবেই শাসনকাজ পরিচালনা করতেন। এ এলাকার জনগণ সঙ্কটকালে তাঁর কল্যাণময় নেতৃত্ব পেয়ে নিজেদেরকে ধন্য মনে করেছিল।

---

[৯১৮] নূরুল্লাহ মাসুম, প্রাগুক্ত, পৃ.১৫

[৯১৯] এ এফ এম আবদুল জলীল, *খান জাহান আলী,* প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫-৬৭

[৯২০] ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ, *সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ,* নওরোজ কিতাবমহল, ঢাকা – ১৯৬৯, পৃ.২০৪

[৯২১] এ এফ এম আবদুল জলীল, *খান জাহান আলী,* প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮

[৯২২] নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৮

Dhaka University Institutional Repository

একটি অনাবাদকৃত স্থান আবাদ করে সেখানে বসতি স্থাপন ও শাসন পরিচালনার জন্য স্বাভাবিক কারণেই গৌড়ের স্বাধীন সুলতান কোন আপত্তি করেন নাই। বিশেষত তিনি যখন কোন যুদ্ধ করেন নি এবং যুদ্ধ করে দেশ জয়ের বা দখলের কোন ইচ্ছাও তার মধ্যে ক্রিয়াশীল দেখা যায় নি। তাছাড়া তখন গৌড় ছিল স্বাধীন সাম্রাজ্য। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ও তাঁর পুত্র সেকেন্দার শাহ দিল্লীর তুঘলকদের সাথে যুদ্ধ করে বঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন। যে জন্যে বাংলাদেশের কোথাও দিল্লীর শাসকদের কোন আধিপত্য ছিল না। কাজেই বাংলাদেশের সীমানায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে দিল্লীর শাসকদের আনুগত্য স্বীকার করা বা তাদের প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়টি যৌক্তিক নয়। বরং এটা সম্ভব যে, রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর খান জাহান (র) গৌড়ের স্বাধীন সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি নিজের এলাকার নাম রাখেন খলিফাতাবাদ এবং নিজে সুলতানের প্রতিনিধি হিসেবেই শাসন পরিচালনা করতে থাকেন।[১২৩]

খান জাহান (র) যে নিজেকে স্বাধীন শাসক ঘোষণা করেন নি তার বড় প্রমাণ হল, নিজ নামে তিনি কোন মুদ্রা প্রচলন করেন নি। তাঁর খলিফাতাবাদ রাজ্যে বিভিন্ন সময়ের প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কোন মুদ্রাতেই তাঁর নামাঙ্কিত পাওয়া যায় নি। সমাধিলিপি থেকে জানা যায়, ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ ১৪৪২-১৪৬০ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৪৫৪ সালের একটি মুদ্রায় মাহামুদাবাদের উল্লেখ আছে। মাহমুদাবাদ যশোর জেলার অন্তর্গত। মাহমুদ শাহের পর তার পুত্র বরবক শাহ সুলতান হন। সুন্দরবন সংলগ্ন বরিশালের অন্তর্গত পটুয়াখালী মহাকুমার মির্জাগঞ্জের নিকট মসজিদবাড়ি গ্রামের একটি মসজিদের আরবি লিপি হতে জানা যায় যে, তা সুলতান বরবক শাহের নির্দেশে নির্মিত হয়েছিল। পটুয়াখালী খলিফাতাবাদের শেষ সীমায় অবস্থিত। কাজেই সহজেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, খলিতফাতাবাদ বা বাগেরহাট অঞ্চল গৌড় সুলতানের অধীন ছিল।[১২৪]

খলিফাতাবাদ শহর গড়ে উঠেছিল বহু বছর ধরে। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের সময় রাজা তোডরমল বঙ্গদেশ জরিপ করে যে রাজস্ব তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন তাতে পরগণা খলিফাতাবাদ নামে একটি বিভাগ দেখা যায়। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে খলিফাতাবাদ ও অন্যান্য ৩৪টি পরগণার রাজস্ব ১,৩৫,০৫৩ টাকায় পৌঁছেছিল।[১২৫]

খলিতাফাতাবাদ নগরী ছিল সুরক্ষিত। প্রত্যেক রাস্তার প্রবেশদ্বারে রক্ষীদের অবস্থানের ব্যবস্থা ছিল। নূরুল আমিন হাইস্কুলের উত্তরে খান জাহান (র) একটি সরাইখানা গড়ে তুলেছিলেন। এখানে বহু আগন্তুক অবস্থান গ্রহণ করতেন। খান জাহান (র) এর সকল ব্যয়ভার বহন করতেন। এ সরাইখানা থেকেই বাগেরহাটের সোরাই বা সরই গ্রামের উৎপত্তি হয়েছে।[১২৬]

খান জাহান (র) এর একটি সেনাদল ছিল বলে জানা যায়, কিন্তু এ সেনাদলের সাহায্যে তিনি দেশ জয় করেছেন বলে জানা যায় না। চট্টগ্রামের সাথে সম্পর্ক ছিল। স্থাপত্য কাজের জন্য তিনি সেখান থেকে নদীপথে পাথর আনাতেন। খুলনায় জাহাযঘাটা নামক স্থানে তার মালপত্র নৌপথে এসে পৌঁছতো।[১২৭]

কোন এক কারণে বৃদ্ধ বয়সে খান জাহান (র) তাঁর আবাসস্থল পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেন। অনুমান করা হয়, ১৪৫০ সালের দিকে তিনি বর্তমান সমাধি স্থলে আবাসস্থল গড়ে তোলেন।

খানজাহানের সমাধি সৌধ একগম্বুজ বিশিষ্ট। এর উপর কিলক চিহ্নের মত অর্ধচন্দ্রাকৃতির আলোক ছিল। সোনালী বর্ণের এ গোলাকৃতি বস্তুটি সূর্যের আলোর সাথে সাথে বৃত্তাকারে ঘুরতো। ইংরেজ আমলে কেউ এটি অপসারিত করেছে। সৌধের ছাদের দক্ষিণে দুটি স্তম্ভের উপর দুটি সোনালী বর্ণের কলস ছিল। এর চারদিক দেয়ালবেষ্টিত এবং এ দেয়ালের পরিধি চার হাত। সৌধের ভেতরে আরো একটি দেয়াল আছে। এর বেষ্টনি ৩৪ হাত। এর চার কোণে চারটি নাতিদীর্ঘ স্তম্ভ দেয়ালের সাথে গাঁথা আছে। সুন্দরবন অঞ্চলের লবণাক্ততার কথা বিবেচনা করে খান জাহান (র)

---

[১২৩] এ এফ এম আবদুল জলীল, *হযরত খান জাহান আলী*, পৃ.৬৮

[১২৪] প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯

[১২৫] প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯-৭০

[১২৬] প্রাগুক্ত, পৃ.৭২-৭৩

[১২৭] *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৮১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

নিজ সমাধি সৌধ নির্মাণের সময় এর দেয়ালের নিচের দিকে প্রায় ৪ফুট পর্যন্ত পাথরের লেয়ার দিয়েছিলেন। এ গাঁথুনি এখনো অটুট আছে।[৯২৮]

খান জাহান (র) এর সমাধি সৌধ খাঞ্জেলী দরগাহ নামেই জনসাধারণ্যে বিশেষভাবে পরিচিত। দরগায় খাদেমদের ফকির বলে অভিহিত করা হয়। তীর্থস্থানে ফকির সাহেবদের পাণ্ডাদের অত্যাচারে তীর্থ যাত্রীদেরকে নিঃস্ব ও নির্যাতিত করার বিবিধ প্রক্রিয়া তাদের জানা ছিল। ধর্মান্ধ যাত্রীদল নির্বিচারে তাদের যুলুম, অত্যাচর সহ্য করে। তারা ছাগল, মুরগি প্রভৃতি কুমিরের নামে আত্মসাত করে।[৯২৯] স্থানীয় ফকিরেরা নিজেদেরকে খান জাহান (র) এর বংশধর বলে দাবি করে। অথচ তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি বা উত্তরাধিকারী ছিল না।

খান জাহান (র) এর সমাধি সৌধে সাধারণত ইসলামী আকীদা সম্পর্কে অজ্ঞ অনেক শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষ ভীর করে। তারা এখানে তাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য মানত করে। আল্লাহর নিকট সাহায্য না চেয়ে মৃত পীরের কাছে সাহায্য চায়। কেউ কেউ এখানে এসে কবরে সিজদাও করে থাকে। আল্লাহর কাছে সাহায্য না চেয়ে এভাবে কোন জীবিত বা মৃত মানুষের কাছে সাহায্য চাওয়া বা কবরে মানত ও সিজদা করা সুস্পষ্ট শিরক।

খান জাহান (র) তাঁর বৃহত্তম দীঘি 'খাঞ্জালী' খনন করার সময় একটি কালো পাথরের ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি লাভ করেন। ইসলামের প্রকৃত অনুসারী হিসেবে তিনি ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণু ব্যক্তি। তাই মূর্তির কোন ক্ষতি না করে তিনি এটাকে স্থানীয় হিন্দুদের দাবি অনুসারে মহেশচন্দ্র বক্ষচারী নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করেন। তারা এ মূর্তিকে শিব জ্ঞানে পূজা করতে থাকেন। এ মূর্তিকে ঘিরে অনেক উপকথা প্রচলিত থাকলেও তার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।[৯৩০]

খাঞ্জালী দীঘিতে বসবাসরত কালা পাহাড় ও ধলা পাহাড় এবং তাদের বংশধর কুমিরগুলো নিয়ে ভক্তদের মাঝে রয়েছে অলীক বিশ্বাস। ভক্তরা মনে করে, এগুলো কুমির নয়। খান জাহান (র) কিছু দুষ্ট জিন্নকে অলৌকিক ক্ষমতাবলে কুমির করে রেখেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এ দুটো খান জাহান (র) এর ঘোড়া। কারো কারো মতে, এগুলো কুমিরই। সে সময়ে এবং এখনো সুন্দরবন এলাকায় কুমির ছিল সুলভ। এরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর প্রাণী। মানুষ খেকো এবং মাংসাসি হওয়ার জন্যই খান জাহান (র) এগুলোকে তাঁর দীঘির পাহারাদার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন যাতে কেউ দীঘির পানি অপবিত্র না করতে পারে। প্রকৃত ব্যাপার সম্ভবত এই যে, সে সময়ে এ স্থানে ছিল সমুদ্রের অধিকতর নিকটবর্তী এবং এখান দিয়ে কিছু বড় বড় নদীও প্রবাহিত ছিল। এখানকার বিলে খালে পর্যন্ত অসংখ্য কুমির বসবাস করত। বিশালকায় দীঘির মধ্যে নিয়মিত খাদ্য পেয়ে খান জাহান (র) এর সময়ে বা তার পরবর্তীকালে কুমিরগুলো এখানে স্থায়ী আবাস গড়ে তোলে।[৯৩১] কুমিরগুলো মানুষ শিকার করে না এটা ঠিক না। আসল কথা হল, এগুলোর মানুষ শিকার প্রয়োজন পড়ে না। খান জাহান (র) এর সময়ে এবং এর পরবর্তীকালে এদের কখনোই খাবারের অভাব হয় নি বলেই তারা মানুষ শিকার থেকে বিরত ছিল। পরবর্তীকালে মাযার সংরক্ষক কিছু দুষ্ট লোকের কারণে কুমির যখন নিয়মিত খাবার পেত না তখন তারা কিন্তু বেশ কিছু মানুষ শিকারের ঘটনা ঘটায়।[৯৩২]

আজকের দিনে এবং আগেও বহু অভিভাবক তাদের সন্তানদের রোগমুক্তি কামনায় কুমিরের উদ্দেশ্যে মুরগি, ছাগল, গরু ইত্যাদি মানত করে থাকে। রোগ দেবার মালিক আল্লাহ পাক, রোগ থেকে মুক্তি দেয়ার মালিকও তিনিই। কেউ অসুস্থ হলে তার যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা আল্লাহ তাআলারই হুকুম। কিন্তু কুমিরের কাছে মানত করা সরাসরি আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক করার শামিল। এ ধরনের মানতে রোগমুক্তি ঘটার কোন কারণ নেই। বরং 'একাজটি মস্তবড় গুনাহের কাজ।[৯৩৩]

---

[৯২৮] এ এফ এম আবদুল জলীল, *হযরত খান জাহান আলী*, প্রাগুক্ত, পৃ.৮২-৮৩

[৯২৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

[৯৩০] প্রাগুক্ত, পৃ.১০৬

[৯৩১] এ এফ এম আবদুল জলীল, *সুন্দর বনের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৬৯-৭০

[৯৩২] প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭১-৭৫

[৯৩৩] নূরুল্লাহ মাসুম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টিতে খান জাহান (র) বীরযোদ্ধা, ধর্মপ্রচারক, সমাজ সংস্কারক, প্রজাহিতৈষী এবং সমাজকর্মী। সর্বসাধারণ অবশ্য তাঁর এত পরিচয় মনে রাখে নি। তাদের কাছে খান জাহান (র) ছিলেন আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন এক সাধক পুরুষ। জীবন সায়াহ্নে তিনি নিজ দরগায় বসে মুরাকাবা ও মুশাহাদায় কালাতিপাত করেন।[৯৩৪]

খান জাহান (র) এর সমাধি সৌধ ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। এটি একটি বর্গাকৃতি সৌধ। ৪৫´ × ৪৫´ অন্তর্ভাগ, অষ্টকৌণিক; ৪৫´ ব্যাসযুক্ত, ৪৭´ উচ্চ মিনার। খান জাহান পরিণত বয়সে এখানে নিজের সমাধি, মসজিদ ও দীঘি প্রস্তুত করেন। মেঝের উপরস্থ কবরের স্মৃতি লেখা হতে জানা যায়, তার মৃত্যুকাল ২৬/১২/৮৬৩ হিজরি (২২/১০/১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ)। নিকটেই অনুরূপ আকৃতির মসজিদ। এখানে বহুলোক যিয়ারত ও মানত করে। সম্পূর্ণ এলাকাকে দরগাহ বলা হয়। চৈত্র-পূর্নিমাতে মেলা বসে।[৯৩৫]

খান জাহান (র) এর ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সমাধিলিপি থেকে। তিনি তথাকথিত মুসলিম নামধারী শাসক মাত্র ছিলেন না আবার সংসার ত্যাগী সাধুর জীবনও তাঁর ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সা) এর আদর্শের যথাযথ অনুসরণের জন্য তিনি তাঁর মতই জীবনের সকল দিক ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সমাধি সৌধের চারকোণে আবুবকর (রা), উমর (রা), উসমান (রা) ও আলী (রা) এর নাম লেখা আছে। প্রত্যেক খলীফার নামে আগে 'ইলাহি বিহুরমাতি' এবং শেষে 'রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু' লেখা আছে। এ লেখনি প্রমাণ করে শাসনকাজে তিনি খুলাফা ই রাশিদার আদর্শ পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিলেন।[৯৩৬]

কবরের চারপাশে আরবি ভাষায় লেখা আছে, 'মান মাতা গারীবান ফাকাদ মাতা শাহীদান' বা যে ব্যক্তি মুসাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল সে শহীদের মৃত্যুবরণ করল।' এখানে অর্ধগোলাকৃতি মাছের পিঠের মত প্রশস্ত পাথরের উপর লিখিত হয়েছে – 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।' উত্তর দিকের উপরের পাথরে কালিমা তায়্যিবা ও কালিমা শাহাদাত আরবি ভাষায় লিখিত হয়েছে। উত্তরদিকে আরবিতে লেখা হয়েছে –
'হাযিহি রওযাতুম মুবারাকাতুন মির রিয়াজিল জান্নাতি লি খানিল আযম খানিজাহান আলাইহির রাহমাতু ওরিযওয়ানুত্তাহরিরি ফী ছিত্তাতি ইশরিনা মিন জিলাহাজ ওয়াছালাছা ছিত্তিনা আমান ওয়া ছামানিয়াতা মিয়াতিন'।[৯৩৭]
'খান ই আযম খানজাহানের এ পবিত্র সমাধি জান্নাতের বাগান বিশেষ। তাঁর উপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। তারিখ ২৬ জিলহজ হিজরি ৮৬৩।'

তুর্ক আফগান আমলে প্রধান সেনাপতির পদবী ছিল খান ই আযম। খান জাহান (র) যে স্বাধীন শাসক ছিলেন না তা তাঁর এ উপাধি থেকেও প্রমাণিত হয়। কেননা তিনি স্বাধীন শাসক হলে তাঁর কবরে তা উল্লেখ থাকত এবং তিনি সুলতান বা এ জাতীয় কোন উপাধি গ্রহণ করতেন। তা না করে খান ই আযম উপাধি উল্লেখ করার তাৎপর্য হল, তিনি একজন সেনাপতি ছিলেন।[৯৩৮] উত্তর দেয়ালে উপরোক্ত লেখার পাশাপাশি লেখা হয়েছে জিব্রাঈল, ইসরাফীল, মীকাঈল ও আযরাঈল (আ) – এ চার ফেরেশতার নাম।
ইসলামে প্রগাঢ় অনুরাগ, এর পূর্ণ অনুশীলন এবং মানবসেবায় খান জাহান (র) অসংখ্য নিদর্শন রেখে গিয়েছেন। কবরের দক্ষিণ দিকে আরবি ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে –
'আদ্দুনিয়া আউয়ালুহা বুকাউন, ওয়া আওছাতুহা আনাউন ওয়া আখিরুহা ফানাউন'।[৯৩৯]
'দুনিয়া এমন এক স্থান যার শুরুতে রয়েছে কান্না, মধ্যাবস্থায় দুঃখ-কষ্ট এবং সবশেষে রয়েছে ধ্বংস।'

---

[৯৩৪] এ এফ এম আবদুল জলীল, *হযরত খান জাহান আলী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৯
৯৩৫ *বাংলা বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫০
[৯৩৬] এ এফ এম আবদুল জলীল, *হযরত খান জাহান আলী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১২
[৯৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ.১১৩
[৯৩৮] প্রাগুক্ত
[৯৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ.১১৪

Dhaka University Institutional Repository

কবরের দক্ষিণ দিকে ইরানের সূফী সাধকগণের অমর বাণী নিম্নোক্ত মূল্যবান উপদেশসহ আরবি-ফারসি ভাষায় লেখা হয়েছে। গবেষকগণ বলেছেন, আরবি ও ফারসি ভাষায় এটা মূলত একটি চমৎকার রুবাই বা চতুর্পদী। এমন চমৎকার হৃদয়স্পর্শী মর্মগাঁথা মানুষের হৃদয় আল্লাহপ্রেমে তন্ময় করে রাখে। লেখাটি হল –

'ইয়াদু মুরিদ ই দুস্তান
আল মাউতু হাক্কুন, আল মাউতু হাক্কুন।
খারাস্ত আন্দার বুস্তান
আল মাউতু হাক্কুন আল মাউতু হাক্কুন।
মরগাস্ত খামমিয় মুহকামি পিয়ে জুমলা ই জানান যু একিন
নাম হামচুদিগার দুষমুনান
আল মাউতু হাক্কুন আল মাউতু হাক্কুন।'[১৪০]

'হে সুহৃদ ভক্ত ও বন্ধুগণ! মনে রেখ, মৃত্যুই সত্য। সে কাউকে ছাড়বে না। মৃত্যু বাগানের মধ্যে অবস্থিত কাঁটার মত। মৃত্যু নিশ্চিত জেন। মৃত্যু প্রতিটি জীবের মহাশত্রু। অন্য সকল শত্রুর চেয়ে মৃত্যু ভয়ঙ্কর। মৃত্যু অনিবার্য জেন।'

উপরোক্ত লেখার সাথে আরো লেখা হয়েছে,

'ইয়া বুরহানু, ইয়া বাদীউছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদি খালিহনা মিনান নার'[১৪১]

কবরের দেয়ালের পাথরগুলোর দক্ষিণ দিকের মধ্যখানে একটি চারকোণা বৃত্ত আছে। বৃত্তটির চারপাশে আরবি ভাষায় লেখা হয়েছে – 'ইনতিকালাল আবদুদ্দায়ীফ আল মুহতাজু ইলা রাহমাতি রাব্বিল আলামীন আল মুহিব্বু লি আউলাদি ছাইয়িদিল মুরছালিন, আল মুখলিছু লিল উলামায়ির রাশিদীন, আল মুবগিদু লিল কুফফারি ওয়াল মুশরিকিন, আল মুঈনু লিল ইসলামী ওয়াল মুসলিমীন, উলুঘ খান জাহান আলাইহির রাহমাতু আল গুফরান মিন দারিদ্দুনিয়া ইলা দারিলবাকা, লায়লাতুল আরবাআ ফী ছিত্তাতি ওয়া ইশরিনা মিন জিলহজ, ওয়া দাফিনা ইয়াওমাল খামছি ফী ছাবয়াতি ওয়া ইশরিনা মিনহু, ফী ছানাতি ছালাছা ছিত্তিনা ওয়া ছামানিয়াতা।'

'এখানে আল্লাহর এক দীন দাসানুদাস মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। তিনি আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থী। তিনি নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহানবী (সা) এর বংশধরগণের প্রতি অনুরক্ত, যিনি সত্য পথানুসারী আলিমগণের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী এবং আল্লাহর নাফরমানকারীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন। যিনি ইসলাম ও মুসলমানদের সদা সাহায্যকারী। তাঁর নাম উলুঘ খান জাহান। আল্লাহ তাঁর প্রতি সদয় হোন। তিনি অস্থায়ী জগত হতে স্থায়ী জগতের আশায় ৮৬৩ হিজরি ২৬ জিলহজ বুধবার রাতে দুনিয়াত্যাগ করেছেন এবং ২৭জিলহজ বৃহস্পতিবার তাঁকে সমাহিত করা হয়।'[১৪২]

সমাধির পশ্চিম দেয়ালে কুরআন মাজীদের ১০৯তম সূরা আল কাফিরুন কুরআনের ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মহাগ্রন্থের এ শাশ্বত ঘোষণা খোদিত করে ইসলামের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা এবং পরধর্মে সহিষ্ণুতার চিরায়ত ইসলামী আদর্শই বিমূর্ত করে তোলা হয়েছে। সূরাটিতে আল্লাহ তাআলা মহানবী (সা) কে অকুণ্ঠচিত্তে এ ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'বল, হে কাফিররা! আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর। এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি। আমি ইবাদতকারী নই তার যার ইবাদত তোমরা করে আসছো এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি। তোমাদের দীন তোমাদের, আমার দীন আমার।'[১৪৩]

এর সাথে লেখা হয়েছে আল্লাহর প্রকৃতি ও শক্তিমত্তা এবং তাঁর অপরিসীম মাহাত্ম্য সম্পর্কে কুরআনের মাজীদের বিশেষায়িত আয়াত 'আয়াতুল কুরসি। ইরশাদ হয়েছে – 'আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পেছনে যা তিনি ইচ্ছা করেন তাছাড়া তাঁর

---

[১৪০] A H Dani, *Inscription of Bengal*, ibid. p. 28
[১৪১] এ এফ এম আবদুল জলীল, *হযরত খান জাহান আলী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১১৯
[১৪২] প্রাগুক্ত, পৃ.১১৫-১৬
[১৪৩] আল কুরআন/ ১০৯ : ১-৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত্ব করতে পারে না। তার কুরসী আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত; এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।[৯৪৪]

সমাধির পূর্বদিকের দেয়ালে কুরআন মাজীদের ১০২তম সূরা আত তাকাসুর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ ঘোষণায় ধন-সম্পদ নিয়ে মানুষের চিরন্তন মোহ ও লোভ সম্পর্কে আলোকপাত করে তা থেকে সতর্ক থাকতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন -- 'প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে। যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। এটা সঙ্গত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে। আবার বলি, এটা ঠিক নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে। সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে তোমরা অবশ্যই মোহাচ্ছন্ন হতে না। তোমরা জাহান্নাম দেখবেই। আবার বলি, তোমরা তো তা দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে, এরপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে নিআমত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।[৯৪৫]

সমাধির উত্তর-পশ্চিমদিকে কুরআন মাজীদের ১১২, ১১৩ ও ১১৪ নম্বর সূরা লিপিবদ্ধ আছে। এ সূরা তিনটি কুরআন মাজীদের তিনটি বিশেষ তাৎপর্যবহ সূরা। এগুলোতে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাষায় আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে –

'বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কাউকেও দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি এবং তাঁ সমতূল্য কেউ নেই।[৯৪৬]

'বল, আমি আশ্রয় নিচ্ছি উষার স্রষ্টার কাছে। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার ক্ষতি হতে, ক্ষতি হতে রাতের অন্ধকারের যখন তা গভীর হয়। এবং অনিষ্ট হতে সকল নারীদের, যারা গ্রন্থিতে ফুঁ দেয়। এবং অনিষ্ট হতে হিংসুকের যখন সে হিংসা করে।[৯৪৭]

'বল আমি আশ্রয় নিচ্ছি মানুষের রবের, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহের নিকট, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিন্নের মধ্যে হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।[৯৪৮]

সমাধিলিপির মধ্যে আসমাউল হুসনা বা আল্লাহ তাআলার সুন্দর সুন্দর নামসমূহ লিখিত রয়েছে। আল্লাহ তাআলার গুণবাচক এ সকল নামের সাথে লেখা হয়েছে – 'নাছরুন মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারীব – ওয়াবাশশিরিল মু'মিনীন।' 'আল্লাহর সাহায্য ও জয় নিকটবর্তী। মুমিনদের জন্য সুসংবাদ।'

খান জাহান (র) একজন প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন। দাম্ভিকতা তার অন্তরে স্থান পায় নি। শাহানশাহ বা শাসকদের মত কোনভাব তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি অন্তরে ছিলেন ফকির বা সর্বস্বত্যাগী। তাঁর হৃদয় ছিল আল্লাহপ্রেমে ভরপুর। গরীব দুঃখী মানুষের জন্য তিনি ছিলেন উদারহস্ত। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সরাইখানা বাবুর্চিখানা হতে দৈনিক বহু আগন্তুক, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি খাবার সংগ্রহ করত। ক্ষমতার গৌরবে তিনি কারো প্রতি কোন রকম অত্যাচার করেছেন এমন কোন ঘটনা শোনা যায় না। ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। জবরদস্তিমূলভাবে তিনি কাউকেও ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেন নি। 'দীনে কোন বাড়াবাড়ি নেই' – কুরআন মাজীদের এ শাশ্বত বাণী তিনি মনে প্রাণে কেবল ধারণই করেন নি বরং বাস্তবে তা প্রয়োগ করেও দেখিয়েছেন। জীবনের শেষদিনগুলো তিনি মুরাকাবা ও মুশাহাদায় কাটিয়ে দেন। দেশ-বিদেশ হতে দলে দলে লোক এসে তাঁর কথা শুনতো। হিন্দু-মুসলিম জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি ছিলেন সকল মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি ছিলেন একজন নিবেদিত সৈনিক, দক্ষ সেনাপতি। শেষ পর্যন্ত দক্ষতা ও কৃতিত্বে তিনি প্রধান সেনাপতির পদেও বরিত হয়েছিলেন (খান ই আযম)। সিলেটের শাহজালাল (র) এর মত তিনিও ছিলেন সৈনিক দরবেশ। এ বীর শাসকের চারিত্রিক মাধুর্য এদেশের মানুষকে দারুনভাবে প্রভাবিত করেছে।[৯৪৯]

---

[৯৪৪] আল কুরআন/ ২ : ২৫৫

[৯৪৫] আল কুরআন/১০২: ১-৮

[৯৪৬] আল কুরআন/১১২ : ১-৪

[৯৪৭] আল কুরআর/১১৩ : ১-৫

[৯৪৮] আল কুরআন / ১১৪ : ১-৬

[৯৪৯] এ এফ এম আবদুল জলীল, *হযরত খান জাহান আলী*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৩

Dhaka University Institutional Repository

খান জাহান (র) জীবন সায়াহ্নে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্য নিজ আত্মাকে তৈরী করেছিলেন। মৃত্যুর আগেই নিজের সমাধি সৌধ প্রতিষ্ঠা এবং তাকে কুরআন-হাদীসের আয়াতমালা দিয়ে সজ্জিত করার বিষয়গুলো থেকে বিষয়টি প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

খান জাহান (র) মানবসেবাকেই আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের সম্পদ ও জীবন এ কাজে উৎসর্গ করেছিলেন। এ জন্যেই তিনি মুর্শিদ বা পীর। সুপেয় পানি প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য অসংখ্য দীঘি খনন, সহজ চলাচলের জন্য সড়ক নির্মাণ সর্বোপরি আনুষ্ঠানিক ইবাদত এবং শিক্ষা ও সামাজিক কেন্দ্র হিসেবে অগুণতি মসজিদ নির্মাণ করে তিনি মানবসেবায় অবিস্মরণীয় অবদান রেখে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

ইসলামের অনুশাসন মেনে চলা এবং সে আলোকে শাসন ও সেবা পরিচালনা খান জাহান (র) এর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তাঁর কবরের দেয়ালে দেয়ালে খোদিত কুরআনের বাণী, আরবি ও ফার্সি ভাষায় লেখা উপদেশসমূহ হতে তাঁর শেষ জীবনের মনোভাব সহজেই অনুধাবন করা যায়। আল্লাহ তাআলার প্রতি তাঁর ছিল নিঃশর্ত আনুগত্য, নিঃসংশয় প্রেম। আল্লাহর রাসূল (সা) এর প্রতি সীমাহীন অনুরাগ। খুলাফা ই রাশিদার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি শাসন কাজে ইসলামের পূর্ণ অনুশীলনের প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি ছিলেন সুবিচারক, ন্যায় পরায়ণ এবং যুগশ্রেষ্ঠ সাধক। তাঁর শাসনকালে কোন ধরনের বিদ্রোহ, বিশৃংখলা বা ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের কথা জানা যায় না। শান্তি ও সাম্যের প্রতীক হিসেবে তিনি ইতিহাসখ্যাত 'মাৎসন্যা'য় বা অরাজকতার যুগে দক্ষিণ বঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

খান জাহান (র) কেমন সাধক ও সংযমী পুরুষ ছিলেন তার তার কবরের গায়ে লেখা বিভিন্ন বাণী থেকেই জানা যায়। নিজেকে তিনি একজন সহায় সম্বলহীন আগন্তুক হিসেবে পরিচিত করেছেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রেখেছেন। বীর সৈনিক হয়েও আত্মীয় পরিজন ত্যাগ করে মানব সেবা আর ইসলাম প্রচারের জন্য সুদূর বিদেশ বিভূঁইয়ে মৃত্যুবরণ করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। আত্মত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত সমকালীন ইতিহাসে আর নেই।

খান জাহান (র) শিক্ষানুরাগী শাসক ছিলেন। অভিনব কারুকাজ দিয়ে তিনি মসজিদগুলো সুসজ্জিত করেছেন। তাঁর স্থাপত্য শিল্প একদিকে যেমন তুঘলক স্থাপত্যের নিদর্শন অন্যদিকে তেমনি গৌড়িয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অনুরূপ। সড়ক নির্মাণে তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা অভিনব ও কালোত্তীর্ণ। তাঁর অধিকাংশ নির্মাতই এদেশী।[৯৫০]

খান জাহান (র) এর কোন উত্তরসূরী নেই।[৯৫১] সাধক পুরুষ খান জাহান (র) এর মৃত্যুর পাঁচশতাব্দীর অধিক সময় পরও মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। আজো হাজারো ভক্ত তাঁর গুণগান করে বেড়ায়। তাঁর মহত্বের কথা প্রচার করে থাকে। তবে কিছু সংখ্যক ভক্ত জেনে বা না জেনে তাঁকে নিয়ে এমন সব কর্মকাণ্ড বেড়াচ্ছে – যা ইসলাম বিরোধী। এক শ্রেণীর খাদিম ও ফকির নামধারী টাউটদের খপ্পরে পড়ে সাধারণ মানুষ মাযারে সিজদা পর্যন্ত করছে, যা ইসলাম সম্মত নয়। মুসলামনরা এক আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে মাথা নত করে না। কিন্তু সহজ সরল মানুষদেরকে এই সব ফকিররা বিপথে পরিচালিত করছে। বিশেষত বয়স্ক মহিলাদের মাযারে প্রবেশাধিকার না থাকায় গ্রাম্য অশিক্ষিত সহজ সরল মহিলারাই এদের শিকার হয় বেশি। কবর যিয়ারত করার বিধান রয়েছে ইসলামে, সিজদা করা নয়। কবরে মানতও ইসলাম বিরোধী।[৯৫২]

ইন্তিকালের পূর্বদিন খান জাহান (র) ষাট গম্বুজ মসজিদে বিরাট জামাআতে ফজর সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে তিনি নিম্নোক্ত নসীহ করেন।[৯৫৩]

'আমার ভাইয়েরা! সবসময় মনে রাখবে, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় এবং সর্বশক্তিমান। তিনিই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা। তিনিই আমাদের একমাত্র উপাস্য। আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। তাই মানুষকে বলা হয়েছে আশরাফুল মাখলুকাত। মনে রেখ, কখনো কোন অবস্থাতেই মানুষকে ঘৃণা বা অবহেলা করতে নেই। মানুষকে অবহেলা করে বা মানুষের মনে আঘাত দিয়ে আল্লাহর ইবাদত হয় না। হোক না সে বেদীন, বিধর্মী, কাফির বা মুনাফিক – তবুও সে আল্লাহরই বান্দা, তবুও সে মানুষ।

---

[৯৫০] প্রাগুক্ত, পৃ.১২৬

[৯৫১] মুহাম্মদ আবু তালেব মিয়া, *বাংলার গুণীজন*, ঢাকা – এপ্রিল, ১৯৯৪, পৃ.২০

[৯৫২] নূরুল্লাহ মাসুম, প্রাগুক্ত, পৃ.২৭-২৮

[৯৫৩] এম এ রহীম, প্রাগুক্ত, পৃ.৭০-৭৩

Dhaka University Institutional Repository

আমার ভাইয়েরা! সবসময় মনে রাখবে, তোমাদের দিলই শ্রেষ্ঠ কা'বা। কেননা প্রত্যেকের দিলের মধ্যেই আল্লাহ বিরাজ করছেন। দিলকে যত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে তোমরা ততই আল্লাহর প্রিয়পাত্র হবে, আল্লাহর রহমত লাভে সমর্থ হবে। আর তোমাদের দিলের ময়লা যদি দূর করতে না পার তাহলে তোমরা নিজেরাই অন্ধকারে হাবুডুবু খাবে ও আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। তোমাদের ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল-অমঙ্গল তোমাদের নিজেদেরই হাতে। আল্লাহ তোমাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে তোমরা তোমাদের ইচ্ছাশক্তিকে যদি সৎপথে পরিচালিত না কর তবে ক্ষতি তোমাদের নিজেদেরই, আল্লাহর তাতে কিছু যায় আসে না।

কোন মানুষকে পাপী বলে ঘৃণা বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কর না। আলোর পরশে যেমন অন্ধকার দূর হয়, পূত-পবিত্র ব্যক্তির সংস্পর্শে তেমনি মহাপাপীও শ্রেষ্ঠ ঈমানদার ও পূণ্যাত্মায় পরিণত হয়। হয়তো তোমার পরশ পেয়েও কোন মহাপাপীর জীবনে ঈমানের স্পন্দন এনে দিতে পারে। যদি তা হয়, তবে তুমি মহাভাগ্যবান। কেননা মহাবিচারকের নিকট ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তুমি আল্লাহর প্রিয় পাত্র বলে পরিগণিত হবে।

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি কর না। গরীব-দুঃখীর প্রতি সদয় আচরণ কর। অভাবগ্রস্তদের অভাব দূর করতে যথাসাধ্য চেষ্টা কর। যদি তার জন্য দুমুঠো খাবার সংগ্রহ করে দিতে পার তবে তো খুবই ভাল কথা, যদি তা নাও পার তবে অন্তত তাকে সান্ত্বনা দিয়ে কাছে বসাও, দুটো মিষ্টি কথা বলে তাকে বুঝিয়ে দাও যে, তোমার নিতান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তুমি তার কোন উপকার করতে পারলে না। সে যেন বুঝতে পারে যে, তার ব্যথায় তুমিও সত্যিই ব্যথিত।

পাপের পথে কখনো পা বাড়িয়ো না - তা যত ক্ষুদ্র পাপই হোক না কেন। আর পূণ্যকাজকে কখনো অবহেলা কর না তা যত ক্ষুদ্র পূণ্যই হোক না কেন। হয়তো কিয়ামাতের মহাবিচারে এক বিন্দু পূণ্যের অভাবে তুমি চতুর্দিক অন্ধকার দেখবে অথবা একবিন্দু পাপের জন্য বহুকাল তোমাকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। মনে রেখ, বিন্দু বিন্দু পানির সমষ্টিতে যেমন মহাসমুদ্রের সৃষ্টি হয়, বিন্দু বিন্দু পাপেও তেমনি মহাপাপের সৃষ্টি হয়।

আজ আমি তোমাদের যে সকল কথা বললাম এর কোন টিই নতুন কথা না - এগুলো তোমাদেরকে আগেও বলা হয়েছে। তারপরও আরেকবার মনে করিয়ে দিলাম। হয়তো আর কখনো এসকল কথা তোমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়ার সুযোগ পাব না।'

খান জাহান (র) এর নামে কিছু উপদেশ প্রচলিত রয়েছে। বলা হয়, এ উপদেশগুলো তিনি তাঁর শিষ্যদের দিয়েছেন। এ বিষয়টিও প্রমাণিত নয়। উপদেশগুলো হল -

সৃষ্টিকে দেখেই স্রষ্টাকে বুঝতে হবে - সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে স্রষ্টার মহিমা ও সৌন্দর্য।

মানুষ যদি আল্লাহর নির্দিষ্ট পথে চলে তবে আল্লাহ তাতে খুশি হন, আর তার ফলে নেমে আসে আল্লাহর রহমত। পক্ষান্তরে মানুষ আল্লাহর নাফরমানী করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, আর তার ফলে নেমে আসে আল্লাহর গযব।

এক আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই- সকল প্রশংসা ও গুণগাণ একমাত্র আল্লাহ তাআলাই প্রাপ্য।

আল্লাহর দৃষ্টিতে বাদশাহ ও ফকিরের কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু অন্তর নিয়ে। যার অন্তর যত পরিষ্কার আল্লাহর দৃষ্টিতে সে তত বড়। ঈমানের বলই হল প্রকৃত বল। এ বলের সাহায্যে বহু অসাধ্য কাজও সহজসাধ্য হয়।

আল্লাহর সৃষ্টিকে ভালবাসলে আল্লাহকেই ভালবাসা হয় আর সৃষ্টিকে কষ্ট দিলে স্বয়ং স্রষ্টাকেই কষ্ট দেয়া হয়।

মানুষের প্রতি অন্যায়-অত্যাচার প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর প্রতিই অত্যাচারের শামিল। যারা ভাল হতে ইচ্ছা করে আল্লাহ তাদেরকে ভাল করেন এবং ভালবাসেন। মানুষের মধ্যে ছোটো বড় বলে কোন ভেদাভেদ নেই। আল্লাহর রাজ্যে সবাই সমান, তবে যে যত বেশি পরিমাণে আল্লাহর আদেশ পালন করে, সে আল্লাহর তত অধিক প্রিয়পাত্র হয়।

যারা পরের উপর নির্ভর করে পরের খেয়ে বাঁচতে চায় তারা পরগাছা, তাদের জীবনের কোন মূল্য নেই। আল্লাহর দুনিয়ায় কাজ করে যেতে হবে। নিজের ও স্ত্রী পুত্রের ভরণ-পোষণের জন্য রুজী-রোজগারের উদ্দেশ্যে পরিশ্রম করাও ইবাদত। কখনো শ্রমে বিমুখ হয়ো না - কাজ করে যাও। সবসময় কাজের মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখ। সংসারের কাজ করাও আল্লাহর ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। অলস ব্যক্তি কখনো আল্লাহর প্রিয়পাত্র হতে পারে না। মসজিদে, মন্দিরে বা গির্জায় আল্লাহর আসন পাতা নেই। তিনি সবসময় মানুষের মনে বিরাজ করেন। মানুষ আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি। তাই মানুষের প্রাণে আঘাত দিয়ে বা মানুষকে কষ্ট দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করলে আল্লাহ তা কখনো কবুল করেন না।[১৫৬]

---

[১৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ.১০৭-১০৯

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

প্রকৃতপক্ষে চিন্তায়, দর্শনে, আদর্শে, হুকুম আহকাম প্রণয়নে এবং জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়নে ইসলাম একটি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক জীবনব্যবস্থা যা কুরআন-হাদীসের বিবৃতি, তাফসীরকার, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের বিশ্লেষণ এবং সকল প্রামাণ্য দলীল থেকে সাধারণভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তবে স্বাভাবিক বিবেচনায় আধ্যাত্মিক সাধনা বলতেই আমাদের চোখে সংসার বিবাগী, দুনিয়াত্যাগী, অবিন্যস্ত বেশভূষা ও পোশাক পরিচ্ছদের যে সাধক পুরুষের প্রতিকৃতি ভেসে ওঠে ইসলামী আধ্যাত্মিকতার সাথে তার তেমন কোন সম্পর্ক নেই।

একজন মানুষ যখন ইসলাম গ্রহণ করে, আল্লাহ তাআলা-রাসূল (সা)-অন্যান্য নবী রাসূলগণ, কিতাব, ফেরেশতা, আখিরাত প্রভৃতি বিষয়ে ঈমান পোষণের ঘোষণা দেয় তখনই তার আধ্যাত্মিক জগতে অভিষেক ঘটে। তবে এ জন্যে তাকে বাহ্যিক জগত ত্যাগ করতে হয় না। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন বর্জন করে সকল নিজস্ব ও সামষ্টিক দায়িত্ব অবহেলা করতে হয় না। বরং অর্পিত দায়িত্ব পালন করে তারমধ্যেই সে আধ্যাত্মিক সাধনা অব্যাহত রাখে।

ইসলামী আধ্যাত্মিকতার একমাত্র লক্ষ্য হল বাহ্যিকভাবে ইসলাম যে সকল হুকুম আহকাম পালনের আদেশ দিয়েছে আল্লাহর কাছে তাকে কবূলযোগ্য করে তোলার জন্য অন্তরকে শুদ্ধ ও সংশোধন করা। কেননা অন্তরের একনিষ্ঠতা ছাড়া ইবাদত করলে তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না।

যেমন একজন মানুষ বিয়ে করে সংসারী হয়। তার স্ত্রী বা স্বামী থাকে। আল্লাহর ইচ্ছায় জন্ম নেয় সন্তান সন্ততি। সহজাত প্রবৃত্তির জন্যই সে স্ত্রী বা স্বামীকে ভালবাসে। সন্তানদের জন্য স্নেহ মমতায় তার হৃদয় পরিপূর্ণ থাকে। কোন বাহ্যিক চাপ বা বাধ্যবাধকতা ছাড়াই সে নিজের ও পরিবারের লোকদের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করে। সাধারণ দৃষ্টিতে এ কাজগুলো নিতান্তই বৈষয়িক কাজ। কিন্তু ইসলামী জীবন দর্শনে এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে আধ্যাত্মিকতার অমিত সম্ভাবনা। লোকটি যদি বিয়ে করে আল্লাহর হুকুম মেনে, পাপাচার থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহর ইচ্ছানুসারে মানুষের স্বাভাবিক প্রজননকাজে অংশ নেওয়া ও তাঁর হুকুমে জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্য তাহলে তার বিয়েটি শুধু বিয়ে হয় না বরং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে পরিণত হয়। এমনিভাবে সে যদি স্ত্রী বা স্বামীকে ভালবাসে আল্লাহর আদেশ মেনে, সন্তান ও সংসারের প্রতি দায়িত্ব পালন করে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার প্রেরণা নিয়ে তাহলে তাও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে পরিণত হয়। এভাবে সকল বৈষয়িক কাজই আল্লাহর ইবাদত হয়ে উঠতে পারে যদি তার নেপথ্যে থাকে আল্লাহর হুকুম মানা ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের বাসনা। শুধু আল্লাহর হুকুম মেনে চলা ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের বাসনায় মানুষ যে কাজই করুক তা ইবাদতে পরিণত হবে এবং তা নিছক কোন বৈষয়িক কাজ হবে না।

আবার সাধারণ বিবেচনায় আধ্যাত্মিক কাজ মনে হয় এমন অনেক কাজও ইসলামী জীবন দর্শনে আধ্যাত্মিক কাজ হয় না। তার বদলে তা বরং ব্যক্তির ধ্বংসের কারণ হতে পারে। তা তার সাধনার বিষয় হলেও এমনকি বাহ্যত তা ইবাদত হলেও। যেমন তাহাজ্জুদের সালাত আদায় একটি অত্যন্ত গুরুত্ব আধ্যাত্মিক ইবাদত। ব্যক্তির আত্মশুদ্ধির জন্য এ সালাতকে বিশেষভাবে অনিবার্য মনে করা হয়। এখন কেউ যদি নিয়মিত তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে আর মনে মনে এ আশা পোষণ করে যে, এর ফলে লোকেরা তাকে ইবাদতগুজার মুত্তাকী হিসেবে শ্রদ্ধা করবে, সমাজে তার সম্মান ও প্রভাব বেড়ে যাবে এবং এ জন্য সে গোপন এ সালাতটির কথা সবাইকে বলে বেড়ায় তাহলে তাতো ইবাদত হবেই না বরং ব্যক্তির ধ্বংস ও খারাপ পরিণতির কারণ হবে। এখানে একটি সত্যিকারের আধ্যাত্মিক ইবাদতও আধ্যাত্মিক ইবাদত থাকতে পারলো না ব্যক্তির নিয়তের কারণে অন্যদিকে বাহ্যত বৈষয়িক কাজ হওয়ার পরও বিয়ে করা, সন্তান জন্ম দেয়া এবং তাদের লালন পালন করার মত কাজটিও আধ্যাত্মিক কাজে পরিণত হল।

মূলত ইসলামী আধ্যাত্মিকতা এমনই। এতে নিয়ত ও উদ্দেশ্যই মূল কথা। আর নিয়ত ও উদ্দেশ্য সহীহ করার জন্য আত্মশুদ্ধি অর্জনের নানা পথ ও পদ্ধতি কুরআন হাদীসে নির্দেশ করা আছে যার কোন একটি কাজ করার জন্যও সংসার ত্যাগী হওয়ার প্রয়োজন নেই।

গবেষণা অভিসন্দর্ভে আমরা পাঁচজন এমন ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছি যাদেরকে বিশ্বে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে ইসলামী আধ্যাত্মিক সাধনার পথিকৃত মনে করা হয়। ব্যাপক অনুসন্ধিৎসা নিয়ে দেখলে দেখা যাবে তাঁরা

Dhaka University Institutional Repository

শুধু তথাকথিত সাধনায় সময় ব্যয় করেন নি। বরং প্রাত্যহিক কাজ করার মধ্যেই সাধনা করেছেন। আর সকল কাজ শেষে বিশেষ যে ইবাদত করেছেন তাও করেছেন আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে। আল্লাহই তাঁর রাসূলকে কম ঘুমাবার এবং রাত জেগে ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন। আলোচিত পাঁচ সাধক ব্যক্তিত্বের সকলেই প্রকৃতপক্ষে এক একজন মুজাহিদের জীবন যাপন করেছেন। ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে, বাতিল শক্তির সাথে প্রয়োজনের সময় প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে এবং আল্লাহর হুকুম মেনে ঘর-সংসার-বিবাহ-সামাজিকতা-বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা) এর সুন্নাতের উপর নিষ্ঠার সাথে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন।

সুতরাং ইসলামে আধ্যাত্মিকতা ছিল, আছে, থাকবে তবে তাকে আলাদা করে দেখানো যাবে না। শরীরে আত্মার মত, দেহে রক্তপ্রবাহের মত তা থাকবে গোপনে কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব বাস্তব জীবনে সময়ই অনুভূত হতে থাকবে।

কারো মধ্যে বিশেষ কোন ক্ষমতার প্রকাশ দেখে বা কাউকে বিশেষ ধারার কোন সাধনায় নিরত দেখলেই তাকে আধ্যাত্মিক সাধক আল্লাহর ওলী বলে গণ্য করা যাবে না। এ ব্যাপারে আব্দুল কাদির জিলানী (র) এর একটি উদ্বৃতি উল্লেখ করে আমাদের আলোচনার সমাপ্তি টানছি। আব্দুল কাদির জিলানী (র) বলেন- 'তোমরা যদি কোন ব্যক্তিকে মহাশূণ্যে উড়ে যেতে দেখ, পানির উপর দিয়ে সোজা হেঁটে যেতে দেখ ও এক পলকে দু দিনের পথ অতিক্রম করতে দেখ অথচ সে শরীআতের বিরুদ্ধাচারণ করে তবে তার কারামতে বিশ্বাস কর না এবং তার ভণ্ডামীতে ধোঁকা খেয়ো না। কে ভণ্ড আর কে প্রকৃত ওলী তা পরীক্ষা করার জন্য তার গোটা জীবন ধারাকে শরীআতের কষ্টি পাথরের নিরিখে যাচাই কর ও পরীক্ষা কর। তার চরিত্র বিশ্লেষণ কর, তার মধ্যে অহঙ্কার ও রিয়া আছে কি না দেখ, দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা কী রকম তা নিরীক্ষণ কর, তার চরিত্রে উত্তম মানবীয় গুণ ও ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধের বাস্তব অনুসরণের মাত্রা কী রকম তা জান, যদি তার মধ্যে ইসলামী শরীআতের পূর্ণ আনুগত্যের নিষ্ঠাপূর্ণ প্রচেষ্টা লক্ষ্য কর, যদি তাকে আল্লাহ রাসূলের প্রতিষ্ঠিত শরীআতের পূর্ণ পাবন্দ দেখতে পাও তখন তার জীবনে সংঘটিত অলৌকিক ঘটনাবলীকে কারামাত বলে বিশ্বাস করতে পার। তার জীবন যদি রাসূল (সা) ও সাহাবী কিরামের জীবনের অনুসরণ হয় তখন তাকে ওলী বলে বিশ্বাস করতে পার। আর যদি ইসলামী শরীআতের বিরোধী কার্যকলাপ তার মধ্যে খুঁজে পাও, শরীআত বিরোধী প্রবণতা লক্ষ্য কর, দুনিয়ার পূজারী বলে প্রমাণিত হয় তবে জেনো সে হচ্ছে মানুষের পোশাকধারী জাজ্জ্বল্যমান শয়তান, তার ধোঁকা থেকে আল্লাহর পানাহ চাও।'[২৫৩]

বস্তুত ইসলামী আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা, বাহ্যিকতা, সামাজিকতা, কর্তব্যপরায়ণতা, সাধনা ও সত্যবাদিতা তথা জীবনের যে দিকের কথাই আলোচনা করা হোক না কেন তার সর্বশেষ কথা হল হযরত মুহাম্মদ (সা) এর জীবন চরিত। আল্লাহ তাআলা তাঁর জীবনকে বিশ্ববাসীর জন্য আদর্শ করেছেন। কাজেই তাঁর জীবনে যা ছিল না বা যার অনুশীলন তিনি করেন নি এমন কিছু তা যে নিয়তেই করা হোক, যেভাবেই করা কোন ভাবেই ইসলামী বিষয় হবে না। এ মূলনীতি বজায় রেখে মুসলিম যে কোন সাধনায় নিরত হতে পারে। রাসূল (সা) একজন আজন্ম নিষ্পাপ মানুষ হওয়ার পরও যখন আত্মশুদ্ধির সাধনায় নিরত হয়েছেন, তাঁর উম্মত হয়ে আমরা কেন তাতে আত্মনিয়োগ করব না? বরং আমরা আরো বেশি আত্মশুদ্ধির সাধনায় লিপ্ত হব। তাহলেই আমাদের দুনিয়ার জীবনের সাথে সাথে আখিরাতের জীবনেও শান্তি, সমৃদ্ধি আর কল্যাণময়তার সুপ্রভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য সহায়ক প্রকৃত সাধনায় আত্মনিয়োগ করা তৌফিক দিন। আমীন।

---

[২৫৩] অধ্যাপক হাসান আইয়ূব, প্রাগুক্ত, পৃ.২২৬

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১. আল কুরআন আল কারীম

২. ফখরুদ্দীন রাজী, *আত তাফসীর আল কবীর,* দার আল কুতুব, তেহরান, ১৪২০ হিজরি

৩. ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর (র), *তাফসীরে ইবনে কাছীর,* ইফাবা, মে ১৯৮৮

৪. সাইয়্যেদ কুতুব, *তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন,* দারুশ শরফ, বৈরুত, ১৯৮২

৫. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (র) *পবিত্র কোরআনুল করীম,* অনুবাদ ও সম্পাদনা : মাওলানা মুহিদউদ্দীন খান, খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা মোনাওয়ারা, ১৪১৩হিজরি

৬. সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, *তাফহীমুল কুরআন,* আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা – জুলাই, ১৯৮৫

৭. ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, *কুরআন পরিচিতি,* নুবালা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, মে ১৯৯২

৮. মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, *আল জামি আস সহীহ,* দেওবন্দ – ১৯৭৫

৯. মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, *আস সহীহ লি মুসলিম,* দেওবন্দ, ১৯৮৫

১০. মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত তিরমিযী, *আল জামি আত তিরমিযী,* দিল্লী, ১৯৮৫

১১. আহমদ ইবন শুআয়ব আন নাসাঈ, *সুনান,* দেওবন্দ, ১৯৮৫

১২. সুলায়মান ইবন আশআছ আস সিজিস্তানী, *সুনান,* দিল্লী, ১৯৮৫

১৩. মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ, *সুনান,* দার আল কুতুব, বৈরুত, ১৪১২ হিজরি

১৪. ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আব্দুল্লাহ, *মিশকাত আল মাসাবীহ,* দেওবন্দ, ১৯৮৫

১৫. ইমাম মুহাম্মাদ (র), *মুওয়াত্তা,* ইফাবা, ঢাকা, আগস্ট ১৯৮৮

১৬. আল্লামা জলীল আহসান নদভী, *রাহে আমল,* ঢাকা, ১৯৯০

১৭. ইমাম মুহীউদ্দীন ইয়াহইয়া আন নববী, *রিয়াদুস সালেহীন,* বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা–১৯৮৫

১৮. ইমাম আবূ হানীফা (র), *আল ফিকহুল আকবর,* দার আল কুতুব, বৈরুত, ১৪২০হি

১৯. আবুল হাসান আল আশআরী, *মাকালাতুল ইসলামিয়া ওয়া ইখতিলাফুল মুসলিমিন,* সম্পাদনা এম এ হামিদ, মাকতাবাত আল নাহদা আল মিসরিয়া, কায়রো ১৯৬৩

২০. আবু মুহাম্মদ ইবন হাজম, *কিতাবুল ফায়সাল ফীল আহওয়াল মিলাল ওয়ান নিহাল,* কায়রো, ১৯০৩

২১. আল বাগদাদী, *কিতাবুল ফারক বায়না ফারক,* মাতবাত আল মাআরিফ, কায়রো, ১৯১০

২২. আল শাহরাস্তানী, *কিতাবুল মিলাল ওয়ান নিহাল,* আল আজহার প্রেস, কায়রো, ১৯১০

২৩. আব্দুর রহমান আল ইজ্জ, *আল মাওয়াকিফ ফী ইলমিল কালাম,* মাতবাত আল মাআরিফ, কায়রো, ১৯৩৮

২৪. আবূ রায়হান আল বিরুনী, *কিতাবুল হিন্দ,* বৈরুত, ১৪১২ হিজরি

২৫. খালীক আহমদ নিজামী, *তারীখ মাশায়িখ ই চিশত,* দিল্লী, ১৯৭৬

২৬. ইবন বতুতা, *আযায়িবুল আসকার,* উর্দু অনুবাদ, লক্ষ্ণৌ, ১৪০২ হি

27. আব্দুর রহীম আল খাযূফ, *কিতাব আল ইনতিসার,* ক্যাথলিক প্রেস, বৈরুত, ১৯৫৭

28. আব্দুল হক দেহলবী, *আখবারুল আখয়ার,* দেওবন্দ, ১৩৮৭ হিজরি

২৯. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত *তাজরীদুস সিহাহ,* ইসলামক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭

৩০. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত *দীনীয়াত,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫

৩১. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২

৩২. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা, ঢাকা – ১৯৮৬

৩৩. সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত বাংলা বিশ্বকোষ, ঢাকা–১৯৭৫

৩৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলাম পরিচিতি,* আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা – জুলাই ১৯৭৯

৩৫. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আকায়েদুল ইসলাম,* কুতুবখানায়ে রশিদিয়া, ঢাকা, জুন – ১৯৯৭

৩৬. ইমাম গাযালী (র), *এহইয়াউ উলুমিদ্দীন,* ভাষান্তর : মুহিউদ্দীন খান, মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা – ২০০৪

৩৭. ইমাম গাযালী (র), *ইসলামী আকীদা,* অনু. মুহাম্মদ মূসা, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

৩৮. অধ্যাপক হাসান আইয়ুব, *ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি,* ইফাবা, ঢাকা – ফেব্রুয়ারি, ২০০৪

৩৯. মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, *ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ,* আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, নভেম্বর – ১৯৮৮

৪০. আন নাসাফী, *তানজীমুল ফারায়েদ আরবী–বাংলা শরহে আকাইদ লিন্নাসাফী,* নোয়াখালী–২০০৫

৪১. এ্যামবেসেডর ফুয়াদ আল খতীব, *ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা,* অনুবাদ : এ এন এম সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশ–সৌদী আরব মৈত্রী সমিতি, ঢাকা, জুলাই – ১৯৮০

৪২. প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, *ধর্মদর্শন,* ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ১৯৮৯

৪৩. ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী, *আত তাওহীদ : চিন্তা ক্ষেত্রে ও জীবনে এর তাৎপর্য,* বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ঢাকা, ১৯৯৮

৪৪. মওলানা এ এম এম সিরাজুল ইসলাম, *ঈমান পরিচিতি,* ইসলামিয়া কুতুব মহল, ঢাকা – ২০০১

৪৫. মোহাম্মদ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, *হাকীকতে তাওহীদ,* ইফাবা, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৫

৪৬. আব্দুস শহীদ নাসিম, *ঈমানের পরিচয়,* আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১

৪৭. মওলানা ইউসুফ, *দরসে আকিদাতুত তাহাবী,* উর্দূ শরাহ, আশরাফি বুক ডিপো, যশোর, ১৪০৯ হি

৪৮. এ এম এম সিরাজুল ইসলাম, *ঈমান পরিচিতি,* ইসলামিয়া কুরআন মহল, ঢাকা ২০০১

৪৯. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরীদী, *কুরআন সুন্নাহ ও যুক্তির আলোকে ইসলামী আকীদা,* আল আকাবা পাবলিকেশন্স, ঢাকা ১৪১৯ হি

৫০. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯২

৫১. ডঃ রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা,* সাহিত্য কুটির, বগুড়া – ১৯৮৪

৫২. ডঃ এম হুদা, *মুসলিম দর্শনের মূলতত্ত্ব,* ইউরেকা বুক হাউস, ঢাকা, মে ১৯৯৯

৫৩. ডঃ আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৮৫

৫৪. প্রফেসর এ কে এম আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা – ১৯৯০

৫৫. মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, *মুজাদ্দিদ ই আলফে সানী (র) এর কামিয়াবী ও কর্মপদ্ধতি,* হেযবুল্লাহ লাইব্রেরী, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৭৯

৫৬. এ এফ এম আবদুল আযীয ও এস এ সিদ্দীক খান, *মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র),* ইস্টবেঙ্গল বুক সিন্ডিকেট, প্রথম মুদ্রণ – নভেম্বর, ১৯৬১

৫৭. মাওলানা মোঃ তরিকুল ইসলাম, *মুজাদ্দিদ আলফে সানী (র),* বিউটি বুক হাউস, আগস্ট ১৯৯০

৫৮. মাওলানা নূরুর রহমান, *তাযকিরাতুল আউলিয়া,* এমদাদিয়া লাইব্রেরী, দ্বিতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ১৯৮৭।

৫৯. ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, *বাংলাদেশে ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশ,* অগ্রপথিক, ২/২/৮৯

৬০. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *শাহ জালাল (র),* ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৭

৬১. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *ইসলাম প্রসঙ্গ,* ঢাকা ১৯৭০

৬২. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *শাহ জালাল (র),* সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ জুন ১৯৯৫

৬৩. ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ, *আমাদের স্বাধীনতার এক বিস্মৃত অধ্যায় শাহজালাল (র),* অগ্রপথিক, ডিসেম্বর ১৪, ১৯৮৯

৬৪. ডঃ এম এ রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতি ইতিহাস,* অনুবাদ, মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, ঢাকা, ১৯৮২

৬৫. ডঃ এ কে এম আইয়ুব আলী, *খান জাহান,* ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

৬৬. নাসির হেলাল, *যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার,* সীমান্ত প্রকাশনী, ১৯৯১

৬৭. এ এফ এম আব্দুল জলিল, *সুন্দরবনের ইতিহাস,* ঢাকা – মার্চ ১৯৬৯

৬৮. মোঃ আবদুর রহিম, *হজরত খান জাহান আলী (র),* কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরী, বরিশাল, আষাঢ় ১৩৮০

৬৯. চৌধুরী শামসুর রহমান, *পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামের আলো,* পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৬৮

৭০. এ এফ এম আবদুল জলীল, *খান জাহান আলী,* হাবেলীবাগ পাবলিকেশন্স, খুলনা – এপ্রিল ১৯৭৮

৭১. হাসান আব্দুল কাইয়ুম, *যশোরে ইসলাম প্রচার,* (আসাদুজ্জামান আসাদ সম্পাদিত 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব লোকাল গভর্নমেন্ট জার্নাল, ঢাকা – ১৯৮৯

Dhaka University Institutional Repository

৭২. আব্দুল মান্নান তালিব, *বাংলাদেশে ইসলাম,* আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা – ১৯৮০
৭৩. গোলাম সাকলায়েন, *পূর্ব পাকিস্তানে সূফী–সাধক,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা – পৌষ, ১৩৬৮
৭৪. সতীশচন্দ্র মিত্র, *যশোহর খুলনার ইতিহাস,* কলিকাতা – ১৩২১
৭৫. মুহাম্মদ আবু তালিব, *যশোর জেলায় ইসলাম,* ঢাকা – ১৯৯১
৭৬. নূরুল্লাহ মাসুম, *দক্ষিণের বাদশাহ খান জাহান আলী (র),* ইফাবা, ঢাকা – এপ্রিল ১৯৯৬
৭৭. সিরাজ উদ্দীন আহমেদ, *বরিশালের ইতিহাস,* ঢাকা – ১৯৮২
৭৮. ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদ, *সূফীবাদ ও আমাদের সমাজ,* নওরোজ কিতাবমহল, ঢাকা – ১৯৬৯
৭৯. মুহাম্মদ আবূ তালেব মিয়া, *বাংলার গুণীজন,* ঢাকা – এপ্রিল, ১৯৯৪
৮০. রাগিব ইসফাহানী, *আল মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন,* মিসর, ১৪০৪ হি
৮১. মুহিউদ্দীন খান, *আল কাওসার আধুনিক আরবী–বাংলা অভিধান,* মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা–১৯৮৬
৮২. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান,* সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯৮
83. Mohammad Ali, Mohammad Moniruzzaman & Jahangir Tareque, ***Bangla Academy Bengali–English Dictionary,*** Bangla Academy Dhaka, 1994
৮৪. Sailendra Biswas, ***Samsad English – Bengali Dictionary,*** Sahitya Samsad, Calcutta, August 1997
৮৫. E. William Lane, ***Arabic English Lexicon***, Beirut, Librairie Du Liban, 1980
৮৬. A S Hornby, ***Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English,*** Oxford University Press, Sixth edition, 2002
৮৭. J. C. Jack, ***Bangal District Gazetteer, Bakerganj,*** London – 1918
৮৮. Hi Beveridge, ***The District of Bakerganj – Its history and Statistics,*** London, 1918
৮৯. Omaly, ***Khulna Gazetteer,*** London – 1945
৯০. Shamsud – Din Ahmed, ***Inscriptions of Bengal,*** Rajshahi – 1966
৯১. Anwar Husain, ***Khan Jehan Ali Khan,*** Pakistan Observer, October 10, 1956
৯২. Syed Murtaza Ali, ***Khan Jahan : The Saint of Bagerhat,*** Morning News Paper, November 14, 1963
৯৩. Dr. J. Wise, ***Notes on Shahjalal, the Patron Saint of Shihat***, quoted by H. Blochman, Contribution to the Geography, ***History of Bengal,*** 1873
৯৪. Muslim mystics, ***The New Encyclopedia Britannica,*** 15th ed
৯৫. Dr. Abdul Karim, ***Social History of Muslims in Bengal,*** Chittagong, 1965
৯৬. Saiyed Abdul Hai, ***Muslim Philosophy A Short Survey,*** Islamic Foundation Bangladesh, January 1985
৯৭. Dr. F.M. Moniruzzaman, ***The Glorious Islam,*** Zeenat Books, Dhaka, 1999
৯৮. J. Manchip White, ***Teach Your Self Anthropology,*** (Translated by Mahmuda Islam), Bangla Academy, Dhaka, 198
99. Ignaz Goldziher, ***Introduction to Islamic Theology and Law,*** London, 1981
100. M M Sharif (ed), ***A history of Muslim philosophy,*** Wiesbaden, OHO Harrassowitz, 1963
101. Plato, ***The Dialogues of Plato,*** tr. by B. Jowett, v. I, Clarendon Press, Oxford, 1953
102. Ralph M Mclnerny, ***A History of Western Philosophy,*** University of Notre Dame Press, 1963
103. A S Tritton, ***Muslim Theology***, Hyperion Press, Westport, Connecticut, 1981

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।